নিবেদিতা রচনা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক
ড. রবীন্দ্র গুপ্ত
শ্রীঅশোক ঘোষ

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন. কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
৫ পৌষ, ১৩৮৪
২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

প্রকাশক

শ্রীবিকাশ ঘোষ

বইপত্র

৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন,

কলিকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীঅভিজিৎ বসু

বিশ্বকোষ প্রেস

কলিকাতা-৯

বাঁধাই

শ্রীপ্রণব ঘোষ

কমল প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

গ্রাহক মূল্য—পাঁচ খণ্ডে মোট ৫০ টাকা

Nivedita Rachana Samgraha
the Works of Sister Nivedita :
Vol. I

নিবেদন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা—আমৃত্যু এই পরিচয় বহন করেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতা নাম গ্রহণের পর। এদেশের মানুষ পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে গ্রহণ করেছেন ভগিনী নিবেদিতা রূপে। ইংরাজী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার এ-যাবৎ প্রকাশিত যাবতীয় রচনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের এই প্রথম উদ্যোগ সেই শ্রদ্ধাবোধের প্রেরণায়। ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা নিয়েই এই উদ্যোগ সূচিত হল ভবিষ্যতে বাংলাভাষায় সমৃদ্ধতর সংস্করণের আশায়।

ভগিনী নিবেদিতা রচনাসমূহের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও বর্তমান সংস্করণের শেষ খণ্ডে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি আলোচনা প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গেই এই সংস্করণের পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা-সংশ্লিষ্ট তথ্যপঞ্জী ও পরিচয়পঞ্জীও শেষ খণ্ডে স্থান পাবে। প্রতি খণ্ডে মূল ইংরাজীভাষায় নিবেদিতা রচিত একাধিক রচনাও প্রকাশিত হবে বঙ্গানুবাদ সহ।

এই খণ্ডে অনুবাদ-কর্মে সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, দিলীপ ঘোষচৌধুরী, কিরণশংকর সিংহরায়, অনুপ মতিলাল ও জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী। তাঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রাহক তথা পাঠকদের কাছে অনুরোধ, এই সংস্করণের উন্নতিবিধানে যে কোন পরামর্শ থাকলে পাঠান—অবশ্যই তা সাদরে গৃহীত হবে। আশা করি সকলের মিলিত সহযোগিতায় এই কঠিন অথচ মহৎ উদ্যোগ সম্পন্ন হবে।

২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলকাতা-৯

বিনীত
প্রকাশক-পক্ষে
বিকাশ ঘোষ

সূচীপত্র

ভগিনী নিবেদিতা'র

(মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল)

বংশলতিকা

হ্যামিলটন—ম্যাক্‌ কাডেন
|
রিচার্ড হ্যামিলটন—এলিজাবেথ মার্ক
|
মেরী হ্যামিলটন
(১৮৪৫-১৯০৯)

জন নোবল—মার্গারেট এলিজাবেথ নীনাস
(১৭৮৮-১৮৪৪) (১৮-৯-১৮৭৩)
|
স্যামুয়েল নোবল
(১৮৪৩-১৮৭৭)

সন্তান:

- মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল (১৮৬৭-১৯১১)
- মেরী (মে)
- রিচমণ্ড নোবল

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে
কয়েকটি রচনা

আমাদের স্বামীজী ও তাঁর বাণী

স্বামী বিবেকানন্দের যে চার খণ্ড গ্রন্থাবলী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হচ্ছে তার ভেতর দিয়ে আমরা শুধু সাধারণভাবে জগৎবাসীর জন্যে উপদেশাবলীই পাইনি, হিন্দুধর্মের সন্ততিদের জন্য হিন্দু বিশ্বাসের একটি সনদও প্রাপ্ত হয়েছি। আধুনিক যুগের ব্যাপক ভাঙনের মাঝখানে হিন্দুধর্ম চেয়েছিল পাথরের মত কঠিন এবং দৃঢ় একটি আশ্রয়, যেখানে সে নিশ্চিন্তে নোঙর করতে পারে। চেয়েছিল একটি প্রামাণ্য উক্তি যার মধ্যে দিয়ে সে নিজ স্বরূপকে চিনতে পারে এবং তার এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী এবং রচনা।

অন্যান্য জায়গায় যেমন বলা হয়েছে, ইতিহাসে এই প্রথম একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মনীষীর দ্বারা সামগ্রিক হিন্দুধর্ম ব্যক্ত হল। আগামী যুগে যখন কোন হিন্দু হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাইবে, যখন কোন হিন্দু মা তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দেবেন পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম বিষয়ে তখন তারা প্রমাণ ও আলোর জন্য এই বইয়ের পাতা উল্টে দেখবেন। ইংরেজী ভাষা এদেশ থেকে উঠে যাওয়ার অনেকদিন পরেও ঐ ভাষাকে মাধ্যম করে জগতের কাছে যে উপহার দেওয়া হল তা পৃথিবীতে স্থায়ী হবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমানভাবে তার ফলপ্রাপ্তি ঘটবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল তার ভাবধারাগুলিকে সংগঠিত ও সুদৃঢ় করা। পৃথিবী চেয়েছিল একটি ধর্মবিশ্বাস যা সত্য সম্পর্কে নির্ভীক। এই দুটোই আমরা এখানে পাচ্ছি। সঙ্কটের সময় জাতীয় চেতনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে তাকে তাঁর কণ্ঠে বাঙ্ময় করেছিলেন যিনি, সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়ের চেয়ে সনাতন ধর্মের চিরকালীন বীর্যের মত, অতীতের মতই ভারত যে বর্তমানেও মহিমাযুক্ত, সে বিষয়ে আরও বড় প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটা যেন আগে থেকেই অনুমান করা ছিল যে নিজের সীমানার বাইরে ভারত শুধু তার অন্ন পরিবহণ করেই নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এই যে প্রথম এমন ঘটনা ঘটল তা নয়। এর আগেও একবার প্রতিবেশী দেশে জাতি-সংগঠনী ধর্মের বাণী পাঠিয়ে ভারতবর্ষ নিজস্ব চিন্তাধারার মহত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধ হয়েছিল—সেই আত্মগত ঐক্যের দ্বারাই আধুনিক হিন্দুধর্মের জন্ম হয়েছিল। আমরা কখনোই বিস্মৃত হতে পারি না যে, এই ভারতভূমিতেই প্রথম গুরু তাঁর শিষ্যকে আদেশ করেছিলেন, "যাও, পৃথিবীর সমস্ত জীবের কাছে এই ধর্মোপদেশ প্রচার কর।" এও সেই একই ভাবনা, একই ভালবাসার প্রেরণা নতুন রূপ নিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে যখন তিনি প্রতীচ্যের একটি বিশাল সম্মেলনে বলছেন: "একটি ধর্ম যদি সত্য হয় তবে অন্যগুলিও অবশ্যই সত্য হবে। এইজন্য হিন্দুধর্ম আমাদের যতটা তোমাদেরও ততটা।" আবার এই একই বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করতে গিয়ে বললেন, "আমরা হিন্দুরা শুধু পরধর্মসহিষ্ণু নই, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিই। আমরা মুসলমানদের মসজিদে যাই, জরথুষ্ট্রদের অগ্নি পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের

ক্রুশের সামনে জানু পেতে বসি। আমরা জানি যে ধর্মগুলি সে নিম্নতম জড়বাদ থেকে উচ্চতম পরমবাদ পর্যন্ত একটি অসীমকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।"

অতএব আমরা এই 'ফুলগুলিকে একত্রিত করে ভালবাসার সুতোয় গেঁথে উপাসনার জন্য একটি অপূর্ব মালা তৈরি করি'। এই বক্তার হৃদয়ে কেউই বিদেশী বা অপর ছিল না। তাঁর কাছে শুধু মানবজাতি ও সত্যের অস্তিত্ব ছিল।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায় যে যখন তিনি বলতে শুরু করেন তখন তাঁর বিষয় ছিল 'হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবধারা', কিন্তু যখন তিনি শেষ করলেন, হিন্দুধর্ম যেন নতুন করে সৃষ্ট হয়েছে। সেই মুহূর্তটি সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের একটা বড় অংশ ছিল পুরোপুরি প্রতীচ্যমনের প্রতিনিধি কিন্তু এদের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য ও প্রগতি ছিল। ইওরোপের সমস্ত জাতির মানুষই আমেরিকায় এসেছে এবং মুখ্যত চিকাগোতে যেখানে ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক কালে প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টতম যা, তার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররানীর সীমান্তে পাওয়া যাবে—মিচিগানের হ্রদের তীরে ঐ রানী পা ছড়িয়ে উত্তরের আলোকে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে বসে বসে চিন্তা করছেন। আধুনিক চেতনায় এমন জিনিস খুব কমই আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে ইওরোপের ঐতিহ্য থেকে খুব কমই পাওয়া গেছে যা চিকাগো নগরীতে আশ্রয় পায় নি। এবং এখানকার সৃষ্টি-শীল জীবন ও ব্যগ্র কৌতূহল আমাদের কারো কাছে বর্তমানে খুব বড় বিশৃঙ্খল বলে মনে হলেও তারা নিঃসন্দেহে মহিমাপূর্ণ ও ধীরে পরিণত মানব ঐক্যাদর্শ প্রকাশ করতে এগিয়ে চলেছে। এই ছিল সেখানকার মানসক্ষেত্র, মনোসাগর—তরুণ, উদ্বেল—আত্মবিশ্বাসে, শক্তিতে উচ্ছল—আর ছিল অনুসন্ধিৎসা ও সজাগতা। যখন বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠলেন তিনি এইসব অবস্থাগুলির মুখোমুখি। বিপরীত দিকে, তাঁর পেছনে ছিল এক প্রশান্ত মহাসাগর, যুগ-যুগান্তের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত। তাঁর পেছনে ছিল এমন একটা জগৎ যার দিনপঞ্জী শুরু হয়েছে বেদ, উপনিষদের দিন থেকে—এমন একটি জগৎ যার কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রায় শিশু; এমন একটি জগৎ যেখানে ধর্মব্যবস্থা বহু সম্প্রদায় অধ্যুষিত; একটি শান্ত দেশ যা গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যালোকে আচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধুলো যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিরা মাড়িয়ে চলেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁর পেছনে রয়েছে এক ভারতবর্ষ, হাজার হাজার বছরের জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সে অনেক কিছু প্রমাণ করেছে, পরীক্ষা করেছে, এবং অনেক কিছুই উপলব্ধ হয়েছে, শুধু তার নিজের ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে দেশের সব মানুষই কিছু কিছু মৌলিক ও প্রয়োজনীয় সত্য হিসেবে বহুদিন ধরে আঁকড়ে রয়েছে।

অতএব এগুলি ছিল দুটি মনের প্রবাহ, প্রাচ্য ও আধুনিক এই দুটি যেন চিন্তার বিশাল দুই নদী; ধর্মমহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গৈরিকবসনধারী ঐ পরিব্রাজক যেন সেই সময়ের জন্য হয়েছিলেন এদের মোহনা। নৈর্ব্যক্তিক এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে

সংঘটিত আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফসল হিসেবে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি রূপ পেয়েছিল।

কারণ নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ সেদিন বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি। এমন কি এই সুযোগে নিজের গুরুর কথা বলার সুবিধেও তিনি কাজে লাগান নি। এই দুটি জিনিসের পরিবর্তে তাঁর ভেতর দিয়ে বাঙ্ময় হয়েছিল ভারতীয় ধর্মচেতনা, তাঁর সমগ্র দেশবাসীর বাণী যা সমগ্র অতীতের দ্বারা নির্দিষ্ট। এবং যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনে অথবা মধ্যাহ্নে বক্তৃতা করছিলেন তখন প্রশান্ত মহাসাগরের আর এক প্রান্তে গোলার্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে ছায়ায় নিদ্রিত একটি জাতি তাদের দিকে অগ্রসরমান প্রত্যাবর্তিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করছিল, যে বাণী তাদের নিজেদের মহত্ত্ব ও শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবে।

একই মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পাশে ছিলেন আরও অনেকে যাঁরা তাঁরই মত, বিশেষ বিশেষ ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর গৌরব ছিল এই যে তিনি এমন এক ধর্মের প্রচারক হিসেবে এসেছিলেন যাঁর কাছে, স্বামীজীরই ভাষায়, এদের প্রত্যেকটি ছিল "বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নানা মানুষ-মানুষীর একই লক্ষ্যে পৌঁছবার অভিগমন।" তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন এমন একজনের কথা বলার জন্য যিনি তাদের সকলের কথা বলেছেন—তাদের একটি বা অপরটি সত্য, এবিষয়ে বা ও বিষয়ে, এ কারণে বা ও কারণে তা নয় বরং "একটি সুতোয় অনেক মুক্তোর মত তোমরা আমাতেই গাঁথা রয়েছ। যেখানেই দেখবে কোনো অতিশয় পবিত্রতা বা অতিশয় শক্তি মানুষকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করছে, জানবে সেখানেই আমি আছি।" হিন্দুর কাছে, বিবেকানন্দ বলেন, "মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না বরং সত্য থেকে সত্যে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে।" এইটা এক মুক্তির শিক্ষা, সেই তত্ত্ব—"ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে মানুষকে ব্রহ্ম হতে হবে" এবং ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পূর্ণতা পায় যখন সে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যায় "যিনি মৃত্যুর জগতে একমাত্র জীবন, নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বে যিনি একমাত্র অনড়, যিনি একমাত্র আত্মা এবং অন্যান্য জীবাত্মারা যাঁর কাছে মায়াময় বিকাশ মাত্র"—এই দুটি শিক্ষা দুটি পরম ও মহান সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, মানুষের ইতিহাসের চিরকালীন এবং জটিল অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে ঘোষণা করল ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ছোট্ট ভাষণটি ছিল তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সনদের মত। সামগ্রিক অর্থে বক্তা হিন্দুধর্মকে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অর্থ অধ্যাত্মতাৎপর্যে রূপান্তরিত করেন। তাঁর কাছে, যা কিছু সত্য তাই বেদ, তিনি বললেন, "বেদ অর্থে কোনো বইকে বোঝায় না। বেদের অর্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীর একটি সঞ্চিত ভাণ্ডার।" এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করেন,—"বেদান্ত দর্শনের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, যার তুলনায় বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক

আবিষ্কারগুলিও প্রতিধ্বনিমাত্র মনে হয়, সেই বেদান্ত দর্শন থেকে শুরু করে, পুরাণ সংশ্লিষ্ট নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ সবকিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পেয়েছে। তাঁর মতে এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোনো মতবাদ,—ভারতবাসীর এমন কোনো আন্তরিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থাকতে পারে না যা যথার্থভাবে হিন্দু আলিঙ্গনের বাইরে হতে পারে—কোনো ব্যক্তির কাছে ঐ মতবাদ বা সম্প্রদায় যতই অবক্ষয়ী মনে হোক না কেন। তাঁর মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হল ভারতীয় ধর্মভাবের মূল বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজের পথ পছন্দ করার এবং নিজপথে ভগবানকে অনুসন্ধান করার অধিকার আছে। এইভাবে সংজ্ঞা নিরূপণ করলে মস্ত হিন্দু সাম্রাজ্যের পতাকা কোনো সৈন্যবাহিনী বহন করে না। কারণ যেহেতু তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ঈশ্বরের অনুসন্ধান, তার আধ্যাত্মিক অনুশাসনও তাই—স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি আত্মার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সবাইকে গ্রহণ করা, প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বলে বিবেচিত হত না যদি না তার পরম আবাহন মধুরতম এই প্রতিজ্ঞায় ধ্বনিত হত: "শুন সবে অমৃতের পুত্র, যারা স্বর্গবাসী তারাও শুন সবে—আমি সেই প্রাচীন পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি সকল অন্ধকার, সকল অজ্ঞানতার অতীত। তাঁকে তোমরাও জানো, তবেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।" এই হল সেই পরম বাণী যার মধ্যে আর সব কিছু আছে এবং চিরকালই রয়েছে। এই সেই চরম উপলব্ধি যার মধ্যে আর সব অনুজ্ঞা বিলীন হয়। যখন স্বামীজী তাঁর 'আমাদের সামনে কর্তব্য' এই বিষয়ক বক্তৃতায় সকলকে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান একটি মন্দির নির্মাণকল্পে, যেখানে দেশের প্রতিটি উপাসক উপাসনা করতে পারে, যে মন্দিরের বেদীতে শুধু ওঁ এই শব্দ খচিত থাকবে, তখন আমরা কেউ কেউ সেই উক্তির মধ্যে আরও বড় একটি মন্দিরের রূপকল্প লক্ষ্য করি, সে মন্দির নিজরূপে প্রতিষ্ঠিতা আমাদের দেশমাতা ভারতবর্ষ স্বয়ং এবং তাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত মানবজাতির ধর্মপন্থাগুলি একীভূত হচ্ছে—সেই পবিত্র বেদীর পাদমূলে যেখানে একটি প্রতীক আছে, যে প্রতীক আসলে কোনো প্রতীক নয়, তা শব্দের অতীত একটি নাম। পৃথিবীর সবচেয়ে আচারনিষ্ঠ ধর্মগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারত ঐক্যতানে ঘোষণা করে যে সাধনার প্রগতি দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে, বহু থেকে একে, নিম্ন থেকে উচ্চে, সাকার থেকে নিরাকারে এবং কখনোই এর বিপরীত নয়। ভারতের বিশিষ্টতা এখানেই যে সে প্রতিটি আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসকেই, যে কোনো স্থানের বা প্রকারের হোক্ না কেন, উচ্চমুখী সোপান বিবেচনা করে, তাকে সহানুভূতি ও আশ্বাস দেয়। হিন্দুধর্মের এই দূতের মধ্যে যদি কোনো নিজস্বতা থাকত তবে স্বামীজী তাঁর যথার্থ সম্মান পেতেন না গীতার শ্রীকৃষ্ণের মত, বুদ্ধের মত, শঙ্করাচার্যের মত এবং ভারতীয় চিন্তার প্রতিটি শিক্ষাগুরুর মত তাঁর বাক্যগুলি ছিল বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ। যে বস্তু-ভাণ্ডার ভারত তার নিজের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে তারই ব্যাখ্যাতা ও প্রবক্তা হিসেবে স্বামীজী ছিলেন। যদি তিনি কখনো জন্মগ্রহণ নাও করতেন তাহলেও যে সত্য তিনি প্রচার করলেন তা সত্যই রয়ে যেত। কিংবা সেগুলি আরও বেশি প্রামাণ্য হয়ে

যেত। তবে প্রভেদ হত এই যে সেগুলি সাধারণের কাছে অবোধ্য হত, আধুনিক সরলীকরণ ও বক্তব্যের তীব্রতা থাকত না, পারস্পরিক সংহতি ও ঐক্যের হানি ঘটত। তিনি যদি না আবির্ভূত হতেন তাহলে আজ যে শাস্ত্রবাক্য হাজার হাজার মানুষের কাছে জীবনের পরমায় হিসেবে বাহিত হ'ল, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিরোধের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। তিনি প্রামাণ্য কর্তৃত্ব নিয়ে শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতের মত নয়। কারণ তিনি যা প্রচার করতেন তার গভীরে অবগাহন করে উপলব্ধি করতেন এবং রামানুজের মতই তিনি শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের কাছে উপলব্ধির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং তবুও তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যে নতুন কিছু নেই এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্যি নয়। একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে স্বামী বিবেকানন্দই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অদ্বৈতদর্শনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেও হিন্দুধর্মে এই নতুন তত্ত্ব যুক্ত করলেন যে দ্বৈত, বশিষ্ঠ দ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি বিভিন্ন অবস্থা বা অনুক্রমিক স্তর যার শেষোক্তটি হল বিকাশের চরম লক্ষ্য। এটা আরও একটি মহৎ ও সরল তত্ত্বের অঙ্গবিশেষ, তা হল, বহু এবং এক একটাই সত্তা, শুধু বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন সময়ে অনুভূত অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "ভগবান সাকার, নিরাকার দুই এবং তিনি এমনই যাতে সাকার এবং নিরাকার উভয়ই অন্তর্গত।"

আমাদের গুরুদেবের জীবনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত যে তিনি একটি সঙ্গমস্থলে পরিণত হয়েছেন যেখানে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যই মিলিত নয়, অতীত এবং ভবিষ্যৎও। যদি বহু এবং এক একই সত্তা হয় তাহলে শুধু সব উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমানভাবে সব কর্মপদ্ধতি, সব অন্বয় পদ্ধতি, সৃষ্টি পদ্ধতি উপলব্ধির পথ। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক এ বিভেদ থাকতে পারে না। কায়িক পরিশ্রমেরই আর এক নাম প্রার্থনা, জয়েরই নাম ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। যোগ এবং ক্ষেম ত্যাগ আর বর্জনের মতই কঠিন দায়।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান্ প্রচারক করেছে, তবে এই কর্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ থেকে আলাদা নয় বরং তাদের প্রকাশক। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর কাছে কারখানা, পড়াশুনো, ক্ষেত-খামার, সাধুর কুটির ও মন্দিরের দরজার মতই সত্য ও উপযুক্ত। তাঁর কাছে মানবসেবা এবং ঈশ্বরের উপাসনায়, পৌরুষ ও বিশ্বাসে, সদাচার ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁর সব বাণীই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর এই প্রধান বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। একবার তিনি বলেছিলেন "চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে বিকাশ করার তিনটি পথ। কিন্তু এর উপলব্ধির জন্য আমাদের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে হবে।"

যে গঠনমূলক প্রভাবে তাঁর অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হয়েছিল তার তিনটি সূত্র আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর সাহিত্য শিক্ষা। এই দুটি ভাষার পরস্পরবিরোধী ভাবজগৎ ভারতবর্ষের ধর্মীয় গ্রন্থগুলির অন্তর্গত অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর মনে একটি দৃঢ় ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে এই যদি সত্য হয় তবে ভারতীয় ঋষিরা হঠাৎ তা লাভ করেন নি,

যেমন অন্যান্যরা করেছেন। বরং এটা ছিল বিজ্ঞানের বিষয়, সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত যা সত্যের অন্বেষণে কোনো প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে পশ্চাৎপদ হয়নি।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন নরেন নামে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির সেই প্রমাণ পেয়েছিলেন যা তাঁর হৃদয় এবং যুক্তি অন্বেষণ করছিল। এখানে তিনি সেই সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন বইতে যা অস্পষ্টভাবে বর্ণিত। এখানে এমন একজন ছিলেন যাঁর জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি সমাধি। প্রতি ঘণ্টায় মনের গতি বহুর থেকে একের দিকে ধাবিত। প্রতি মুহূর্তে শোনা যেত সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞার উপদেশাবলী, তাঁর চারপাশের সকলেই দিব্যদর্শন লাভ করত। জ্বর অনুভূতির মতই জ্ঞান লাভের এষণা এই শিষ্যকে সমাচ্ছন্ন করেছিল। যিনি এই রকম বইয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই ছিলেন কারণ তিনি কোনো বই পড়েন নি। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের চাবিকাঠিই খুঁজে পেয়েছিলেন।

তবু এখনও তাঁর কর্মপ্রস্তুতি সমাপ্ত নয়। তাঁকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে হয়েছে, সাধু, পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, সকলের কাছে শিখতে হয়েছে, সকলকে শিক্ষা দিতে হয়েছে, সকলের সঙ্গে বাস করতে হয়েছে—এবং ভারতমাতা যেমন অতীতে ছিলেন ও যেমন বর্তমানে হয়েছেন তা দেখতে হয়েছে—এইভাবে ব্যাপক সমগ্রতাকে আয়ত্ত করে তিনি উপলব্ধ হয়েছিলেন যে এইসবের সংক্ষিপ্ত এবং ঘন সংস্করণ ছিল তাঁর গুরুদেবের জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

তাহলে এই তিনটি সুর—শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—একত্রে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনাবলীর মহান্ সংগীত। এই রত্নভাণ্ডার তিনি দান করছেন। এগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুদান দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন পৃথিবীর সকলের জন্য এক সর্বরোগহর ওষধি। এগুলি যেন তিনটি দীপশিখা, একই আধারে অবস্থিত, ভারতবর্ষ তাঁর হাত দিয়ে জ্বালিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর নিজের সন্ততি ও সমগ্র মানবজাতিকে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বছরের কর্মের মাধ্যমে। এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা এই দীপ জ্বালানোর জন্য ও এই রচনাবলী যা তিনি পেছনে রেখে গেলেন তার জন্য। আশীর্বাদ জানাই সেই দেশকে যেখানে তাঁর জন্ম, তাঁদের যারা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। এবং বিশ্বাস রাখি এখনও তাঁর বাণীর বিশালত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
নিবেদিতা

---

* রচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী রচনাসংগ্রহের ভূমিকারূপে লিখিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কাজের জাতীয় তাৎপর্য

বিশ্বে যে দেহধারী বিবেকানন্দ বলে পরিচিত ছিলেন, আজ তাঁর ভস্মাধার ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের নদীতীরে নিভৃত বিগত পাঁচবছর ধরে প্রজ্জ্বলিত আলো আজ নির্বাপিত। নানা জাতির জীবনে ধ্বনিত মহাকণ্ঠ মৃত্যুতে নিশ্চুপ।

জীবন প্রায়ই এই শক্তিমান আত্মার কাছে ঝড় ও যন্ত্রণারূপে এসেছে কিন্তু অবসানে শান্ত। নিঃশব্দে, সুষম সঙ্গীতের শেষে, কালির অন্ধকার রাত্রে মৃত্যুর আশীর্বাদ এল। ক্লান্ত ও নির্যাতিত দেহ ধীরে শায়িত হল। বিজয়ী আত্মার চিরসমাধিতে পুনঃস্থাপিত হল।

তিনি চলে গেলেন। তাঁর প্রথম সাফল্যের শিরোমাল্য তখনও সতেজ ছিল। তিনি চলে গেলেন। তখনও তাঁর কানে সজ্জন ও মহান আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছিল। নিঃশব্দে, তাঁর সুন্দর রোগকক্ষে মাত্র কয়েকটি ছেদ সহ অন্তর্বর্তী বছরগুলি গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে, চারপাশে সমবেত শিষ্যদের অনাড়ম্বর শিক্ষা দিতে দিতে, তাঁর নামের আলোকোজ্জ্বল যশঃখ্যাতিকে নীরবে অবহেলা করে তিনি চলে গেলেন। তাঁর মূল্যবান কাজের স্বকৃত নিষ্করুণ সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে মানুষ-গড়া। এবং শ্রমশীলতাসহ অক্লান্তভাবে, দিনের পর দিন ঘুরেফিরে গুরু, পিতা এবং বিদ্যালয়-শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে তিনি মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। যে অপরাহ্ণে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিনই কি বেদের ওপর সংস্কৃত পাঠ দেওয়ায় তিন ঘণ্টা ব্যয় করেন নি?

এ ধরনের মানুষের কাছে বাহ্যিক সাফল্য ও নেতৃত্ব তুচ্ছ। পশ্চিমে থাকা বছর-গুলিতে, তাঁর ধনী ও শক্তিশালী বন্ধু হয়েছিল। তারা সানন্দে তাঁকে নিজেদের মধ্যে রাখতে পারত। কিন্তু তাঁর কাছে, তার সকল বৈভব নিয়ে পাশ্চাত্য কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর কাছে ভিক্ষুকের পোশাক, কলকাতার গলি, এবং তার নিজের দেশের মানুষের অক্ষমতাগুলি বিদেশের গৌরবের চেয়ে আরো প্রিয় ছিল। যে সদাই প্রাচ্যের দিকে ধাবিত এমন একজনের প্রভাব শিথিল হল ধৃত হাতের ওপর।

কি জন্য পাশ্চাত্য তার কথা শুনত, এত লোক প্রশংসা করত এবং বিশ্বের মহান ধর্মীয় শিক্ষকদের অন্যতম বলে তাঁর নাম স্মরণ করত? তাঁর কোন ব্যক্তিগত দাবি ছিল না। তিনি কোন ব্যক্তিগত কাহিনী বলতেন না। তিনি যাদের অনেকদিন জানতেন ও বিশ্বাস করতেন তাঁরা কখনও শোনেননি যে গুরুভাইদের মধ্যে তিনি কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরই হোক বা গুরুই হোক, অচেনা লোকের কাছে কোন এক রূপ বা বিশ্বাসকে জনপ্রিয় করবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। বরং বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জগতের ওপর তুষারাবৃত হিমালয়ের আপন উৎস থেকে আসা সতেজ শীতল জলধারা তার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম প্রবলবেগে ঢেলেছে। ভারতীয় গৃহ ও সাধু-সন্ন্যাসীর বিশাল ধর্মীয় সংস্কৃতির সাক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে কখনই নিবৃত্ত করতে পারেন নি। বেদান্ত ব্যতীত তিনি কিছুই শেখান নি। এবং মানুষ কেঁপেছে, কারণ তারা এই প্রথম সত্যে নির্ভয় এমন ধর্মীয় শিক্ষকের কণ্ঠ শুনল।

আমরা জানি না শিবের সেই কাহিনী যখন তিনি পথের পাশ দিয়ে চলছিলেন। "কেউ বলে তিনি পাগল। কেউ বলে তিনি শয়তান। কেউ বলে—তুমি জান না? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।" তৎসত্ত্বেও ভারত এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত যে প্রত্যেক মহান ব্যক্তিত্বও বিরোধী ধারণাসমূহের সাক্ষাৎ ও মিলন ক্ষেত্র। তাঁর শিষ্যদের কাছে বিবেকানন্দ চিরকালই সন্ন্যাসীদের আদর্শরূপে থাকবেন। তাঁর মধ্য দিয়ে যে উদ্দীপনগুলি আমরা পেয়েছি তার মধ্যে প্রধান হল জলন্ত ত্যাগ। "আমার প্রভুর মত সত্যিকারের সন্ন্যাসীর মৃত্যু আমাকে দাও," তিনি একদা বলে উঠেছিলেন, "অর্থ, নারী ও যশে নির্বিকার! এবং এসবের মধ্যে সবচেয়ে ছলনাময়ী হচ্ছে যশপ্রীতি!" তথাপি সেই আত্মসদৃশ অদৃষ্ট যে তার মধ্যে মূর্ত তীব্র বৈরাগ্যের জলন্ত তৃষ্ণা দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিল সেই তিনি আদর্শ গৃহীত ছিলেন,—রক্ষণাবেক্ষণের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, দ্রব্যাদির ব্যবহার, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে আগ্রহী, জীবনের পুনর্গঠন ও পুনঃশৃঙ্খলা স্থাপনায় আগ্রহী। এ বিষয়ে অবশ্য তিনি বেনেদিস্ট ও বার্নার্ড, রবার্ট দি সিটকস্ক ও লাওলার জ্ঞাতি। এ কথা বলা যেতে পারে যে আস্‌সিসির ফ্রান্সিসের মধ্যে যেমন ক্যাথলিক গীর্জার ইতিহাসে মুহূর্তের জন্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর হরিদ্রাভ পোশাক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি মহান সাধু বিবেকানন্দের মধ্যে পশ্চিমী মঠবাসীদের মঠাধ্যক্ষ নতুন করে প্রাচ্যে জন্ম নিয়েছে।

একইভাবে, তিনি একাধারে ছিলেন অধিচেতন ধর্মের স্বর্গীয় প্রকাশ এবং অন্যাধারে সর্বকালের জাত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমীদের একজন। জাতীয় অনৈক্যের সময়ে বেঁচেছিলেন এবং নতুনকে তিনি ভয় করতেন না। তিনি বেঁচেছিলেন যখন সবাই উত্তরাধিকারকে পরিত্যাগ করছে, এবং তিনি প্রাচীনের গোঁড়া পূজারী ছিলেন। ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি চেতনার নতুন তরঙ্গ সদাই উদ্বোধিত হওয়া জাতির এ ভবিতব্য তার মধ্যে স্বয়ং পরিপূর্ণতা লাভ করল। এটাও হতে পারে যে এই রকম মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে সমগ্র বেদ আমরা পাব। যাই হোক আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিবেকানন্দের ধর্মীয় তাৎপর্য পরিমাপের সময় হয়নি। ধর্ম জীবন্ত বীজ। তার বপন সমাপ্ত। ফসল তোলার সময় এখনও হয়নি।

কিন্তু মৃত্যুই প্রকৃতপক্ষে দেশকে দিল দেশপ্রেমিককে। যখন তাঁর শিষ্যদের মাঝখান থেকে গুরু চলে গেলেন, শ্মশানে তাঁর সমালোচকদের সমস্ত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সেই স্বাধীনতার কথা বলা কম্বুকণ্ঠ অবাধে ধ্বনিত হল এবং সমগ্র জাতি এক হয়ে সাড়া দিল। এখানে ছিল একটা মন যে বহু দেশের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের অনন্য সুযোগ পেয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে তিনি দেখেছিলেন উঁচু ও নীচু সবাই একইভাবে সমাদর করেছিল। দৃষ্টের পরিমাপে তার চমৎকার মেধা কখনও ব্যর্থ হয়নি, "আমেরিকা শূদ্রদের সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু কি ভয়ানক গোলমালের মাধ্যমে।" পশ্চিমের সম্পদের লোভ ও অত্যাচারের কামনা দেখে এবং তার সঙ্গে বহু শতাব্দী পূর্বে চীনের সূত্রায়িত প্রাচীন এশীয় সমাধানগুলির স্থির মর্যাদা ও নৈতিক স্থায়িত্বের সঙ্গে তুলনা করে দ্বিতীয় ভ্রমণের সময় অবশ্য তিনি মন পরিবর্তনের জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর

অসাধারণ সূক্ষ্ম বিচারশক্তি বিস্ময়কর মানবতার সংযোজক হয়ে দাঁড়াল। আফ্রিকার জাতিসমূহের সম্পর্কে অবজ্ঞার সঙ্গে যে আমেরিকান ভদ্রলোক কথা বলছিলেন তাকে প্রত্যুত্তর হিসাবে তিনি যা বলেছিলেন নিগ্রোদের পক্ষে এত বড় আশার বাণী আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এবং যখন তাঁকে মাঝে মাঝে দক্ষিণ দেশীয় রাজ্যগুলিতে "কৃষ্ণ লোকদের" কাছে নিয়ে যাওয়া হত, এবং কোন কোন দরজার কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হত (ভুলটা ধরা পড়া মাত্র সেই জায়গার সবচেয়ে দায়িত্বশীল পরিবারের ব্যয়বহুল অতিথিপরায়ণতা দিয়ে প্রতিকার করা হত) সত্য-কথনে তিনি কখনও পিছপা হননি। তাঁর নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু বলেছিলেন, "এটা কি আমার ভাইকে প্রত্যাখান করা হল না?"

তাঁর কাছে প্রতিটি জাতির নিজস্ব মহত্ত্ব আছে এবং সেই আলোতে সে আলোকিত হয়। তুর্ক ছাড়া কোন ইয়োরোপ নেই, মাটির মানুষের বিকাশ ভিন্ন কোন মিশর নেই। আত্মমর্যাদাপূর্ণভাবে বাধ্যতার গোপন রহস্য ইংলণ্ড বুঝেছে। জাপানের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে দেশপ্রেমের কথা বলা দেশপ্রেমকে অপবিত্র করা।

তাহলে বিবেকানন্দ তাঁর নিজের দেশের মানুষ সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী রেখে গেছেন? কি জাতীয় তাৎপর্য নিয়ে তিনি গেরুয়া পোশাক পড়েছিলেন এবং চলে যাওয়ার সময় রেখে গেছেন? তাহলে কি পতাকা-দণ্ডশীর্ষে সেই হরিদ্রাবর্ণ ছিন্নকন্থা তুলে ধরা এবং সেই পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি আমাদের কাজ?

নিঃসন্দেহে। কারণ এই সেই মানুষ যিনি কখনও ব্যর্থতার কথা কল্পনা করেননি। এই সেই মানুষ যিনি শক্তি ছাড়া আর কিছুর কথা বলেননি। ভাবালুতা থেকে একেবারে মুক্ত, সকল কর্তৃত্বের একেবারে বিরোধী (এখনও কি কিছু ধর্মীয় মিথ্যা কলঙ্ক আমাদের কানে বাজছে না? তার কিছু কিছু কি গর্বের সঞ্চয় বলে আমরা গ্রহণ করব না?) শিক্ষক হিসাবে ছাড়া আর কোন বিদেশীকে দেখা দিতে তিনি অস্বীকৃত ছিলেন। তাঁকে খুব ভালভাবে জানতেন এমন একজন ইংরেজ বলেছিলেন, "স্বামীর মহান প্রতিভা তাঁর মর্যাদায়। এটা একেবারে রাজকীয়।" তিনি একথা বুঝেছিলেন যে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের কাছে আসতেই হবে, তবে সেটা স্তাবক হিসাবে নয়, ভৃত্য হিসাবে নয়, শিক্ষক ও গুরু, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব উচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ হওয়ার পতাকাকে কখনও অবনত করেন নি। বিদ্রূপমিশ্রিত কৌতুকভরে তিনি বলতেন, "ইয়োরোপ ধর্মে আমাদের নেতৃত্ব দিক!" একবার তিনি বলেন, "আমি প্রতিহিংসার কথা কখনও বলিনি।" "আমি সর্বদাই শক্তির কথা বলেছি। এই একবিন্দু বায়ুতাড়িত সমুদ্রবারির ওপর আমরা কি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে পারি? কিন্তু মশার পক্ষে এটা একটা বিশাল ব্যাপার!"

তাঁর মতে, ভারতীয় কোন কিছুর জন্যই লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। বিদেশী, বর্বর বা স্থূল নকল-সংস্কৃতির কাছে কোন কিছু কি প্রতিভাত হয়? অস্বীকার না করে কোন কিছু ছোট না করে নির্দিষ্ট বিষয়টি প্রমাণের জন্য তাঁর বিপুল শক্তি মনোনিবেশ করল। তাঁর নিজস্ব যুক্তির ওপর দুর্ভাগা সমালোচককে আগু-পাছু করতে হল। একবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক জাহাজে চলাকালে এক

ইংরেজ পুরাণ সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি অবজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্ন করেছিল। তিনি কেমন করে সেই ভদ্রলোককে গুঁতো করেছিলেন সেকথা উপস্থিত কেউই বিস্মৃত হননি। তিনি খ্রীষ্টীয় উপদেশাবলীর সঙ্গে হিন্দু পুরাণের অনুকূল তুলনা করে এবং বেদ ও উপনিষদকে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেক উপরে স্থাপিত করে উত্তর দিয়েছিলেন। জাতীয় মর্যাদা রক্ষার নামে নির্মমভাবে যে কোন বন্ধুকেই তিনি বলি দিতে পারতেন। এ রকম মনোভাব সব সময় সম্ভবত যুক্তিযুক্ত হয় না। প্রায়ই অস্বস্তিকর হয়। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে এটা চমৎকার, সবাই এমনকি শত্রুরাও প্রশংসা করে। বিবেকানন্দের কাছে, আবার বলি ভারতীয় সবকিছুই চরমভাবে ও সমভাবে পবিত্র ছিল—"ঈশ্বর অভিমুখী সকল আত্মাকেই এই ভূমিতে আসতে হবে।" তাঁর ধর্মীয় চেতনা সস্নেহে একথা বলত। চিকাগোর সেই বিশাল বিশ্ববাজারে উপস্থিত যে কোন ভারতীয় তা ধনী বা দরিদ্র, উচ্চ বা নীচ, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি যাই হোক না কেন, যে কোন মুহূর্তে নিমন্ত্রণকর্তার বাড়িতে গিয়ে তিনি হাজির হবেন। আতিথিপরায়ণতা ও সেবা করতে হবে। তাঁরা সবাই জানতেন যে এদের ন্যূনতম সহৃদয়তার ঘাটতি ঘটলেই তার উপস্থিতি শেষ হয়ে যাবে।

তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি দেখতেন যে আর একজন ধার্মিক তার বিষয়টি উপস্থাপনার অসুবিধায় পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়ে তার জন্য বক্তৃতা লিখে দিতেন। সেই বন্ধুর বিশ্বাসের অনুগামীদের অনেক ভালভাবে তার কাহিনী ভালভাবে উপস্থিত করে দিতেন।

তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যদের হাত দিয়ে খাওয়া শেখানোর জন্য এবং হিন্দু জীবনের সাধারণ কাজগুলি সম্পাদনের জন্য অশেষ যত্ন নিতেন। "মনে রেখো, ভারতকে যদি মোটেই ভালবাস, তাহলে সে যেমন আছে তাকে সেইভাবেই ভালবাসতে হবে, তুমি তাকে যা বানাতে চাও সেইভাবে নয়।" তিনি প্রায়ই বলতেন। এটাই ছিল তাঁর মহান পর্বতসদৃশ দৃঢ়তা। সম্ভবত এই একটি ঘটনাই তাকে যারা ভালবাসত সেই বিদেশীদের সাধারণ ভারতীয় জনগণের সাধারণ জীবনের সেই সুপ্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তি দেখবার চোখ খুলে দেয়। তাঁর নিজের দিক থেকে, নতুন কোন উপস্থাপিত পথকে কোন সুবিধা দিয়ে অনুমোদনাত্মক প্রশংসা পাওয়ার কামনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক দেশের সর্বোত্তমটি তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু রীতিকে আঁকড়ে থেকেছেন, তাঁর সবলতার এত গর্ব ছিল যে পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন মনে করেন নি। "রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করব।"—বলে ওঠেন মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে। সেই বহুকথিত কাহিনীটি বলা হল যে ধুতি-চাদর পরে কাঠের চটি পায়ে চটর পটর শব্দ করতে করতে পণ্ডিত ভাইসরয়ের পরামর্শ সভায় এলেন, ভৎ'সিত হওয়ায় তিনি বললেন, "কিন্তু আপনারা আমাকে যদি না চান, তবে আমাকে আসতে বলেন কেন?"

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যরূপেই বিষয়গুলিতে ঔৎসুক্য। প্রশ্নটির গভীরতর তাৎপর্যটি আপনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা কি? কোন্ দিকে তার প্রবণতা? তার

সারা জীবনটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধান। দু পয়সার পোস্টকার্ড, সস্তা ভ্রমণ এবং নানা বিষয়ে একটি সাধারণ ভাষা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে এই ধারণা তাঁর গভীর বিচারবুদ্ধিতে খুবই ছেলেমানুষী ও ভাসা-ভাসা। যদি ভারত ইতিমধ্যেই একটা গভীর সাংগঠনিক ঐক্য পেয়ে থাকে তখনই এগুলি প্রাচীন ভারতকে সেবা করতে পারে এবং সহজেই প্রকাশরূপে পরিণত হতে পারে। এ ধরনেই ঐক্য আছে কি নেই? প্রায় আট বছরের মত সময় ধরে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন, প্রতিটি গ্রামে নাম পরিবর্তন করেছেন, দেখা হওয়া প্রত্যেকের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন, গভীর ও সাধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত ও বিস্তৃত দৃষ্টি লাভ করেছেন। এই মহান সন্ধানলব্ধ নিশ্চয়তা তাঁকে ঘিরে থাকত। ধর্মীয় সভায় পশ্চিমের সামনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রমাণ করলেন যে হিন্দুধর্ম একটি নিশ্চিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছে। এবং সেটা এত সম্পূর্ণতাসহ প্রমাণ করলেন, যে কোন ধর্মবিশ্বাসের মেধাগত আক্রমণের প্রতিরোধে পূর্ণভাবে সক্ষম।

কখনও তাঁর মনে হয়নি যে তাঁর আপন লোকেরা যে কোন জাতিই হোক না তার থেকে কোন অংশে কম নয়, সমান। ধর্ম তাদের জাতীয় প্রকাশ এ সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়েও তিনি এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে এক্ষেত্রে তারা যে শক্তি দেখাতে পারবেন, খুবশীঘ্রই অন্য যে কোন প্রকার ধারণায় যোগ্য শক্তিরূপ দ্বারা অনুসৃত হবে।

বর্ণ-ব্যবস্থাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার ফলে, তাঁর কথাবার্তা আশাতীতভাবে এর খুঁটিনাটি ও আপাত বিরোধে পূর্ণ ছিল! তাঁর আত্মনিমগ্নতার মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের চাবিকাঠি দেখতে পান। মুসলমানরা জাতির আর একটা বর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্টানরা আর একটা, পারসীরা আর একটা ইত্যাদি! একথা সত্য যে এগুলির সবই (শেষেরটির আংশিক ব্যতিক্রম সহ) বর্ণভেদে বিশ্বাসী না হলেও বর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু তারপর ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও একথা সত্য, এবং হিন্দুধর্মের অপরাপর গোষ্ঠী সম্পর্কেও। সবার পিছনেই এক দেশের বিশাল অভিন্ন ঘটনা দণ্ডায়মান; সুপ্রাচীন সভ্যতার এক সুন্দর প্রাচীন নিয়ম; এবং সেই বিরাট প্রয়োজনগুলি যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ প্রেম ও সাধারণ ঘৃণায় অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু তিনি ভারতীয় জনগণের প্রতিটি গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর আশা ও আদর্শকেই জানেন নি, তাদের স্মৃতিগুলিও জেনেছেন। কলকাতায় হিন্দু এলাকায় একটি শিশু গঙ্গার পাশ দিয়ে বাস করতে গিয়ে যদি ফিরে আসে, তার উৎসাহ থেকে কেউ ভাববে সে জন্মে চলেছে এখন পাঞ্জাবে, আবার হিমালয়ে, তৃতীয় মুহূর্তে রাজপুতনায় বা অন্যত্র। তার ওষ্ঠে কখনও গুরু নানকের গান, কখনও মীরাবাঈ-এর বা তানসেনের। পৃথ্বীরাজ ও দিল্লীর কাহিনী গুতোগুতি করত চিতোর ও প্রতাপ সিং, শিব ও উমা, রাধা ও কৃষ্ণ, সীতারাম ও বুদ্ধের গল্পের বিরুদ্ধে। যখন তিনি অভিনয় করতেন, প্রতিটি নাটকই বিস্ময়কর বাস্তবতা নিয়ে বেঁচে উঠত। তাঁর সমগ্র হৃদয় ও আত্মা ছিল দেশের জলন্ত মহাকাব্য, তার সেই নামের দুকূলপ্লাবী রহস্যময় আবেগ স্পর্শ করে থাকত।

বেলুড়ের নিভৃত আবাসে উপবিষ্ট বিবেকানন্দ সকল জায়গা থেকেই দর্শনার্থী ও চিঠিপত্র পেতেন। বিশাল উপরিতল নীরব হতে পারে, কিন্তু ভারতের হৃদয়ের গভীরে স্বামী কখনও বিস্মৃত হতে পারে না। এক-আধজন ইচ্ছা করলে কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর কর্ণে কথিত কোন আশা, তাঁর জানা কোন দুঃখ নেই, যা তিনি প্রশমিত বা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন নি। এইরূপে, ধর্মীয় নেতার ক্ষেত্রে যেমন সর্বদাই হয়, যে ভারতকে তিনি দেখেছিলেন সেটি ছিল অন্য কোন চোখে দৃষ্ট ভারত থেকে পৃথক। তার কারণ মৌলিক, আঙ্গিক ও পরম যা কিছু তার সূত্রগুলি তিনি ধরে রেখেছিলেন। জীবনের গোপন ঝরনা তাঁর জানা ছিল ; কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে কোন কথাগুলি তা তিনি জানতেন। এবং এই সমস্ত জ্ঞান থেকে তিনি এক সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত আশায় উপনীত হয়েছিলেন।

অন্যরা যে সাংঘাতিক ভুল ইচ্ছা তাই করুক। তাঁর কাছে দেশ তরুণ, ভারতীয় ভাষাগুলি অগঠিত, নমনীয়, জাতীয় শক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতে। বেদনা ও কষ্টের মধ্যে আজ চেতনার যে নতুন পর্যায় শুরু হল সেটি হল দীর্ঘ বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। নিজের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ। কখনও বিদেশে নয়। সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশের প্রয়োজনকেও জুড়ে থাকে, বিশ্বকে সর্বজনীন আশার বাণী শোনায়। কিন্তু তিনি কখনও সাহায্য চান নি, সহায়তা প্রার্থনা করেন নি। কখন কারও ওপর হেলেন নি। যাই করা হোক না কেন, এটা কর্তার কাজের সুযোগ, গ্রহীতার গ্রহণের কিছু নেই। বাইরে থেকে কোন ভয় বা আশা কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর সন্ন্যাসের অর্থ ছিল—ভারতের সার আত্মাকে পুনঃজাগ্রত করা, তাজা আত্মবিশ্বাস ও জীবনীশক্তিতে শক্তিশালী জাতীয় জীবনের মহাস্রোতকে সাগরের পথ খুঁজে নিতে ছেড়ে দেওয়া। তাঁর কাছে নিশ্চিতভাবেই সন্ন্যাস ছিল মহত্তর সেবা। তাঁর কাছে ভারত হিন্দুমতাবলম্বী, আর্য ও এশীয়। তাঁর যৌবন আধুনিক বিলাসিতা নিয়ে নিজস্ব পরীক্ষা চালাতে পারে ? তার কি সে অধিকার নেই ? তারা কি ফিরবে না ? কিন্তু তার অন্তরের গভীর সত্তা নৈতিক, আত্ম-সংযমী ও আধ্যাত্মিক। গঙ্গাতীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে যে জনগণ তাকে বেশিদিন যান্ত্রিক শক্তির চমৎকারিত্বে বিভ্রান্ত করা যায় না।

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করেছিলেন, এবং দু শতাব্দীর মধ্যে ভারত এক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। শিরা-উপশিরা দিয়ে তার মহান জীবনীশক্তিকে সে আর একবার অনুভব করুক এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই নব-জাগ্রত শক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। অনুকরণ হয়, শুধু এটা তার নিজের জীবনে হতে হবে, সে তার জীবন ফিরে পাবে। তার যথাযথ অতীত ও পরিবেশ থেকে সে উদ্দীপনা পাবে, বিদেশীদের কাছ থেকে নয়। নিজেকে যে দুর্বল ভাবে সেই দুর্বল ; যে নিজেকে শক্তিশালী ভাবে সে ইতিমধ্যেই অপরাজেয় হয়। জাতির ক্ষেত্রেও যা, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দের একটিই মাত্র কথা ছিল, অবিরত উচ্চারিত বার্তা।

দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ

সম্ভবত স্থানীয় দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঘটনা যে এ দেশের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ভারতের সকল ধর্মীয় নেতাদের মতই জাতি কি দিয়ে গঠিত সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি অনেক বেশি জটিল ও সামগ্রিক ছিল। সাধারণ মানুষের মন যা বুঝতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি। বৈদেশিক পদ্ধতি বা ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে তিনি কিছুই আশা করেন নি। ইয়োরোপীয়দের তিনি মাঝে মাঝে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাদের এই জোরালো বিশ্বাস দিয়ে শাসন করতেন যে তাদের "কালো মানুষের অধীনে কাজ করতে হবে।"

স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই, শোনা যায় স্বদেশের জনগণকে ইউরোপীয় প্রভাব যা কিছু দিতে পারে তা তিনি আত্মীকরণ করেছিলেন। এই সময় থেকে তাঁর জীবন ক্রমেই বেশি বেশি করে জাতীয় আদর্শগুলিকে পুনরায় ধরবার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অর্থনৈতিক সামাজিকতার ছাত্র তিনি ছিলেন না, তাঁর এশীয় সাধারণ বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টির চমৎকার শক্তিগুলিই তাঁকে এ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে পশ্চিমের বিশাল কৃষিভূমিকে এককহস্তে চাষ করবার জন্য প্রযুক্ত শ্রম বাঁচানোর যন্ত্রবিদ্যাকে এদেশের যে ছোট্ট খণ্ড মাঠে মেয়ে-পুরুষে কাজ করে সেখানে প্রয়োগ করলে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে। তাঁর স্বদেশের লোকের :মধ্যে বিকশিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ-যুক্তিযুক্ততা দেখতে অবশ্য তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু এটা বরং অবস্থার সঙ্গে পুনরায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে নতুন ও আরও সরাসরি চিন্তার অভ্যাসের উদ্দেশ্যযুক্ত ছিল। পশ্চিমের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মতই সম্ভবত তিনি বুঝতেন (কারণ তারাই বিদ্বান যারা জাতীয় ও অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য বোঝে! রাষ্ট্রনীতিবিদরা নিশ্চয়ই নয়!) যে বর্তমানে এশিয়ার সমস্যা হচ্ছে যে কোন মূল্যে তার প্রাচীর প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার সামগ্রিক প্রশ্ন, এবং মোটেই দ্রুত-উদ্ভাবনের প্রশ্ন নয়। (তিনি রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না; তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী।)

তাঁর কাছে দেশটাই সুন্দর ছিল,—"সবুজ পৃথিবী, মা!" সকল মানের ভিতর দিয়ে চালিত শ্রম-সংগঠনে প্রস্ফুটিত আদর্শগুলি, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির, চিন্তার ও কর্মের ফলগুলি হল সম্পদের খনি। তাঁর বিরাট মন ও আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধাশীলতা স্থূল মানুষের পথ নির্দেশ ও আলোকিত করার জন্য আত্মীভূত চিন্তার নতুন সম্পদগুলি চিরকাল সংগ্রহ করতে পারে। শুধু ধর্ম নয়, শুধু দর্শন নয় বা শুধু ভারতীয় সমাধি নয় যা এই মহান শিক্ষকের মধ্য দিয়ে কথিত হয়েছে। তিনি চিরন্তন সাক্ষী, জাতীয় প্রতিভার স্বীয় প্রবল স্রোতোধারার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কপাটের মত ছিলেন তিনি। প্রতিরক্ষার—আক্রমণের নয়—কাজে তাঁর বিশাল মুষ্টিবদ্ধ শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ণব্যবস্থার বিরোধীরা কি কি বলতে

পারে তার সবকিছু নিঃশেষে তিনি বুঝতেন। জীবিত যে কোন ব্যক্তির চেয়ে চমৎকারভাবে এর সপক্ষে তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু একটা বিষয় তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল যে এ ধরনের বিতর্ক উঠলে প্রয়োজন হচ্ছে সেই শক্তির যে তার নিজের প্রশ্নাবলী নিয়েও আলোচনা করবে এবং ইচ্ছামত স্বীয় নতুন বা পুরনো বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙতে বা গড়তে পারবে।

তাঁর কাছে এ ওকালতি করা মূল্যহীন ছিল যে তাদের কল্যাণের প্রমাণ হচ্ছে তাদের জনগণের নৈতিকতা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠবেন যে মৃতদেহের মত তারা কেউ নৈতিকতাপূর্ণ নয়! জীবন! আসুক সে শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা, শক্তি, যদিও তার সঙ্গে আসতে পারে ঝড়ঝাপটা ও দুঃখ—ছোটখাট সংস্কার নয় এগুলিই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য। নিজস্ব চালচিত্রণের পক্ষে উপযুক্ত জীবনই জাতির নিজের হতেই হবে। ভারতকে নিজেকে এশিয়াতেই খুঁজে পেতে হবে, "জার্মানীতে প্রস্তুত" নকলও বাজে ইয়োরোপে নয়। ভবিষ্যৎ অতীতের মত হবে না, তবুও অতীতের প্রতি গভীর ও জীবন্ত শ্রদ্ধাশীলতার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এজন্যই স্বামী জাতীয় চেতনার সারবস্তু আবিষ্কারের দিকে এত একরোখাভাবে, এত নাছোড়বান্দার মত লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। সেজন্যই কোন ক্ষুদ্রতম কাহিনী, ব্যক্তি বা রীতির কোন তুচ্ছ খুঁটিনাটিও তাঁর মেধার জালের বাইরে কখনও যেতে পারেনি। হিন্দুধর্মের অভিন্ন ভিত্তির জন্য তাঁর মহান অনুসন্ধানের অর্থ ছিল এটাই। শক্তিশালী অতীতের ওপর আরও বড় ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। প্রতিটি মানুষ ভীষ্ম অথবা যুধিষ্ঠির হোক এবং মহাভারত আবার বেঁচে উঠুক। তাঁর মহান ধ্বনি ছিল—"আমরা সম্মোহিত হয়ে রয়েছি! আমরা ভাবি আমরা দুর্বল এবং তাই আমাদের দুর্বল করে! আসুন আমরা ভাবি আমরা বলশালী এবং আমরা অপরাজেয় হই।" সেই ধ্বনির জাতীয় আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল। তাঁর জনগণের ব্যর্থতা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি, ঠিক তেমনি অত্যুৎসাহী নির্বোধদের ভাসা-ভাসা সমালোচনাকে তিনি সহ্য করেছেন। তাঁর কাছে ভারত সর্বাংশে নবীন। তাঁর কাছে প্রাচীন সভ্যতার অর্থ যুগ যুগ ধরে অন্তঃশক্তির জন্মলাভ। তাঁর কাছে তাঁর জনগণের অদৃষ্ট তাদের নিজেদের মাটিতে এবং মাটির অদৃষ্ট নিজস্ব জনগণের কাছে কম নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

আজ সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কথা বলতে যখন আসি, তখন আপনারা মনে রাখবেন যে আমি শিষ্যরূপে, তাঁর কন্যারূপে বলতে আসি। তাই একজন ঐতিহাসিক বা সাংবাদিকের কাছ থেকে আমার মহাগুরুর সমালোচনামূলক বিবরণ আশা করতে পারেন সেটি আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমার নিজস্ব আন্তরিক ও বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতার কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি। তাঁর ছোটবেলার কাহিনী, অসংলগ্ন স্বপ্ন, শিবের প্রতি ভক্তি, তাঁর অদ্ভুত স্বর্গীয় খেয়ালী-পনার জন্য তাঁর মায়ের তালাবন্ধ করে রাখা এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাহিনী বলা হয়েছে। সংস্কৃত শিক্ষা অনুগতভাবে ও উপকারের মনোভাব নিয়ে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাবলী পরিত্যাগের পথে চালিত করল এবং বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। তাঁর সত্যনিষ্ঠা অনাক্রম্য। তাঁর চমৎকার মেধার গুণাবলীর ফলে পনের বছর বয়সেই বেশ যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ শিক্ষা ও হৃদয় ও মনের বিকাশে সজ্জিত হয়ে উঠলেন এবং সেই বয়সেই সত্য অনুসন্ধানের জন্য বনে-জঙ্গলে হনুমানের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন। বার বার হনুমানকে না পেয়ে তিনি অশান্ত হয়ে উঠেছেন। তারপর সেই দিন এল, তখন তিনি নদীতীরবর্তী মহামন্দিরের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি একজনের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁর প্রশ্ন "তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ ?" এর উত্তর দিলেন এই বলে, "হ্যাঁ, পুত্র ! আমি ঈশ্বর দেখেছি এবং কেমন করে তাকে দেখতে হয় সে শিক্ষাও তোমাকে আমি দেব।" তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। আমি জানি না বোম্বেতে তোমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে কত গভীরভাবে পরিচিত। আমি সেই বলতে পারলে, তিনি ছিলেন আমার স্বীয় গুরুর স্বামী বিবেকানন্দের সর্বস্ব। প্রায় ষাট বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর আগে অর্থাৎ বর্তমান যুগের গোড়ার দিকে, কালীমন্দিরে পুরোহিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে এসেছিলেন। উপনিষদ ও বেদেই তাঁর মুক্তির আদর্শ পাওয়া যাবে। ভগবদ্‌গীতার লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তির তত্ত্ব গ্রথিত রয়েছে। তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখানে ঘুমিয়েছেন, আল্লাহ্‌র নাম ধরে ডেকেছেন, মুসলমান খাদ্য খেয়েছেন এবং তাঁর মত ছিল যে আর্যজাতির যে কোন শিশুর মত একজন মুসলমানও স্বর্গীয় করুণা পাওয়ার যোগ্য। সমভাবে তিনি খ্রীষ্টের পদতলেও নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ভারতীয় খ্রীষ্টানে রূপান্তরিত হয়েছেন। খ্রীষ্টীয় জীবনের যা কিছু বাহিক খুঁটিনাটি তার সঙ্গে নিজেকে যতখানি সম্ভব একাত্ম করেছেন। এবং দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে মা কালীর যত সত্য ও আলোকে পৌঁছনোর পক্ষে খ্রীষ্ট নিজেও একটা পথ। এই হচ্ছে সেই মানুষ যাঁর কাছে আমার গুরু আঠার বছর বয়সে এলেন। তখন মূর্তিপূজা, জেনানা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং হিন্দু সভ্যতার ঘৃণ্য চরিত্র সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় আলোচনায় ভরপুর ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য সত্য উপলব্ধিতে তাকে সাহায্য করল এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে

মেধার যুদ্ধে তাঁকে সক্ষম করে তুলল। দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমে এলেন এবং দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই গুরু ও বিজয়ীরূপে তাঁর ধর্মীয় চেতনাকে আক্রমণকরলেন। আমাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে এই দুটি আত্মা আসলে এক মহান আত্মা। ভারতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ ও নবায়নের জন্য দুটি আত্মায় প্রকাশিত।

আপনাদের প্রাচ্য জীবনের ঐক্যের ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রাচ্যের জীবন আমাকে পূর্ণতম চেতনা দেয়। আর একটা দেশে জন্মেছিলাম বলে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। প্রাচ্য-জীবনের ঐক্য সম্পর্কে আমার যতটা নিজস্ব প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, ঐক্যের প্রবল শক্তিতে কোনভাবেই ভারতের ঘাটতি নেই। এই জগতের যে জাতির লোকই হোক না কেন তার চেয়ে কোনভাবেই নীচু নয়। জগতের মহানদের মধ্যে মহত্তম। অন্যান্য জাতির দ্বিগুণ শক্তি তার আছে। অন্য জাতির কল্যাণের জন্যই খুবই উচ্চতম পর্যায়ে সে অনুশীলন করে। অপর জাতিগুলির অকল্যাণের জন্য নয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, তার পিছনে বার বা পনের জন মানুষ যদি না থাকত, তার শক্তিশালী ও বিপুল প্রতিভা নিয়েও স্বামী বিবেকানন্দ কতখানি সম্পাদন করতে পারতেন? তাঁর পিছনের মানুষদের একটানা সহযোগিতা ভিন্ন কতখানি কাজ করা সম্ভব হত? এটি বিস্ময়কর বস্তু, অনন্য ভারতীয় চেতনা। সমগ্র বিশ্বের সেবায়, সমগ্র জগতের পুনরুদ্ধারের জন্য এই দুই সন্ন্যাসী তাঁদের জীবন নিবেদিত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়—তার মধ্যে থাকবে গবেষণার যন্ত্রপাতি জড়ো করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন। সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলেই শাস্ত্রসমূহের চাবিকাঠি তিনি পেলেন। যিনি স্বয়ং মুক্তির গভীরতা ধ্বনিত করেছেন, সেই মানুষের হাতে চাবিকাঠি এল। এটা অবশ্য ঠিকই যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখাশোনার পরই স্বামী দেশভ্রমণে বেরোন এবং কখনও বাস করেছেন ধাঙড়দের সঙ্গে, কখনও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে; এবং এই আছেন শৈবদের সঙ্গে, আবার এই আছেন বৈষ্ণবদের সঙ্গে। তখনই তিনি তাঁর নিজস্ব মহা-উপলব্ধি সম্পূর্ণ করলেন। এই কারণেই, আমি মনে করি যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্যক্তিগত অচেতন জীবন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে রেখে দেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে চিরকালের মত সেই সরাসরি ও বজ্রসদৃশ স্পর্শের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন। শক্তি ধর্ম এবং শুধুমাত্র মুক্তি নয়। আপনাদের মনে থাকবে যে মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে ফিরে এসে স্বামী নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে 'বেদান্ত' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থ দিতে হবে। সূত্রবদ্ধ দর্শন হিসেবে যখন আমরা গ্রহণ করি তখন 'বেদান্ত' শব্দটির আমরা হোঁচট খাই এবং আমাদের শব্দটির ধারণা খুবই অগভীর হয়। তার সে অর্থ থাকতেই পারে না। আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন যে মহান শঙ্করাচার্য সেই অর্থে শব্দটিকে বুঝতেন? এক অর্থে 'বেদান্ত' ধর্মের হাজারো ভিন্নরূপসহ জাতীয় জীবনের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়, কারণ এতে এক ধর্মের প্রতি আর এক ধর্মের মনোভঙ্গী প্রকাশ পায়। এবং সেই মনোভঙ্গীটি কি? সেটা হল কোন ধর্মই একে অপরের প্রতি ধ্বংসমূলক নয়। ধর্মীয় প্রতিভায় পূর্ণ

হচ্ছে বেদান্তদর্শন। ধর্মশিক্ষার জন্য কিণ্ডারগার্টেন ক্লাশের মত। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এখন ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের মহান ধারণাগুলি উপলব্ধ হচ্ছে। তাঁর স্বীয় ব্যক্তিগত চরিত্রের শক্তিতে ও তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বে হিন্দুধর্মের গভীর অর্থের ছাপ ফেলেছিলেন আমাদের ওপর। সত্যধর্মের আমাদের ধারণার সমগ্র অসুবিধাগুলির সমাধান হিসাবে এটা আমাদের মনে আঘাত করেছিল—সত্যধর্ম ছিল জীবনের নিজস্ব অধিচেতনা। হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে এই সেই তত্ত্ব যাকে তিনি নিজের বলে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু আমরা মহাসূত্রে উপনীত হয়েছি। প্রমাণসহ স্বয়ং জীবনের এই মহা ধারণাতে উপনীত হয়েছি। প্রমাণটা একক ব্যক্তিত্বের নয়, একক গুরুর প্রমাণ নয়, কিন্তু প্রমাণ রয়েছে সেইসব মানুষদের জীবন ও সাহিত্যে যারা তিন হাজার বছর আগে বাস করত।

পশ্চিমে স্বামী অনেক বড় কাজ করেছেন। বর্ণ, জাতি, বিশ্বাস, ইতিহাস, বা ঐতিহ্য নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘুরে ঘুরেও তিনি এ কাজ করেছিলেন। তার কষ্টের মধ্যে, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে এবং তাদের সুখের মধ্যে, এখানে সেখানে গিয়ে, হিমালয়ের তুষারে বা পশ্চিমের কোন কোন জায়গায় বরফ জমায়, ক্ষুধার্ত হয়ে বা কোন কিছু গ্রাহ্য না করে সেই কাজ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জীবনচেতনাই জাতীয় ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র। আমরা মনে করি যে এদেশে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, এদেশের পক্ষে আরও বড় পরিণতিযুক্ত সামাজিক সমস্যা নেই, এদেশের পক্ষে আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা নেই যা সেই বিরাট সমস্যা নামত, "কেমন করে ভারত ভারত থাকবে?" এর চেয়ে বড়। ওটা একটা বিরাট সমস্যা। জবাবটা হচ্ছে, "জাতীয় চেতনা দিয়ে।" আমি বলি না "জাতীয় অস্তিত্ব", কারণ জাতীয় চেতনা অটুট থাকে। সে মরে না। আমি আপনাদের এই নীতি গ্রহণ করতে বলি, এবং বলি নিজের নিজের প্রতি সত্য হও, কারণ সত্য হচ্ছে শক্তিশালী সম্পদ যা তুমি ধরে রাখ এবং তোমার নিজস্ব উপকারের জন্য ধরে রাখ না, কিন্তু বিশ্বের দুঃখী মানবতার উপকারের জন্য ধরে রাখ।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত

সুদুর ১৮৭৭ সালে এক অপরাহ্নে "পুণ্যমায়ের পবিত্র মন্দির দর্শনের জন্য একদল কলেজের ছাত্র দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়েছিল। সেখানে একদল ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধব ও পিছনে পিছনে ঘোরা কিছু মানুষ এবং অন্যান্য অনেক মানুষের মধ্যে একজন প্রবীণ সাধুকে দেখতে পেল। মন্দিরের ছোট্ট একটা ঘরে সাধু বসেছিলেন। সেখানে এই ছেলের দল ঢুকল। সাধু তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেই ছেলেটির তখন এমন কিছু ছিল যা দিয়ে দলের অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়। সেই তরুণ কলেজের ছাত্রটিকে তিনি গান করতে বললেন। সেই তরুণটির গাওয়া রামমোহন রায়ের*গান ছোট্ট ঘরটির মধ্যে যখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তখন সেই প্রবীণ সাধু তার ওপর চেনা লোকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল এবং আদান-প্রদানের চিহ্ন তাদের মধ্যে চলল। গান শেষ হলে প্রবীণ সাধু হাঁটু গেড়ে এগিয়ে এসে তরুণটিকে আলিঙ্গন করে বলে উঠলেন, "আহ্! তুই আগে আসিস্‌নি কেন? আমি তোকে তিন বছর ধরে খুঁজছি।" তারপর শুরু হল সাধু আর তরুণ শিষ্যের মধ্যে ছ বছর ব্যাপী সংগ্রাম। সংগ্রাম শেষ হল, শিষ্যভাইরা গুরুকে ধরে ফেলায় শেষ হল। তরুণ কলেজ ছাত্রটির মধ্যে শিক্ষক এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিলেন। তারপর বিশ্বে বেরিয়ে পড়ল জাতীয় আন্দোলনের আধুনিক সেণ্ট পল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমী ধারায় শিক্ষিত তরুণটির চিন্তায় ভারতীয় ক্ষমতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পশ্চিমী প্রভাব ছিল আধুনিক তরুণের চরিত্র-লক্ষণ—সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তার সঙ্গে ছিল সত্যের প্রতি আবেগপূর্ণ ক্ষুধা। পুরনো দিনের বিশ্বাস, পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে তার খুবই সামান্য বিশ্বাস ছিল। এসবের প্রতি তাঁর বয়সের উপযুক্ত বিদ্রূপ ও পরিহাসপূর্ণভাবে তিনি উল্লেখ করতেন। পরবর্তী কালে এই তরুণটি স্বামী বিবেকানন্দরূপে পরিচিত হন। বাল্যকালে তিনি এক সাধু থেকে আর এক সাধুর কাছে যেতেন এই প্রশ্ন নিয়ে "তুমি ঈশ্বরকে দেখেছ?" কথিত আছে একবার তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় যেতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ বালকটি সাঁতার দিল, নৌকো বেয়ে উঠল এবং মহর্ষির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই স্বাভাবিক প্রশ্নটি। কিন্তু মহর্ষি ইতিবাচক উত্তর দিতে পারলেন না। সেই বালকটি এক শিক্ষকের কাছ থেকে আর এক শিক্ষকের কাছে সেই এক প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে ফিরল। যে উত্তর পেল তাতে সে ভগ্নহৃদয় নিয়ে ঘরে ফিরে এল। শিশুকালে রামায়ণের হনুমানকে খুঁজতে বলা হয়েছিল তাঁকে। তিনি গিয়ে বই খুলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন, বৃথাই তাকে খুঁজলেন। বাল্যকাল থেকেই সত্যের জন্য তাঁর আবেগ ছিল। এজন্য বিদেশে তিনি কম পূজা পাননি। সাধুর আত্মা বালকের আত্মার সঙ্গে কথা বলল। গুরু বালকের ওপর জলজল বিষয়গুলি দিয়ে গভীর ছাপ ফেললেন।

---

* বক্তৃতাটি পাটনায় রবিবার, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯০৪ সালে প্রদত্ত হয়। উল্লিখিত গানটি অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্তৃক রচিত হয়।

তাঁর সেই প্রিয় প্রশ্ন "ভগবানকে দেখেছ" সাধুকে করা হল। সেই অপরিমেয় ভালবাসা সহ উত্তর দিলেন তিনি দেখেছেন এবং সেই বালকও দেখবে। সবাই দেখল যে বালকটি চূড়ান্ত সমাধিতে চলে গেল। সে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি মানবিক ক্রন্দন ছাড় পেয়ে গেল, যেন এ বিচ্ছেদ অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সাধু বললেন, "যে করুণা তোকে প্রত্যাখ্যান করল সে তোর হবে। কাঁদ, কাঁদ এবং কেঁদে তোর হৃদয় বের করে ফেল।"

সাক্ষাৎকারটি ছিল এরকম। সন্দেহ ও অবিশ্বাসযুক্ত এই কলেজের তরুণ আর অজ্ঞ ফকির, কালী উপাসকের মধ্যে। সেই কালীমূর্তি কাঠের নয়, পাথরের নয়, ভীতিজনক রঙে রঞ্জিত নয়, কিন্তু সেই মূর্তি ভয়াবহ আদিম। সেই মূর্তি খুবই নির্দয় যার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ ধ্বংস হয়ে যাবে—সেই কালীমূর্তি, যে মূর্তির সঙ্গে গোড়ার গোড়ামির সাহচর্য মিশে রয়েছে। সেই ভয়াবহ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রইল বালকটি যতক্ষণ বিভীষিকা বালকের উপর পূর্ণ হয়ে উঠল এবং সেই ধারণাটি বালক সহ্য করতে পারল না। কিন্তু তারপর মানুষের ভিতরের সত্যটি বালকটিকে আরও কাছে টানল এবং তার গুরুর প্রতি বালকটির এত ভালবাসা জেগে উঠল যে সে ঘরবাড়ি ও ভক্তি-ভাজন বন্ধুদের ত্যাগ করল। এক অদ্ভুত ভাবনার তাড়নায় চালিত হয়ে তাকে সেবা করতে এল। সেবা করতে এল গুরুকে প্রাচীন হিন্দু ছাত্রের সব ধারণা নিয়ে, কারণ সাধুর জন্য ছিল শ্রদ্ধা ও পূজার এক শঙ্কিত মনোভঙ্গি। বালকটির সাথী ছিল ধৈর্য ও কষ্ট কিন্তু গুরুর প্রতি একান্ত ভালবাসা ও ভক্তি বালকটিকে মহৎ করল ; তার যোগাড় হল একদল ভাই, একদল আত্ম-নিয়োজিত বন্ধু ; যোগান দিল সেই সাহস যা ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহার করায় তাকে সংকুচিত করল না। ভক্তি ও শৃঙ্খলায় তাকে পূর্ণ করল। পরবর্তী জীবনে এগুলি খুবই সহায়ক হয়েছিল। সেই গুরুর প্রভাব এমনই ছিল যে যখন সময় এল, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের একটা স্তর বিশ্ব দেখতে পেল—সেটা খুব কম পর্যায় নয়—তাদের ভ্রাতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব জেগে উঠল ব্রতটি বিশ্বের কাছে ঘোষণা করতে। ব্রতটি একটি জীবন দিয়ে প্রচারিত হয়েছে যাকে বিশ্ব সম্মান করে।

আমাদের কাছে এটা দুর্জ্ঞেয় যে বিশ্বের ঈশ্বর যিনি নদীগুলি সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে যেতে পাঠান, তিনিই আবার একদল সাথী ও সহকর্মী পাঠান যখন এক মহৎ আত্মার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে। শিষ্য গুরুর পায়ের কাছে বসে আছে বছরের পর বছর, গুরুর শক্তি শুষে নিচ্ছে, আপনা-আপনি দুর্জ্ঞেয় ও অদ্ভুত, এবং তার গুরুর আলাপী প্রকৃতির মর্ম অবধারণ করছে—তিনি যে ভয়াবহ রহস্যের অধিকারী তা প্রদান করছেন—এই দৃশ্য কত সুন্দর, কত মহৎ, কত ওপরে তোলে। তার গুরুর অভিজ্ঞতা বালককে জয় করে এবং সেই অবিশ্বাসী তরুণ ভীতিজনক সারশক্তিকে বিশ্বাস করে—সেই যুবক যার মনের উপর পশ্চিমী শিক্ষা, আশা, উদ্বেগ ও ভয় উৎপন্ন করেছে। গুরুর শক্তিকে তরুণ শুষে নিয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতীয় অতীতের আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে বেরিয়ে এল। অলৌকিক ঘটনা দেখত গুরু কিন্তু শিষ্য এগুলি বিশ্বাস করত না। ভাবত যে তার গুরু বুড়ো

ও মাথা খারাপ। অলৌকিক ঘটনাগুলি তার দুর্বল মস্তিষ্কের সৃষ্টি। অবশেষে তরুণটি উপলব্ধি করল যে অলৌকিক দর্শনগুলি এক বৃদ্ধ সাধুর পাগলামিপূর্ণ হীন তোষামোদ নয়—সত্য—ভয়ঙ্কর মা কর্তৃক তার গুরুর কাছে পাঠান সত্য। তরুণটি এত দক্ষ হয়ে উঠল যে এক অপরাহ্নে এক বৃদ্ধা মহিলা কি সব অলৌকিক ঘটনা দেখেছে সেই কাহিনী নিয়ে এল। প্রাচীন সাধু মহিলাকে বালকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন! তার কাছে মহিলা সব আবার বললেন এবং তখন তরুণ তাকে বলল যে তার দর্শনগুলি সত্য এবং সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। গুরুর শক্তি দুর্জ্ঞেয়ভাবে বিশাল। তিনি একক অভিনেতার নাটক করতেন; তার স্পর্শ মানুষকে সাধু বানাত; বিক্ষুব্ধ ও পাপী হৃদয়ের কাছে তাঁর কথাগুলি গঙ্গাজলের মত মিষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন কুসংস্কারের ও সত্যের বিস্ময়কর অন্তঃদৃষ্টির অদ্ভুত মিশ্রণ। এবং কে কে ছিল এই গুরু? তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস—এক মহিলা নির্মিত কালী মন্দিরের এক পুরোহিত—মতামতের খুব গোঁড়া পুরোহিত, দেবীর প্রসাদ খায় এবং পূজা সম্পাদন করে। কিন্তু দেবী যখন আশীর্বাদ পাঠায়, তখন সে পরিবার ও বন্ধুকে ত্যাগ করে, এবং সত্যকে ও অলৌকিক দর্শনকে আঁকড়ে ধরে, সমাধিতে ডুবে যায়। তার মন ঈশ্বর ও ভয়ঙ্করী মাতার প্রতি নিবিষ্ট হয় এবং সেই জায়গায় উপনীত হয় যা সকল ধরনের উপাসনার বাইরে—কোন মূর্তি যেখানে পৌঁছয়নি। বিগত সমাধিতে তিনি অনধিগম্য ও চূড়ান্ত শান্তিতে পৌঁছেছিলেন এবং সমস্ত উপলব্ধির বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

গুরুর ব্রত নিয়ে শিষ্য বেরিয়ে পড়লেন। আট বছর দেশে-বিদেশে ঘুরে প্রচার পরিহার করে বিশ্রাম ও ধ্যান চেয়ে অবশেষে হলুদ পোশাক পরা ভিক্ষুক আমেরিকার সেই স্মরণীয় সমাবেশ ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। সুতরাং এই প্রথম ব্রত নিনাদিত হয়ে উঠল এমন একটা সমাবেশে যারা হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে খুবই সামান্য কিছু জানত। এটা ভারতের, তার জনগণের, আদর্শের ব্রত ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল এমন একজনের দিনপঞ্জীতে আমরা দেখি যে লেখককে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে যা তা হল "ধর্ম প্রচারের গুপ্ত রহস্য ছিল অপরিচিত মানুষটির নিজের জনগণের জন্য আবেগ।" তাঁর বক্তৃতাটি ছিল হিন্দু বিশ্বাস সম্পর্কে এবং যাই তিনি বলুন না কেন বা যাই তিনি শেখান না কেন তার সবই হিন্দু, সারগতভাবে হিন্দু। বিশ্বের কাছে তাঁর গুরুর ব্রত ঘোষণায় আপন অন্তরে তাঁর তিনটি বিষয় ছিল যা কাজের জন্য যথাযথ ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ধারায় তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা ও বস্তু অধ্যয়ন করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল গুরুর অলৌকিক দর্শন, এবং সমগ্রভাবে ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান। ধর্মে যা সত্য, প্রাচ্যের জন্যও সত্য, প্রতীচ্যের জন্যও সত্য, তাই শেখানো এবং ধর্ম সম্পর্কে দুঃখজনক কুতর্ক কাটিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দিতে তাঁকে পাঠান হয়েছিল।

১৯০০ সালে প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষবারের মত তাঁর গুরুর ব্রতর কথা পশ্চিমের কাছে বলেন। তাঁর ধর্মের যে ব্যাখ্যা তিনি সেখানে দেন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় জগতের উচ্চতম স্থানাধিকারী সংস্কৃতির মানুষেও তা গ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের

বাগানের নম্র জীবনকে তার কাজ গৌরবান্বিত করে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এশিয়ার নেতৃত্ব পুনঃস্থাপন করেন। বিবর্তনের তত্ত্ব এবং অন্য বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি ইউরোপ খুব সহজেই ধরতে পারে কিন্তু এশীয় মেধার ভিত্তি হচ্ছে সকল ধর্মীয় কার্যকলাপ।

আপনাদের কাছে, তার নিজের দেশের লোকের কাছে, তার ব্রত হচ্ছে এটি বানানোতে আপনার যে শক্তি আছে তাই। আপনাদের কাজ, বিশ্বাস ও উপলব্ধি এবং সবার উপরে আপনাদের সাহসের ওপর তাঁর ব্রত নির্ভরশীল। মহামাতার আশীর্বাদ আপনার ওপর বর্ষিত হোক; লোহার বাঁধনের চেয়ে শক্তিশালী বাঁধন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি ও ক্ষমতায় মাতাল হয়ে ওঠ।

পশ্চিমের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত

কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় ধারণার ইতিহাসের জট ছাড়ানোর চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বার্ষিক ধর্মীয় শোকানুষ্ঠানের উৎপত্তিও সম্ভবত নির্ণয় করা যেতে পারে অ্যাডোনিস নদীর তীরে, নিহত ঈশ্বরের রক্তে লাল জলের ওপরে ফোনেসীয়দের বার্ষিক ক্রন্দনের মধ্যে। তথাপি সামান্য কয়েকটি ঘটনা কম-বেশি সুস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় ভাষার মত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধর্মের ধারণাগুলি জন্মলাভ করে। অস্পষ্টভাবে মনে হয় যেন এগুলি কম-বেশি ধর্ম ও জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে যমুনা আদর্শসমূহের মহাবন্দনের গৃহ বলে প্রতিভাত হয়। উত্তরের আর একটি গঙ্গা। ইতিহাসের রাজনৈতিক ও জাতিগত আন্দোলনগুলি এ ধরনের ব্যবস্থার মিলন ঘটার সময়। তারা মেলে, ঐক্যবদ্ধ হয় সম্ভবত ভেঙে আবার নানাদিকে অন্যধারা ধরে ছড়িয়ে পড়ে, মেরুদেশীয় বরফের মত। এইভাবেই বিশ্বের বিশিষ্ট ধর্মগুলি জন্মলাভ করেছে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধর্মের জন্মকাহিনী খুবই আগ্রহোদ্দীপক। রোম সাম্রাজ্য বলে পরিচিত, পূর্ব ও পশ্চিমের জাতিসমূহের বিশেষ সংহতি সাধনের ফল হিসাবেই পশ্চিমের এই ধর্মের উৎপত্তি। স্থানীয় পুরাকাহিনীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতার মানুষের বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়ে এসব জাতিসমূহের ও পুরাকাহিনীর মিলন সর্বদা ঘটে থাকে। এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম, অন্তত প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্ম, সম্প্রতি এই অভিঘাত ভোগ করেছে। খুঁটিনাটিসহ মথুরার প্রাচীনতর কাহিনীগুলি আমরা সর্বপ্রথম যখন জানি, তখন ভারতের বেথেলহেমের কাহিনীর আক্ষরিক সম্পূর্ণতায় এই প্রাচীন বিশ্বাসকে ধরে রাখা অসম্ভব। অধিকন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপের মেধার সামনে দ্বৈতবাদের সমস্যা হাজির করেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ইয়োরোপ কল্যাণ ও অকল্যাণের শেষ-উদ্ভূত জাতি সংক্রান্ত ধারণার ছায়ায় বাস করছে। এজন্য নয় সে বেছে নিয়েছে, কারণ হচ্ছে এ তা থেকে নিজেকে এখনও ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করে নিতে পারে নি। সামগ্রিকভাবে বিশ্বের আধুনিক আবিষ্কারের ওপর ধর্মীয় অবস্থাবলীর এ ধরনের পরিণতি হয়। যেই ইংরেজীভাষী দেশসমূহের বৃত্তের মধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে বিশুদ্ধ আর্য-চিন্তার পরিমণ্ডলে আর্য মেধাকে নিয়ে আসা হল অমনি পশ্চিমের চিন্তার জগতে এ অবস্থা ঘটল। এই অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে পশ্চিমে তার ঐতিহাসিক উক্তিগুলি করেন। স্বীয় গুরু কপিলের শিক্ষার শক্তি ও তেজ পরীক্ষার জন্য তরুণ বুদ্ধের নাগা ভূমিতে তীর্থযাত্রার মত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিক্ষার শক্তি ও তেজ পরীক্ষার জন্য মহাজীবনের গভীরে বেরিয়ে পড়লেন। সমগ্র ভারতের পর্যটনের ফলে সেই জীবন কিন্তু আরও বড় ও গভীর হয়েছে। "হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণাগুলি"র বিষয়ে বলবার জন্যই পশ্চিমের সংস্কৃতির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মাধ্যমে কুড়ি কোটির বেশি লোক সরব হয়ে উঠল। একটা সমগ্র জাতি, একটা সমগ্র বিবর্তন তাদের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াল। চার

বছর ধরে পশ্চিমে তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে দুটি ধারণা বিশেষ সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল। সংহত ধর্মের ভবিষ্যৎ বিবর্তনে আধিপত্যকারী উপাদান হিসাবে তিনিই প্রামাণিকভাবে সর্বপ্রথম কথাগুলি বলেন। একটা হচ্ছে সেই প্রিয় কথা, যার মধ্যে তিনি অবিরত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের সারসংক্ষেপ করেন। গৃহীত অর্থে কোন ধর্ম সত্য একথা যে বিশ্ব স্বীকার করে না সেই বিশ্বকে তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে আরও উচ্চ ও আরও সত্য অর্থে সব ধর্মই সত্য। "মানুষ সত্য থেকে সত্যে যায়, মিথ্যা থেকে সত্যে নয়।" আর একটা হচ্ছে ঐক্যের তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব পরিণতি লাভ করে অদ্বৈতদর্শনে, "কল্যাণ ও অকল্যাণের পিছনে যে আনন্দ ও বেদনার পিছনে যে আকার ও নিরাকারের পিছনে যে এক তুমিই সেই! তুমিই সেই! ও আমার আত্মা।"

এখানে বিশ্ব-কণ্ঠ যে কথা বলেছে আমরা তা থেকে কিছুতেই পেছিয়ে যাব না। এ বিষয়ে আমাদের যা শিখতে হবে তা হল আমাদের কালের চেয়ে বড় করে চিন্তা করতে, যার অধীনে আমরা আজ সমবেত হয়েছি তার উপস্থিতিকে যথেষ্ট বড় করে চিন্তা করতে হবে। বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে মানবচেতনা কর্তৃক আবিষ্কারের যুগে, আমাদের নিজের চোখে এমন একজনকে দেখেছি, এমন একজনের কথা নিজের কানে শুনেছি, এমন একজন যার কণ্ঠ শতাব্দীগুলি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন একজন যাকে পাওয়া যাবে আরও স্পষ্টতা ও আলো আনায়, সংখ্যায় পরাজিত আত্মা আনায়, এমন একজন যার পাদস্পর্শ করার জন্য যারা জন্মেনি, অন্যদেশের যারা দেখেনি অবর্ণনীয়ভাবে কামনা করবে এবং বৃথাই কামনা করবে।

নাগরিক আদর্শ ও ভারতীয় জাতীয়তা

জাতীয়তাবাদীর দৈনিক প্রার্থনা

আমি বিশ্বাস করি, ভারত এক, অবিভাজ্য।

জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে সাধারণ ক্ষেত্রে, সাধারণ স্বার্থে ও সাধারণ প্রেমে।

আমি বিশ্বাস করি, ধর্ম ও সাম্রাজ্য গঠনে, পণ্ডিতদের শিক্ষায়, সাধুর ধ্যানে, বেদ ও উপনিষদে, যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তা আবার আমাদের মাঝে জন্ম নিয়েছে, এখন তার নাম জাতীয়তা।

আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমানের মূল তার অতীতের গভীরে প্রোথিত এবং তার সামনে প্রতিভাত হচ্ছে গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

হে জাতীয়তা, আমার কাছে তুমি আনন্দ বা দুঃখ, সম্মান বা লজ্জারূপে এস! আমাকে তোমার করে নাও!

স্বাধীনতার প্রার্থনা

তুমি ভেবে দেখ, জগৎ তোমার জন্য
অপেক্ষা করেছে, খুঁজেছে তোমায়,
যুগ যুগান্তর, নানা পরিবেশে।
কেউ ছেড়েছে সংসার, কেউ বা সখার প্রেম,
স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছে তোমার সন্ধানে,
পেরিয়েছে ভীষণ সাগর, আদিম অরণ্য,
প্রতি পদে লড়েছে জীবন ও মৃত্যুর সাথে।
তারপর এল সেই সার্থক দিন,
সেইদিন পূর্ণ হল পূজা, প্রেম, ত্যাগ।
সেদিন তুমি করুণায় ছড়িয়ে দিলে,
মুক্তির দীপ্তি মানবতার দেহে।

হে প্রভু, এগিয়ে চল তোমার নিঃশঙ্ক যাত্রায়,
তোমার দীপ্ত প্রভাত ছড়িয়ে পড়বে জগতে,
সব দেশে জ্বলে উঠবে তোমার আলো,
নরনারী উন্নতশিরে দেখবে ভেঙেছে শৃঙ্খল,
উচ্ছ্বসিত আনন্দে জানবে,
পুনর্জাত হল তারা!

নাগরিক আদর্শ

শহরগুলি জাতীয়তাবাদের শিক্ষালয়, যে কোন জাতিই সব নাগরিকদের নিয়ে গঠিত। সাধারণত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সেবার দ্বারা বৃহত্তর গোষ্ঠীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়.; যে বীরত্ব নাগরিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার, তার সাহায্যে নির্ভীক, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিরা জাতির অগ্রগতি পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন। কোন জাতির ইতিহাসে কোন যুগের উন্নতিতে কোন বিপথগামী জীবনের জন্য সময় নষ্ট করা হয়নি। এরকম জীবন সেই মুহূর্তে মানবতার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে ঐ শক্তি-উৎস থেকে শক্তি গ্রহণ করতে থাকে, ঐ উৎসের আরো বহু দাবিদার থাকে। আধুনিক যুগে সব শ্রেণীর মানুষ যে এ সত্যকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, এতে বোঝা যায়, পূর্ণাঙ্গ নাগরিক জীবনের ব্যক্তির প্রতি দাবি এবং সেই ব্যক্তির জীবনের শক্তি দ্বারা যেসব সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আমাদের এখনো যথার্থ ধারণা হয় নি। এরকম আদর্শ প্রকাশ লাভ করবে একটি দেশের প্রতিটি নর, নারী ও শিশুর সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ বিকাশের দ্বারা, এ দৃশ্য জগৎ আগে কখনো দেখেনি।

ভারতীয় রাজা মোটরে বিলাসভ্রমণ করে বা সমাজের শৌখিনতাকে নকল করে, অথচ সে সমাজ তার গড়া নয়, তাকে সে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে না; মার্কিন লক্ষপতি দেশে শূদ্রের পরিশ্রমের দ্বারা সঞ্চিত ধন দেশের বাইরে ব্যয় করে; ইউরোপীয় অভিজাত-শ্রেণী সব জায়গায় সব সমাজে সব শ্রেণীর সব সুযোগকে নিজের কাজে লাগায়; এদের কারোর একবারও এই সন্দেহ জাগছে না যে, নিজের স্বার্থপর ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়াও মানুষের প্রতি মহত্তর দাবি করার অধিকার মানবতার আছে। অথচ যে কোন মুহূর্তে জগতে এত অশুভ দূর করা যায়, এত দুঃখের প্রতিকার করা যায়, এত কাজ শেষ করে ফেলা যায় যে, যদি আমরা সবাই জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রাণপণ সাড়া দিতাম তাহলে যা উন্নতি হয়েছে, তা অতি ধীরে স্পষ্ট হত। যথার্থত সমগ্র অনন্তকালে একটিও পরাশ্রয়ী মানবের জন্য কোন অন্যায়, দুর্বলতা, অলসতার একটি মুহূর্তও বরাদ্দ নেই।

বর্তমান যুগে ভারতে যে নতুন আইন আমাদের মহান ভবিষ্যৎকে চালিত ও পরিবর্তিত করবে তা আমরা ধীরে ধীরে হলেও পড়তে শিখছি। সম্প্রদায় হিসেবে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল অতীতের যতটুকু সম্ভব বজায় রাখা। অবশ্য হঠাৎ এ চেষ্টার সমাপ্তি ঘটেছে। আমরা নতুনকে গড়ে তোলার এক যুগে প্রবেশ করেছি। অগাস্তে কোঁতে বলেন, "অতীতের দ্বারা বর্তমানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে!" অর্থাৎ, অতীতকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করে এবং নিজেদের ভেতরে সঞ্চিত শক্তির সুযোগ গ্রহণ করে আমরা আমাদের কাজকে এমনভাবে পরিচালিত করতে পারি যাতে আমাদের এবং অন্যদের জন্য শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ রচিত হয়। সেই ভাবী বিশাল অনাবিষ্কৃত জগতের অধিকার নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে। যে যুগ নতুন কিছু আবিষ্কার করছে না, সে এখনই আসন্ন মৃত্যুর অভিমুখী। যে

দর্শন শুধু জ্ঞাত তথ্যকে লাভ করে, তা আসলে অজ্ঞের দর্শন। এর কারণ, এখন আমাদের দেশে মহৎ চিন্তা জন্মলাভ করছে, নতুন কর্তব্য দেখা দিচ্ছে, প্রাচীন সংস্কৃতির নতুন, অকল্পনীয় ব্যবহার ঘটছে, তাই আমাদের বিশ্বাস, আমাদের নতুন যুগ দেখা দেবে। যদি ভারতীয় মন প্রত্যহ নব নব জয়ের লক্ষণ না দেখাত, যদি সে অবিরাম নতুন দিগন্তের অনুভূতি লাভ না করত, তাহলে আমরা নিজেদের জন্য কিছুই আশা করতে পারতাম না। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটছে। আবার আমাদের সভ্যতার মন জেগে উঠেছে, আমরা জানি যে, ধর্মীয় উন্নতির দীর্ঘকাল পূর্ণ হয়েছে, আর এদিকে নাগরিকও জাতীয় জীবনের যে মহৎ আদর্শগুলির দ্বারা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্মীয় কাজগুলিকে সংরক্ষিত করতে হবে, সেই কর্তব্য এখন আমাদের সামনে রয়েছে। এখন আমাদের যেন নিজেদের জীবনের চারদিকে অনুর্বর ভূমিতে বেরিয়ে পড়ে সেখানে আত্মসংগঠন ও পারস্পরিক সাহায্যের স্তম্ভ-দুর্গ গড়ে তুলতে হবে, তার ফলে আধুনিক জগৎ এবং তার সব আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা সক্ষম হয়ে উঠব। আমাদের কাজের জন্য প্রচুর ইঁট পড়ে রয়েছে। আমাদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, প্রথায়, আচরণে প্রচুর উপাদান রয়েছে, তার দ্বারা আমরা নিজেদের সবল ও সুসমঞ্জস জাতিরূপে গড়ে তুলতে পারি। আমাদের শুধু নিজস্ব লক্ষ্য এবং তাতে পৌঁছনোর উপায়কে বুঝতে পারা দরকার। স্থপতি যেমন পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলে, তেমন জাতিকে গড়ে তোলে তার স্বপ্ন। যে একথা জানে, সে স্বপ্নের শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়, তাও জানে। জীবনে সব কিছুই বাসনার ফল, এই মতবাদই এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেয়। কারণ, এই মতের অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা যায়, কিভাবে চাইতে হয় এবং কি চাইতে হয়, এটা যারা জানে তারাই জগৎকে বদলে দেয়। এমনও হতে পারে যে, সুগঠিত "আকাশ-কুসুমের" চেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাসাদ পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলি নাগরিক উপাদান, এই উপাদানগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী সম্পর্ক। যে লোক গোচারণভূমির উদ্ধারের জন্য গ্রামকে একবিন্দু সাহায্য করে না, সে দেশের জন্য রক্ত ও প্রাণ দিতে পারে না। যে জাতীয় কল্যাণের জন্য এতটুকু ঝুঁকি ও অসুবিধা সহ্য করে না, তাকে কোন সেনা-বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া যায় না। নাগরিক কর্তব্যের দ্বারা জাতীয় দায়িত্ববোধের পরীক্ষা হয়। ছোট ছোট গুণের উন্নতি করে আমরা বৃহৎ গুণের সীমা অনেক বাড়িয়ে দিই। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, নাগরিক জীবন ও নাগরিক আদর্শের অর্থ কি, সে বিষয়ে এখন আমাদের ধারণা খুব সামান্য। এ কথা সত্য; তবু কথাগুলিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে এবং নিঃসন্দেহে একদিন আসবে, যখন ঐ কথাগুলিকে ভালবাসা ও বিশ্বাস করার ফলে আমরা মরতে প্রস্তুত হব।

আমাদের দুটি বিরাট মহাকাব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, মহাভারতের প্রবণতা মূলত বীরত্বপূর্ণ ও জাতীয়তাবাদী, আর রামায়ণের ব্যক্তিগত এবং নাগরিক। সত্যি হয়ত বাল্মীকির কাব্যের জন্ম হয়েছিল প্রিয় নগরী অযোধ্যার গৌরববর্ণনা এবং তার আদি শাসকদের পৌরাণিক ইতিহাস বর্ণনার বাসনা থেকে। শহরটি, তার সব কিছু

কবিকে আনন্দে ভরে তোলে। তিনি বড় বড় উৎসবে শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। তার প্রাসাদ, খিলান, গম্বুজের চিন্তায় ডুবে যান। কিন্তু যখন তিনি লঙ্কার বর্ণনা শুরু করেন, তখন অযোধ্যার সাহায্যে উদ্ভূত তাঁর নাগরিকবোধের শ্রেষ্ঠ উপহার পাই। যে দৃশ্যে হনুমান দ্বারের প্রহরী স্ত্রীলোককে অন্ধকারে চাপা স্বরে বলছে, "আমি লঙ্কা নগরী," সেই দৃশ্যের চেয়ে আধুনিক ভারতীয় মনের পক্ষে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নেই।

এখানে আমরা নাগরিক চেতনার মূল প্রয়োজনকে পাই, সে হল যে, আমাদের শহরকে সত্তারূপে, ব্যক্তিত্বরূপে, পবিত্র, সুন্দর ও প্রিয় বলে ভাবা উচিত। রাম ও তাঁর প্রজাদের কাছে এই ছিল অযোধ্যা। রাবণ ও তাঁর প্রজাদের কাছে এই ছিল লঙ্কা। বাল্মীকি উভয়ের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পারতেন, কারণ, তাঁর মহান যুগের সব লোকের মত তিনিও সহজাতবোধে নিজের গৃহ, রাজ্য ও গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারতেন।

যেসব বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি, সেসব বিষয়ে স্পষ্ট বলার শক্তি ইউরোপীয় ভাষায় ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। যেমন, নাগরিক সম্প্রদায়, যে সচল জীবন নির্দিষ্ট স্থানে নিজের আদর্শ ও আশা অনুযায়ী ঘর গড়ে তোলে, সেই নগরের তুল্য মানবিক জীবনের কোন সমার্থক শব্দ ইংরেজী ভাষায় নেই। আমরা যা বলতে চাই, ফরাসী শব্দ 'কম্যুন'-এ তা বোঝায়, কিন্তু আমাদের অনেকের মনে হতে পারে, শব্দটির সঙ্গে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাব যেন বড় বেশি যুক্ত। হতে পারে—কে বলতে পারে?—যে, কোন ভারতীয় ভাষায় শুদ্ধ নাগরিকতার মানবিক ও সামাজিক দিক বোঝাবার মত কোন ধ্বনি-প্রতীক প্রথম গড়ে উঠবে! যখন বিষয়টা বোঝার চেষ্টা শুরু হবে, তখন নিশ্চয় শব্দ গড়ে উঠবে। বড় বড় আন্দোলন আপন লোক গড়ে নেয়, ভাব নিজের ভাষা গড়ে নেয়।

নগর হল তার অন্তরালবর্তী জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতীক। শুধু বর্তমানের জীবনই এতে বোঝায় না। এ জীবন নির্ধারিত হয় শহরের অতীত ও বর্তমানের স্রষ্টাদের শক্তির সমষ্টি দ্বারা। একটা আদর্শ নগরও এক অর্থে আছে, সে নগরে সব ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের শ্রমের কথাও গণ্য করতে হবে। লক্ষ্ণৌ কেন কলকাতার চেয়ে, বোম্বাই কেন বারাণসীর চেয়ে, দিল্লী কেন আমেদাবাদের চেয়ে আলাদা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা কি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারি না যে, যা দৃষ্ট, তা অদৃষ্টের প্রতীক ও চিহ্নমাত্র, বাস্তব রূপ আধ্যাত্মিকরূপের আবরণ, বস্তু চিন্তার প্রকাশ? কেন প্যারি বা রোম অমৃতসরের চেয়ে এত আলাদা? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে যুগ ও মহাদেশ-গুলির ইতিহাস রয়েছে। মানুষের উচ্চাশার শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ত পূজাবেদী। আমাদের ঐক্যের সবচেয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রতীক নিঃসন্দেহে হল নগর।

যে বাড়িগুলি নিয়ে শহর গড়ে ওঠে, সে তার সমষ্টির চেয়ে বেশি। এই গৃহগুলি অলিখিত আইন বা আদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছাঁচে সমষ্টিবদ্ধ। এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাড়ি ও বাগান যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তার ভবিষ্যৎ স্বল্পস্থায়ী। জনগণ নাগরিক উন্নতি, সাধারণের বাড়িগুলির চমৎকারিত্ব ইত্যাদির পরিমাণ নিয়ে

নানা মত প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু একটি রাস্তা বা গলির শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে শহরের রক্ষাকারী দেবতার উপস্থিতি এবং তার ভবিষ্যৎ জনকল্যাণের সম্ভাবনা স্বীকার করি। এর পরে হয়ত থাকে পরিকল্পনার সৌন্দর্য। প্যারিতে প্রায় প্রতিটি বড় পথ আলো ও বাগানযুক্ত একটা বড় জায়গায় শেষ হয়, সে জায়গাটা আবার দেখতে একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলের মত; প্রায় প্রতিটি বীথিকা আলোকরেখার মত আকারে কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ বা স্মারকস্তম্ভে পৌঁছেছে। কাজেই প্লেস দ্য লা কঁকর্দে দাঁড়িয়ে আমরা শাঁপ এলিসির বিরাট পথ দিয়ে দূরে ক্রমোচ্চ পথের শীর্ষে নেপোলিয়নীয় আর্ক দ্য ত্রায়োম্ফে পর্যন্ত দেখতে পাই। অথবা, জোন অব আর্কের সোনালী মূর্তির কাছ থেকে প্রস্তরস্তম্ভ, মূর্তি ও জাগ্রত শহরগুলির বৃত্তযুক্ত প্লেস দ্য লা কঁকর্দ পর্যন্ত দেখতে পাই। পণ্ডিতরা বলেন যে, যেসব ব্যাধ-জাতীয় লোক শিকারের জন্য একটি কেন্দ্র থেকে বহু অরণ্য উপত্যকা খুঁজে দেখতে অভ্যস্ত, তারা এরকম ধাঁচে নিজেদের প্রকাশ করে। সত্যিই ভারতবর্ষের জয়পুরে আমরা পরস্পরকে ছেদ করে যায় এমন পথযুক্ত ধানক্ষেতের আয়তাকার পরিকল্পনা দেখতে পাই।

কিন্তু সে যা-ই হোক, এ কথা স্পষ্ট যে, শহর যেমন ব্যক্তিগত গৃহসমষ্টিমাত্র নয়, সম্প্রদায় তেমন পরিবারসমষ্টির চেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার জাতি ও পেশায় আবদ্ধ; কিন্তু সম্প্রদায় রয়েছে সব জাতিকে নিয়ে; তাকে অতিক্রম করেও রয়েছে। সে সকলের মাঝে তার সন্তান, প্রেমিক ও ভৃত্যকে খোঁজে। সে ভাগ্য বা জন্মের কোন গণ্ডী টেনে দেয় না। যে ঝাড়ুদার পরিচ্ছন্ন তার নাগরিক আদর্শকে যথাযথ বজায় রাখে, সে ব্রাহ্মণের চেয়ে উৎকৃষ্ট নাগরিক, যদি ব্রাহ্মণ শুধু আত্মপরায়ণ হয়। শুধু জাতি নয়, গীর্জাকেও নগরের জন্য ভুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু আর মুসলমান এক। শুধু ধর্মের ভেদ নয়, জাতি, ভাষা, বয়স ও লিঙ্গের ভেদও নাগরিকতার ঐক্যে বিলীন হবে। এইসব বৈচিত্র্যের উপাদান ভ্রাতাদের মধ্যে আনন্দের আগুনকে উদ্দীপ্ত করবে। স্কটের "অ্যান অব জিয়ারস্টাইন" রচনার পাঠক বুঝতে পারবে যে, ইউরোপে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত প্রবল জাতীয়তাবাদ আর কোথাও নেই। অথচ এই ছোট দেশটি তিনটি ভাষায় ও দুটি ধর্মে বিভক্ত! শূদ্রদের গ্রাম দক্ষিণের শহরে যেমন মূল্যবান, ব্রাহ্মণদের গৃহের সারির নিকটবর্তী মন্দিরও তেমন মূল্যবান। বয়স্কদের পরিষদের মত সর্বত্র বিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিশুদের খেলার মাঠেরও দরকার। ভূমিয়া দেবী, ভূমির দেবীর কাছে মুসলমান কৃষক হিন্দু শ্রমিকের সমান প্রিয়। মানবতার কেন্দ্রে সব মানুষই প্রয়োজনীয়, আমাদের প্রতিটি আত্মা সেই মহান সমগ্রের কাছে প্রয়োজনীয়; নাগরিক ঐক্যের জটিলতার মাঝে ব্যক্তি-মন এ সত্যকে গ্রহণ করতে সবচেয়ে সক্ষম। যাকে আমরা জনগণের মনোভাব বলি, তা আসলে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে নাগরিক চেতনার প্রতিফলন। অর্থাৎ, যে চরিত্র পরিবারের নিজেকে যত তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠা করে, সেইভাবে আরো জটিল ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা করে, জনমনোভাব হল সেই চরিত্রের প্রকাশ। এইভাবে নতুন কর্তব্য ও নতুন দায়িত্ব দেখা দেয়, আত্মীয়-স্বজন বা গোষ্ঠীর নিম্নতর ও বেশি ব্যক্তিগত কাজকর্মের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় নাগরিক ঐক্য।

তাহলে এতসংখ্যক বিচিত্র উপাদানকে কোন মূল বন্ধন একটি একক, সাম্প্রদায়িক মূর্তিতে আবদ্ধ করে? প্রতিটি উপাদানের সাধারণ ক্ষেত্রে সমান সম্পর্কের মধ্যেই কি এই ভিত্তি নেই? বাসস্থানের প্রতি ভালবাসার মত জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই। যে জায়গায় একটা শহর দাঁড়িয়ে থাকে সে জায়গা বস্তুত মানবিক প্রেমের এক মহৎ উষ্ণ স্থান, আত্মিক অগ্নির যথার্থ বেদী। কঠিন পর্বতের প্রহরায় সমুদ্র তীরের ঢালু জায়গায় ছিল এথেন্স নগরী। সাতটি পাহাড়ের মাঝে এক জায়গায় রয়েছে রোম। চারদিকে দ্বীপ নিয়ে সীন নদীর তীরে মানুষ প্যারিকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু প্রতিটি শহর কত স্বপ্ন, কাব্য, প্রার্থনা, প্রেম ও জয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল! সেই কাঙ্ক্ষিত ভূমির জন্য দেবতারা যুদ্ধ করছেন, এরকম কল্পনা করা হয়েছিল। প্যালাস অ্যাথনি এথেন্সকে পাহারা দিতে হবে। রোম নিজেকে ভাবত শাশ্বত নগরী। প্যারিতে তো এই সেদিন পুভা ন্ত শাভানে আমাদের জন্য সেণ্ট জেনেভিভের চমৎকার কাহিনীটির ছবি আঁকলেন, তাতে আমরা জানতে পারি যে, সবচেয়ে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক নগর তার অন্তরের গভীরে এই বিশ্বাসকে লালন করে যে, উচ্চ স্বর্গে সাধকদের একজন এই নগরে আসতে চান।

কিন্তু বাসস্থানকে আদর্শায়িত করার উদাহরণের জন্য এত দূরে যাওয়ার কি দরকার? বৈদিক আগুন থেকে জাত বারাণসী যে আজকে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণগৃহ, তার কি হবে? হাজার হাজার তীর্থযাত্রীসমন্বিত, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র জলে স্নাত এলাহাবাদের কি হবে? কালিকার, যুদ্ধের দেবী কাংড়া-রানীর মন্দিরযুক্ত চিতোরের কি হবে? যেখানে কালীঘাটের অভিভাবক হয়ে রয়েছেন নকুলেশ্বর, সেই কলকাতার কি হবে? জনগণে পরিপূর্ণ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত যেখানে তাকাই আমরা দেখব যে, মানুষ গৃহকে নিজের ও অন্যদের কাছে অতুলনীয় পবিত্র করে তোলে এবং প্রতি গৃহে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আগুন মিলিত হয়।

তাহলে এই হল সব নাগরিক উন্নতির পেছনের ধারণা, পবিত্র গৃহে থাকে প্রিয় সাম্প্রদায়িক রূপ। অতীতে ভারতীয় যুবকদের কাছে ধর্মীয় সম্প্রদায় যা ছিল,—ধর্ম মাতারূপে তাকে মহৎ কর্তব্য সাধনে পাঠাত, সে ছিল তার কৃতিত্ব সাধনের রঙ্গমঞ্চ, তাকে প্রশংসার পুরস্কার দিয়েছে—ভবিষ্যতে সেই জায়গা নেবে গ্রাম, দেশ বা নগর। অতএব, গৃহই আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, গৃহেই রয়েছে আমাদের আশা। তাই, এক জায়গায় জাত সকলে ভাই। তাই আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই; রক্ষণশীলও নই, প্রগতিশীলও নই; আমরা সবাই ভারতীয়, সবাই স্বদেশের সেবক, এক মাতৃভূমির সন্তান।

কিন্তু প্রিয় গৃহের ইতিহাস সব মানুষের কাছে বিস্ময় ও আনন্দের উৎস। ইতিহাস ব্যক্তির নিশ্চিত ও পূর্ণ প্রকাশ। চরিত্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চরমতা। ইতিহাস যে কখনো ঘুমোয় না, সর্বদা সচল থাকে, এ কথা সব মানুষ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, নগর ও জাতির ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। একদা আমরা যা ছিলাম, তা পুনরুদ্ধার করে আবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষমতা আমাদের সর্বদা আছে।

দেখা যাচ্ছে, যখনই আমরা নাগরকি আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখনই সেই আদর্শের ইতিহাস আমাদের কাছে অসাধারণ মূল্যবান হয়ে ওঠে। আমরা যুগে যুগে নানারূপে তার বিকাশকে লক্ষ্য করি।

সব যুগেই দেখি, সেই অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হয়েছে মানুষ। যারা কাজ করে তারা বলে, "আমি মানুষের সৌভ্রাত্রের অসীম শক্তিতে বিশ্বাস করি!" এখন সহযোগিতাকে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করা হয়। দেখা গেছে, যদি সাম্রাজ্যের অর্থ হয় বহুকে শোষণের জন্য অল্পের সংঘবদ্ধতা, তাহলে তার বিপরীতে জাতীয়তাবাদ চায় প্রত্যেকের সমান কল্যাণের জন্য সকলের সহযোগিতা। জাতীয় ও নাগরিক আদর্শের মত আত্ম-সংগঠনের সব মহৎ ও আন্তরিক রূপকে যে গ্রহণ করে, তাকে এটি প্রভাবিত করে, তার ব্যক্তিগত শক্তিকে অসাধারণ রূপে গভীর করে।

যে কোন ছোট জার্মান শহর এর আধুনিক উদাহরণ হবে। এখানে আমরা এমন শহর ও গ্রাম দেখি না, যেখানে একটি পরিবারও বোধ হয় আড়ম্বরে বাস করার মত ধনী, তবু তাদের একটা কম্যুনাল প্রাসাদ থাকে, যা সকলের সম্পত্তি। সামান্য দক্ষিণা বা তার চেয়েও কম চাঁদায় যে কোন লোক তাতে ঢুকতে পারে। সুসজ্জিত ঘরগুলিতে কিছু দক্ষ ভৃত্য দেখা যায়, কিন্তু কোন পুলিস থাকে না। কারণ, বাড়িটি সমগ্র সম্প্রদায়ের গৃহ, তার সম্পত্তি তারই উপকারের জন্য; বাধ্য-বাধকতার শর্তে দেওয়া কোন সুবিধা নয় এটি! একের পর এক দেখা যায় গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, লেখার ঘর, সামাজিক মেলামেশার উন্নতির জন্য বড় বড় সালোঁ (Salon)। সেই বাড়িতেই থাকে বাদ্যকক্ষ, বক্তৃতাকক্ষ, নাট্যশালা। দক্ষ সদস্যদের মিলিত প্রচেষ্টায় জার্মান পুরসভার লোকেরা বছরে প্রায়ই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, কঠিনতম বিজ্ঞান এবং অ

উচুদারের শিল্প সমালোচনা শুনবার সুযোগ পায়। তাহলে সহযোগিতা ব্যক্তির ক্ষমতাকে তিনগুণ, এমনকি চারগুণ বাড়িয়ে দেয়! কিন্তু এ প্রাসাদ সংস্কৃতি-কেন্দ্রের চেয়ে বেশি, এটি ছোট শহরকে প্রায় বিশ্ববিত্তালয়ে পরিণত করে। যাদের নাগরিক ভদ্রতার উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুযোগ নেই, তাদের দেওয়া সব আতিথেয়তা এই কেন্দ্র বিতরণ করে। তাই সাধারণ জীবন ও উচ্চচিন্তা-যাপনকারী একা তরুণী ছাত্রী সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে মেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না। এই সংস্কৃতি-সম্পন্ন অস্থায়ী গৃহটি বুদ্ধিচর্চার বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত নয়। সর্বোপরি, সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশবার সুযোগ পায়।

আবার সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে আমরা নাগরিক ঐক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ 'প্লেস' (ফরাসী ভাষায়, 'প্রোপ্লাস') দেখে অভিভূত হই। 'প্লেস' হল একটি উন্মুক্ত জায়গা, সেখানে ফুলের গাছ, মূর্তি আছে, হয়ত ফোয়ারাও আছে, শহরের কেন্দ্রস্থল রূপে তার চারদিকে রয়েছে বড় বড় সাধারণের বাড়িগুলি। ব্রুজেসে (বেলজিয়মে) আমরা দেখি হোটেল দ্য ভিল (টাউন হল), প্যালে দ্য জাস্তিস (হাইকোর্ট) এবং হোলি গ্রেলের একটি প্রাচীন গীর্জা, সব একটি অমূল্য ঐতিহাসিক স্থানে জড়ো হয়ে রয়েছে। অন্যত্র, বাজারের মুখোমুখি রয়েছে গীর্জা ও শহরের বাড়িগুলি। প্যারিতে প্রাচীন প্রাসাদসহ সেণ্ট লুই দ্বীপ যেন লুভ্‌র্‌ এবং তুইলারি-র সমরেখায় নত্‌র্‌ দমের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা প্লেস দ্য লা কঁকর্দের যে মূর্তিগুলি ফ্রান্সের বড় শহরগুলির প্রতীকস্বরূপ, তারা নীরবে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে অতীতের বিরাট ঘটনাগুলির দৃশ্য দেখে। কয়েকটি বড় শহরে যে রেলস্টেশন এবং কেন্দ্রীয় ডাকঘর শহরের কেন্দ্রস্থলের অঙ্গ এর চেয়ে করুণ ঘটনা বর্তমানের ইউরোপে খুব কমই আছে! এই যাওয়া-আসার পৃথিবীতে গৃহ যে পরিত্যক্ত হয়েছে, এ ব্যবস্থাটি কত চমৎকার—অস্থায়ী বাসিন্দাদের অস্থায়ী আস্তানা!

আধুনিক রুচির মহার্ঘতা এবং আধুনিক চিন্তাজগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশাল অভিজ্ঞতার ফলে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেরকম বহু সমস্যার সমাধান হল নাগরিক মালিকানা। এত ইংরেজীভাষী শহরের গৌরব যেসব যাদুঘর, চিত্রশালা ও গ্রন্থাগার, সেখানে এই সত্যই প্রকাশ পায়। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর বস্টনের ফ্রি লাইব্রেরি দেয়ালে লোকে ছবি আঁকার ফলে ওটি আমেরিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরগৃহ হয়ে উঠেছে। ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে টাউন হলকেও ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউনের দান অনুরূপভাবে শহরের ইতিহাস বর্ণনার দ্বারা গৌরবান্বিত করেছে। বাড়িটির প্রবেশপথে দুজন বিজ্ঞানীর সাদা মর্মর পাথরের মূর্তি রয়েছে, এদের নাম ম্যাঞ্চেস্টারের গৌরব—অথচ আমরা শুনেছি যে, এই দুয়ের মধ্যে জুল এত বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতেন যে, বাড়িটির উদ্বোধনের দিন তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাবার কথা কারোর মনে পড়েনি! এই বিরাট বাড়িতে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম অপূর্ব অর্গান, তার সাহায্যে লোকে প্রতি সপ্তাহে সঙ্গীতসুধা পান করে। আবার, লিভারপুল শহরের কেন্দ্রে কাছাকাছি রয়েছে সাধারণ পাঠাগার, চিত্রশালা, যাদুঘর, টাউন হল, এমনকি গীর্জা, এর জন্য লিভার-পুল গর্বিত।

আধুনিক বাণিজ্য ও শ্রমের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলিতে নাগরিক চেতনার জন্মের এ হল কয়েকটি উদাহরণ। এগুলি যেন গণতন্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়, জনগণের জন্য জনগণই রচনা করেছে নিজেদের মন ও হৃদয় দিয়ে, সাধারণ মানুষ যা কিছু ব্যবহার ও উপভোগ করে, তা এইভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু শহরের বিবর্তনের কয়েকটি প্রাথমিক স্তরে আমরা যা দেখি, তা জনসাধারণের, তাদের সব আবেগের সেরকম শোভন, সুশৃঙ্খল প্রকাশ নয়। মধ্যযুগের ইউরোপে জাতিগুলি ছিল গীর্জার ছত্রচ্ছায়ায়। লণ্ডনে, ব্রাসেলসে পর্বতচূড়ায় যে গীর্জা স্থাপিত হয়েছে, এটা অস্বাভাবিক নয়, এমনকি রোমও গড়ে উঠেছে ভ্যাটিকানের চারদিকে, আর ঐ নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে দোকান-গুদামে-ভরা পথগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় গীর্জা বা গ্রামের গীর্জার বাড়ির অর্থ ইউরোপের জনগণের কাছে কি, তা আমাদের প্রায় মনে পড়ে না। কোন বড় ভারতীয় মন্দির, তার কর্তব্য ও গুরুত্বের মুখোমুখি হলে এ কথা আবার আমাদের মনে পড়ে। এর আশ্রয়ে ভজনথানেক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠে। মন্দিরে বাসন, অলঙ্কার ও পুঁথির সংগ্রহ থাকে। কুস্তিগীর, পাণ্ডা ও মিষ্টান্নবিক্রেতা পূজারী ব্রাহ্মণের মত মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মন্দির গঠনে অসংখ্য শিল্প নিয়োজিত হয়। মন্দিরগঠনের গুরুত্বপূর্ণ যুগগুলিতে ইউরোপেও এরকম হয়েছে। এ কাজের জন্য যেসব কর্মীদের প্রয়োজন হত, তার কয়েকজন হল রাজমিস্ত্রি, খোদাইকার, ধাতুশিল্পী, ছুতোর, কাচ রাঙানের কর্মী, অর্গাননির্মাতা, তাঁতি, সূচিশিল্পী। গীর্জার বাড়িতে প্রকৃত শহরের জন্ম হত, কারণ, সেখানে সব কর্মীরা যথাযথ সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে মিলিত হত। যখন ওগুলি তৈরি হত, তখন গ্রামের গীর্জার পক্ষে নাগরিকজীবনের কেন্দ্র হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল ; এরই বারান্দায় শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং কোন ঘোষণাপত্র এর দরজায় সাঁটা না থাকলে, এখান থেকে ঘোষিত না হলে যথার্থ বলে মনে করা হত না। এক অর্থে, গীর্জা যে বৃহত্তর মন ও চেতনার প্রতীক, তারই সঙ্গে যুক্ত থাকত নগরসংক্রান্ত ভাবধারা। গীর্জার অধ্যক্ষ ও গীর্জার চারদিকে একত্রীভূত শহর সংখ্যা, সংগঠন ও দৃঢ়তার আধিক্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রাসাদ বা রাজাকেও কিছুটা অবজ্ঞা করতে পারত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্টধর্ম নিঃসন্দেহে এশীয় ভাবধারা নিয়ে গঠিত হলেও সমগ্র মধ্যযুগে তার স্বার্থের উন্নতি যে জাতির হাতে ছিল, তারা রোমক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের অভ্যাস পেয়েছিল। অন্তরালের এই রোমক সংগঠনের চেতনাই ইউরোপ ও এশিয়ার ধর্মীয় ভাবধারায় এত পার্থক্য ঘটিয়েছে। খ্রীষ্টীয় উপাসনার সৌন্দর্য ও গরিমা, তার অতি প্রিয় কয়েকটি বিশ্বাসের শক্তি ও সঙ্কীর্ণতা, যারা খ্রীষ্টান নয় তাদের মনে এই ধর্মের প্রতি ভয় ও বিতৃষ্ণারও কারণ এই। বহিরাগতদের কাছে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি বিশ্বাসরূপে দেখা দেয়, মনে হয় যেন, মনের স্বেচ্ছাচারিতা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপে মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থির হয়নি। জমিদারদের জয় অনুযায়ী এক-এক জায়গা এক-একজনের রাজত্বে থাকত। কিন্তু সারা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জালের মত ছড়িয়ে থাকত গীর্জাগুলি, প্রত্যেকে গীর্জার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত ছিল।

এইভাবে ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠী এই সম্পর্কের ওপরে নির্ভর করত। এতে তারা ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করত। গীর্জা ছিল শহরের স্বাভাবিক উন্নতির কেন্দ্র।

হয়ত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গীর্জার বাড়িগুলি শহরের ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে উন্নতির ক্ষেত্রে খুব প্রেরণা দিত। একথা ঠিক যে, গ্রাম ও ছোট শহরগুলি ক্রমশ বিবদমান সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাবানদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করছিল। এই কারণগুলির সঙ্গে অন্যান্য কারণ মিলিত হয়ে নাগরিক শক্তির এমন প্রবল প্রকাশ ঘটিয়েছিল, যাতে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও বেলজিয়মের অপূর্ব হোতেল দ্য ভিল সৃষ্টি হয়েছিল। এখানেই ছিল শিল্পী-গোষ্ঠীগুলির কেন্দ্র। এখানে শহরের দলিলপত্র রাখা হত। এখানে নাগরিক আতিথ্য দান করা হত। প্রায়ই এখানে মহৎ শিল্প-কর্ম সংগৃহীত হত। সম্প্রদায় নিজের একক রূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। ছোট রাজ্যে শহর ও গীর্জার মিলনের নিদর্শন আমরা পাই জার্মানির মারগ্রুস ও ইংল্যাণ্ডের ডারহ্যামে; কারণ, এ দুটি জায়গার ধর্মাধ্যক্ষরা ছিলেন রাজপুত্র; শহরের বিবর্তনের ওপরে এই মিলনের ফল কি, তার আলোচনা আগ্রহজনক। কিন্তু প্রধানত ত্রয়োদশ শতাব্দীর গীর্জা, মঠ ও মহাবিদ্যালয়ের পর দেখা দিল চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর হোতেল দ্য ভিল বা টাউন হল এবং তার পর ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জাতিত্বের বিবর্তন। শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এলেন এক অন্ধ স্যামসন, ইন্দ্রের বজ্র, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে, তিনি খেলার ছলে অতীতের সব স্তম্ভ ভেঙে ফেলে নিজের নাগরিক আইনের দ্বারা ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন, ফলে এত শতাব্দী ধরে অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যেক জাতি যা শিখেছিল, হঠাৎ তা উপলব্ধি করল। পশ্চিমের জাতিগুলি নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

বরাবর এই রকম হয়েছে। যে দিন আমরা ভাবি কোন নতুন জাতি দেখা দিল, প্রায় তখন তাদের চোখের আবরণ সরে যায়, হঠাৎ তারা দেখে যুগ যুগ ধরে নীরব উন্নতি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোন্ লক্ষ্যের দিকে তারা চলেছে। নেপোলিয়ন ইউরোপে জাতিত্ব গড়ে তোলেন নি। সে কাজ করেছে ভাষা, ইতিহাস, কাব্য, সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পরিচয়। কিন্তু নেপালিয়ন ওদের আত্ম-উদ্বোধনে সাহায্য করেছিলেন। তিনি কড়া রাসায়নিক বিশ্লেষকের মত বর্ণহীন তরল দ্রব্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে গাঢ় পদার্থ তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি আসার আগে জাতিত্ব সক্রিয় ছিল। তিনি চলে যাওয়ার পর তা অনিবার্য হয়ে উঠল।

শহরগুলি অতীতে যা শিখেছে, ইউরোপের জাতিগুলিকে তা শিখতে হবে। বহু লোক মানুষের মন ও চেতনাময় জীবনের জন্য বেঁচে থাকে, এর বিপরীতটা সত্য নয়। একটি মহৎ সত্য আবিষ্কৃত ও বিতরিত হলে, একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখে অন্যদের দেখালে একটি জাতির সমগ্র অস্তিত্ব সার্থক হয়। বিজ্ঞানে এ সত্য হল,—মানুষের জ্ঞানের উন্নতি,—শিল্পে—সুন্দর সার্বজনীন স্বপ্ন—ধর্মে—আত্মার প্রসার—এই হল শহর ও জাতির লক্ষ্য। মানুষের দেহ রয়েছে তার মনকে উন্নত করার জন্য। বর্তমানে পশ্চিম যে ভাবে, দেহের মঙ্গলের জন্যই মন রয়েছে, তা ঠিক নয়। কোন শহরের লোকের জীবন যদি মুক্ত, স্বচ্ছন্দভাবে মানব-চেতনার মন্দির গঠনে নিযুক্ত না হয়, তাহলে

শহরের পয়ঃপ্রণালী, সাজসজ্জায় কিছু হবে না। শহরের ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতিগুলির ক্ষেত্রেও তাই। অপব্যয়ের ফলে যে বিলাসিতার সৃষ্টি হয়, সে অনুযায়ী খামার ধ্বংস হওয়া যুদ্ধের ঘটনার সমান। শহরে সামরিক আইন বা পুলিসের শাসনে যে মৃত্যুর শাস্তি বিরাজ করে তা কামানের গর্জন এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের মত যুদ্ধের পূর্বাভাস। যুদ্ধ মানবজাতির কাজ নয়। যে দেশ যুদ্ধ শুরু করে এবং যে আক্রান্ত হয়, উভয় দেশকেই যুদ্ধ ধ্বংস করে। বর্তমানে একসারি সশস্ত্র শিবির ইউরোপকে ছেয়ে ফেলেছে, এদের ভুল করে জাতি বলা হয়। এখন পাশ্চাত্য জনগণের কাছে আক্রমণ একমাত্র যথার্থ কাজ বলে মনে হয়। এ ধারণা সত্য হলে ও যে শিশুসুলভ এবং হীন ধারণা, তা শিক্ষা দেবে বুদ্ধিমান প্রাচ্য। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। এ সত্যের উদ্ভট বিকৃতি। এ শিক্ষা দিতে হবে দুর্বলতা দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে, সে শক্তি প্রাচ্য জাতির শক্তি।

প্রাচীন শহর পম্পেই-এর নাগরিক আদর্শ

প্রাচীন ইউরোপের শহরগুলিতে আমরা নাগরিকতাবোধের সবচেয়ে সুসম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ দেখার আশা করতে পারি। কারণ, রোমানদের কাছে 'ধর্ম' কথার অর্থ ছিল, যেসব প্রতিষ্ঠান ও ভাবধারা মানুষের গোষ্ঠীগুলিকে একসূত্রে বাঁধে, ঐক্যবদ্ধ করে, সেগুলির সমষ্টি। সুতরাং নগর-রাষ্ট্রের চিন্তার মত এত জরুরী, যথার্থ অর্থে ধর্ম, একমাত্র আদর্শ তার আর কিছুই ছিল না। তার সঙ্গে তুলনায় গ্রীকরাও এশীয় এবং ঈশ্বরবাদী। তার কাছে বিচারালয়, পণ্যবীথি, গৃহ ও সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক পবিত্র অ্যাক্রোপলিসরা স্মৃতিসৌধ, বিশ্ববিদ্যালয়, মন্দির বা সমাধি। কিন্তু বিপরীতপক্ষে রোমানদের কাছে উন্মুক্ত সভাগৃহ—মসজিদের আকারে নির্মিত—যেখানে নাগরিকরা জনসাধারণের বিষয়, আলোচনা, সভা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য একত্র হত, সেই উন্মুক্ত সভাগৃহ ছিল নাগরিক দেহের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও ফুসফুস। এখানে লোকে নাগরিক হয়ে প্রবেশ করত; এখানে তারা খবর শুনত; এখানে তারা রাজনৈতিক মত প্রকাশ করত। এই সভাগৃহ একাধারে পরোক্ষ সংসদ এবং ক্লাব এবং এই বৈশিষ্ট্যের ফলে যাকে আমরা শহর বলি, তা পাঁচিল-ঘেরা কয়েকটি বাড়ির সমষ্টির চেয়ে বেশি।

অবশ্য আমরা যদি প্রাচীন শহর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে আলোচনা করতে চাই, তাহলে সে কাজ করার আদর্শ উপায় হল এমন এক শহর খুঁজে বার করা, যা উন্নতির ঐ বিশেষ স্তরে থেমে গেছে। সেই যুগ থেকে রোমই পাদ্রী ও গীর্জার শহর হয়ে উঠেছে। সে খ্রীষ্টধর্মের পালক, আদৌ প্রাচীন নয়। মার্সেই কখনো উপনিবেশের বেশি আর কিছু ছিল না, এখন সে মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক। অবশ্য, এক অদ্ভুত ঘটনা, তাকে প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের দিক থেকেও ভালো ঘটনা বলার দুঃসাহস আমাদের নেই, আঠারো শো বছর আগের এক গরমের দিনের দুর্ঘটনার ফলে এরকম একটি শহর ঠিক এই আদর্শ অবস্থায় আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে আছে। ভিসুভিয়াসের ছাই-এর নীচে পম্পেই-এর দীর্ঘ নিদ্রা যেদিন ব্যাহত হয়েছে তারপর দেড়শো বছরেরও বেশি হয়ে গেছে। ৭৯ খ্রী থেকে ১৭৪৮-এর ২৩শে অগস্ট পর্যন্ত কৃষক চাষ করেছে, বীজ বুনেছে, ফুলের বাগানে ফুল ফুটেছে, ফলের বাগানে ফল ধরেছে, প্রাচীন রাস্তার ওপরের মাটিতে পায়ের নীচে যে অদ্ভুত নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার কথা কেউ জানত না বা ভাবতে পারে নি। এখন, পম্পেই শহরের অধিকাংশ তার পাঁচিলের ভেতরে প্রকাশিত, কেউ যদি সমুদ্রের দিকের দরজা, প্রাচীন পোর্টা ভেল্লা মারিনা দিয়ে ঢোকে এবং ডানদিকে ছোট যাদুঘরে আসে তাহলে সেই আকস্মিক মৃত্যুর সময়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাবে, তা অলিখিত বলেই আরো স্পষ্ট। এমন ছাত্র আছে যারা একটা হাতের লেখা দেখে একটা মানুষ সম্বন্ধে সব কিছু বলতে পারে। অনেকে হাতের তালু বা পায়ের চেটো দেখেও এরকম বলতে পারে। কিন্তু এখানে পম্পেই-এর যাদুঘরে আমরা এ সব কিছুর চেয়েও নিশ্চিত উপায় পাই। সেই ভয়ঙ্কর ২৩শে অগস্ট, যেদিন দুর্ভাগা শহরকে ঘন মিহি ছাই ঢেকে দিয়েছিল, তখন বহু লোক পালাতে পালাতে চাপা পড়েছিল। সাম্প্রতিক খননকাজে

এরকম অনেক দেহ যেভাবে শুয়েছিল, সেই আকারকে প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে ভরে ছাঁচ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ কথা বুঝতে হবে যে, দেহগুলি অঙ্গার হয়ে অনেক আগেই নষ্ট হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি দেহের চারদিকে একরকম কঠিন আবরণ তৈরি হয়েছে উত্তপ্ত ছাই-এর চাপে, এই ফাঁপা খোলার ভেতরে প্লাস্টার ঢেলে ওখানে একদা যে মৃতদেহ ছিল, তার আকার গড়ে নেওয়া যায়। সারা যাদুঘর জুড়ে শবাধারে যে দেহগুলি শায়িত আছে, তাদের উদ্ভব হয় এইভাবে। দেহগুলি নগ্ন, কারণ জামাকাপড় ছাই হয়ে তাদের দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

কখনো এত চিত্রার্পিত, এত করুণ প্রতীক দেখা যায়নি। আমরা চোখের সামনে মৃত্যুর ধ্বংসলীলা দেখতে পাই। মানুষের মনের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে যে একমাত্র পট, তার বন্দীদেহে, তাতে সে একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষণের স্থায়ী ইতিহাস রেখে গেছে। আহা, সে কি রচনা! তাতে ঐ আত্মার অতীত এবং লিখবার মুহূর্তের ভয়ঙ্কর ইতিবৃত্ত রয়েছে। এই একজন রয়েছে, সে দু-হাত ওপরে তুলে চিৎ হয়ে পড়েছিল; সেই নিস্পন্দ অধরে আমরা হতাশার শ্বাস শুনতে পাই, দৃষ্টিহীন চোখে তার দেখা শেষ ছবি দেখতে পাই, দেখি সামনে যে আগুন ফেটে পড়েছিল তার আতঙ্ক, তখন সে দেখছিল নীচের উঁচু হয়ে ওঠা ছাইতে তার হাঁটু ডুবে যাচ্ছে। আবার এই একটি স্ত্রীলোক, এ সংগ্রামে অভ্যস্ত নয়। সামনে পড়ে গেছে, হাতের ওপরে মাথা রাখা। পুরুষটির মত সেও দ্রুত পালাতে গিয়ে মৃত্যুর কবলে পড়েছিল। কিন্তু সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে অনেকটা যেন সমর্পণের ভঙ্গীতে। তার সমগ্র ভঙ্গীটি আত্মসমর্পণ, মাধুর্য, সৌন্দর্যে ভরা। নিশ্চয় শেষ মুহূর্তে একটু শান্তির স্পর্শ পেয়েছিল। হয়ত তার সংসারে সেই শেষ ব্যক্তি, হয়ত তার সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত। হয়ত সে আর কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, দেখাচ্ছিল কি করে মরতে হয়। ভারতীয় স্ত্রীলোকরাও এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে এই শান্ত স্বীকৃতি দিয়েছে বা আনন্দে গর্ববোধ করেছে।

কিন্তু মানবদেহে মনের এই ছবির কথা ছেড়ে আমরা এবার অন্য ইতিহাস, শহরের ইতিহাস দেখব, যে ইতিহাস প্রায় একহাজার বছর ধরে বংশের পর বংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে। আকারে এটি ভারতবর্ষের অতি পরিচিত ধরনের। আজকের কাঞ্চীভরম বা কলকাতার হিন্দু অঞ্চল অনেকটা এর আভাস আমাদের দিতে পারে।

সমৃদ্ধ সরণী এবং সৌভাগ্য সরণী নাম থেকে বোঝা যায়, ধনীদের গৃহে ভরা ছিল। কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল অঞ্চলের মত পথগুলি সঙ্কীর্ণ, যাতে বাড়িগুলির আড়ালে আলো ম্লান হয়ে যায়। এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে দুটো রথ যেতে পারত না, একজোড়া চাকার গভীর গর্ত তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ওদের ফুটপাথ ছিল এবং রাস্তার একপার থেকে অন্যপার পর্যন্ত টানা পাথর বসানো থাকায় বোঝা যায়, গ্রীষ্মকালে খুব বৃষ্টি হত। আরেকটা বিষয়ও বোঝা যায়: সব ক্ষেত্রেই সম্ভবত রথ টানত একজোড়া ঘোড়া। অবশ্য আমরা যেরকম যানবাহনের ভীড় দেখি তা ছিল না, কারণ লোকে শহরে এদিক-ওদিক বেড়াত না, শুধু শহরে ঢুকত ও বেরোত এবং অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার পথ নিশ্চয় মানচিত্রে আঁকা ছিল—সমুদ্রে যাওয়ার পথ, হার্কুলেনিয়মে যাওয়ার পথ ইত্যাদি, যানবাহন সর্বদা একটি পরিচিত পথেই চলত। বৃধ সরণীতে আমরা দুটি

স্মারকস্তম্ভ পেয়েছি, যার থেকে অনেক কিছু জানা যায়, শহরে ক্যালিগুলা ও নীরোর আগমন উপলক্ষে রচিত তোরণ। প্রথমত, ওর থেকে দুদিন নাগরিক উৎসবের কথা জানতে পারি। এরকম তোরণ আমরাও করি বাঁশ, পতাকা ও ফুল দিয়ে, দু-একদিন পরে তুলে ফেলি এবং উৎসবের কথা সবাই ভুলে যায়। এক্ষেত্রে তোরণদুটি তৈরি হয়েছিল পাথর দিয়ে, যাতে তা স্থায়ী হয়। যথার্থত! দু হাজার বছর পরেও ঐ তোরণ দুদিনের উৎসবের আনন্দমুখর দৃশ্য জাগাতে পারবে! কিন্তু ওরা আমাদের আরো কিছু বলে। ওরা আমাদের শহরের সম্পূর্ণ চরিত্র জানিয়ে দেয়। জায়গাটা সপ্তাহান্তিক প্রমোদের স্থান ছিল, শহরটি ছিল আনন্দময়, উদ্যানময়—এখনকার সজ্জার অর্থে নয়! ক্যালিগুলা আর নীরো রোমের সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, পম্পেইতে সোৎসাহে অভ্যর্থিত হয়ে নিশ্চয় তাঁরা স্বস্তি বোধ করেছিলেন। আমরা মনে করতে পারি, অন্যায়ের ফলে আগুনে মৃত্যু ঘটেছিল যে সোডোম আর গোমোয়ার সেই প্রাচীন কাহিনী পম্পেই-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেত। অথচ পরিস্থিতির সৌন্দর্য, অধিবাসীদের সংস্কৃতির ফলে সর্বদা মার্জিত আমোদ-প্রমোদেরও সম্ভাবনা থাকত; আমরা শুনেছি, সিসেরো ওখানে লেখার জন্য নিজের বাড়িতে থাকতেন।

সমাধি-সরণী—যেখানে ভস্মাধার ঢেকে কবরগুলি স্মারকচিহ্ন হয়ে রয়েছে—সেটি দেখলে আমাদের মনে পড়ে রোমক সভ্যতা ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সভ্যতার মিলগুলি। বাড়িগুলির ঘর থাকত একটি বহিরঙ্গন ও একটি ভেতরের প্রাঙ্গণ ঘিরে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে সুন্দর যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেতিয়াই, ভেতরের প্রাঙ্গণ, মাটির উনুন ও ধাতবপাত্রসহ রান্নাঘর এই মিলের সুন্দর পরিচয় দেয়। প্রতিটি বহিরঙ্গনে একটি করে ছোট মর্মরপাথরের চৌবাচ্চা পাওয়া যায়, নিশ্চয় মুখ-হাত-পা ধোওয়ার জন্য নির্মিত। বেতিয়াই নামক ভেতরের প্রাঙ্গণে হয়ত অভ্যর্থনা করা হত—কে জানে? পম্পেইতে সম্রাটরা এলে, অনেক উঁচু ছোট ছোট ফোয়ারা আছে, হয়ত ওগুলো আতিথেয়তার জন্য এবং অলঙ্কারের জন্য ব্যবহার করা হত। যথার্থ স্নানের জন্য আমরা ডায়ানার স্নানের একটি দেয়ালচিত্র দেখতে পাই, তাতে দেখা যায়, একপাত্র জল একটি লোকের মাথায় ঢালা হচ্ছে, স্নানের পদ্ধতি হিন্দু ও পম্পেই-বাসীদের একই রকম ছিল। অপূর্ব গণ-স্নানাগারও ছিল, তার মধ্যে সভাগৃহটি নিশ্চয় শহরের সবচেয়ে শৌখিন ক্লাব ছিল। এটা বিশেষভাবে সত্য টেপিডেরিয়াম বা অন্তর্বর্তী কক্ষের (middle hall) ক্ষেত্রে, যে স্নানার্থীরা স্নানের জন্য ওপরের পোশাক খুলে ফেলেছে, তারা এখানে একটা ব্রোঞ্জের বড় পাত্রের পাশে বসে বা দাঁড়িয়ে আগুন পোয়াত, ঐ পাত্রটি উনুনের কাজ করত, ওখানে ওরা দেয়ালের তাক থেকে তেল ও সুগন্ধি নিয়ে গায়ে মেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হত। বাইরে রাস্তায় থাকত ধাতুর নল, তার গায়ে নির্মাতাদের নাম খোদাই করা থাকত, ঐ নল দিয়ে শহরের জলাধার থেকে বাড়িতে, স্নানাগারে জল যেত। কিন্তু রাস্তাতেও আমরা খাবার জলের উঁচু ফোয়ারাসহ জলাধার দেখি, মানুষ ও পশুর পানের জন্য। একটি জলাধারের প্রান্তের পাথর ক্ষয়ে গেছে, সেখানে যুগের পর যুগ লোকে হাত রেখে কল থেকে জল ভরে খেয়েছে। আহা! আমাদের চারদিকের শূন্য জগৎকে যে ব্যস্ত

জীবন একদা পূর্ণ করে রাখত, তার এই নীরব সাক্ষ্য কি করুণ! প্রথম যখন খোঁড়া হয়, তখন এখানকার বাজার এলাকায় মাছের কাঁটার একটা ছোট স্তূপ পাওয়া গিয়েছিল, ওখানে ভাজা মাছের দোকান ছিল এবং সেই শেষের ভয়ঙ্কর দিনের করুণ দ্বিপ্রহরের আগে কিছু লোক ওখানে মাছ খেয়েছিল। বাঁধানো পথে গাড়ি ও রথের চাকার গভীর দাগ; আমরা দেখি দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা আছে যে, সাপ ডিম-ভরা পাখির বাসার দিকে যাচ্ছে, এইভাবে পথিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এই রাস্তাগুলি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দেবতা এসকিউলেপিয়াসের কাছে পবিত্র; এই বিজ্ঞপ্তি আধুনিক পোস্টারের মত দেয়ালে লাল অক্ষরে আঁকা; এইসব ছোটখাট ব্যাপার দিয়ে পম্পেই-এর গভীরতম আবেগ প্রকাশ পায়।

প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের ছোট-বড় মেশানো উচ্ছলতা হঠাৎ থেমে গেল—আমাদের সামনে এই দৃশ্য দেখি, একটি উজ্জ্বল গ্রীষ্মের সকালের দৃশ্যকে হঠাৎ মৃত্যু শাশ্বত করে দিয়ে গেছে।

এইসব রাস্তায় বাড়ির ফাঁকে দোকান ছড়ানো ছিল। কোন্ কোন্ জিনিস থাকা সম্ভব নয়, তা নিয়ে একটু ভাবতে ভাল লাগে। কাপড়ের দোকান নিশ্চয় ধ্বংস হয়েছিল। জন-গৃহগুলির সিঁড়ির কথা ভাবলেই মনে হয়, এখানে গ্রামের লোকরা শহরের বাইরে থেকে ফল-ফুলের ঝুড়ি বয়ে আনত। অবশ্যই, এসবের আর চিহ্ন নেই। কিন্তু রুটিওয়ালার দোকান উনুন ও জাঁতাসমেত রয়েছে, এমন কি এক জায়গায় বন্ধ উনুনে রুটিও রয়েছে, তা পুড়ে কয়লা হলেও রয়েছে। তেলের দোকান রয়েছে, অবশ্য শূন্য পাত্রে তেল অনেকদিন আগে শুকিয়ে গেছে। মদের দোকান প্রচুর। সত্যি, পম্পেই লোভনীয় শহর ছিল! তবে কাদায় মদের দোকানগুলি কলকাতার বাজারের দই ও ডালের মত সরাইখানার একদিকে বসে গেছে দেখে ভারতীয় অতিথিরা আনন্দ পেলে তাদের ক্ষমা করা উচিত!

কিন্তু ব্যাসিলিকা ও ফোরামে এলে আমরা পম্পেই-এর ঐতিহ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারি। একটা পুরনো ফোরাম (সভাগৃহ) ছিল, ছোট, ত্রিভুজাকার, তাতে বজ্রের একটি ছোট, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্দির ছিল, হয়ত উল্কাপাতের কারণে শহরটি মূলত নির্দিষ্ট জায়গায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সময়ে শহর অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় একটা নতুন, বড় সভাগৃহ তৈরি হয়েছিল। মাঝখানে একটা লম্বা, খোলা জায়গা, তিনদিকে থামওয়ালা বাঁধানো পথ এবং পেছনে যে গাঢ় নীল পর্বতমালা জায়গাটিকে সুন্দর করেছে, একপ্রান্তে তার মুখোমুখি রয়েছে বৃহস্পতির বা দেবরাজের মন্দির, এক অতি উঁচু জায়গায়, সেটি সাধারণের যজ্ঞবেদী। এখানে আমরা দেখি নাগরিকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথবা আলোচনা বা গল্প করার জন্য দল বেঁধে রয়েছে। এখানে দেখি রোম থেকে খবর নিয়ে লোক আসছে। এখানে মাঝখানে বক্তারা জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিংবা এখানেই যে কোন মত বা স্বভাবের লোক ভিড় করছে, নির্দিষ্ট দিনে যজ্ঞের ষাঁড়-বলির উৎসব দেখতে। এর গায়েই রয়েছে ব্যাসিলিকা বা উচ্চ আদালত। আবার সেই একই স্থাপত্য-পরিকল্পনা, কিন্তু পথগুলি এখানে ছাদ দিয়ে ঢাকা, শুধু চত্বর খোলা। এখানে স্থাপত্যের

চমৎকারিত্ব দেখে মনে হয়, রোমানদের বুদ্ধিজগতে আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রাধান্য আধুনিক সভ্যতার মতই ছিল। শেষে দেখা যাবে, বড় বড় মূর্তি ও বিচারের পবিত্র প্রতীক, এর আড়ালে থাকত একটি উঁচু ঘর, সেখানে বিচারক দু-পক্ষের বক্তব্য শুনে অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। এই ঘরের নীচের ঘরে বন্দীরা অপেক্ষা করত এবং ছোট সিঁড়ির নীচের দরজায় নিশ্চয় দুজন সশস্ত্র লোক পাহারা দিত। বাইরে ব্যাসিলিকার বাঁধানো পথে ছিল আইন-গ্রন্থাগার—সেখানে দু-পক্ষের উকিলরা দেখা করত, ঘুরত, কথা বলত।

ধর্মীয় দিক দিয়ে পম্পেই-এর অবস্থা বেশ জটিল ছিল। এখানে এক মিশরী দেবতার মন্দির, ওখানে এক গ্রীক দেবতার মন্দির। ঐ দেশের দেবতা জেনাসের দু-মুখো মূর্তির সামনে রয়েছে সম্রাটের নবপ্রবর্তিত উপাসনা। কে জানে, ধ্বংসের মুহূর্তটি আসার আগে এইসব ছাদবিহীন দেয়ালের আড়ালে খ্রীষ্টধর্মের আশার বাণী অস্ফুটে উচ্চারিত হয়েছিল কি না? মনে হয়, এই রোমানদের কাছে ধর্ম ছিল পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, গৃহকে সুরক্ষিত করার জন্য শক্তিমান অনন্তের সঙ্গে বুদ্ধিমানের মত চুক্তি করা। কিন্তু যখন আমরা ওদের গণসৌধ, গণজীবন গঠন, নাট্যশালা, অসিবিদ্যালয়, স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্তি, বিচারালয়, সভাগৃহ দেখি, তখন এমন এক দৃঢ়তা দেখি যাতে কোন দুর্বলতা ছিল না। এই সাহসী রোমানরা নাগরিক সংগঠন, নাগরিক চেতনায় শ্রেষ্ঠ; যখন এরা যোদ্ধা হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন ধর্মবাদী দেশগুলি শক্তির উৎসস্বরূপ যোগ্য আত্মসংগঠন এদের পায়ের কাছে বসে শিখতে পারে। যেখানে ভারতের বীজ গেছে সেখানে সার্বজনীন বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে; যেখানে রোমের বীজ পড়েছে সেখানে শক্তিমান জাতি দেখা দিয়েছে। তার কাজ হয়ত ভয়ঙ্কর; কিন্তু তার ফলে শক্তি জন্ম নেয়।

ভারতীয় জীবনে নাগরিক উপাদান

দৃঢ় নাগরিক চেতনার উন্নতির মূল হল সাম্প্রদায়িক জীবন ও সচেতনতা বজায় রাখা এবং এই শর্ত প্রাচ্য দেশের মত এভাবে জগতের আর কোথাও পালিত হয় নি। এর কিছুটা হল, আবহাওয়ার ফল। ভারতবর্ষের নির্মল বাতাস ও নির্মেঘ আকাশের নীচে জীবন প্রধানত খোলা জায়গায় কাটে। রাস্তাই যে একজাতীয় ক্লাব, রাস্তার ধারের বারান্দা ও পাথরের আসনগুলি তার নীরব সাক্ষ্য দেয়। বড় বড়, খোলামেলা সালোঁর (Salon) পেছনে থাকে বাড়ি, যেমন গায়কদলের রক্ষণশীল সদস্যদের জন্য আলাদা ঘরের সারি থাকে কনভেণ্টে। মাঝে মাঝে আরো বড় সামাজিক ভীড়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরে তিনরাস্তার মোড়ে বড় গাছ আছে, যে কোন সময়ে দেখা যায়, ওর নীচে আরামে কোন না কোন দল বসে গল্প করছে। কাঞ্জিভরমে মন্দিরে ঢুকবার পথে এত চওড়া, তার আগের তোরণটি এত চমৎকার, পূজা ও আনন্দ, দুয়ের পক্ষেই এত অপূর্ব যে, ওই শহর যেন প্রাচীন গ্রীক বা অ্যাসিরীয় শহর। ভারতীয় মেয়েদেরও নাগরিক কেন্দ্র ও মিলনস্থল আছে, যদিও এগুলো প্রধানত স্নানের ঘাট, মন্দির বা কূপ-সংলগ্ন।

অবশ্য, একটি রাস্তার বাসিন্দাদের বা পুরুষ বা নারীদের মেলামেশা, ঠিক অর্থে শ্রেষ্ঠ নাগরিক একতা নয়। এরকম মেলামেশায় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের একথা খেয়াল থাকে যে, এই সম্বন্ধ পারিবারিক সম্বন্ধের চেয়ে বড়। কিন্তু তবু একটি ধর্মমত বা এক প্রথানুসরণের ফলে এর রূপ বৈচিত্র্যহীন হয়ে যায়। কাজেই এ ঐক্য সাম্প্রদায়িক বা স্থানগত, নাগরিক নয়। যুক্তির দিক দিয়ে বলতে গেলে, এ হল গ্রামের মধ্যে জমায়েত। কিন্তু শহর গড়ে ওঠে হাজার গ্রামের মানুষ ও পরিবার নিয়ে এবং তারা কখনই এক মত এমনকি এক জাতিও হয় না। আমরা যদি একমুহূর্তের জন্য কয়েকটি প্রাচীন শহরের কথা মনে করি, তাহলে বুঝতে পারব, খাঁটি শহর কত জটিল। ক্রোপোট্‌কিন দেখিয়ে দিয়েছেন, শহর সর্বদা অবস্থিত হয় বড় বড় রাস্তার মিলনস্থলে। এটা দেখতে হলে আমাদের কাশী, এলাহাবাদ, ব্যাবিলনের দিকে তাকাতে হবে। এখন, ভারতের সব রেলপথের কেন্দ্র হল দিল্লী।

তাহলে আদর্শ শহর হল রাখাল ও চাষী, ব্যবসায়ী ও শিল্পী, পুরোহিত ও তীর্থযাত্রী, বিচারালয় ও সৈন্যশিবিরের মিলনক্ষেত্র। পৃথিবীর সব অংশের স্রোত এই কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। শহর হল বাজার, আদান-প্রদানের কেন্দ্র, ধন ও শিল্পের সঞ্চয়, আন্তর্জাতিক মন্ত্রণাসভা, বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর ও দক্ষিণবাহী বিরাট নদীর তীরে অবস্থিত, পার্সিপোলিস ও থিংসের মাঝখানে ব্যাবিলন শহর, তার প্রধান পথগুলি চলে গেছে দামাস্কাস, বালবেক, আরব, এমনকি সুদূর চীনদেশে—এই শহর নাগরিক জটিলতার চরম উদাহরণ। কিন্তু এক সময়ে নিশ্চয় তক্ষশিলা, প্রাচীন থানেশ্বর এবং গৌরবময় পাটলিপুত্রের সঙ্গে তার মিল ছিল।

তাহলে ভগ্নাংশ নাগরিক ঐক্য নয়। 'অংশ' শহর নয়। তবু ভারতবর্ষে আমরা জানি, প্রাচীন ঐক্যের চমৎকার অংশে থাকে নাগরিক মর্যাদার নিয়ম ও নাগরিক বন্ধুত্বের আভাস, যদি তা দেখার চোখ আমাদের থাকে। গ্রাম হল বৃহত্তর পরিবার, ক্ষুদ্রতর গ্রাম, এর সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের ফলে ভারতবর্ষে গ্রাম যে-রূপ ধারণ করে, তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। যে জমির অংশটুকু ব্রাহ্মণের, সেটুকু তার জন্য চাষ করা হত। বিধবার চাষ করে দিত তার প্রতিবেশীরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার স্ত্রীর সংসার চলত লোকের দেওয়া উপহারে। আমরা লক্ষ্য করি, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শক্তি বজায় রাখার জন্য সম্প্রদায় তার শক্তি ব্যয় করত। এখনো ভারতবর্ষে এমন কোন গ্রাম নেই, সে যত দরিদ্র গ্রামই হোক, যে কোন অপরিচিত শিক্ষক বা চিন্তাবিদকে আসা-যাওয়ার খরচ না দিয়ে আমন্ত্রণ জানাবে, এছাড়া অতিথির জন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় তো আছেই। এখানে আমরা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী এক বিশাল নাগরিক সভ্যতার প্রমাণ পাই।

একই সত্যকে আমরা অন্যদিক দিয়ে উপলব্ধি করি, ভারতীয় শহরগুলির নাগরিক কত সহজে আতিথেয়তা দেখায়। এখানে আমরা বৃহত্তর সংগঠনে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখতে পাই। এমন কোন হিন্দু শহর নেই, যে মুসলিম নাম না থাকলে কোন বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাবে। তেমন, মুসলিম অঞ্চলে ভালো-ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন হিন্দু বাসিন্দা না থাকলে, সে অঞ্চলের গুরুত্ব থাকবে না। ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক মনে করা হয়, কিন্তু যৌথ কাজে এক সম্প্রদায় অন্যকে বাদ দিয়েছে, এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি! এরকম পারস্পরিক সৌজন্য ও স্বীকৃতির ফলে আমরা শ্রেষ্ঠ নাগরিক আত্মোপলব্ধির সম্ভাব্য বৃহত্তম ভিত্তিকে পাই। মনে রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের শহর এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যালোচনা করে, বুঝে আমরা আমাদের নাগরিক বোধ গড়ে তুলতে, উন্নত করতে পারব।

বলা হয়ে থাকে, শহরের সব কাজ শহরের লোকদের করা উচিত, এই দাবিই নাগরিকতার মূল দাবি। আমি না ভেবে পারি না যে, নাগরিকদের কর্তব্যের সাররূপী এই বক্তব্য ত্রুটিপূর্ণ। ওদের নিশ্চয় একত্রে আনন্দও করা উচিত! যে একটি বন্ধন ওদের দৃঢ়রূপে বেঁধে রেখেছে সব আপাত-বৈচিত্র্যের মাঝেও, মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে সে কথা ওরা যদি সচেতনভাবে অনুভব না করে, তাহলে নাগরিকতার মূল চেতনাই নষ্ট হয়ে ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এই বন্ধনের অনুভূতিকে উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। চিরকাল মানুষের ইতিহাসে সামাজিক ঐক্যের অনুভূতি ঘটেছে জয়ের প্রকাশে।

যে কোন গ্রাম্যপথের প্রান্তে প্রতিটি বিজয়তোরণ, স্নানের ঘাটে, গঙ্গার তীরে তোরণে এই অনুভূতি দেখা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মিছিল প্রচলিত করেছিলেন, তখন এই অনুভূতির কথাই তাঁরা জানতেন। ঋগ্বেদে বার বার পৃথিবীকে বলা হয়েছে "যজ্ঞভূমি", তার চারদিকে বছরে একবার আলোকবর্ত্ম পুরোহিতদের মত বৃত্তাকারে বেষ্টন করে। এ উপমা অতিসুন্দর ও বলিষ্ঠ উপমা। অগাস্তে কোঁতে-র কথা স্বাধীনভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "পৃথিবী নিজে হল বৃহত্তম প্রতিমা আর তার

চারদিকের মহাশূন্য হল অনন্ত বেদী।" এ যেন বৈদিক উপমারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু এতে আমাদের মনে পড়ে যায়, মূর্তি নিয়ে চমৎকার মিছিলের কথা, ঐ মিছিল ভারতীয় নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ। আলো যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করে, তেমন এই আনুষ্ঠানিক যাত্রা আমাদের গ্রাম ও জেলাগুলিকে ঘিরে থাকে, শুধু সরস্বতীর ভক্ত বা মহম্মদের স্মরণকারী সম্প্রদায়ের উৎসব করে না। আনন্দের সমগ্র ভারতীয় ধারণাই সম্প্রদায়ভিত্তিক, বিবাহেও মিছিল করে আনন্দ করা হয়।

আমরা যেন না ভুলি যে, বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে পবিত্র বস্তু। নগর ও জাতির প্রতীকস্বরূপ শোভাযাত্রাগুলি ক্রমশ আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, পরে সংখ্যায় আরো বাড়বে এবং তার তাৎপর্য গভীর হবে। এখনই প্রায়শ চোখে পড়ে, হিন্দু শহরের রাস্তা-গলি গায়ক কিশোরের দলে পূর্ণ, তারা পতাকা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছে কোন দেবতা বা দেবীর উদ্দেশে নয়, মাতৃভূমির উদ্দেশে "বন্দেমাতরম্" এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করছে। ওদের দেখবার সময়ে আমরা যেন মনে রাখি যে, যে শহরে ওরা ঘুরছে সেটি জাতির প্রতীক, এখানেই রয়েছে মায়ের সিংহাসন। ভবিষ্যৎ এইসব মন্ত্র ও কবিতা আরো শুনতে পাবে। বাঙলাদেশে প্রতিটি হিন্দুশিশু শৈশবে যে গঙ্গাস্তোত্র শেখে তা এক মুসলমানের রচনা। এইভাবে সে সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছে। এখনো আমরা সেই মহান যুগের প্রবেশপথে মাত্র রয়েছি। কিন্তু যারা এখন তরুণ, তারা এ ঘটনা ঘটার আগে বৃদ্ধ হয়ে পড়বে না। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে ভারতীয় হৃদয়ে প্রথমত মাতৃভূমি এবং দ্বিতীয়ত নিজের শহরের মত পবিত্র আর কোন প্রতীক হবে না। নাগরিক জীবন-সংক্রান্ত ধারণা পরিবার ও গৃহ-সংক্রান্ত ধারণার মতই স্পষ্ট হবে। নাগরিকতার কর্তব্য জাতি ও সমাজের কর্তব্যের চেয়ে কম মূল্যবান মনে হবে না। বিশেষ স্থানের উপাসনা, নাগরিক সম্মান, মর্যাদাবোধ ও সুখ প্রত্যেকের হৃদয়ে ফুলের মত ফুটে উঠবে।

নারীর বর্তমান অবস্থা

সাধারণ আলোচনা

মানবিক প্রথাগুলি যে আদর্শকে প্রকাশ করে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা নিরর্থক। প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তন, সে আধুনিক মার্কিন, হটেনটট, সেমিটিক বা মঙ্গোলীয় সমাজ যাই হোক না কেন, সকল উপাদানের আড়ালে থাকে আদর্শ। সমাজতত্ত্বের ছাত্রের যে কোন বস্তুর পেছনে এই গঠনমূলক উপাদান আবিষ্কারের অক্ষমতা এক বিরাট ত্রুটি। একটি জাতি কোন নৈতিক লক্ষ্যকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে নিজেদের পরিবর্তিত করেছে, আর অন্য জাতিগুলির কাছে এ লক্ষ্য নিরর্থক, তারা যেরকম ছিল তাই আছে, এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক। তবু জাতিগত সমাজতত্ত্বের পরিসংখ্যানের জন্য আমরা যে লেখকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তাদের মধ্যে এ-জাতীয় ধারণা খুব প্রচলিত। আমরা প্রধানত সাম্প্রদায়িক উৎসাহকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানবতার সেবা করতে বাধ্য, এ রকম কথার এই ফল হয়েছে।

তুলনামূলক বিবৃতিতে আর একটা ভুল এড়ানো চাই, সেটা হল, পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও প্রবণতাকে উপস্থিত করা, ভ্রান্ত দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দিয়ে তাদের আমরা মেলাই। প্রথা থেকে আদর্শ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে এমনভাবে তর্ক করা যায়, যাতে কিছু লোকের অজানা কাব্য ও আশার জগৎকে পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু আদর্শ সকলের জন্য, তা বিশেষ কারোর সম্পত্তি নয়; এবং যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমাদের কখনো মূল ঐক্য ও মানবজাতির মানবিকতার কথা ভোলা উচিত নয়। অতএব, প্রথম নজরে তিব্বতের মেয়েদের বহুস্বামিত্বের মত এত সঙ্কীর্ণ আর কিছু চোখে পড়বে না। আমরা ভাবতে পারি, এত বিশেষ ধরনের একটি জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট মান ও বুদ্ধি খোঁজা বৃথা। এরকম মত যে অসত্য হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সোয়েন হেডিনের সাম্প্রতিক বই 'ট্রান্স-হিমালয়'-এ। সেই বইতে তিনি এক তিব্বতী ভদ্রলোকের কথা বলেছেন, তিনি তাঁকে বুনো হাঁস মারতে বারণ করেছিলেন, কারণ, এই পাখিদের শোনা যায় মানুষের মত হৃদয় আছে, মানুষেরই মত তারা পুরুষ-স্ত্রী মাত্র একবার মিলিত হয়; অতএব, একজনকে মারলে আমরা আরেকজনের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখ নিয়ে আসব। সর্বত্র মানুষের আত্মার যে উচ্চ ক্ষমতা রয়েছে, সে কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই একটি ঘটনা যথেষ্ট, এক নজর তাকালে তার ফল যতই নিরুৎসাহব্যঞ্জক মনে হোক না কেন। আবার, আধুনিক ইউরোপের বিস্ময়কর গঠনমূলক ও আত্মগঠনকারী শক্তির কথা আমরা সবাই জানি। এই লক্ষণের আড়ালে কারণটি যখন দেখি, তখন এ মত গঠন করতে বাধ্য হই যে, এ ক্ষেত্রে আসল উপাদান হল, প্রাচীন রোমের প্রতিভার প্রভাব, এ প্রভাব প্রথমে সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে, তারপর ধর্মের ক্ষেত্রে এবং শেষে বর্তমান

যুগে জাতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে। কিন্তু সেই মূল রোমক প্রতিভা সম্পর্কে এমন কোন মন্তব্য করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে, যা আমাদের ক্ষেত্রেও বলা চলে এবং পীত জাতিগুলির বিরাট নেতারূপে চীনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রোম ও হুন-জাতীয় লোকদের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য হয়ত এই কারণে যে, এই দুটি চেতনাকে কাজ করতে হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও উপাদানের ভিত্তিতে। হয়ত মানবতার ঐ ঐক্যের ক্ষেত্রে রয়েছে সমাজতাত্ত্বিক সত্যের ভিত্তিপ্রস্তর, এসব আলোচনাই তার প্রমাণ দেয়।

শেষত, বিভিন্ন ধরণের প্রমাণের একেবারে পৃথক পৃথক মূল্যের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সম্ভব হলে লোককে দিয়ে নিজেদের কথা বলানো সর্বদা দরকার। সবাই স্বীকার করবে যে, একই উপাদান বিভিন্ন লোকের হাতে আলাদা-ভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমরা যদি বলি যে, সব ক্ষেত্রে বিদেশীদের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে মৌলিক প্রমাণকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, তাহলে আমাদের খুব বেশি ভুল হবে না। প্রমাণ-বিচার করার বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি একইভাবে মৌলিক নথিপত্র পরীক্ষা করতে পারে, যেমন ধরা যাক, দৈহিক পরীক্ষা বা বিচারালয়ের ক্ষেত্রে। তাহলে কোন বিশেষ দেশের বাসিন্দাদের বিবৃতি যদি বিশেষ কোন পক্ষের সমর্থনের উদ্দেশে রচিত হয়, সেটা এই ধারণার ফলে এমন অবস্থায় পড়বে, যেন প্রমাণ করে দেখানো যায় যে, ও বিবৃতি কোন বিশেষ প্রশ্নের কথা ভেবে রচিত নয়। যেমন, বিবাহের ক্ষেত্রে চীনা স্ত্রীলোকের অবস্থার উল্লেখ করতে পারি। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য আধুনিক লেখকরা আমাদের বলেছেন, এ অতি শোচনীয় অবস্থা। তত্ত্বগতভাবে স্ত্রী একেবারে দাসী হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইভাবে প্রাপ্ত সুযোগ স্বামী পুরো কাজে লাগায়। বিবাহ যে বর্বর হতে পারে এ কথা চীনের মত ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা শুধু জানতে চাইতে পারি যে, বিবাহের বিপরীত সম্ভাবনা আছে কি না, থাকলে কত পরিমাণে এবং কতটা তাড়াতাড়ি হতে পারে। আমার মনে হয়, সমাজের সাধারণ উন্নতির সঙ্গে কবিকে স্বীকৃতি ও খ্যাতিদানের ইচ্ছা জড়িত। এই সম্পর্কের কথা মনে রেখে আমরা মার্টিনের অনূদিত মরণোত্তর ছোট বই 'লা ফেম এন চিন' বইটির দুটি ছোট কবিতার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। দুটির মধ্যে একটি কবিতা এখানে দেওয়া যায়। কবিতাটি কবি লিন-চি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন:

আমার জীবনের হে প্রিয় সঙ্গিনী,
আমরা বাস করছি একই গৃহে,
কবর হবে আমাদের এক সমাধিতে,
এবং দুজনের মিলিত চিতাভস্ম আমাদের
মিলনকে করবে কালোত্তীর্ণ।
কত ভালবাসায় বরণ করেছ আমার দারিদ্র্যকে,
তোমার সেবায় চেষ্টা করেছ
আমার পাশে দাঁড়াতে!

আমার কবিত্ব দিয়ে আমাদের নামকে
পারি বিখ্যাত করতে,
তোমার দীপ্ত আদর্শ, তোমার প্রেমময় সেবা
কে পারি গৌরবময় করতে!
কিন্তু আমার ভালবাসা আর শ্রদ্ধা
এ কথা তোমায় প্রত্যহই জানিয়েছে।*

এ কথা কি সত্য নয় যে, একটি জাতি হৃদয় থেকে উচ্চারিত একটি আন্তরি বাণীর মূল্য সমগ্র মতামতের চেয়ে অনেক বেশি, সে মত যতই সত্য হোক? বিভি দেশে প্রকাশিত ঐতিহাসিক পদ্ধতির দ্বারা হয়ত সংগঠনের উদ্দেশ্যরূপে নানা আদর্শ বেছে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরিসংখ্যান ভালভাবে পরীক্ষা করলে কোন জাতি আধ্যাত্মিকতা বা সংস্কৃতিতে উন্নত না ভাবার কথায় সন্দেহ দেখা দেবে।

শ্রেণীবিভাগ

এই রচনার প্রকৃত বিষয়, সভ্য স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থার আলোচনায় প্রথ যা ঠিক করতে হবে, তা হল, শ্রেণীবিভাগের নীতি। আমরা মেয়েদের এশীয় ইউরোপীয়—দু ভাগে ভাগ করতে পারি। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে মার্কি স্ত্রীলোককে শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় স্ত্রীলোক বলে মনে করতে হবে। তাহলে জাপা স্ত্রীলোকের স্থান কোথায় হবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শব্দ দুটি খুব অস্পষ্ট, আধুনিক মধ্যযুগীয় কথা দুটিও ঠিক নয়। আবার, এই শেষের ভাগটিকে বাদ দিয়ে মে নর্স, টিউটন, স্লাভ বা ল্যাটিন—যা-ই হোক, তাদের পাশ্চাত্য এবং অন্যদি মঙ্গোলীয়, হিন্দু বা মুসলমান বলে ভাগ করা চলে না। এরকম শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি খুব জটিল। বোধ হয়, একমাত্র যথার্থ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি আদর্শ এবং তাই যদি হয়, তা হলে আমরা মানবসমাজকে স্ত্রী-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নাগরিক প্রাধান্যযুক্ত — পরিবার ও আদর্শগত প্রাধান্যযুক্ত সম্প্রদায়ে ভাগ করতে পারি।

*Paris Sandoz & Frischbacher, 1876

নাগরিক আদর্শ

অনেক স্ত্রীলোক ভুল করে ভাবে, নাগরিক আদর্শ রূপায়িত হয়েছে—এই আদর্শে পুরুষ ও স্ত্রীকে ব্যক্তিরূপে স্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে, প্রকাশ্য উৎসবে তাদের পরস্পরের নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং স্বেচ্ছায় তারা সহযোগিতার দ্বারা পরিবার গড়ে তোলে। নাগরিক জীবন উৎপাদনশীল সহযোগিতার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে পরিবারকে অবহেলা করতে চায় এবং শ্রেষ্ঠ উন্নতি ঘটলে হয়ত স্ত্রী-পুরুষ ভেদকেও অস্বীকার করতে পারে। যেমন, আমেরিকায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই 'নাগরিক' রূপে পরিচিত। কেউ বলে না, "তুমি আমেরিকার লোক না বিদেশী?" সর্বদা বলে, "তুমি কি আমেরিকার নাগরিক?" পুরুষের সঙ্গে রাজনৈতিক সাম্যের জন্য ইংরেজ মেয়েদের বর্তমান সংগ্রাম মেয়েদের নাগরিক বিবর্তনের দীর্ঘ পথে একটিমাত্র পদক্ষেপ। নাগরিক আদর্শকে সে যে লক্ষ্যরূপে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক জাতিগুলির মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রতি অতি-স্পষ্ট প্রবণতার ফলে এই মুহূর্তের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়েছে নিঃসন্দেহে; কায়িক থেকে যান্ত্রিক, বা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে শিল্পগত রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত এই পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী জনগণের মধ্যে পরোক্ষভাবে বেড়ে যায়, এটা বাড়িয়ে তুলেছে জাতিগত অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশগত সীমানার দিকে শাসক-শ্রেণীর লোকেদের আকর্ষণ। এসব ক্ষেত্রে জড়িত একটা উপাদান হল, অতি সাহসী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকরা প্রধান লক্ষ্যরূপে পরিবারকে অবাস্তব মনে করে। এসব স্ত্রীলোকরা নাগরিক জীবনকে তাদের কাজের ক্ষেত্র, মানসিক ও আবেগ-সংক্রান্ত উন্নতির ক্ষেত্র করে তোলে। এরকম অবস্থা বর্তমানের ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী রোমেও এরকমই হত। নিরো কর্তৃক তার মাকে হত্যার ঘটনাকে স্ত্রীলোকদের কষ্টকে অস্বীকার করার রোমক চেহারারূপে দেখা যায়।

মেয়েদের নাগরিক বিবর্তনের বিষয়ে এটা বোঝা সহজ যে, এইসব সম্প্রদায়ে এই বিবর্তন খুব দ্রুত ঘটবে এবং এই যুগে, যখন রাজনৈতিক ও শিল্পগত রূপান্তর ঘটছে, তখন এই বিবর্তন খুব প্রবল ও ব্যক্তিভিত্তিক। যে নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক-প্রভাব প্রাপ্ত ফলকে শেষ আকার দান করে, তা পাওয়া যায় আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক সম্পদ, সামাজিক, শিল্পগত ও আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে। এখানে আমরা আদর্শগত পার্থক্যের খুব আপেক্ষিক ও আনুমানিক চরিত্র থেকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ পাব। আমাদের সহানুভূতি যত প্রসার লাভ করবে, ততই তার ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়বে। ইংল্যাণ্ডে আন্দোলনরত অ্যাংলো-স্যাক্সন স্ত্রীলোকরা বা আমেরিকায় বড় পৌরপরিষদ গঠনরত স্ত্রীলোকরা যদি এখন পূর্ণ নাগরিক দায়িত্বের সংগ্রামে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে আসে, তাহলে ফ্রান্সের জাতীয় ইতিহাসে স্ত্রীলোকদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা ভুললে চলবে না। যে মধ্যযুগীয় ধর্ম লাতিন জনগণের অসাধারণ সৃষ্টি, যে ধর্ম আত্মার বাসস্থানরূপে স্ত্রীলোকদের সমগ্র মধ্যযুগে এক সুগঠিত পরিবার-বহির্ভূত

জীবন দিয়েছিল, হয়ত পরেও অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়রূপে তাদের ভবিষ্যতে একটি বিরাট অংশ গ্রহণ করবে, এর কথাও ভুললে চলবে না। এ কথাও ভোল চলবে না যে, ফিনল্যাণ্ড ইংরেজীভাষী জাতিগুলিকেও পরাজিত করেছিল। প্রসঙ্গে আমরা প্রাচ্যের নারীদের কথা অবহেলা করতে পারি না। যেমন, চার হাজার বছরে চীনের সচল ইতিহাসে নারীর গুরুত্ব সহজেই আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে, যদিও চীনা নারীর জীবনে পরিবার ছিল প্রধান, তবু সে নাগরি জীবনের বাইরে ছিল না। আবার, ৫৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাটের অধীন স্ত্রী চোং-ৎসের নিজের ছেলের রাজা হওয়ার বিরুদ্ধে মহৎ প্রতিবাদ বোঝা যায় যে, সে দেশে সুযোগ ও নৈতিক উন্নতি পাশাপাশি ছিল। তিনি বলেছেন, "এরকম কাজে আমার স্নেহ সন্তোষ লাভ করবে, কিন্তু কাজটা বেআইনী হবে। রাজার মত ভাব, কাজ কর পিতার মত নয়!" সবাই স্বীকার করবে, এ কথা তার নাগরিক গুণ ও গভীর রাজনৈতিক বোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রোমের যে কোন মায়ের যোগ্য হত।

প্রাচ্যে কিন্তু শুধু চীনই এর একমাত্র প্রমাণ নয়। ভারতেও স্ত্রীলোকরা মাঝে মাঝে শাসক ও সম্রাজ্ঞীরূপে প্রায়ই স্মরণীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ইসলামধর্ম সম্পর্কেও যে এ কথা বলা চলে না, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তত ভুপালে একটি ভারতীয় মুসলমান সিংহাসনের বরাবর অধিকারী স্ত্রীলোক। পশ্চিমী মেয়েদের ক্ষেত্রে নাগরিক ব্যক্তিত্বের বিবর্তন যে মন একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, প্রাচ্যও তেমন তার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এই আদর্শ রূপায়ণের ক্ষেত্রে অবদানের শক্তি যে রাখে, এ কথা বোধ হয় যথেষ্ট বলা হয়েছে। এটাকে অস্বীকার করা, অথচ পশ্চিমী মেয়েরা আনুগত্য, কোমলতা ও অন্যান্য পারিবারিক গুণ দিয়ে কখনো কিছু অর্জন করেনি, এই ভান করা মূর্খের মত কাজ। এই পরস্পরবিরোধিতায় শুধু বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতি ক্ষেত্রে অসংখ্য সামাজিক প্রথা লক্ষ্যের ধারণার সঙ্গে বাঁধা, অথচ সমাজের লোকরা উপস্থিত থাকলেও লক্ষ্যের তুলনায় তাদের প্রাধান্য অনেকটা কম, কিংবা হয়ত অপ্রকাশিত।

তাহলে, নাগরিক জীবন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবদ্ধ—সে সম্প্রদায় জাতিগত, প্রদেশ বা নগর-সংক্রান্ত, যাই হোক না কেন—তার ঐক্য পরিবারকে ছাড়িয়ে যায়, তাকে প্রাধান্য দেয় না, পরিবারের সক্রিয় উপাদানরূপে শুধু স্ত্রী বা পুরুষের ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করে। এ ধরনের সামাজিক সংগঠনে জনগণের মনোভাব হল একটি বিশিষ্ট গুণ; আর এর বিশিষ্ট দোষ হল, বিশেষ শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বার্থে সকলের কল্যাণের স্বাধীনতা দেওয়া হবেই। নাগরিক চেতনা হল জাতীয় ঐক্য বা প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার আদর্শের মত আদর্শের ব্যক্তিভিত্তিক রূপ। তার সৃষ্টিশক্তির মূলে রয়েছে স্থানের বন্ধন, গণ-গৃহ—এ বন্ধন রক্তের বন্ধন থেকে আলাদা—এই গণ-গৃহের সন্তানরা একত্র হয়ে নাগরিক পরিবার গড়ে তোলে, সে পরিবার জাতীয় পরিবাররূপে অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে।

আমাদের যুগ ব্যক্তিকে নৈতিক মর্যাদা ও পরিণতির যে বিশেষ পরীক্ষা করে তা হল—নাগরিক শিক্ষা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণ। আমাদের দেশপ্রে

যুদ্ধপ্রীতি থেকে সঙ্কীর্ণতা পর্যন্ত নানাজাতীয় হতে পারে, কিন্তু যে কোন আকারেই হোক, দেশপ্রেমের দাবিকে আমরা সঙ্গত বলে স্বীকার করি। বিভিন্ন দেশের নাগরিক বিবর্তনে বিভিন্ন সমস্যা থাকে এবং তার প্রভাব পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধাজনক হয়। আমেরিকায় প্রাচীন অবস্থা থেকে জন্ম নিয়ে সমাজ আধুনিকভাবে জেগে উঠেছে নতুন মাটিতে, সেখানকার মেয়েদের জীবনে অনেক উদাহরণ রয়েছে। এখন আমরা ঐ দেশে নিশ্চিতভাবে যে পারিবারিক ভাঙন দেখছি, তার দুঃখজনক প্রবণতাকে নাগরিক আদর্শের ফল বলে দেখাটা ভুল হবে। উন্নত নৈতিক লক্ষ্য সর্বদাই প্রায় পরস্পর জড়িয়ে থাকে। আধুনিক সম্প্রদায়ে নাগরিক একতার বৃদ্ধির সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা একসঙ্গে চলবে না। আমোদ-প্রমোদের অধিকারের ধারণার ফলে নগরের প্রগতিশীল ভাবধারা এবং পরিবারের রক্ষণশীল ভাবধারা—উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ঐ অধিকার এই বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ দেশটির বৈশিষ্ট্য, তার সম্পদ ঠিকমত কাজে লাগানো হয়নি। বিভিন্ন মার্কিন রাজ্যে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে; সাংসারিক ও পারিবারিক অনেক প্রতিষ্ঠান মেয়েদের কষ্টলাভ বন্ধ করেছে, আবার অনেকের কাছে বিবাহবিচ্ছেদ খুব চপলতার পরিচায়ক। কিন্তু এটাকে আমরা যথার্থ বলে ধরে নিতে পারি যে, মেয়েদের ক্ষেত্রে নগর ও পরিবার প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের বিরোধী নয়; কেউই তার সত্তার ক্ষতি করতে চায় না; কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই কষ্ট দেখা দেয় স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ও অপব্যয়ের ফলে; আবার, মেয়েদের সম্মান ও দায়িত্ব বৃদ্ধির প্রবণতার ফলে উভয়েই শক্তিশালী হয়। প্রধানত মার্কিন মেয়েদের সৃষ্ট নিউ মনাস্টিসিজ্‌ম্ নামক আন্দোলন—এটি সামাজিক পর্যালোচনা ও সমাজসেবার আন্দোলন—বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও হাল হাউসগুলিতে এ আন্দোলন জেগে উঠছে—নিরঙ্কুশ প্রমোদের আধুনিক মনোভাব, সর্বোপরি মার্কিন মনোভাব নিয়ে এটি গঠিত। এটি মূলত এপিকিউরীয় আন্দোলন,—এপিকিউরাসের মত এতেও সর্বদা মনে করা হয় যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দেই রয়েছে বেদনা—এতে শুধু দারিদ্র্য ও শ্রমকেই উজ্জ্বল এবং জীবন্ত করার চেষ্টা হয় না, যারা এতে জড়িত, যাদের কখনো বলতে শোনা যায়নি যে, সমাজসেবার সব দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও তারা তীব্র আনন্দ ছাড়া আর কিছু পেয়েছে, তাদের মনের সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় আনন্দও থাকে।

পারিবারিক আদর্শ

প্রাচ্যের সমাজ, অতএব তার নারীসমাজ অনাদি অনন্ত কাল থেকে পরিবারের মূল আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলেছে। চীনের দৃঢ়তা এবং ইসলামের আন্তর্গোষ্ঠীয় ঐক্যের কথা বাদ দিলে কোন প্রাচ্য দেশে বলা যায় না যে, নাগরিক চেতনা কখনো আধুনিক পশ্চিমী দেশের মত স্বচ্ছ ও প্রবল হয়েছে। তার ছোট একটা প্রমাণ-স্বরূপ আমাদের কাছে রয়েছে, বিভিন্ন জাতির সম্মানজনক উপাধির জন্ম-সংক্রান্ত আগ্রহজনক প্রশ্নটি। আমরা শুনেছি, চীনে সবরকম সৌজন্যমূলক সম্বোধন এসেছে পারিবারিক সম্বন্ধ থেকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, তবে পুরোপুরি নয়; কারণ, ভারতে অনেক উপাধি আসে বিচারালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মঠ ইত্যাদি থেকে। অবশ্য সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ও সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধি নিঃসন্দেহে দেখা যায় মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে, ওরা প্রথম থেকে বিদেশী, অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর বিষয়ে অবহিত। এশিয়া ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সব দেশে স্ত্রীলোক পদ-মর্যাদা ও চরিত্রগত কারণে, কদাচিৎ নাগরিক বা সামরিক শাসনে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্স যদি তার সাধ্বী রানী ব্লান্‌শ্‌ অব কাস্টাইলকে পেয়ে থাকে, তাহলে চীন পেয়েছে চাং সুন-চি-র মত প্রতিভাময়ী, শ্রদ্ধাশীল, স্মরণীয় রানীকে, তিনি ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে এসেছিলেন তাই-ৎসুং-এর স্ত্রী হয়ে। সামরিক ক্ষমতা ও বীরত্ব ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে একাধিকবার দেখা গেছে। এসব ঘটনা সত্ত্বেও, মেয়েদের প্রধান কর্তব্যরূপে নাগরিক জীবনের যে ধারণা, তা কখনো কোন প্রাচ্য জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে বলে বলা যায় না, এ ধারণা সাম্রাজ্যবাদী রোমের উত্তরাধিকারী জাতিগুলির মধ্যে গত একশো বছরে অবশ্যই দেখা দিয়েছে।

এখন পাশ্চাত্যে বহু অবিবাহিত মেয়ে রয়েছে, চাকরিরত ও চাকরিহীন দুরকমই, তাদের মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনের চেয়ে আগ্রহ নাগরিক জীবনের প্রতি বেশি। এদিকে প্রাচ্য পরিবারকে মেয়েদের যথার্থ নিজস্ব ক্ষেত্র বলে মনে করে চলেছে। পরিবার সমাজের অংশরূপে সমগ্র সমাজচেতনাকে নির্দিষ্ট করে। রক্তের ও বংশের দ্বারা গঠিত আত্মীয়-সম্প্রদায় পরিবারে একতার বন্ধনরূপে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র সম্প্রদায়টিকে প্রাচ্যদেশে সামাজিক-সম্প্রদায় বলে মনে করা হয়, তার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এইভাবে শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের যে ধারণা গড়ে ওঠে, তার ফলে দেখা দেয় জাতি এবং বহুসংখ্যক জাতি নিয়ে দেখা দেয় সমাজ। প্রাচ্য জাতির শিল্পে আমরা দেখতে পাই, তারা কত সহজে নীচ ও উচ্চ জাতির মধ্যে প্রভেদ করে এবং সেটা তাদের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ক্ষেত্রেও একই আগ্রহ দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত ইতিহাসকে উচ্ছেদ করে দেয় জাতিতত্ত্ব। ভূগোলে ওদের দৃষ্টি স্বভাবত সমস্যার অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে মানবিক দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। জন্ম-সংক্রান্ত ধারণার পরিপূরকরূপে প্রাচ্যের গ্রাম-সম্প্রদায় সম্পর্কে

ধারণা যথার্থত বেশি নাগরিক, এটা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু প্রাচ্যের সম্প্রদায়গুলিকে যদি বিদেশে উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রয়োজন আঘাত না করত, তারা যদি নিজের মত থাকত, তাহলে অতীতের মত ভবিষ্যতেও তারা হয়ত পরিবার, জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় অনুযায়ী বৃহত্তর ঐক্যের ভাবধারাকে উন্নত করত, চরমে পৌছে শ্রেণী, গোষ্ঠী ও আত্মীয়তাকে আন্তর্জাতিক পবিত্রতার ধারা বজায় রাখার জন্য বিশ্বাস ও প্রথার দ্বারা বাঁধা হত। অন্যদিকে, পশ্চিম দেশগুলি আত্মীয়তা ও শ্রেণীপূজার উন্নতিতে অক্ষম না হলেও স্বভাবত তাদের প্রবণতা স্থান ও দেশের উন্নতির দিকে এবং এইভাবে জাতিগত ধারণার পরিপন্থী জাতীয়তাবাদী ধারণার জন্ম হয়।

জাতিগত ঐক্য মুসলমান জনগণের বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, এর কারণ, তারা মূল গোষ্ঠীটিকে একমাত্র ঐক্যের মূল বন্ধন মনে করে এবং একটি সহজ ধর্মীয় ধারণার ওপরে নির্ভর করে। ইসলাম সব মুসলমানের অন্তর্বিবাহ সমর্থন করে, সে তাদের জাতিগত উৎপত্তি যাই হোক না কেন। কিন্তু প্রথমে ব্যপারটাকে যেমন অদ্ভুত মনে হয়, এটা যে সত্যি তা নয়, সেটা দেখানো সহজ। এখানে চরম অর্থে জাতিই ধর্ম এবং সে ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণভিত্তিক। অতএব, এরা অনবরত বাইরের উপাদান নিয়ে বেড়ে চলে। মূলত এরা সম্প্রদায়ভিত্তিক থেকে গেলেও অন্যান্যদের তুলনায় জাতীয়তাবাদের বেশি কাছাকাছি আসে। আবার, চীন সভ্যতার ক্ষেত্রে কনফুসীয় নীতিবাদ, চীনাদের অপূর্ব সাধারণ বুদ্ধি এবং জনকল্যাণের জন্য তাদের আগ্রহের জন্য সম্প্রদায়-চেতনা পরিবর্তিত হয়, ফলে দেশপ্রেম ও জাতীয় সমন্বয়ের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেয়। তবু এই প্রবণতা দেখা যায় পারিবারিক বন্ধনরূপে পূর্বপুরুষপূজার গুরুত্বের মধ্যে। বিবাহের পবিত্রতা রয়েছে স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য স্ত্রীকে আনার সুন্দর অনুষ্ঠানটিতে, পূর্বপুরুষদের প্রতি স্বর্গীয় সম্মান নিবেদনে।

পূর্বপুরুষদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অন্তত একটি ছেলেকে পালন করা কর্তব্য, হিন্দুদের এই ধারণায় ঐ একই উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। নির্বংশ পরিবারের পূর্বপুরুষরা দুঃখ পান, হয়ত পরলোকে দুর্ভিক্ষগ্রস্তও হয়ে পড়েন। আমার নিজের মতে, সম্প্রদায়ের সদস্য-সংখ্যা বজায় রাখার প্রয়োজন সম্প্রদায়কে বোঝানোর এ এক প্রাচীন পদ্ধতি মাত্র। আদিম সভ্য লোকরা যখন আরো আদিম লোকের প্রথার সম্মুখীন হত, তখন নিশ্চয় চিন্তাশীল লোকরা এই জরুরী বিষয়টির কথা ভেবেছে। যখন সম্প্রদায়ে একজনের স্থান তার ছেলে অধিকার করত, তখন সে ব্যক্তিজীবনের ইচ্ছামত চলতে পারত।

মুসলমান পরিবার

সব দেশে, সব যুগে নৈতিক সংগ্রাম রূপায়ণের স্বাভাবিক ক্ষেত্র হল পরিবার, তার ফল দেখা দেয় ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে। পরিবারের সুখ কোন সদস্যের দাসত্বের ওপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে সকলের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ওপরে। প্রাচ্য দেশগুলির বড় বড় সংসার ও একান্নবর্তী পরিবারে এই প্রয়োজন স্বতঃপ্রকাশিত। এরকম পরিবারের অস্তিত্ব নির্ভর করে প্রথমত.পদ ও কর্তব্যের যথাযথ বিন্যাসের ওপরে। এখানে আমরা মেয়েদের দাসত্বের ঘটনার সম্মুখীন হই, যে ঘটনা বর্তমান যুগের উৎসাহী স্ত্রী-আন্দোলকদের এত বিরক্তির কারণ ঘটায়। তবু স্বামী ও স্ত্রীর মত দুটি উপাদানের স্থায়ী ঐক্যের জন্য যে কোন একজনকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। নানা কারণে এই প্রাধান্য পুরুষরা পায়। যখন নাগরিক সংগঠন ঐক্যের আদর্শরূপে দেখা দেবে, তখনই শুধু স্বামী-স্ত্রী নিজেদের একতাকে নষ্ট না করে পরস্পরকে সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, অথচ পৃথক ব্যক্তিরূপেও তাদের সম্বন্ধ বজায় থাকবে। পারিবারিক শোভনতা বজায় রাখার প্রাথমিক শর্ত হল, স্বামী বা স্ত্রী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানকে তত্ত্বগতভাবে মেনে নেবে। পিতৃশাসিত পরিবারে—এখন মাতৃশাসিত পরিবার বিরল, প্রায় নেই—সর্বদা দ্বিতীয় স্থান হল স্ত্রীলোকের; কিন্তু এই নিয়মের প্রাধান্যের সঙ্গে তার প্রথম প্রয়োগের সময়ে যথেষ্ট বাধাও দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, পিতৃশাসিত ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সময়ে এই নিয়ম তৈরি হয়, তখন মনে হয়েছিল, এই নিয়ম পরস্পরবিরোধী ছাড়া কিছু নয়। প্রাচ্য মতবাদে পুরুষের প্রাধান্যের বিষয়ে যে জোর দেওয়া হয়েছে, সেটাই এর কারণ, মেয়েদের অপমানিত বা লাঞ্ছিত করার বাসনা এর কারণ নয়। পিতৃশাসিত ব্যবস্থার উদ্ভবের মুহূর্তে পিতৃত্বের জন্য এই আগ্রহের একটা প্রমাণ হল মুসলমানী প্রথা, বিশেষত মুসলমান জনগণের স্বাভাবিক বহুবিবাহ। পুরোপুরি ব্যক্তিসচেতন ও সভ্য স্ত্রীলোকের কাছে বহু স্ত্রীযুক্ত পরিবারে স্ত্রীর স্থান যথেষ্ট দুঃসহ মনে হতে পারে। এরকম বৈষম্য মেনে নেওয়া সত্যি সম্ভব হয়, একাগ্রমনে ত্যাগকে জীবনে প্রাধান্য দিলে এবং স্বামীর চেয়ে পুত্রকে নারীর আবেগের আশ্রয় বা ভরসারূপে আঁকড়ে ধরলে। ভারতে এবং চীনে পরিবারকে বজায় রাখার :জন্য বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য হলেও ইসলামের মত সম্পূর্ণ অনুমোদন ঐ দুটি দেশে কখনই দেওয়া হয় না। ইসলামীয় সভ্যতার এটি একাধারে শক্তি ও দুর্বলতা যে, আদিম সেমেটিক গোষ্ঠীগুলি যেসব মাতৃশাসিত জাতির দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই সভ্যতা নিজেকে পিতৃশাসিত সভ্যতার আদর্শের মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করে। আমাদের যুগে 'বাবিজ্‌ম্' বা 'বিহেজ্‌ম্' নামে প্রগতিশীল আত্মপরিবর্তনের যে স্বতস্ফূর্ত ইসলামীয় আন্দোলন দেখা যাচ্ছে, তাতে মেয়েদের শিক্ষিত করার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেওয়ার ধর্মীয় কর্তব্যের ওপরে খুব জোর দেওয়া হয়।

চীনদেশের পরিবার

ভারতবর্ষ বা আরবের তুলনায় চীন যদিও আদর্শের জন্য অতিপ্রাকৃতের ওপরে কম নির্ভরশীল, তবু তার যেন সাধারণের কল্যাণের জন্য বুদ্ধিভিত্তিক আগ্রহ রয়েছে। অন্যের মঙ্গলের জন্য সে সবরকম আত্মত্যাগকে সমর্থন করে, কিন্তু ভারতে আদর্শের যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, চীনের মন অত্যন্ত যুক্তিপ্রবণ ও বাস্তববাদী হওয়ায় ততটা যেন হয় না। সে বাস্তব প্রয়োগের আলোকে অতি উদার আবেগকেও বিচার করে। যেমন, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সার্থক মিলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকায় সে কখনো বাল্যবিবাহ প্রথার অনুবর্তী হয়নি। সে বিবাহের জন্য স্ত্রীলোকের কুড়ি ও পুরুষের ত্রিশ বছর বয়সকে ঠিক বলে মনে করে।* চীনদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও কখনো প্রবল আপত্তি দেখা দেয়নি। বরং গত শতাব্দীর আগে থেকে জাতীয় জীবনীসংগ্রহে সর্বদা বিখ্যাত নারী, তাদের শিক্ষা ও সাহিত্যকর্ম অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। মেয়েরা অনেক বিখ্যাত কবিতা ও নাটক লিখেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, একটি রাজবংশের ইতিহাস লেখকের মৃত্যুতে অসমাপ্ত থাকায় তাঁর শিক্ষিতা ভগ্নী তাকে যথাযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করেন।**

স্ত্রীরা যে স্বামীর মর্যাদা ভোগ করে এবং বংশগত সম্মানের অংশলাভ করে, এতেও ব্যক্তিরূপে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈনিক জীবনে মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি হল শ্রেষ্ঠ গুণ, এ কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু এই ভক্তি যে দুজনের প্রতিই দেখানো হয়, একজনের প্রতি শুধু নয়, এটা বোঝা দরকার এবং এটাই পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও দৃঢ়তার প্রমাণ। আমি প্রাচ্য ও বাদ্যযন্ত্র বীণার আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ চীনা কবিতার অনুবাদ শুনেছি, তাতে আমরা দেখছি, একটি মেয়ে তাঁতের সামনে বিষণ্নমনে বসে আছে, শেষে তাঁত ছেড়ে উঠে পুরুষের পোশাক পরল, সে তার বৃদ্ধ বাবার পরিবর্তে অনেক উত্তরে যুদ্ধে যাবে ঘোড়ায় চড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পথে সে সঙ্গীতের আত্মাস্বরূপ বাদ্যযন্ত্রটি পেল এবং সেটি বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দিল, যাতে তার সুরে তাঁরা বুঝতে পারেন, মেয়ের মন তাঁদের জন্য দিবারাত্র কত ব্যাকুল! সব লেখকরা যেন স্বীকার করেন যে, এখানে পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তির সমান ছিল সন্তানের জন্য চীনা পিতামাতার ভালবাসা।

চীনা পরিবারে পূর্বপুরুষপূজার অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ পুত্রদের করতে হয়। মেয়েরা বোধ হয় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের পরিবর্ত হতে পারে না। ১০৩৩ সালে, চীন সম্রাজ্ঞী অভিভাবিকা রূপে কাজ করছিলেন, তখন একটি ধূমকেতু দেখা দেওয়ায় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় পূজার প্রয়োজন হয় এবং সম্রাজ্ঞী

---

*Martin

**Prof. Giles, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

নিজেই ঐ পূজা করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এই সাহসী ঘটনাটি ব্যতিক্রম মাত্র। আবার, বিবাহের পর স্ত্রীদের পিতৃগৃহে যাওয়ার প্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হলেও পিতৃগৃহে সন্তানের জন্মের নিয়মটি অত্যন্ত কঠোর।* এইসব তথ্য থেকে মাতৃশাসিত সমাজের পিতৃশাসিত সমাজে রূপান্তরের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, রূপান্তর সত্ত্বেও সব আগেকার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়নি। চৈনিকসমাজ বলে, মাতৃশাসিত প্রথার অবসান তথা বিবাহের সূচনা ঘটিয়েছেন পৌরাণিক সম্রাট ফু-হি খ্রীষ্টাব্দের প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। প্রথা অনুযায়ী এই সম্রাট স্বয়ং, শোনা যায়, কুমারী মাতার সন্তান ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মায়ের বিবাহ হয়নি, এটা প্রাচীন চীনা সাধু ও বীরদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।** দক্ষিণ চীনে দেবীপূজার প্রাধান্য, বিশেষত স্বর্গের রানী কোয়ান-ইনের পূজায় মাতৃশাসিত সমাজের অনুরূপ চিহ্ন রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, সমগ্র এশিয়ায় দেবতাপূজার চেয়ে দেবীপূজা অনেক প্রাচীন এবং এই নিয়মকে মাতৃশাসিত সমাজকে পর্যবেক্ষণের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বলা যায়। চীনা ভাষায় গোষ্ঠীর নাম তৈরি হয় মাতা ও জন্মের নাম দিয়ে, এক সময়ে যে মায়ের মাধ্যমে বংশ পরিচিত হত, এ তার স্পষ্ট প্রমাণ। শেষত, মাতৃশাসিত সমাজের প্রভাব শুধু অভিভাবিকা-মাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব যা রাজমাতাতেই দেখা যায় তা নয়, সমাজের নিম্নস্তরে স্ত্রীর প্রতি বিবাহোত্তর আচরণ সম্বন্ধে তার পরিবার, এমন কি তার জন্মস্থানের গ্রাম যে কড়া নজর রাখে, তাতেও বোঝা যায়। ডাক্তার আর্থার স্মিথের মতে, এর ফলে যতদূর সম্ভব বিবাহবিচ্ছেদ এড়ানো যায় এবং নিষ্ঠুরতা ও স্ত্রী-পরিত্যাগের শাস্তি দেওয়া যায়। এইভাবে স্ত্রীর আত্মীয়রা বিবাহ-চুক্তির বলে এক অলিখিত অসাধারণ ক্ষমতা উপভোগ করে এবং এমন এক দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের থাকে যার উদাহরণ ইউরোপে নেই।

চীনা স্ত্রীলোকের জীবনে খাঁটি আদর্শও অনুপস্থিত নয়। মেয়েদের কৌমার্যরক্ষার শপথ গ্রহণের প্রবণতায় এটা দেখা যায় ; যে স্ত্রীলোকরা একবারমাত্র বিবাহ করে এবং যারা ষাট বছর বয়সের আগে ত্রিশ বছরের একনিষ্ঠ বৈধব্য পালন করে, তাদের প্রতি প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও সাধারণ সম্মানে এটা দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ রয়েছে, শোনা যায়, তার মধ্যে বর্তমানে তাওবাদী সম্প্রদায় বেশি সামাজিক সম্মান লাভ করে। এইসব আদর্শের একটা দুঃখজনক দিক রয়েছে—হয়ত সেই দিকটির জন্য চৈনিক সমাজ মেয়েদের নাগরিক জীবনের উন্নতিতে বাধ্য হবে—সেটা হল যে,মেয়েদের যদি বিবাহে বাধ্য করা হয় তাহলে একযোগে আত্মহত্যা করার গোপন শপথ নিয়ে মাঝে মাঝে তারা একত্র হয়। এ বিষয়ের লেখকরা কৌমার্যের প্রতি এই শ্রদ্ধার কারণস্বরূপ বলেন, চীনে ভারতীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ, এ কারণ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, নারীর যে সম্মান পিতৃশাসিত সমাজের স্থায়িত্বের অঙ্গ, সেই উচ্চ ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্বে আলোচিত মাতৃশাসিত সমাজের বীর নারীদের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি।

*Dr. Arthur Smith, Village life in China.

**Giles

ভারতে পরিবার

ভারতে এবং চীনদেশে পরিবারকে বজায় রাখা সাধারণের প্রতি ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করা হয়। সারা পৃথিবীর মত এখানেও নিয়ম রয়েছে যে, পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে মৃতের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারবে শুধু পুত্র, পুরুষ উত্তরাধিকারীর জন্যই এই বাসনা দেখা যায়। কিন্তু দত্তকপুত্র নেওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং পারিবারিক গুরুরূপে এ বিষয়ে পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের ফলে চীনাদের তুলনায় হিন্দুজীবনে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কিছু কম, চীনাদের মধ্যে পিতাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এশিয়ার অন্যান্য স্থানের মত এখানেও পরিবার যৌথ, এ-জাতীয় বৃহৎ সংসারে সাংসারিক বিষয় সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের দ্বারা চালিত হয়। অন্তঃপুরে বা মেয়েদের মহলে দাস-দাসী কম, পদস্থ, ধনী স্ত্রীলোকরাও রান্না, সেবা, পরিচ্ছন্নতার কাজে আমরা যতটা উচিত মনে করি, তার চেয়ে বেশি সময় ও শ্রম ব্যয় করে। বাল্যবিবাহ কমে এলেও এখনো অল্পবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ প্রথা, এই বিবাহে বালিকা বধূর সঙ্গে তার স্বামীগৃহের আত্মীয়দের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অনেকটা পশ্চিমী-মেয়েদের প্রথম বোর্ডিং-এ যাওয়ার মত। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, স্ত্রী স্বামীর সম্মান ও মর্যাদার অংশীদার, অতএব, সম্মান ও প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তার উন্নতি প্রথম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মাতৃত্বের আবির্ভাব স্ত্রীকে বিশেষ ক্ষমতা দেয় এবং এই স্বীকৃতির চরম অবস্থা হল, পুত্রদের অনুপস্থিতিতে সে তার স্বামীর উত্তরাধিকারী, সন্তানদের শৈশবে তাদের অভিভাবিকা। বিধবা হিসেবেও তার দত্তকগ্রহণের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে। মায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মেয়েরা পায়।

ভারতীয় নারীদের সৃষ্ট ও চালিত ভারতীয় সংসারজীবনের চেয়ে সুন্দর কিছু কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু যদি এমন কোন সম্বন্ধ বা অবস্থা থাকে যার উদ্দেশে জনসাধারণ তাদের আদর্শ রচনার শক্তিকে ব্যয় করে, তবে তা হল স্ত্রীর সম্বন্ধ। হিন্দু ভাবধারা অনুযায়ী এখানেই রয়েছে সমাজ ও কাব্যের মূল। হিন্দুধর্মে বিবাহ অবিচ্ছেদ্য, পবিত্র। বিচ্ছেদের ধারণা যেমন অসম্ভব, বিধবার পুনর্বিবাহ তেমনই ভয়ঙ্কর। প্রাচীন হিন্দুমতে এই শেষ বিষয়টিকে আইনত সম্ভব করে তুলেছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবন ও পরিশ্রম দিয়ে। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলিষ্ঠ সমর্থকদের একজন ছিলেন। কিন্তু বিধবার পরিবর্তিত আইনসম্মত অবস্থায় জনসাধারণের সাধারণ মনোভাব একই রইল। নিঃসন্দেহে যে কারণটির জন্য বিধবাবিবাহ ঘন ঘন হচ্ছে তা হল, পরিণত সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত বয়সী স্ত্রীর জন্য তরুণদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। সম্প্রতি কলকাতার এক দৈনিক পত্রে একটি ভারী করুণ বিজ্ঞাপন থেকে অভিজাত, পদস্থ এক তরুণের এরকম প্রয়োজন দেখা গেছে, তাতে আরো রয়েছে, "এক পয়সা পণ নেওয়া হবে না।" বোধ হয়, এই একটি সামাজিক শক্তিই বিবাহের বয়স বাড়িয়ে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাকে

নিশ্চিত করে তুলবে। হিন্দুধর্ম যে ব্যক্তির চেয়ে পরিবার এবং পরিবারের চেয়ে সমাজকে প্রাধান্য দেয়, স্বামীকে ত্যাগ, স্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগের অন্যায়ের কোন ক্ষমা হয় না, এ কথা সত্য। কেউ এরকম করলে প্রাচ্য কখনো ভাবে না যে, সেই স্ত্রী যা অসহনীয় তাকে ত্যাগ করতে পারে, বরং এর ফলস্বরূপ যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার জন্য তাকেই বেশিরকম দায়ী করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যথার্থই ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন হয়েছিল—একজাতীয় হিন্দু ধর্মান্দোলন—তাতে পুরুষের সমান অধিকার, ধর্মীয় ব্রহ্মচর্যের অধিকার মেয়েদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে পরিবারকে ত্যাগ করার ঘটনাকে অধিকার ভঙ্গ বলে মনে করা হবে। ভারতীয় জনগণের সব স্বপ্নের কেন্দ্র হল স্ত্রীর বীরোচিত পবিত্রতা ও বিশ্বাস।

স্ত্রীর প্রতি হিন্দুর এই মনোভাবে একটা যাদুবিদ্যা-জাতীয় উপাদান রয়েছে। তাদের পূজানুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতারূপে পুরোহিতদের পরের শ্রেণী বলে মনে করা হয়। আমি একটি স্ত্রীলোককে মন্দিরের কাজ করতে দেখেছি, তার পুরোহিতপুত্র তখন সাময়িকভাবে অসুস্থ ছিল! আনুষ্ঠানিক কর্মে পুরুষেরই একমাত্র যোগ্যতা আছে, আমাদের এই সংস্কার সহজাত মনে হলেও তার কারণ সম্ভবত সেমিটিক প্রভাব। এমনকি রোমে ব্রহ্মচারিণীরা ছিল। কুর্গের অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগ্র বিবাহের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে স্ত্রীলোকেরা, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সারাদেশে বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে মেয়েদের হাতে। যাত্রার পূর্বে বা কোন কাজের সূচনায় পুরুষের চেয়ে মেয়ের আশীর্বাদ সর্বত্র বেশি যোগ্য বলে মনে করা হয়। মেয়েরা আধ্যাত্মিক দীক্ষা দেয়, কুলগুরুর কাজ করে, তার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, যদি ভবিষ্যৎ গুরু শিশু থাকে এবং এতে কেউ মন্তব্যও করে না। ছোট ছেলেকে শেখানো হয় যে, ভাইদের সঙ্গে সে যেমন ব্যবহারই করুক, বোনকে আঘাত করা অপরাধ। সমস্ত লোকের চেয়ে মাকে বেশি ভালবাসা প্রত্যাশিত। তার ফলে মেয়েদের সুখ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। স্থায়ী কীর্তির প্রতিযোগিতায় নারী-শাসিকাকে যে সম্মান ও প্রশংসা দেওয়া হয়, তাতে পুরুষের তুলনায় তার অনেক বেশি সুবিধা হয়। এর আংশিক কারণ হল, অধিকাংশ মেয়েদের ভক্তি ও জীবন-ব্যাপী স্বার্থত্যাগ; কিন্তু তার চেয়েও বেশি হল, যখন তারা জগতের শাসক ও রক্ষক ছিল, তার ম্লান স্মৃতি। তিনটি বৃহৎ এশীয় সমাজ—চীনা, ভারতীয় ও ঐস্লামিক সমাজে পরিবারের বাইরে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মেলামেশা নেই। কিন্তু মেয়েদের গৃহে আবদ্ধ থাকার বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, ভারতের যেসব প্রদেশে আদিম সমাজের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের খুব কম যোগাযোগ ঘটেছে সেখানে এই নিয়মের কঠোরতা খুব কম এবং সবচেয়ে কঠোর বোধ হয় মুসলমান জনগণের মধ্যে।

প্রাচ্যে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা

মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিয়ে আলোচনা না করলেও তার অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উল্লেখ করতেই হয়। যেসব সমাজে পারিবারিক জীবনই মেয়েদের প্রধান, সেখানে সে পিতা বা স্বামীর ওপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের মধ্যে এই নির্ভরতা সামান্য কমিয়ে দেয় বিবাহের সময়ে ও পরে পাওয়া অলঙ্কারগুলি। এই সম্পত্তি একবার দেওয়া হলে তা স্ত্রীর নিজস্ব হয়ে যায়, এমনকি তার স্বামীও তা ছুঁতে পারে না, বৈধব্য দেখা দিলে যদি আর কোন সঞ্চয় না থাকে, তাহলে সে তা বিক্রী করে ঐ অর্থের সুদে চালায়। মুসলমানদের মধ্যে একটা যৌতুকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং স্বামী বিবাহের সময়ে এই চুক্তিপত্রে সই করে। শোনা যায়, কলকাতার প্রতিটি ট্যাক্সিচালক স্ত্রীকে এক হাজার টাকা যৌতুকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ টাকা দেওয়া নেহাৎ অসম্ভব, তবু প্রথাটা নিরর্থক নয়। যদি সে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়, তাহলে তাকে যথাসাধ্য টাকা দিতে হবে, বলা হয়, বিচারের দিনে স্বয়ং ঈশ্বর জানতে চাইবেন, যে টাকা সে দেয়নি, সে টাকা কোথায় আছে। স্ত্রীকে রক্ষা করাই যে এর উদ্দেশ্য সেটা বোঝা সহজ। একটা চমৎকার গল্প থেকেও এই প্রথার যৌক্তিকতা বোঝা যায়। মহম্মদের মেয়ে ও আলির স্ত্রী ফতিমাকে তার বাবা জিজ্ঞাসা করেন, সে কি যৌতুক চায়, ফতিমা বলে, "প্রত্যেক মুসলমানের মুক্তি!" এইভাবে বিবাহের হাতে নিজের অরক্ষিত ভবিষ্যৎকে সঁপে দেওয়ায় ঈশ্বর নিজে বিচারের দিনে তাকে যৌতুক না দিয়ে পারবেন না।

চীনারা স্ত্রীলোকের দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ বৈধব্যের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা করে, তা আমি জানতে পারিনি। নিঃসন্দেহে ভারতের মত চীনেও সমগ্র পারিবারিক ঐক্যই তার প্রধান উপায়। যদি স্বামীর আত্মীয়রা তার ভরণপোষণ করতে না পারে, তাহলে সে নিজের বাবা বা ভাইদের ওপরে নির্ভরশীল হয়। যতদিন যে কোন একটি পরিবার থাকে এবং তাকে দেখাশোনা করে, ততদিন তার স্বীকৃত স্থান থাকে। যদি তার সন্তান থাকে তাহলে সন্তানসহ তাকে স্বামীর আত্মীয়দের কাছে থাকতে হয়।

সমগ্র প্রাচ্য স্ত্রীলোকের নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন বোঝে। শোনা যায়, চীনদেশে তুলো সংগ্রহের কাজ, রেশমগুটির পরিচর্যা; ভারতে দুধ, পশু, ফল বিক্রী; মুসলমানদের মধ্যে ডিম, মুর্গী ও ছাগলের দুধ বিক্রী থেকে পাওয়া অর্থ সংসারের গৃহিণীর হাতখরচ। ফরাসী স্ত্রীলোকদের মত প্রাচ্য স্ত্রীলোকেরা খুব মিতব্যয়ী, সামান্য অর্থ সঞ্চয়ে বাড়িয়ে তোলার ক্ষমতা তার অসাধারণ। বোধ হয় প্রত্যেক পুরুষই স্বীকার করবে, গৃহের স্বার্থে মেয়েদের নিজস্ব সঞ্চয় থাকা উচিত। অবশ্য পারিবারিক পরিবেশ খুব বেশি দারিদ্র্যপীড়িত হলে এটা সম্ভব হয় না।

একথা বুঝতে হবে যে, বর্তমান যুগে প্রাচ্যে একটা অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছে। আমাদের মধ্যে দেড়শো বছর আগে এবং প্রাচ্যে পঞ্চাশ বছর আগে সব স্ত্রীলোকের বিশেষত ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের প্রধান কাজ ছিল সুতো কাটা। আমি বহু উচ্চ-

শিক্ষিত লোক দেখেছি, যাদের শৈশব হয়ত পিতামহীর গোপন উপার্জনের ওপরে নির্ভর করে কেটেছে। এখন আর তা সম্ভব নয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তার পরিবর্তে যে পরিমাণ নিষ্ফলা অবসর দেখা দিয়েছে তা এর একটি দুঃখজনক পরিণতি। আমরা সবাই জানি, বিলাসিতার বৃদ্ধি ও দক্ষতাহ্রাসের ফলে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকরা সুতো কাটা ও আনুষঙ্গিক শিল্পের বদলে আগের চেয়ে স্বামীর ওপরে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের মধ্যে অবিবাহিত স্ত্রীলোকরা নতুন পেশা ও জীবিকা গ্রহণ করলে মেয়েদের প্রধান অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। এখনো প্রাচ্যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে আমাদের অল্প কিছু নারী চিকিৎসক ও লেখিকা রয়েছেন; আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান চেতনার ফলে একশ্রেণীর শিক্ষক মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নিজেদের শিক্ষিত করে তুলছেন। এছাড়া নিম্নতর সামাজিক শ্রেণীতে পুরনো কুটিরশিল্পের জায়গায় আসছে কারখানা-জাত শিল্প এবং বহু জায়গায় মেয়েরা শ্রমিকের কাজ করছে। অবশ্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে রয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সব দিকে দারিদ্র্যের কামড়। সভ্যতায় যে অনেক পরিবর্তনের স্তর থাকে, এটা সেইরকম একটা স্তর। এই পরিবর্তনের স্তর লক্ষ্য করা ভয়ঙ্কর। সে স্তর কষ্ট ও শাস্তিতে ভরা। তবু প্রাচ্যকে এর থেকে বাঁচানো যাবে না। তবে চাকরির দ্বারা এইটুকু চেষ্টা করা যেতে পারে যে, যে আদর্শ নিয়ে প্রথাগুলি গড়ে উঠেছে সেই আদর্শ থেকে তাদের চ্যুত করা হবে না। এটা মেনে নিলে প্রাচ্য জনগণের পক্ষে নতুনকে শোধন করে নিজেদের বিবর্তনের অতিপরিচিত ব্যবহারে লাগানো সম্ভব হতে পারে।

আভ্যন্তরীণ উন্নতি

একথা বোঝা উচিত যে, এশীয় চিন্তা ও আদর্শের উৎস হল ভারত। অন্যান্য দেশে আমরা প্রয়োগ দেখতে পেতে পারি, কিন্তু ভারতে পাই মূল ভাবধারা। ভারতে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও মাধুর্য এক মহান সংস্কৃতির স্তরে উন্নীত হয়েছে। স্ত্রীর ধর্ম হল যথার্থ ধর্ম; মাতৃত্ব হল পূর্ণতার স্বপ্ন; মানুষের গর্ব ও রক্ষণশীলতাকে খুব উঁচুতে তুলে ধরা হয়। ভারতীয় গৃহের মহাকাব্য রামায়ণ সাহসের সঙ্গে এই মত ঘোষণা করেছে যে, পুরুষও স্ত্রীর মত মাত্র একবার বিবাহ করবে। একজন ভারতীয় স্ত্রীলোক দৃপ্তস্বরে আমায় বলেছিল, "আমরা একবার জন্মাই, একবার মরি, বিয়েও একবার করি!"

এখন প্রাচ্যের মেয়েদের সামনে যে উন্নতিই থাক, আমরা আশা করব যে, তারা বৃহত্তর জ্ঞান ও উদার সামাজিক সংগঠনের নতুন ছাঁচে সেই প্রাচীন আনুগত্য ও পবিত্রতার গলিত ধাতু ঢেলে দেবে।

পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে মনে হবে, আধুনিক যুগ পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়েদের নৈতিক শক্তির নতুন উৎসকে উন্মুক্ত করেনি, অবশ্য তাকে নারীরূপে বৃহত্তর প্রচার ও নাগরিক প্রভাবের ক্ষেত্রে চালিত করে সে নারীকে তার চরিত্রের প্রাচীন উৎসকে কাজে লাগাবার অব্যাহত সুযোগ দিয়েছে এবং তার সামাজিক গুরুত্বও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, আধুনিক সংগঠন নারীকে সঞ্চিত মাতৃত্বের ভাব, বৃহত্তর দুঃখের দৃশ্য এবং নাগরিক উন্নতির ত্রুটির সঙ্গে পরিচিত করে নিঃসন্দেহে তার কাছে দায়িত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছে। প্রাচ্যের মেয়েরা এর মধ্যে আত্মরূপান্তরের পথে পা দিয়েছে, এর শেষে সে নাগরিক ও বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতায় পৌঁছবে। সে যেমন আমাদের জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছে, তেমন তার সেবায় আমরা তৃপ্ত হব, পারিবারিক পবিত্রতা, বিশেষত বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতার এক নতুন চেতনা লাভ করব, এ আশা করা কি অসম্ভব হবে?

আধুনিক যুগ ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা

আজ ভারতবর্ষের মন বুঝেছে যে, তার সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সৃষ্টি। তার জন্য, ইতিহাস সচেতনার জাগরণ চাই। কিন্তু এরকম জাগরণ আর ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য আমাদের ভাল করে বোঝা চাই। ভারতবর্ষ এরকম উপাদানে পূর্ণ, কারণ, ভারতবর্ষ প্রবল জাতীয়তাবাদী অনুভূতির উপাদানে প্লাবিত। কিন্তু দুটো পৃথক বস্তু। একরাশি খণ্ড বস্তু যত সংখ্যকই হোক সমগ্রকে গড়ে তুলতে পারে না। দীর্ঘ কথার

মালা গাঁথলে অভিধান তৈরি হয় না। পুরাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক তথ্য ইতিহাস-গঠনে যতই যথেষ্ট হোক, ইতিহাসের স্থান অধিকার করতে পারে না।

বলিষ্ঠ, সচেতন জাতীয় জীবনের প্রকাশের জন্য কিসের দরকার? বিশেষ স্থানের প্রতি প্রেম, জন্মের জন্য গর্ব বা অতীত সংস্কৃতিতে বিশ্বাসই কি যথেষ্ট? কোন একটা বা একত্রে সবগুলো যথেষ্ট কখনো হতে পারে না। উপরন্তু, সমন্বয়ের দুর্বার বাসনা, সহযোগিতাবোধ, মহৎ সৌভ্রাত্রের দৃঢ় শৃঙ্খলা থাকা চাই। তেমন, ইতিহাস গঠনেও সঠিক খুঁটিনাটি তথ্য জড়ো করার চেয়ে প্রধান ভাবধারাগুলি বেশি প্রয়োজনীয়। কোন রাজার রাজত্বকাল বা যুদ্ধের তারিখ সঠিকভাবে সংগ্রহ করার চেয়ে অতীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ এবং তার থেকে ভবিষ্যতের সূত্র সংগ্রহ করলেই আমরা বড় ঐতিহাসিক, জনগণের বিবর্তন-সঙ্গীতের প্রধান গায়ক হতে পারব।

সাম্প্রদায়িক বা কালগত, সব ইতিহাসেরই মূল সূত্র রয়েছে, সেটা না বুঝলে সে ইতিহাস এলোমেলো হয়ে পড়ে। কখনো হয়ত আমরা নগরের আদর্শ খুঁজছি, কখনো বা ধীরে পরিবর্তমান গীর্জার কাছে যাচ্ছি। আসল হল জাতীয়তার ভাবধারা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এ দুটি যদি প্রধান না হয়, তাহলে মানবিক চেতনায় ফ্ল্যাণ্ডার্স বা ইতালি অথবা ডাচ জাতির অর্থ কি? কি করে ইউরোপীয় জীবনে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সৌরভ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর সাময়িক সম্ভাবনা ফিরিয়ে আনা যায়?

তাহলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আলোকে ভারতবর্ষকে পর্যালোচনা করে কোন্ কোন্ বিষয়কে আমরা তার উন্নতির প্রধান সূত্র, আমাদের ব্যাখ্যার প্রধান উপাদান বলে মনে করব? তার শত্রুদের মত আমরাও কি বিশ্বাস করব যে, ভারতবর্ষ চিরকাল দুর্বল, মূর্খ কৃষকের দেশ, স্ত্রীলোকসুলভ ভাবধারা, স্ত্রীলোকসুলভ ঈর্ষা ও কলহে পূর্ণ, একতার বা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক ভাবনার শক্তি নেই, স্বদেশবাসীর শত্রুদেরই সে আতিথেয়তা দেখাতে চায়? যদি এই কথাগুলি আমরা অবিশ্বাস করি, তাহলে এ বিষয়ে বিপরীত তত্ত্বগুলি প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের। শুধু চীৎকার করে অস্বীকার করলেই কোন মিথ্যা বিশ্বাসকে দূর করা যায় না। যুক্তিহীন তত্ত্বের জায়গায় চাই সঙ্গত তত্ত্ব, দুর্বল বক্তব্যের বদলে বলিষ্ঠ বক্তব্য, মিথ্যার বদলে সত্য। কোন্ পক্ষ জয়ী হবে, তার প্রশ্ন ওঠে না। জ্ঞানই শুধু জয়ের শর্ত। সত্যের প্রতি চরম অনুরাগ ঠিক করে দেয়, কে জয়ী।

শুধু ইতিহাসে নয়, তার সঙ্গে সবরকম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতীয় সমালোচনাকে খুঁটিনাটি বস্তুর ব্যাপক অনুসন্ধান থেকে উদ্ধার করতে হবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, ভগবদ্‌গীতা এখানে একটা বিশেষ্য, ওখানে একটা বিভক্তি নিয়ে শুধু চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করে। কিন্তু জঙ্গল বাদ দিয়ে গাছকে দেখার এই ব্যর্থতাকে যথার্থ অর্থে গীতার জ্ঞান কিছুতেই বলা যায় না। সামান্যীকরণের শক্তি ও স্বভাব ভারতীয় মনের দ্বারা পুনরধিকার করতে হবে। ইতিহাসের মত এই বিষয়ে প্রয়োজন আর কোথাও এত নয়।

সামান্যীকরণের শক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ যে সামঞ্জস্য ঘটানোর শিক্ষিত চেতনা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে যারা প্রাচ্যের জ্ঞানকে নতুন করে সৃষ্টি করবে তাদের কাছে ইউরোপীয় ইতিহাস জানার মূল্য আমরা উপলব্ধি করি। সাহিত্যগুণযুক্ত আবিষ্কৃত ও গঠিত ভাবধারারূপে ইউরোপীয় ইতিহাসের একমাত্র অস্তিত্ব আছে। যে মহান যুগ ভারতবর্ষে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাদের সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে এই চিন্তা যে, এক মুহূর্তের জন্যও আমরা উপলব্ধি করেছি, আধুনিক ঐতিহাসিক ভাবধারার যথার্থতা রয়েছে জনগণের অতীতে নয়, ভবিষ্যতে, তার ফলে দেখা দিয়েছে অতীতগাথা, জাতীয় জীবনের সঙ্গীত প্রথম লিখবার ও গাইবার দায়িত্ব। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাস যে আকারে ভারতে পৌঁছেছে, সে ইতিহাস সামান্যীকরণ সম্বন্ধে খুব অল্প জানে, সে ভারতের সব ঘটনার নীচে যে প্রবণতার স্রোত বয়ে চলেছে তাকে বাস্তবরূপে, সহানুভূতির সঙ্গে জানে না। সামঞ্জস্য ঘটানো হল জ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ; ধারাবাহিকতার ভাবধারা তারপর। আগে কুভিয়েরের শ্রেণীবাদ তারপর ডারউইনের বিবর্তনবাদ।

তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের সামনে যদি সামঞ্জস্য ঘটানোই প্রথম কাজ হয়, সেক্ষেত্রে প্রথম কোন অসাধারণ ঘটনাকে সে সামগ্রিকরূপে বুঝতে ও বোঝাতে শিখবে? নিশ্চয় আধুনিক যুগের বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট, বাস্তব ধারণা করাই হবে তার প্রথম কাজ। অস্পষ্টভাবে ভারতীয় ছাত্র নিজেকে সারাজীবন জানে, জানে সে সংঘর্ষমান দুই জগতের মাঝে জন্মেছে। এতদিন যা ছিল অস্পষ্ট অনুমান, এখন তা হয়েছে স্পষ্ট ভাবনা। আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? একসময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ছিল মূলত আলাদা, শুধু ধর্মীয় আশা ও বিশ্বাসে নয়, তার চেয়ে গভীরে,—প্রাত্যহিক অভ্যাসে, শিল্প উপভোগের ধারণায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ধরনে। এখন এইসব দিকগুলি যতটা "আধুনিক", ততটাই সে একটা বিশেষ ধরনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। বহু প্রথার গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য চলে যেতে বসেছে। সাহিত্যিক আদর্শ, রাজ উচ্চাশা এবং আগ্রহের বিষয় সকলেরই এক। এ যুগ হল স্বীকৃতির যুগ।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য স্পষ্ট, স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়। যে সব ঘটনাবলী এই জটিল ফল সৃষ্টি করেছে, সেসব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে পারার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। কেন এ যুগ স্বীকৃতির, আন্তর্জাতিকতার যুগ? কেন দিনের পর দিন ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড পৃথক না হয়ে ক্রমশ একরকম হয়ে উঠছে? প্রত্যেকের লক্ষ্য আমেরিকা, এ কথা কোন্ অর্থে বলা যায়? যা স্পষ্টত নতুন যুগের, তা সেনাবাহিনী, কারখানা, আর্থিক ব্যাপার বা আমোদ-প্রমোদ—যাই হোক, তার প্রধান আদর্শ কি? অচেতনভাবে কোন্ লক্ষ্য অনুসরণ করে মানুষ সংখ্যা দিয়ে যোগ্যতার বিচার করে; বিদ্যুৎগতিতে বিরাট বিশ্বপথে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে; ক্রমশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করে; বিশেষ ক্ষমতা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যায়?

যাকে আমরা আন্তর্জাতিকতা বলে সন্তুষ্ট হই, আসলে তা দ্রুতগতির ফল এবং গতির ঐ দ্রুততা হল বাষ্প ও বিদ্যুতের যান্ত্রিক ব্যবহার আবিষ্কারের ফল।

যান্ত্রিক যুগের আড়ালে রয়েছে আধুনিক যুগ। যন্ত্র তার আদর্শ; তার স্বপ্ন হল ক্রমশ আরো বেশি জায়গাকে অধীনে নিয়ে আসা। গঠন ও প্রচেষ্টায় এটি যাতনা দুর্নীতিগ্রস্ত তার চেয়ে বেশি নীতিবিহীন। এ উৎপাদন ঘটায় না; অতীতের উৎপাদনকে সংগ্রহ করে।

তবু আধুনিক যুগের নিজস্ব মহত্ত্ব আছে। বিজ্ঞানে তার জ্ঞান সুগঠিত—ভ্রমণ-জগৎকেও সে সুগঠিত করেছে। সে দৈনিক সংবাদপত্রের তথ্যকেও গড়ে তুলেছে। এর ফলে, মানুষ যে পুরোহিততন্ত্রের চাপে পড়ে আর্তনাদ করত, সেই পুরোহিত-তন্ত্রের শক্তি সে অনেক কমিয়ে দিয়েছে। একথা সত্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে নিজের পুরোহিততন্ত্র গড়ে তুলেছে সাংবাদিক বা সংবাদ-সেন্সর প্রথা দিয়ে, যে প্রথা মূর্খ জগতের ওপরে গোঁড়ামি চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত। সন্তদের জীবনীর বদলে অভিধান আর বিশ্বকোষ দিয়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে, এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ।

এ রকম যুগের তাহলে আদর্শ প্রয়োজন কি? স্পষ্টত একটা বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে বাহ্যিক আন্তর্জাতিকতার যোগ থাকবে। প্রাক্-আধুনিক যুগ কাউকে ব্রাহ্মণ, কাউকে কায়স্থ ইত্যাদি করেছে। আজকে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রকে সমগ্র বিষয়টি সংক্ষেপে জানতে হবে। তার নিজের বৈশিষ্ট্য হবে স্ব-নির্বাচিত। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বচেতনা ব্যক্তিজীবনের নীরব পটভূমিকা হয়ে আছে, এমনকি গৃহের মাধুর্যও তার কাছে বাহ্যিক এবং তার আশ্রয় হল এই চেতনা।

কিন্তু অন্যান্য যুগকে বাস্তবায়িত করার যে ক্ষমতা আমাদের রয়েছে তার মধ্যে আধুনিক যুগকে দেখার মূল প্রয়োজনও রয়েছে,—ইউরোপে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস; ভারতে বৌদ্ধ, পৌরাণিক ও মোগল যুগ হল সেই সব যুগ।

ভারতবর্ষে দুটি মহৎ জাতীয়তাবাদী যুগ দেখা দিয়েছিল, বৌদ্ধ ও মুসলিম যুগ। মাঝে মাঝে প্রাচীন পুস্তকের ছাত্ররা দেখে সাধারণ একটা পাণ্ডুলিপি লেখা রয়েছে কোন প্রাচীনতর, অমূল্য রচনার ওপরে,—যেমন, ইউক্লিড বা ভার্জিলের একটা বই ইচ্ছাকৃতভাবে একটা লুপ্ত ধর্মপুস্তকের ওপরে লেখা হয়েছে। এরকম বইকে বলা হয় 'প্যালিম্পসেস্ট,' পণ্ডিতের কাজ হল, আগেকার অস্পষ্ট রচনাটিকে উদ্ধার করা। অনুরূপভাবে, ভারতের মাটি অশোক ও মুসলিম সাম্রাজ্যের এক বিরাট 'প্যালিম্প-সেস্ট'। বিহারে,—অর্থাৎ প্রাচীন মগধে—এটা প্রমাণ করা বিশেষ সহজ। এখানে পিপল বৃক্ষের জায়গায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বসানো হয়েছে তেঁতুলগাছ, প্রাচীন স্তূপের মাথায় বসেছে পীরের সমাধি। অশোকের রাজধানীর জায়গায় গড়ে উঠেছে মুসলিম দুর্গ। এই ভাবধারাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলে তবেই আমরা পরের প্রশ্ন আলো-চনার জন্য প্রস্তুত হতে পারি, সে প্রশ্ন হল, কতদূর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতকে প্রভাবিত করেছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত আমরা সৌধ, নানা জাতীয় স্মারকচিহ্নে, অদ্ভুত রীতির স্থাপত্যে, অন্যত্র নামে, মতবাদে, লোকসঙ্গীতে এর চিহ্ন দেখতে পাব।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম কাকে বলে? যত বড়ই হোক, এ কোন গোষ্ঠী নয়, যত প্রগতিবাদী হোক, এ কোন ধর্মসংস্থা নয়। এ হল একজাতীয় ধর্মীয় স্তর। আসলে

বৌদ্ধধর্ম হল জাতীয়তাবাদী হিন্দুধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা। হিন্দু ধর্ম একা তার সম্পূর্ণতা দিয়ে কখনো জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ তাহলে এ ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্যের প্রবণতা দেখা দেবে, ব্রাহ্মণদের আদর্শ স্বভাবত এবং ন্যায়ত এ ধর্মের মূল। আদর্শের বিশেষ ধর্মীয় গুণ হল শিক্ষা ও কঠোরতা। তার বিশেষ ত্রুটি ও দুর্বলতা হল, অন্য আদর্শকে গণ্য না করা। সেইজন্য যখন হিন্দুধর্মেই ব্রাহ্মণদের একটা প্রতিকেন্দ্র হবে, তখন হিন্দুধর্ম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে পারবে। এই প্রতিকেন্দ্র পাওয়া গিয়েছিল অশোক-যুগে বুদ্ধের মধ্যে, তিনি জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

মুসলিম ধর্ম আসার পর এও আর যথেষ্ট হল না, তাই আকবর ও শাহজাহান হিন্দু সংস্কৃতি ও মানব সৌভ্রাত্রের ইসলামীয় ভাবধারাকে মিলিত করে জাতীয়তা-বাদের নতুন ধারণার প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন।

এখন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে হবে এবং দীপ্ত, নির্ভীক, গোঁড়ামিহীন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিজয়গর্বে দেখা দেবে, তার ফলে পূর্বের বিবর্তন অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে।

এই সূত্রের চারিদিকে ভারতের সব ঐতিহাসিক গবেষণাকে দানা বাঁধতে হবে, অতীতের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার স্বাভাবিক কেন্দ্র ছিলেন অশোক ও আকবর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েই শুধু আমাদের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ মূল্যবান হতে পারে। কারণ মানুষের আবির্ভাবের দীর্ঘ কাহিনীর আড়ালে যেমন রয়েছে পশুদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ওপরে ক্রমশ মানব-মস্তিষ্কের প্রাধান্য বিস্তার, তেমনই বাস্তব জীবনের ইতিহাস-অংশের ক্রমবর্ধমান সমন্বয়ের ফলে সমগ্রের গড়ে ওঠার পদ্ধতিকে প্রকাশ করে।

ভারতবর্ষে জীবন ও শ্রেণীগত একতা

মানবতার আড়ালে ও অভ্যন্তরে মানবের যে ইতিহাস আছে তা স্তরীভূত শিলা-গঠনের কাহিনীর মত কৌতূহলোদ্দীপক। খুব কৌতূহল জাগায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। জাতির পর জাতি, সভ্যতার পর সভ্যতা, যুগের পর যুগ মানুষের স্রোত এসে মিশেছে এবং তার ছাপ রেখে গেছে। স্থানগত প্রভাবে একটির পর একটি ঢেউ যুক্ত হয়ে, সব মিশে এক হয়ে ভাবধারা ও ব্যবহারবিধি গড়ে উঠেছে। প্রাচীন মিশরের পেছনে কত দীর্ঘদিন ধরে কত ঐতিহাসিক উপাদান যুক্ত হয়েছিল! সেই উজ্জ্বল রচনা প্রথম মানবমনে জেগে ওঠার আগে একটির পর একটি জাতি মিলিত হওয়ার কাজ কতদিন ধরে চলেছে! অথচ বিশিষ্ট মানবরূপে প্রাচীন মিশরীর অস্তিত্ব ছিল, যা তার সমসাময়িক ফিনিশিয়া, ক্রীট বা ব্যাবিলনে ছিল না। আমাদের যুগেও এই সম্ভাবনা দেখা দেয়, আধুনিক আমেরিকান নামে যে মানুষ, তার মত বিচিত্র ইতিহাসযুক্ত লোক কখনো এর আগে দেখা দেয়নি, অথচ আর সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সে যাদের নিয়ে গঠিত, সেই ইংরেজ, রুশ, ইতালীয়দের চেয়ে আলাদা।

মানুষের ঐক্যের ক্ষেত্রে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটায় স্থান। মানুষ নিজের গৃহ তৈরি করে শুরু করে। শেষে গৃহ তাকে নতুন করে গড়ে তোলে। যত রকম পরিবেশগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার একটা জাতি পায়, তার মধ্যে জন্মস্থানের প্রভাব সবচেয়ে নির্দিষ্ট, সবচেয়ে প্রবল ও ক্ষমতাশালী। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে পৃথিবীর সন্তান! বৃথাই আমরা নিজেদের মাটির সন্তান বলি না। নীলনদ ছিল মিশরীয়দের জননী। ভূমধ্যসাগরের তীরভূমিই ছিল ফিনিশীয়দের চরিত্রের মূল। ব্যাবিলনীয়রা ছিল ব-দ্বীপ ও নদী সমভূমির ফল। বাঙালীরা যথার্থ মা গঙ্গার সন্তান।

অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই স্থানগত ঐক্য বেড়ে যায় মিলিত জাতি—উপাদানের ক্ষমতায়। মানুষ মানুষের কাছে শেখে। যে নতুন পরিবেশে আমরা এসে পড়ি তার উন্নত আদর্শের সঙ্গে আমাদের শক্তির সামঞ্জস্য করার চেষ্টায় প্রবল সংগ্রাম করে আমরা অতীতের প্রাপ্তির চেয়েও উন্নত করি ভবিষ্যতের কর্মকে। জল একবার যে জায়গায় পৌঁছেছে সেখানে সহজেই যেতে পারে। একে আরো উঁচুতে তুলতে হলে কত শক্তি ব্যয় করতে হবে! বড় বড় নেতাদের সফল চুক্তি শুধু তার স্কুলের বন্ধুদের মনে করিয়ে দেয়, তারা খেলার মাঠে বা ক্লাসে কেমন জয়ী হত। শোনা যায়, বহু বিখ্যাত সেনাপতি তালপাতার সেপাইদের সাহায্যে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতেন। ভবিষ্যৎ শুধু নতুন পরিবেশে, পরিবর্তিত সমস্যার অতীতের পুনরাবৃত্তি।

এইভাবে আমরা জাতির জন্মের মূল সূত্রে পৌঁছই। যে দেশের ভৌগোলিক রূপ আছে সে দেশেরই জাতীয়তাবাদীদের জন্ম দেওয়ার শক্তি আছে। জাতীয় ঐক্য স্থানের ওপরে নির্ভরশীল। মানবজাতির মধ্যে জাতির স্থান নির্ধারিত হয় তার অংশগুলির

জটিলতা ও ক্ষমতার দ্বারা। একটি উপাদান অতীতে যা করতে পেরেছে, সমগ্র জাতি ভবিষ্যতে তা লাভ করার আশা করতে পারে। উপাদানের জটিলতাকে যখন স্থানের জাতীয়তাবাদী প্রভাবের অধীনে আনা যায় তখন তা শক্তির উৎস হয়, জাতির দুর্বলতা ঘটায় না।

বর্তমানে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে আসার পথে, ধর্মীয় থেকে জাতীয় রূপগঠনের মুহূর্তে এইসব সূত্র পর্যালোচনার চমৎকার ক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। অনেক পর্যবেক্ষক, যারা সচেতন যে এখন ভারতীয় জনগণ এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত, তারা সামনে নৈরাশ্য ও পরাজয় ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা এদের সম্বন্ধে বলে, "কি! ভারতবর্ষে মৌচাকের মত অগণ্য ভাষা; অসহ্য প্রথার ভার, কোন দুটো প্রদেশের প্রথা এক নয়; জনগণের মধ্যে কালো, পীত, সাদা সব জাতির লোক আছে, তারা যে যার নিজস্বতাকে ঈর্ষার সঙ্গে আঁকড়ে থাকে; পাঞ্জাবী ও বাঙালীর মত সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে ভরা; মুসলমান ও হিন্দু, এই দুইভাগে বিভক্ত; এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলা সম্পূর্ণ মূর্খতা! ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারা সম্পূর্ণ স্বপ্ন!" যেসব ইউরোপীয়রা ভারতে বেড়াতে এসেছে বা এখানে থাকে তাদের অধিকাংশেরই বস্তুত এই মত; তাছাড়া, যাদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধেই এদের যথার্থ বিদ্বেষ রয়েছে। তবু এ হয়ত সত্যের একমাত্র সিদ্ধান্ত নয়, সাধারণত স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, দু-পক্ষের বক্তব্য না শুনে বিচার করা যায় না।

তাহলে প্রশ্নটা হল, ভারতীয় জনগণের মধ্যে কি এমন কোন জীবন ও শ্রেণীগত ঐক্য আছে, যা এখন অথবা পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে? এ কথা হয়ত সত্য যে, বাঙালীরা ভারতের আইরিশ, মারাঠারা স্কট, পাঞ্জাবীরা ওয়েলস্ বা পার্বত্যজাতি, এভাবে আমরা নাম দিতে পারি; কিন্তু এমন কিছু আছে যা এদের সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, যেমন ব্রিটিশত্ব পশ্চিমের লোকদের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে? জীবন ও শ্রেণীর এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের ওপরে ভারতের জাতীয় আশার চরম সার্থকতা নির্ভর করবে।

কোন জাতির প্রধম সম্পদ হল ভৌগোলিক স্পষ্টতা। এ স্পষ্টতা যে ভারতের প্রচুর পরিমাণে আছে তা স্বীকার করতেই হবে। পায়ের নীচে নীল সমুদ্র, মাথার ওপরে বরফ ঢাকা পর্বত নিয়ে সে সিংহাসনে বসে আছে। এই জায়গায় যে জাতিগুলি বাস করে তাদের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের মঙ্গোলীয়দের এবং উত্তর-পশ্চিমের সেমাইটদের পার্থক্য ভারতের সীমার মত স্পষ্ট। এই দেশে সব উপাদানের মধ্যে প্রধান হল আর্য আদর্শ ও ভাবধারা। ভাবধারার বাহ্যিক বিন্যাসের আগে থাকে আভ্যন্তরীণ বিন্যাস, তার ফলে একজাতীয় বৈশিষ্ট্যের যে সঞ্চয় দেখা দেয়, জাতিগত বিভাগ বলতে আমরা তাকে বোঝাই। ভারতে মহৎ সত্যের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে বিশেষ ধরনের ভাবধারা দেখা দেয়। জৈন বা মুসলমানরা বেদ বা উপনিষদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে না, কিন্তু উভয়েই বৈদিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গার্হস্থ্য প্রীতির উন্নতি, সামাজিক পর্যালোচনা ও সমালোচনার সূক্ষ্ম বিস্তার, বাসনা ও বিবেকের নৈতিক দ্বন্দ্বের অধীন যে সমগ্র জীবন

তার সচেতন স্বীকৃতি এই দুই শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর মত স্পষ্ট। অন্য কথায় বলতে গেলে ভারতের সব জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা চালিত শিক্ষার ফল দেখা যায়, কারণ, ধর্মের বিষয় সর্বদা হৃদয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। মিশর যখন পিরামিড গড়ছে, ভারতবর্ষ তখন বেদ এবং উপনিষদের দর্শনের ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাখ্যায় সমান শক্তি ব্যয় করছে। এই সংস্কৃতি বহু পূর্বে জন্ম নিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান পর্যন্ত চলে এসেছে স্বদেশে প্রাধান্য বজায় রেখে এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ ভাবধারার অনেক আগে ভারতীয় সমাজকে উন্নত ভাবধারা ও অনুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত করেছে। ভারতীয় ব্যক্তিত্বের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হল, গভীর আবেগের পরিণতি ও সূক্ষ্মতা, শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি ও সম্প্রদায় থেকে অতি আদিমকাল পর্যন্ত এই বিশাল উপমহাদেশের এটা সাধারণ গুণ।

আবার, পারিবারিক আনুগত্যের মূল মন্ত্র, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ক্ষেত্রেই, মায়ের প্রতি সন্তানের মনোভাব। যে কোন পরিবর্তন ঘটুক না কেন, এখানে আমাদের মূল পর্বতের মত দৃঢ়। এই সম্বন্ধের কোমলতা ও তীব্রতায় কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ভালবাসা ধর্মীয় অনুরাগের স্তরে পৌঁছে যায়। প্রাচ্য জীবনের এই সত্য আমাদের মাতৃত্বের প্রতীককে এত গভীর করেছে—সন্তান মায়ের অবলম্বন ও গৌরব, মা জীবনকে পবিত্রতা ও নিশ্চয়তা দেন।

এর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও একেবারে অনুরূপ নয়, প্রাচ্য সাংসারিক জীবনে বৃদ্ধের ভূমিকা। তরুণ সদস্যদের সঙ্গে বৃদ্ধদের যোগসূত্র হল একটা সংযত আনন্দ, কোমল উচ্ছ্বাস। সাম্প্রদায়িক সভ্যতার এটি অন্যতম সুন্দর বৈশিষ্ট্য যে, পরিবারের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল বৃদ্ধ। আমাদের ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে বয়স্কদের নিঃসঙ্গতা ও অক্ষমতায় জীবন থেকে যে বিচ্ছিন্নতা, তা প্রাচ্যে মোটেই নেই। বৃদ্ধদের জ্ঞানকে সাধারণ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করা হয়, যদিও তাদের চপলতা শিশুর মত হয়। তবুও এবং তাদের দেখা শোনার দায়িত্ব বহু তরুণী সহজে বহন করে। বিরাট অবসরের স্মৃতিযুক্ত ভারত কখনো এই ধারণায় সহজে বিচলিত হয় না যাতে লোকের কর্মজীবন শেষ হলে সে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করবে। ভারত জানে যে, কাজের শেষে দেখা দেয় অভিজ্ঞতার পক্ব মূল্যবান ফল। রাঁধুনি ও কামারের যৌবনের শক্তি দরকার হতে পারে, কিন্তু নেতা ও পাদ্রীর পক্ষে ষাট বছর বয়স শ্রেষ্ঠ সময়।

কলকাতায় কয়েকটি শ্রেণী আছে, যাদের আমরা গাড়িওয়ালা বা গাড়োয়ানের মত তুচ্ছ মনে করি। তারা বেশিরভাগ মুসলমান, দেশে পরিবারকে রেখে এসেছে, তারা আত্মসংযম বা আচরণের একাগ্রতার দিক দিয়ে অতি সাধারণ। অথচ, এদেরই একজনকে একদিন আমার পাড়ার মোড়ে দেখি, অতি সাবধানে, বিনম্রভাবে এক বৃদ্ধা হিন্দুকে প্রচণ্ড যানবাহনের ভীড় পার করে দিচ্ছে! সেই অন্ধ রমণীকে দুর্বলভাবে পথ হাতড়াতে দেখে সে নিজের আসন থেকে লাফিয়ে নেমেছে, গাড়ি ছোট ছেলে বা সহিসের হাতে দিয়ে। আরবের মহাপুরুষ বলেছিলেন, "যে মায়ের পা চুম্বন করে, সে স্বর্গে যায়।" মায়ের প্রতি ভক্তি ও বার্ধক্যের প্রতি আনুগত্যে হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও নীচ শ্রেণী একেবারে এক। জেনেভা ও রোমের মধ্যে যে তিক্ততা, হিন্দু ও ইসলাম

ধর্মের মধ্যে সেরকম ধর্মীয় বিভেদ আছে ভাবলে ভুল করা হবে। বহু সাধক ও শহীদ-যুক্ত সুফিবাদ ইসলামধর্মে এমন এক উন্নতির স্তর গড়ে তুলেছে যার সঙ্গে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশের মিল রয়েছে। উভয় মতের মহাপুরুষরা উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকারযোগ্য। দুই ধর্মের প্রকৃত বিভেদ মতের চেয়ে প্রথায়, মত দর্শনের দিক দিয়ে দুর্বোধ্য নয়।

মুসলমানদের প্রথা এসেছে আরবের এমন এক যুগ থেকে, যে যুগে বহু গোষ্ঠীর জাতীয় ঐক্যের খুব দরকার ছিল; হিন্দুর অভ্যাসের ভিত্তি তার অতীত, নিম্নতর সভ্যতাকে উচ্চতর সভ্যতার ক্ষেত্রে উন্নীত করে বজায় রাখার প্রয়োজন। অন্য কথায় বলতে গেলে, যেসব কারণে পুরুষদের জীবন এবং নাগরিক ও জাতীয় কর্ম গড়ে ওঠে, তার চেয়ে সংসার, প্রচার, নারীজাতি ও পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষেত্রেই দুই ধর্মের প্রভেদ। যেখানে একটা মত প্রধান সেখানে এটা তখনি দেখা যায়। হিন্দু রাজার বহু পদস্থ, বিশ্বস্ত কর্মী মুসলমান, বিশেষ উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, হায়দ্রাবাদের নিজামের হিন্দু কর্মীদের আনুগত্য তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি। বারাণসীর উত্তরাঞ্চলে যেখানে শত শত বছর ধরে ইসলাম ধর্ম শান্ত, নিরুপদ্রব, সেখানে দুই ধর্মের মধ্যে প্রায় সামাজিক মিলন ঘটেছে। এর তাৎপর্যময় ইঙ্গিত রয়েছে ছেলেদের নামে—সংস্কৃত ও আরবী মিশ্রিত নাম শোনা যায়, যেমন, রাম বক্‌শ।

'চৌম্বকশক্তি' শব্দটি বাদ দিলে 'জাতি'র মত কোন শব্দ এত অস্পষ্ট ব্যবহৃত হয় না। যদি মনে করি, এতে অন্যদের চেয়ে পৃথক কতকগুলি সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজেদের মধ্যে এক পদ, প্রথা ও বৃত্তিতে ঐক্যবদ্ধ, তাহলে তখনি দেখব যে, জনজীবনকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ প্রথা প্রতিকূল না হয়ে বরং অনুকূল। বর্তমানে সারা ভারতে প্রাচীন ব্যাবিলন বা থিব্‌সের মত বা পেরিক্লিসের এথেন্সের মত গৃহের মন্দিরতুল্য বিচ্ছিন্ন রূপের পাশেই রয়েছে নানা সম্প্রদায়ের পথ ও নদীতীরের মিলন। এর আংশিক কারণ জলবায়ু, অংশত এই দেশের যে ভাবধারা আমাদের ঐতিহ্যবাহী মনে হয়, তার প্রতি আনুগত্য। এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যে সামাজিক সামঞ্জস্যের কোন দাবি নেই। সেসব বিষয় শুধু অন্তরঙ্গ ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পরিবার, স্ত্রীলোক ও পুরোহিতদের হাতে রয়েছে।

জাতিভেদপ্রথা নিয়ে বিদ্যালয়, স্নানের ঘাট বা শহর মাথা ঘামায় না। এদিক দিয়ে দেখলে শব্দটিতে সদ্বংশের কড়াকড়ি বোঝায়। এটি এমন ক্ষেত্র, যেখানে কোন বহিরাগত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। একে সহযোগিতার বাধা মনে করা আর ইউরোপীয় মহিলার বয়স জিজ্ঞাসা করা যায় না ভাবা, একই কথা। এই সৌজন্যমূলক নিয়মটি ঐক্যবদ্ধ কাজের বাধা, এ কথা বলা কি অর্থহীন! খাওয়া এবং বিবাহ নিজের শ্রেণীতে করলে সবাই জীবনের অন্য সব বিষয়ে যা খুশি করতে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে। প্রতিটি জাতি তার সদস্যদের কাছে স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষালয়, পুরো প্রথাটা শ্রমিক-সংগঠনের ও অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক কাজের চমৎকার কাঠামো। যে এইসব তথ্যকে যথেষ্ট উদারতা নিয়ে দেখতে পারে, তার কাছে এগুলি এত স্পষ্ট যে, অন্য ধারণা কি করে প্রচলিত হল, এ কথা বোঝাই কঠিন।

অনেক লোক 'ঐক্য' কথাটাকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে মনে হয় যেন, চিংড়িমাছের একধরনের অঙ্গের অগণ্য পুনরাবৃত্তির ঐক্য মানবদেহের চেয়ে বড়, মানবদেহের ডান-বাঁ—দুদিক সমান নয়। আমার দিক থেকে আমি না ভেবে পারি না যে, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমাদের এর চেয়ে জটিলভাবে ভাবতে সক্ষম করেছে। এক ফরাসী শ্রমিকের কথা আমি ভুলতে পারি না, নিজেকে সে অস্তিত্ববাদী বলত, একদিন কয়েকবছর আগে পাশ্চাত্যের এক বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে আমার কাছে এসে বলল, "আমি যদি আপনাকে আঘাত করি, তাহলে আমি নিজেকেই আঘাত করব, অথচ আমরা দুজন ঠিক এক নই, এই প্রমাণ ছাড়া মানুষের একত্বের আর কোন প্রমাণ কি ভারতের মানুষ দিতে পারে?" তারপর বোধ হয়, আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে চিন্তিতভাবে বলল, "আমরা যে সবাই যে যার মত, এটাই আমাদের ঐক্যের প্রমাণ!" আমার মনে হয়েছে, ঐ ধারণার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত ধরনের। আমার বন্ধু যে ঐক্যের কথা বলেছে, তা স্বাভাবিক, যান্ত্রিক ঐক্য নয়, আমি নিজেও দেখি, ভারতে যে কোন লোক বা প্রদেশের কাজ আরেকজনের মত নয়, এটাই তার ঐক্যের একটি অনন্য দিক।

অতি পরিণত অনুভূতির মহৎ ও সাধারণ পটভূমিকার সামনে বাঙালী দাঁড়িয়ে আছে তার নম্রতা ও রসবোধ নিয়ে; মারাঠা প্রকাশ করছে তার গাম্ভীর্য ও ধৈর্য। একজনের গর্ব হয়ত কল্পনা নিয়ে, অন্যজনের ইচ্ছাশক্তি নিয়ে। পাঞ্জাবীর মধ্যে সামরিক জাতির পূর্ণ সাহস এবং কিছুটা সরলতাও রয়েছে। যে লোক ধর্মের ছায়ায় রয়েছে, মাদ্রাজীর মধ্যে রয়েছে তার গাম্ভীর্য ও শোভনতাবোধ। মুসলমান যেখানেই থাক, তার সৌজন্য ও সুন্দর ব্যবহার তুলনাহীন। আমাদের মনে রাখতে হবে, এদের প্রত্যেকে এক উপাদানভিত্তিক কাজে যোগ দেয়। সকলের কাছে গৃহের প্রতি আকর্ষণ, জাতিগর্ব, নারীর আদর্শের আবেদন তীব্র। প্রত্যেকের মধ্যে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সব প্রদেশের হিন্দুর কাছে তার মাতৃভূমি পবিত্রতার আসন, ন্যায়ের স্থান, সাতটি পুণ্য নদীর দেশ, "এখানে ঈশ্বরের সন্ধানে সকলকে কোন না কোন সময়ে আসতে হবে।" মুসলমানের কাছে তার জগৎ তার সাধকদের পায়ের ধূলি। সে জগৎ তার শ্রেষ্ঠ স্মৃতির প্রতীক। দেশের সব গ্রাম তার গৃহ। তার আশা ভবিষ্যতের প্রতি। উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদী চেতনা নবীন ও উৎসাহ পূর্ণ। খ্রীষ্টের আড়াইশো বছর আগে পাটলিপুত্রের বিরাট সিংহাসনে অশোক যা ছিলেন,—আঠারোশো বছর পরে দিল্লীতে আকবর যা ছিলেন,—জাতীয় দায়িত্বের ক্ষেত্রে আগামী দিনে প্রতি ভারতীয় তাই হয়ে উঠবে। কারণ, এ যুগ সিংহাসনের নয়, গণতন্ত্রের যুগ; সাম্রাজ্যের যুগ নয়, জাতীয়তাবাদের যুগ; যে ভারত জাতিগুলির অভ্যুদয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে তরুণ ও বলিষ্ঠ।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব

তরুণ ভারত ইউরোপীয় দেশগুলির রাজনৈতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধঃ মুগ্ধ, হয়ত ইন্দ্রজালে বশীভূত। সে হয়ত ভাবছে যে, যতক্ষণ না সে দুই বিরোধী পক্ষের আস্তানা হয়ে উঠছে, ততক্ষণ সে পাশ্চাত্য দেশপ্রেমের শৌর্য ও শক্তি লাভ করতে পারছে না। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ ও আক্রমণের যে অন্যায় রীতি দেখা দিয়েছে এটা বোধ হয় তার একমাত্র কারণ। যারা একই ক্ষেত্রের নানা অংশে লড়াই করছে, তারা সাধারণ শত্রুর বদলে নিজেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে সময় ও গোলাগুলি নষ্ট করছে। আসলে, নবীন ভারত এখনো বোঝেনি যে, তার আন্দোলন আদৌ দলাদলির রাজনীতি নয়, এ হল জাতীয় আন্দোলন, তথা ঐক্যবদ্ধ প্রগতি। ভারতে সংলোকদের মধ্যে জাতীয় প্রশ্নে মতভেদ নেই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে বিধান পরিষদে রাখ। তাদের মত সর্বদা এক বলে কি গণ্য করা হবে না? ব্রাহ্মণ কোথায় খায় বা কাকে নিমন্ত্রণে ডাকে, তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? সে, কায়স্থ, বৈদ্য বা ক্ষত্রিয় কি বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে পরস্পরবিরোধী দাবি করে? পুরনাগরিক হিসেবে একজনের মঙ্গল কি অন্যের মঙ্গল নয়? প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে কতদিন লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যেতে পারে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মেকি গন্ধ শুঁকে হাউণ্ডরা কতদূর যেতে পারে, সেও অদ্ভুত। ভারতে প্রচুর ভুল কাজ ও এলোমেলো রাজনৈতিক চিন্তা দেখা দিচ্ছে শুধু এই কারণে যে, এখানে রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রধানত অনুকরণভিত্তিক, ভুল কাজ অনুকরণে দক্ষ।

যেমন, যে দর্শক প্রথম কংগ্রেসে যায়, সে যদি ঠিক করে যে, আগে থেকে কোন ধারণা না গড়ে যতদূর সম্ভব সত্য অনুযায়ী বিচার করবে,—তাহলে প্রথমে তার নজরে পড়বে, চরম বামপন্থী থেকে চরম দক্ষিণপন্থী পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্যের আশ্চর্য মতের মিল। এ কোণে এক বৃদ্ধ বিশেষ কোন মত প্রকাশ করাটা এত অন্যায় মনে করেন যে, তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি দল থেকে চলে যাবেন। ওদিকে এক তরুণ এই অতি-সতর্কতাকে উড়িয়ে দিয়ে ঘোষিত নীতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য বৃদ্ধকে আহ্বান জানায়। হয়ত সে ঠিক বলছে, তার ভুলও হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, তরুণ ভারত এইসব মতভেদ নিয়ে ক্রুদ্ধ বা হতাশ হয়ে পড়ছে। ততক্ষণে বহিরাগত প্রত্যেকে স্পষ্ট বুঝেছে, এখানে কোন মতভেদ মোটেই নেই এবং এরকম অবস্থায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের তরণীকে চালনা করা উচিত শিক্ষিত ভারতীয়দের।

অতএব, কংগ্রেসের আন্দোলন রাজনৈতিক বা দলীয় নয়, জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক—একেবারে পৃথক বস্তু। কংগ্রেসের তর্ক-বিতর্ক উচ্চস্তরে গুরুত্বপূর্ণ বা তার মত কার্যত গৃহীত হয় বলে সে সফল নয়, তার সাফল্যের কারণ হল, তার পরিকল্পনা পরিচালনার ক্ষমতা ও আন্তরিকতা, রাজনৈতিক কাজে বহু মানুষের

আনুগত্য এবং তাদের যোগ্য করে তোলায় তার ক্ষমতা, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সারা দেশে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। এই মূল সত্যগুলি যদি একবার স্পষ্ট করে বোঝা যায়, তাহলে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির ভবিষ্যৎ, বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ বা বাক্যে বিশেষণের সংখ্যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কারণ, তখন বোঝা যাবে যে, কংগ্রেসের আসল কাজ হল শিক্ষাসংক্রান্ত, যে নতুন চিন্তাধারা ও অনুভূতি জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলছে, সদস্যদের তা শেখানো, তাদের তৎপর, ঐক্যবদ্ধ কাজ, রাজনৈতিক আনুগত্য, সাম্প্রদায়িক উদারতা শেখানো, শেষে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া, যাতে হিমালয় ও কন্যাকুমারিকা, মণিপুর ও আরবসাগরের মধ্যবর্তী বিশাল সংসারের প্রত্যেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়।

অবশ্য এতে বোঝা যায়, আসল কর্মীদল কংগ্রেসে নেই, কংগ্রেস শুধু একদিকে—রাজনৈতিক দিকে রয়েছে—অন্যদিকে রয়েছে অনেক বড় অথচ কম শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশ। পাশাপাশি সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, উভয়ের প্রচেষ্টাকে বিপরীতমুখী না করে দেশের উন্নতি নিশ্চিত হবে। এইভাবে, কংগ্রেসের পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনের আরেকটি অরাজনৈতিক অংশ চাই। কিন্তু সে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট যে, এই অরাজনৈতিক অঙ্গ নিজের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে রাজনৈতিক অঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি সমস্যায় পড়বে।

তবু, একটা পরিকল্পনা—দৃঢ় সংগঠন না হলেও আলোচনাসাপেক্ষ পরিকল্পনার দরকার। জাতীয় আন্দোলনের সামনে কি দায়িত্ব এবং তার পারম্পর্য কি?

সকলেরই কাজ এক,—সমগ্র জাতির সব অংশে পরস্পরের মধ্যে এক ভাবধারার ঐক্যও দেশের সঙ্গে ঐক্যের শিক্ষাদান। কিন্তু সবক্ষেত্রে শিক্ষাদান যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে, একথা ভাবা ভুল। লেখা ও পড়াতে কাজ হবে, কিন্তু সে শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করবে না। আগেই আমরা দেখেছি, মেয়েরা স্বদেশী তপস্যার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করছে। জাতীয় ও নাগরিক জীবনে এর ফলে তারা এক ধাপ ওপরে যা আর অবনত হবে না। কিন্তু তাদের প্রতি এই আবেদন স্বদেশের জন্য আকুল আগ্রহে সাফল্য লাভ করলেও—এ আবেদন নিরক্ষর, অশিক্ষিত অসহায় জনগণের কাছে যখন করা হবে—তখন তা করতে হবে শিল্প পুনর্গঠনের মাধ্যমে, স্বদেশী শপথে একথা বলা হয়েছে। আগে বাস্তব শিক্ষা, পরে তত্ত্ব। প্রথমে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসা চাই, তারপর সব ভাবধারা, শিক্ষা সৌভ্রাত্রের নবজাত চেতনাকে বুদ্ধিগত গভীরতা ও দৃঢ়তা দান করবে। তাহলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের কাজ হল, বর্তমানে নৈতিক শক্তির যে দুটি বৃহৎক্ষেত্র জাতীয়ভাবে প্রায় নিস্তব্ধ তাদের জাতীয়তাবাদী করে তুলে তাদের মুখে ভাষা জোগাতে হবে। এই দুটি ক্ষেত্র হল, নারী ও কৃষক। শহরের কলেজগুলিতে দশজন করে ছাত্র একটা করে দল গড়ে এই উদ্দেশে একজন প্রচারক নিয়োগের শপথ করুক। সেই প্রচারক কিছু ছবি আঁকা কার্ড, ম্যাজিক লণ্ঠন, ভারতের মানচিত্র আর গাথাকাব্য, কাহিনীও ভৌগোলিক বর্ণনা শিখে নিয়ে ঘুরে বেড়াক। মেয়েদের আর গ্রামবাসীদের একত্র জড়ো করে সে তাদের বাগানে, উঠোনে, বারান্দায়, কুয়োর ধারে, গ্রামের গাছতলায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গল্প, গান আর বর্ণনা শুনিয়ে আনন্দ দিক।

যা আমরা ভাবি, তাকে আমরা ভালবাসি, যা জানি, তার কথাই ভাবি। তাহলে প্রথমে একটা স্পষ্ট ধারণা চাই, তারপর ভালবাসা আপনি আসবে এবং এইভাবে আমাদের বিশাল দেশের সর্বত্র এই মহৎ চিন্তার রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়বে যে, "এই দেশই আমাদের মাতৃভূমি! আমরা প্রত্যেকে ভারতীয়!"

তাহলে এখানে আমাদের রয়েছে জাতীয়তাবাদী করার চরম কাজ, এ কাজ করবে বিপুলসংখ্যক জাতিগঠক, সে কাজ করার জন্মগত অধিকার রয়েছে প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষিত লোক ও স্ত্রীলোকের। এই দলের একপ্রান্তে যারা রয়েছে, তাদের কাজ হল, জাতীয় গৌরবকে উচ্চতর ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া। এরা হল বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্যের প্রকৃত কর্মী, তারা শপথ করবে, কোন ইউরোপীয় যেন এ ক্ষেত্রের উৎকর্ষে তাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে, শপথ করবে, যে কাজই তারা করুক, হয় তাতে জয়ী হবে, নয় মরবে।

প্রধান বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃতি ও কর্তব্য সম্বন্ধে এখানে যে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, তা দ্বিতীয় পুরুষের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত একই রকমের প্রশ্নের চেয়ে একেবারে আলাদা! জাতিগঠক দলের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে ঐ একই চেতনাযুক্ত প্রচারক ও নির্মাতাদের সম্বন্ধ আর সাধারণ গৃহী ও সাধুর সম্বন্ধ একরকম। তারা একা জীবনযাপন করতে পারে না, তবু সহানুভূতি ও নীরব সহায়তা দিয়ে জীবনকে বাঁচার যোগ্য করে। তাহলে এদের বোঝা দরকার যে, এ যুগের নীতি হল,—"পারস্পরিক সাহায্য, আত্মগঠন, সহযোগিতা!"

আধ্যাত্মিক সংগ্রাম নয়, নির্দিষ্ট পার্থিব সাফল্যের দ্বন্দের শপথ গ্রহণে শহীদের পূর্ণ সাহস গৃহীর নেই। জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতি, কৃষক সাহায্য সংগঠন, সমবায় ঋণ উদ্যোগ ইত্যাদিতে অর্থদান, তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য গৃহীর বোধ হয় একটু কেউটের বিষের দরকার। কিন্তু প্রথমত, শেষত, সর্বোপরি, তাকে বুঝতে হবে যে, এই আন্দোলন, এই দায়িত্ব, এই গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষা যথার্থ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হবে ভারতীয় জাতিতে।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয়-জনগণ সমস্ত জগতের কাছে নিজেদের শ্রদ্ধেয় করে তোলার যে সুযোগ পেয়েছে, এ কথা বলা দরকার এবং আমার মনে হয়, এ কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ জগৎ একে শ্রদ্ধা করায় বোঝা যায় যে একে ভয় করে চলতে হবে, যাকে সবাই ভয় করে, সে বলিষ্ঠ, বুদ্ধিযুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ। আমরা একটা হাতিকে সহজে পরাস্ত করতে পারি। কিন্তু গোটা দলটাকে আক্রমণ করবে, এমন লোক কোথায়? সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে পৌরুষ আর আত্মনির্ভরতার সুর বেজে উঠছে। সাহায্যের জন্য প্রার্থনা নেই, সুযোগের জন্য আকুলতা নেই। ভারত নিজে যা করতে পারে, তাই করবে। এখন সে নিজের জন্য যা করতে পারবে না, তার কথা পরে ভাবা হবে।

গভীরে যাওয়ার জন্য ভারতীয় জনগণের কর্তব্য হল, আধুনিক বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণের প্রস্তাব প্রাণপণে প্রত্যাখ্যান করা, আধুনিক বাণিজ্যের জন্য তার স্বদেশ ও দেশবাসী ক্রমবর্ধমান হারে দরিদ্র হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই কর্তব্য উদ্ভূত হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজন এই কর্তব্যবোধ বিবেককে জাগিয়ে তোলে, অন্যভাবে তাকে স্পর্শ করা কঠিন হত, তখন এমনকি প্রবীণতম কর্মীদের মধ্যেও নতুন আশা ও উৎসাহ দেখা দেয়, সমবেত প্রচেষ্টার শক্তিতে। আন্দোলন ভারতে ব্যর্থ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমেরিকা শিল্পের নিরাপত্তার জন্য চড়া হারে শুল্ক না বসালে শিল্প বজায় রাখতে পারত না, কোন ইউরোপীয় দেশে শুধু নীতি ও স্বেচ্ছা-ভিত্তিক স্বদেশী আন্দোলন সফল হতে পারে না, এ যুক্তি দিয়ে আমাদের আন্দোলনের বিরোধিতা করা চলে না। প্রথমত যদি কোন লোকের শক্তি পরিচয় দেওয়ার জন্য কয়েকটা অস্ত্র থাকে, তাহলে তার কোন একটা সম্বন্ধে সে লোকের ঔদাসীন্য থাকতে পারে, কিন্তু ঐ কটার বেশি সম্বল না থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত প্রতিরোধশক্তি, তার আত্মরক্ষার সমস্ত আকুলতা তখন অস্ত্রের ব্যবহারে কেন্দ্রীভূত হয়। আর, আমাদের সম্বল বলতে শুধু স্বদেশী আন্দোলন। তাছাড়া, পাশ্চাত্য দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের একটা নিম্নতম মাত্রা আছে, যার নীচে লোক যেতে পারে না। কিন্তু আমাদের এরকম কোন মাত্রা নেই। ভারতীয়ের ত্যাগ করার শক্তি সীমাহীন। আমাদের পক্ষে আরো সুবিধা আছে। কারণ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, যদিও প্রাচ্য জনগণ কয়েক ধরনের সহযোগিতা ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জনগণের চেয়ে দুর্বলতার প্রমাণ দিয়েছে, তবু সমগ্র মানব ইতিহাসে দেখা গেছে, একটা প্রাপ্ত ভাবধারার স্বীকৃতিতে, নৈতিক আবেগের কাছে আত্মসমর্পণে, ন্যায়ের জন্য সব অস্বাচ্ছন্দ্য ও বঞ্চনা ক্রমান্বয়ে মেনে নেওয়ায় তাদের ক্ষমতা অনেক বেশি। এইভাবে ভারতের সমস্ত ইতিহাস ভারতীয় জনগণকে এমন এক সংগ্রামের যোগ্য করেছে, যে সংগ্রামে আত্মসংযম, স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রলোভনের বিরুদ্ধে মানবিক ইচ্ছা ও মানবিক বিবেক ব্যতীত ধর্মকে তুলে ধরবার আর কোন

শক্তি নেই। এমন হতে পারে যে, আর কোন আধুনিক দেশ এ সংগ্রামে সফল হতে পারবে না। তবু তাতে এ পবিত্র দেশ ব্যর্থ হবে না। এতদিন ভারতীয় জনগণ শুনেছে শুধু নিজেদের দুর্বলতার কথা। এখন তাদের আপন শক্তির কথা ভেবে তা প্রমাণ করতে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। কঠোর, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনকারী পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে লব্ধ আত্মসংযম ও আত্মনির্দেশের যে সম্পদ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হিন্দু আনুগত্যের দৈনিক ব্যবহারে বেড়ে উঠেছিল, সেসব কোথায় গেল? তাছাড়া, এ কথা কি সত্য যে, মানুষ শুধু সস্তা কাজ করে? মানুষের ইচ্ছা কি সর্বদাই জলের মত আপন বেগে নিম্নতম স্তরে নেমে যাবে? তাই যদি হয়, তাহলে একদা যে মহৎ পরিবর্তনের ফলে হিন্দুরা গোমাংস খাওয়া বন্ধ করল, তা আমরা কি করে ব্যাখ্যা করব? তারা ঐ মাংসে অভ্যস্ত ছিল, গোমাংস ভালবাসত। অভাবের সময়ে গোবধ করে সংসারকে খাওয়ানো সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু স্থায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থযুক্ত দয়া ও কোমলতার ভাব দেখা দিল, আর আজ, গোমাংস খাবে, এমন হিন্দু কোথায়? বর্তমান যুগের স্বদেশী আন্দোলন হল গোরক্ষার আন্দোলন। আবার এমন এক সময় ভারতে আসবে, যখন স্বদেশের লোক যা তৈরি করতে পারে, তা কেউ বিদেশীর কাছে কিনলে তাকে আজকের গোহত্যাকারীর মত মনে করা হবে। কারণ, নিশ্চিতভাবে, দুটিই সমান নৈতিক অপরাধ।

আবার, এ কথা যদি সত্য হত যে, মানুষ সর্বদা সহজতম পথটি বেছে নেয়, তাহলে বর্বরতা থেকে মুক্ত হওয়ার আশা কে কবে করত? সহজ পথকে, দুটি ফলের মধ্যে সহজটিকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে পরিচ্ছন্নতা, সূক্ষ্মতা, বিদ্যানুরাগ ইত্যাদি উন্নত প্রবণতাগুলি আমাদের গড়ে উঠেছে। বরং এ কথা বলা ঠিক যে, মানুষ সহজাত শক্তিতে সূক্ষ্মতর, সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য তার স্থূল ক্ষুধা ও বাসনাকে পরিবর্তিত করতে পারে বলেই মানুষ। মানুষ যে তার আদিম আবেগজাত অন্ধ, প্রবৃত্তিময়, তাৎক্ষণিক সুবিধাজনক, ব্যক্তিগত স্বার্থময় জীবন যাপন করে না, বরং এইসব আদিম কামনার বিরুদ্ধে উন্নততর সংগ্রাম এবং তাকে অতিক্রম করে সূক্ষ্মতর, কম স্বার্থকেন্দ্রিক, সুদূরপ্রসারী জীবনযাপন করে, এজন্যই সে মানুষ। স্বদেশী শপথ রক্ষার মত কাজে বিশেষ করে ভারতীয় জনগণ যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেতে পারে। পাশ্চাত্যের বিলাসিতা ও জটিলতার পাশে এদের সভ্যতাকে যথেষ্ট কৃপণ, দরিদ্র মনে হয়। কিন্তু যদি সে প্রমাণ দেয়, সব দারিদ্র্য সত্ত্বেও সে নিশ্চিত নৈতিক ক্ষমতা রাখে, ন্যায়কে বেছে নেবার গোপন শক্তি তার আছে, যার কথা অন্যরা জানে না, তাহলে কার মহত্ত্ব সবাই স্বীকার করবে, ইউরোপের আড়ম্বর, না মাতৃভূমির দারিদ্র্য?

যদি আমাদের বলা হয় যে, সস্তা জিনিস কেনা সম্ভব হলে কেউ সেচ্ছায় দামী জিনিস কিনবে না, তাহলে আমরা বলব; স্বার্থের জন্য সহযোগিতা করার শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য জনগণের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হতে পারে এবং একই সঙ্গে স্বার্থত্যাগের জন্য সহযোগিতায় প্রস্তুত ভারতীয় জাতির সম্বন্ধে এ কথা মিথ্যা হতে পারে।

আমি বলেছি, এ হল ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু এ কথা কি সত্য? স্বদেশী আন্দোলন কি সত্যি জাতীয় সত্যপালনের অঙ্গ? মায়ের মন্দির অন্তত দৃঢ়স্বরে কথা বলেছে।

কলকাতার কালীঘাটে ভেরীধ্বনির মত শপথ নতুন করে উচ্চারিত হয়েছে। পুরীতে প্রচারিত ঘোষণা সারা দেশ শুনেছে। সুতরাং পূজায় বিদেশী বস্ত্র নিবেদন করা অপরাধ হবে। এখানে সেখানে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের কথা শুনছি, যেমন, পূর্বের জেলাগুলিতে দরিদ্র পুরোহিতরা স্বেচ্ছায় সাম্প্রতিক পূজায় গামছা দিতে চেয়েছে সাধারণ পরিমাণ দেশী কাপড়ের অভাবে, যদিও এর ফলে একবছর তাদের দারিদ্র্যে কাটাতে হবে। কিন্তু মানবিক প্রমাণও রয়েছে। কলকাতার ব্যবসায়ী পাড়ায় বয়কট শুরু হওয়া মাত্র দেখা গেল, তখনি শোনা গেল "পকেটমার"!—বড় বাজার ফুটপাথের প্রাত্যহিক চীৎকার শোনা গেল না। ছোট ছেলেদের পক্ষে অবিরাম পুলিসের বিরক্তিকর দৃষ্টিতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে, জেল তাদের শিক্ষালয় হিসেবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে! খোঁজ নিয়ে ব্যবসায়ীরা জানল যে, ছোট ছেলেগুলির ছোট আঙুলগুলি এখন দেশী বিড়ি পাকাতে ব্যস্ত, বিড়ি পাশ্চাত্য সিগারেটকে ছাড়িয়ে গেছে।

১৬ই অক্টোবরের জাতীয় উৎসবে শোনা গেল এক বাঙালী মুসলমান মুসলমানদের উদ্দেশে বলছে। সে বলছে, "ভায়েরা, অল্পদিন আগে আমরা দিনে চার আনা রোজগার করতে পারতাম না। তোমরা জান, একজনকে আফিং-এর পয়সা চুরি করতে হয়েছিল এবং আমরা অনেকে যখন প্রতি বছরে আটমাস করে জেলে কাটিয়েছি তখন আমাদের স্ত্রীদের বাড়ির বাইরে খেতে হয়েছে! কিন্তু কত বদল হয়েছে! দিনে দশ আনা রোজগার, আরামে, ভদ্রভাবে। আর চুরি নেই, জেল নেই, আমাদের স্ত্রীরা আমাদের এবং নিজেদের জন্য রান্না করছে!" কলকাতার বিষয়ে বলা যায়, চারদিকে ফুলের মত কুটীরশিল্প দেখা দিয়েছে। এখানে এক একটা পুরো পরিবার দেশলাই তৈরি করে। অন্যত্র তৈরি করে কালি, দাঁতের মাজন, সাবান, কাগজ, কি নয়। আরো বৃহৎ আকারে কাচের বাসনের কারখানার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে দেশের মূল শিল্প, সুতীবস্ত্র তৈরি। আগে যেখানে ছিল শুধু হতাশা ও উপবাস, এখন সেখানে আমরা দেখছি হাসিমুখ, আশাপ্রদ পরিবেশ অনুভব করছি।

আবার লোক যেখানে উপযুক্ত খাদ্য সীমার নীচে থাকতে অভ্যস্ত, সেখানে প্রাচুর্যের প্রথম লক্ষণ হল বেশি খাবারের দোকানের উদ্ভব। কলকাতার ভারতীয় অংশে চারদিক থেকে এই দৃশ্য দৃষ্টিকে তৃপ্তি দেয়, সেসব দোকানে আগের চেয়ে অনেক বেশি রকমের খাবার থাকে। লোকের মনে আশা দেখা দিয়েছে। তাদের সামনে আত্মনির্ভরতার সুযোগ এসেছে। আমরা বাজী রাখতে পারি যে, যখন সেই দুঃসময় আসবে, তখন দেখা যাবে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের দুর্গের বিরুদ্ধে অবরোধ কত নিরর্থক। কারণ যথেষ্ট পুষ্টির মধ্যেই থাকে যথার্থ স্বাস্থ্য। সবচেয়ে ভাল ওষুধ হল যথেষ্ট খাদ্য।

এখন এ সবের অর্থ কি? অপরাধের প্রয়োজনের অভাবে খাঁটি অপরাধী-শ্রেণীর আনন্দ দেখার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? ইউরোপে যারা কাজ করে না, অপরাধ করে, তাদের প্রতি ভালবাসায় কে কাজ করবে? কিন্তু আমাদের ভারতীয় নিম্ন শ্রেণীর "ছোট ভাইদের" সম্বন্ধে কি একথা বলা যায়? মুসলমান শ্রমিকদের মুখে যে মাধুর্য, সততা, হৃদয়ের পবিত্রতা প্রকাশ পায়, তাকে যদি কেউ সুযোগ দিতে পারে,

তাদের যদি রক্ষা করতে পারে, সংগ্রামে ওপরে ওঠায় সাহায্য করতে পারে, তাহলে সে হাজারটা অন্যায় করে চিরকাল আগুনের সরোবরে ডুবে থাকতে হলেও খুশি হয়। ভারতীয় জনগণ, নিপীড়িত, মূর্খ, অসহায় জনগণের কণ্ঠস্বর যেন মন্দ্রিত হয় যাতে আমরা, তোমাদের আপন লোক, তোমাদের কান্না শুনতে পাই, তোমাদের সরল সুখকে জানতে পাই, এক দুঃখ, এক ভালবাসা তোমাদের শক্তি ও হৃদয় দিয়ে ভাগ করে নিতে পারি! এ কথা যদি সত্য হয় যে, কঠোর আত্মসংযমের মনোভাব নিয়ে আমরা অপরাধীদের সাধু করতে পারি; যে শিশুরা এখন সংসারের দারিদ্র্যহেতু অসৎ কাজ করতে বাধ্য হয়, তাদের শ্রমের শিক্ষা দিতে পারি, জীবনযাত্রার যথেষ্ট উপকরণ জোগাতে পারি, উপবাসীকে খাদ্য, হতাশকে আশা দিতে পারি, শেষে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের মত শক্তি দিতে পারি, তাহলে স্বদেশী তপস্যা ধর্ম বলতে কি কোন আপত্তি হবে? কেউ যেন অন্য দেশ সম্বন্ধে অবান্তর কথা না বলে! ভারতের দরিদ্রের সেবা করার দায়িত্ব ভারতীয় নর-নারীর। যে লোক নিজের কাজ না করে অন্যের কাজ করে, তার প্রতি গীতার অভিশাপ আমরা যেন না ভুলি। "অন্যের কাজ যত সহজ হোক, সেটা করার চেয়ে নিজের কর্তব্য খারাপ করে করাও ভাল। অন্যের কর্তব্য ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়।" ম্যাঞ্চেস্টার বিদায় হোক! লণ্ডন বিদায় হোক! ভারতীয় জনগণ নিজেদের কর্তব্য করবে।

কিন্তু এই তপস্যা সফল হলে তার পুরস্কার কি, দেখা যাক। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে, কোন কাজ কখনো বৃথা হয় না। সংগ্রামের প্রতি স্পন্দন ফলবান হয়। যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করলে তার ফলে জয় ঘটে। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বলে কিছু নেই। কোন স্পষ্ট ভাবনা ব্যর্থ হলে আরো স্পষ্ট হয়। তখন লোকসানের অর্থ হল, বিলম্বিত লাভ। আবার জয় শুধু কথার ওপরে নয়, চেষ্টার ওপরেই নির্ভর করে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে যে সংগ্রাম চলছে, সারা ভারত তা লক্ষ্য করছে। একটা কথাও খবরের কাগজে বেরোয় না, তবু সবাই জানে। স্বদেশী বাণিজ্যের জন্য ঐ গম্ভীর বীর লোকগুলির মৃত্যুর সঙ্গে নীরব সংগ্রামে প্রত্যাশায়, সহানুভূতিতে, গর্বে পরিবেশ থমথমে। নীরবে সমগ্র ভারত শক্তি সংগ্রহ করছে। এই কৃষক জনতা যে যুদ্ধে ব্যাপৃত, আধ্যাত্মিক অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছে বলে তা কি কম সত্য? ন্যায়ের পথে যে বাধা দিতে চায়, দিক কিন্তু সাবধান! অন্যায়ভাবে বাধাপ্রাপ্ত ইচ্ছা স্পষ্টত বেড়ে উঠছে। যারা আপন শক্তিতে ভরসা রাখার শক্তি পেয়েছে তারা ক্রমশ কঠোর হচ্ছে এবং সমগ্র ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আসছে, যখন নির্দয় মানুষ কাঁপছে, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করে দেখছে, সে করুণা নেই!

তাহলে স্বদেশীর প্রতি আনুগত্যের প্রথম ফল হল, আরো অনুগত হওয়ার শক্তি লাভ। এখানে আমরা আমাদের সমস্যার মূল্য পাই। যে ভয়ে বাধাকে মেনে নেয় সে মূর্খ বা কাপুরুষ। পুরুষ সে যে, অনুভব করে বাধাই তার উৎসাহের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয় ফলটি আরো স্পষ্ট। আজকের আন্দোলন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। দেশের আর্থিক শোষণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত একে থামতে দেওয়া যায় না। ভারতের দারিদ্র্য যদি চক্রবৃদ্ধিহারে বার্ষিক শোষণ হয়, যথার্থ তাই ঘটছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বদেশী আন্দোলন-কর্তৃক বিতাড়িত দারিদ্র্যের পরের অবস্থা যদি বজায় থাকে, তাহলে তা চক্রবৃদ্ধিহারের সমৃদ্ধিতে পরিণত হয়। ভারতে ব্যবহৃত প্রতি পয়সায় রয়েছে ক্রমবর্ধমানহারে ভারতের মাটিতে মাঝে মাঝে সঞ্চারিত মূল্য। কাজেই স্বদেশী আন্দোলন যদি দৃঢ়ভাবে বজায় রাখা হয়, তাহলে আমরা কংগ্রেসের নেতাদের কাছে হতাশাব্যঞ্জক অর্থনীতির বদলে আশাপ্রদ অর্থনীতির কথা শুনতেও পারি!

তাহলে স্বদেশী আন্দোলনের সমস্যাগুলি কি কি? রাজনৈতিক বাধাকে সাময়িক বলা হয়েছে, এ ছাড়া রয়েছে পার হবার মত অনেকগুলি গুরুতর বাধা। এর মধ্যে আমি সামান্য আগ্রহের অভাবকে গণ্য করছি না, সব মানুষেরই তা কখনো না কখনো ঘটে, অগণ্য লোকের প্রথম আগ্রহ চলে যাওয়ার পর। মোটের ওপরে, আমাদের নারী ও পুরোহিতদের বিশেষ অভ্যাসের এত গভীরে এই আন্দোলনের মূল যে, ঐ ভাঁটা সমগ্র কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তুচ্ছ। পরে যখন সমুদ্র এসে বেলাভূমিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তখন এসব কথা ভুলতে হবে। না, স্বদেশী আন্দোলনের গুরুতর সমস্যা রয়েছে উৎপাদন ও বণ্টনের দুটি বড় ক্ষেত্রে। কম উৎপাদন সমস্যা আমরা সবাই বুঝি। সত্যি, বলিষ্ঠ ও সাবলীল ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় উৎপাদন যথার্থ স্তরে পৌঁছেছে, এটি সব কর্মীদের আশা ও আনন্দের পূর্বাভাস। তবে বণ্টনের ক্ষেত্রেও আমাদের সমস্যা খুব গুরুতর। কারণ, কোন নির্দিষ্ট বস্তু দেশে তৈরি হয় জানলেও তা কোথায় পাওয়া যায়, আমরা জানি না। অথবা, যে দোকানে পাওয়া যায়, সে দোকানে যাওয়া যায় না, বা যথেষ্ট সরবরাহ নেই। কলকাতায় চালু প্রথম সাবান কারখানা এই নিয়মের লক্ষণীয় ব্যতিক্রমরূপে দেখা দিয়েছিল। সাবান উৎপাদনের মত সমান যত্ন নিয়ে একে বিক্রিও করা হয়েছিল, ফলে কলকাতার বহু সুপরিচিত জায়গায় সংসারের জন্য অল্প পরিমাণ সাবান তখনি পাওয়া গেল। সুতরাং তখনি এর বিরাট সাফল্য দেখা দিল। অবশ্য জ্যাম, চাটনি, দেশী বিস্কুট, কালি, দেশলাই, খাতার কাগজ এবং এরকম অন্য আরো দরকারী জিনিসের ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থা অন্যরকম। কারণ উৎপাদকের পক্ষে তার ব্যবসার গোপন কোন ব্যাপার জানিয়ে দেওয়া যতটা কঠিন, ক্রেতাকে যদি ততটা কষ্ট করে কোন জিনিস কেনার সুযোগ পেতে হয়, তাহলে উৎপাদন বন্ধ হতে দেরী হবে না। এটা খুব স্বাভাবিক। এরকমই ধারণা করা গিয়েছিল। বণ্টনের প্রণালী এবং ছোট ছোট যে দোকানগুলি সব শহরের আসল বণ্টন-কেন্দ্র—সেসব এত দিন বৈদেশিক বাণিজ্যের হাতে ছিল, এখন এগুলি নিজেদের দখলে আনতে হবে। সর্বোপরি, স্বদেশীদের এই ছোট দোকানগুলি দখলে আনতে হবে। কারণ, বাড়িতে গৃহিণীর ভাঁড়ার ঘরের যে স্থান, এই দোকানগুলির স্থান শহরে সেইরকম। চার আনা বা চার পয়সার দোকান হল গরিবের ভাঁড়ার ঘর। সেখানে স্কুলের ছাত্র কালি, খাতা-

কাগজ, পেন্সিল কেনে। সেখানে নদী থেকে বাড়ি ফেরার পথে গৃহিণী থেমে কোন উপহার বা বাসন কেনেন। এখানে আমাদের চোখ নিজেদের সাবান, কালি, কাগজ, দেশলাই, খেলনা ইত্যাদির ওপরে ঘুরতে থাকে। দোকানের জানলা হল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন। এরকম অবস্থা ঘটলে তবে স্বদেশী আন্দোলন যথার্থত প্রাসাদ ও মন্দির পেরিয়ে গ্রামের ও কুঁড়েঘরের দূরতম প্রান্তে পৌঁছতে পারে।

এটা করতে গেলে, প্রতিটি ক্ষুদ্র ব্যবসাকে বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের বণ্টনের দেখাশোনা করার জন্য লোক রাখতে হবে অথবা প্রতি শহরে একটা করে স্বদেশী কমিটি গঠন করে সব শিল্পদ্রব্যের বিবরণ, কোন্ কোন্ দোকানে পাওয়া যায়, তার নাম লিখে রাখবে, স্থানীয় দোকানে বিদেশী জিনিসের চেয়ে স্বদেশী বস্তুর বিক্রী বাড়াবার চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে সারা দেশে এত আগ্রহ যে, সামান্য সুসংগঠিত প্রচার এবং সামান্য সুপরিচালিত প্রচেষ্টাতে অনেক কাজ হবে। কিন্তু প্রচেষ্টা বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বাণিজ্যিক ঋণদানের এমন ব্যবস্থা যে, বিদেশী বাণিজ্য থেকে দোকানগুলিকে মুক্ত করার জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে, এ কাজে সময়, ধৈর্য এবং গভীর উৎসাহের প্রয়োজন।

আরেকটা সমস্যা অবশ্য আছে, যে জন্য এরকম সংস্থার গঠন এবং অনুমোদিত দোকানের তালিকা-প্রচারের দরকার। এর কারণ হল, ব্যবসাগত অসাধুতার রীতি। অনেক জিনিস ভারতীয় চিহ্ন ও নাম নিয়ে বাজারে দেখা দিয়েছে, জিনিসগুলো কিন্তু বিদেশে তৈরি। হয়ত সেই নামগুলো ছাপালে মানহানি ঘটবে। উপরন্তু, অন্যায়টা আরো বেশি ছড়িয়ে পড়বে। স্পষ্টত, এই জালিয়াতি রোধ করার একমাত্র উপায় হল, স্বদেশী আন্দোলনের বিশ্বস্ত নেতাদের অধীনে প্রকৃত বস্তুর তালিকা প্রকাশ করা। তা ছাড়া, এই নেতারা যেসব জিনিসের কথা বলবেন, সেগুলির পাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অবহিত থাকবেন। এরকম স্পষ্ট একটা অসাধুতাকে ঠেকাতে না পারা আমাদেরই দোষ। এটা রোধ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে ধৈর্য ও ভবিষ্যৎ চিন্তা চাই।

আমরা চাই আঘাত করার স্পষ্ট বিন্দু, আমাদের মাতৃভূমির অধিবাসী, অসহায়, "ছোট শিশু"দের ভালবাসা, যাতে প্রতি আঘাত সফল হয়। এগুলি পেলে আমরা ব্যর্থ হতে পারি না। সুতরাং আমরা ব্যর্থ হব না। কারণ ভবিষ্যতের সব শক্তি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতে থাকবে, ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রতিক্রিয়া ও হতাশার সব স্রোতকে আধুনিক ভারতে ব্যর্থ করবে।

জাতীয়তার নীতি

মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক পরিবেশ হল স্থান, এই সত্যের ওপরেই জাতীয়তার নীতি নির্ভর করে। যারা একই জন্মস্থানের লোক হয়ে সেই স্থানের সঙ্গে ও তার অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কর্ম, প্রথা, আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্যকে যুক্ত করে এবং এর ফলে যাদের গণ-অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা হয়, তারা জাতির কর্তব্য, দায়িত্ব ও গুণাবলী নিয়ে জাতি গড়ে তোলে।

বলা হয়ে থাকে, নিজের কর্তব্যেই শুধু মানুষের অধিকার। কিন্তু এতে বোঝা যায়, তার নিজের সমগ্র কর্তব্যে অধিকার আছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য, সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। যে কোন দেশের লোকের সেই দেশের সব কাজ করার অবশ্যই অধিকার আছে।

তাহলে এইদিক থেকে বিচার করলে প্রতি মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা নয়, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অংশ নয়, এক বিরাট জাতির স্বাধীন সদস্য। এইভাবে তাকে ভাবতে, অনুভব করতে ও কাজ করতে শিখতে হয়।

চিন্তার রাজত্বে এর অর্থ হল যে, প্রত্যেকে তার জন্মভূমিকে নিজের জীবনে চরম সত্য বলে স্বীকার করবে এবং জন্মভূমির প্রভাবকে সচেতন শ্রদ্ধা জানিয়ে তাতে গর্ব অনুভব করবে, তাকে যথার্থ ক্ষেত্রে পুনরাবিষ্কার করতে ও বুঝতে চেষ্টা করবে। অনুভূতির রাজত্বে, জন্মভূমি ও তার থেকে জাত সকলের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করবে। দেশ ও জনগণ—ভারত ও ভারতীয় জাতি। জাতীয় সন্তান, জাতির সদস্যের হৃদয় হবে সব প্রদেশের ভালবাসা, ইতিহাস ও আদর্শের ক্ষেত্র। মসজিদের গম্বুজের মত এর ছায়াতলে উচ্চারিত সব সঙ্গীতের এ প্রতিধ্বনি করবে, ভারতীয় হৃদয়ের সব আনন্দ, দুঃখ, স্মৃতি ও আশা এখানে স্থান পাবে। ভারতীয় শিশুর হৃদয় বিশাল চিত্রশালার মত দেশের সৌন্দর্য, পর্বত, তীরভূমি, নদী, সমতল, প্রভাত, সন্ধ্যা, সনাতন জীবনের সরলতা, জটিলতা দিয়ে প্রেমের ছবিতে সাজিয়ে তুলবে—আর আচরণে যে জাতির সদস্য সে স্বপ্নদ্রষ্টার মত হতে পারে না। দেশের সব কাজ যদি দেশের লোককে করতে হয়, তাহলে দেখা যায়, এক মুহূর্তও কেউ নিষ্কর্মা থাকতে পারে না। যে আলো অবতারদের মাথার চারদিকে থাকে, শহীদদের আগুনে থাকে, সে আলো বুদ্ধিমান ব্যক্তির আলো। তার থাকে শক্তি, দায়িত্ব এবং আত্মত্যাগের অদম্য বাসনা।

এক লক্ষ্যে চালিত সব চিন্তা, অনুভূতি, কর্ম দিয়ে গড়ে ওঠে চরিত্র। জাতীয়তার মহৎ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা দিয়ে তার সেবা করার চেষ্টা করে মানুষ ও সম্প্রদায় বদলে যায়। তাদের উদ্দেশ্য পুনর্জাগ্রত হয়, স্বচ্ছ হয়, আরো আন্তরিক আনুগত্য পায়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানে পরিণত হয়। জ্ঞান গভীরতায় সমৃদ্ধ হয়। চরিত্র গড়ে ওঠে। চরিত্রের বলে মানুষ পর্বতকে সরাতে পারে।

"চরিত্রই শুধু সমস্যার দৃঢ় প্রাচীরকে ভেদ করতে পারে।"

ভারতীয় জাতীয়তা—একটি ভাবনা

ধম্মপদের শুরুতে বুদ্ধ বলছেন, "আমরা যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তার ফল। আমাদের ভাবনাই এর ভিত্তি। আমাদের ভাবনা দিয়ে এ অস্তিত্ব গড়া।" এই মহৎ বাণীর সত্য বর্তমান ভারতের মত আর কোথাও এত ভালভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের সামনে রয়েছে জাতি গড়ার দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের কাজের উপায় একমাত্র চিন্তা। স্বচ্ছ, প্রত্যক্ষ চিন্তার দ্বারা আমরা সমস্ত সমস্যার অরণ্য কেটে পথ করতে পারি। দুর্বল, এলোমেলো চিন্তায় আমরা শুধু নিজেদের লক্ষ্যকে আমরা হারিয়ে ফেলব।

সব মানুষ মূলত সত্যের বন্ধু। এমন কোন গোপন স্বার্থ নেই যা মানুষকে চিরদিন ন্যায়ের আহ্বান থেকে দূরে রাখতে পারে। আমরা কি প্রায়ই দেখি না, একজন প্রতিক্রিয়াবাদীর পুত্র স্বদেশী নেতাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, তার ক্ষমতামত যথাসাধ্য চেষ্টা করছে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে? এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, পরিবার, দল, স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই স্থায়ীভাবে বিবেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। এর অর্থ হল যে, যে কোন মানুষ শ্রেষ্ঠ সত্যকে পেতে পারে। এর অর্থ হল, আমরা ধর্ম ও ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সবাই এক।

তাহলে এখন যারা ভারতীয় পরিস্থিতি বুঝতে পারে, তাদের সকলের কর্তব্য হল, যেসব স্থায়ী সত্যের ওপরে জাতীয়তার আকুলতার ভিত্তি, সেগুলিকে উপলব্ধি করা। মূল ভাবধারা যদি আমাদের বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ হয়, তাহলে কেউ আমাদের মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা রোধ করতে পারবে না। আমরা হব তার মূর্তরূপ ও আবেদন। এমন কি বিরুদ্ধ-পক্ষের সেনাপতিও আমাদের চিন্তাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু কোন মহৎ ভারতীয় কখনো অসংযত উচ্ছ্বাস, শক্তির এলোমেলো ব্যবহারে বিশ্বাসী ছিল না। গীতা বলেছেন, যে দানে ব্যক্তি, স্থান, কাল লক্ষ্য করা হয়, সে-ই হল সাত্ত্বিক দান। এই বিচার না থাকলে সৎ অনুভূতি তমস্ মাত্র। দেশ সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা, ভালবাসা, আকর্ষণকে বিচার করে, যাচাই করে নিতে হবে। এইসব মনোভাব একত্র করে অন্যের মনে সঞ্চারিত করব, না হলে আমরা দেশের শুধু ক্ষতি করব, যাকে আমরা দেশপ্রেম ভেবেছিলাম তা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের আত্ম অসংযম। অনুভূতির সঙ্গে সর্বদা চিন্তা থাকা চাই। ভালবাসায় চিরকাল জ্ঞানের আলো চাই।

কিন্তু শুধু অনুভূতির মত শুধু চিন্তাও ভারতীয় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত। কোন সাহসী শিশুকে কঠোর ও ন্যায়পরায়ণ অভিভাবকদের হাতে ফেললে কি হয় দেখা যাক, যাদের ঐ শিশুর প্রতি ভালবাসা নেই। কোন অল্প-বিত্তর দুষ্টুমি বা প্রতিবাদের মত স্বাভাবিক কাজ করলে ভয়ঙ্কর তিরস্কার দেখা দেবে। তার মাত্রা শিশুর অন্যায়ের চেয়ে বেশি, ফলে শিশুর গর্বে আঘাত লাগে। সে

অভিভাবকদের শত্রু মনে করে, অর্থহীন, অজস্র অবাধ্যতা করতে থাকে। অভিভাবকের নিষিদ্ধ কাজে তখন তার আনন্দ হয়। প্রায়ই অপরাধীদের জীবন এইভাবে শুরু হয়।

ধরা যাক, শিশুসুলভ দুষ্টুমির মাঝে তার বাবা-মা হঠাৎ ঘটনাস্থলে দেখা দিল। ছেলের দুষ্টুমিতে ভয় না পেয়ে তাঁরা ছেলের কাজের দুঃসাহসিকতা ও শক্তির কথা শুনে খুশি হল। ছেলেটির মন তাদের অনুমোদনের উষ্ণতায় সাড়া দিয়ে আ প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করল। কালক্রমে সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রা বা দ্বারকানাথ মিত্রের মত হয়ে উঠল।

এখানে বাবা-মা ও অভিভাবকের পার্থক্য শুধু জ্ঞানে নয়। একই ঘটনা উভ দেখেছে। কিন্তু অভিভাবকরা শিশুর কাজকে দেখেছে বুদ্ধি দিয়ে, বাবা- দেখেছে হৃদয় দিয়ে। একজন তার চরিত্রের একটা দিক দেখেছে, অন্যজন সম্পূ পৃথক একটা দিক দেখে অভিভূত হয়েছে। কতবার আমরা স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনে দেখেছি, যে ছেলেরা আগে পুলিসের কাছে নম্র ব্যবহার পেয়েছে, তারা পরে দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলার শ্রেষ্ঠ অভিভাবক হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, নৈতিক প্রশ্নে, অর্থাৎ মানুষের সব কাজে,—এইভাবে ঘটনা নির্ধারিত করে আমাদের প্রধান চিন্তা ও অনুভূতি, যেসব শক্তি ঘটনাকে সম্ভব করে, তাদে প্রতি আমাদের মনোভাব। কিন্তু যাকে আমরা ভালবাসি, তাকে শত্রুর দৃষ্টি দি দেখাটা বিশ্বাসঘাতকতা। কোন জিনিসকে দেখবার সর্বদা দুটো পথ আছে একটা ঘটনা বিবৃত করা হলে জনতা বলল ভারতীয় জনগণের কি অনৈক্য! কি ধর, সেই ঘটনাই কারুর মনে কোন জায়গায় ভারতীয় ঐক্যের প্রমাণ হয়ে উঠল। এর চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। একটা দৃশ্যকে দেখবার দুটো আলাদা — আছে, এটা কি স্পষ্ট হবে না? বহু লোক বদরাগী শিশুকে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখবে, একজন দেখবে পিতার হৃদয় নিয়ে। কিন্তু কোন্‌টাই বুদ্ধির চিহ্ন কোন্‌টা বেশি ন্যায়সঙ্গত? কোন্ দৃষ্টিতে সত্য বেশি? অপরাধীদের ইতিহাসে পাশে রাখলে একটা ছোট ছেলের অন্যায়কে খুব তুচ্ছ মনে হয়, তবু সেইগুলি ভবিষ্যতে তাকে অপরাধী করে তোলার উৎস হয়ে উঠতে পারে। যে বৃহৎ অভিজ্ঞতা এই ঘটনাকে সত্য আলোকে দেখবে, শুধু সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা আমা বিচারক ও পরিচালকের দায়িত্ব নিতে হবে। সর্বদা স্পষ্ট ব্যাখ্যাই নির্ভুল হয় ..

এবার আমাদের বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষ নিজেকে জাতি বলে ভাবলে জাতি হতে পারবে। তার প্রয়োজন শুধু এই ভাবনাকে উপলব্ধি করা। তার জাতীয়ত পদ্ধতি হল 'ভারত এক'। কোন মন্ত্রের পেছনে উপলব্ধি থাকলে তার অর্থ গভীর উপলব্ধি না থাকলে তার মূল্য যাদুকরের যাদুমন্ত্রও নয়।

ভারতবর্ষ এক। এর কতটা ঐক্যবদ্ধ? বন্ধু, যতটা এই সত্যকে উপলব্ধি .. শক্তি রাখে! ভারত এক। অথচ তার এত অনৈক্য! তাই কি? আবার দেখ! সত্যকে সোজাসুজি দেখ। সব মোহ ছিন্ন কর। ভয় পেও না। বস্তুর সত্যরূপে ডুবে যাও। হয়ত তুমিই কোনদিন বলবে, কোন দেশ বা জাতি এত

অনৈক্য নিয়ে আমাদের ভারতের মত সব অংশ একত্র করে মূলত এত ঐক্যবদ্ধ হয়নি।

ভারতে কি ঐক্য নেই? কেউ বলছে তার এত জাতি! এত জাতি না থাকলে সে এক হত কি করে? তার জাতি তার শত্রু নয়। ইসলামীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওরা ভারতের সন্তান। হিন্দুধর্মে মহৎ ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথা ও সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু এখন এই দুটি সুসমঞ্জস উপাদানের জন্য জাতীয়তাবাদ থেকে সাধারণ ধর্মহীন উপাদান বাদ দেওয়া দরকার। হিন্দুধর্মের রয়েছে যুগ-যুগ সঞ্চিত স্মৃতি, স্থানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ভারতীয় ধাঁচের সভ্যতা। মুসলিম ধর্মে গণতন্ত্রের শিক্ষিত অনুভূতি জাতীয় ক্ষেত্রে, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের পিতৃ-প্রধান সংস্কৃতিতে, ভারতীয় কাব্য ও ধর্মকে সব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার উপযুক্ত পরিপূরক ভাবধারায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটা জাতি, একটা দেশ কোন সঙ্কীর্ণ, সীমিত বস্তু নয়। যারা ভালবাসতে পারবে, তাদের সকলের স্থান এতে আছে! মুসলমানের লাভে হিন্দুর ক্ষতি নেই, বরং উল্টোটা সত্যি! হিন্দুর মুসলমানকে দরকার! ভারতীয় জাতি গড়তে গেলে মুসলমানেরও হিন্দুকে দরকার। অতীতের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সমপরিমাণ শক্তির প্রমাণ দেওয়া। ইংরেজ ও স্কটদের সীমান্ত-যুদ্ধের মত, এসব যুদ্ধও শুধু যারা নিজেদের জাতি বলে জানত তাদের সংঘর্ষ। প্রত্যেকে অন্যের অস্ত্রে নিজের তরোয়ালে শান দিত। সাহসী লোকের যুদ্ধের চেয়ে ভাল বন্ধুত্ব আর কিছুতে হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেখ। জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার বড়লাট হতে পারেনি বলে কি নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে? সবাই যদি নেতা হয় তাহলে সাম্রাজ্য থাকবে কি করে? জাহাজের ইঞ্জিনীয়ারও সমান দরকারি। কিন্তু নিজের কাজের মর্যাদাকে সানন্দে স্বীকার না করলে, পদের দায়িত্ব মেনে না নিলে তাকে দিয়ে কোন সাহায্য, কোন শক্তি পাওয়া যাবে না। জাতি হল একক সমাহার। একটা ছোট গ্রামেও অনেক জাতির দরকার থাকে। সামাজিক মাত্রাভেদ না থাকলে জাতি থাকবে কি করে?

আজ ভারতীয় জাতির জন্য যেসব উপাদানকে প্রস্তুত দেখছি তার প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য দরকার। মুসলমানের সাহায্য না নিয়ে একা হিন্দু কখনো জাতি গড়তে পারে না। আর্য সমাজ সংগঠন সর্বদা সংস্কৃতির বিরাট পরিকল্পনার উন্নতি ও বজায় রাখার জন্য ধাপে ধাপে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছিল, এই সংগঠন অশোকের যুগ থেকে পাটলিপুত্রের গুপ্ত রাজাদের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধমঠের গণতন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছে। আবার আকবরের সময়ে আকবর জাতীয় ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এমন কি এই দিক থেকে ভাবলে সংগ্রামের ইতিহাসও ঐক্যের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ভারতীয় ঐক্যের সামনে ভবিষ্যৎ দায়িত্ব থাকার অর্থ ভারতীয় বস্তুকে ভালবাসা। জাতির হৃদয়ে একটি মন্ত্র হল, মাতৃভূমির, স্বদেশের নাম। দেশের গান তার সব

স্বপ্নে গুঞ্জরণ করে। ভারতীয়রা ভারতীয় দ্রব্যের জন্য সংগ্রাম করুক, তাকে ভালবাসুক, তাহলেই তারা নাগরিক, জাতির সদস্য।

চিন্তা ও ভালবাসা হল সমগ্র রহস্যের চাবিকাঠি। তুর্সা লুভ্‌র্চার বলেছিলে এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে, "সকলের পথ উন্মু থাকা" জাতির পক্ষে ভাল। মাতৃভূমি কোন জাতিকে পৃথক করে দেখবে ন কারণ তাহলে সে শ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এর জন্য, গণত সম্মত সামাজিক সংগঠনের খুব দরকার, জাতিভেদ নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে শিক্ষাে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক করতে হবে যাতে সকলের দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং দেশে পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত হয়।

কিন্তু যে লোক পরিষদ-কক্ষে বা বাজারে সব জাতির অতীত, নিজের গৃহে ব মন্দিরে সে আবার সংগঠিত সমাজে নিজের স্থান গ্রহণ করে। এখানে স্বচ্ছ চিন্তার দ্বারা এই আপাত বৈষম্যের সমাধান ঘটবে। আবার, ধর্মে সব জাতি সমান। স্বধর্ম অর্থাৎ আপন কর্তব্য পূর্ণ করার দ্বারা লোকের সামাজিক গুণের পরিমাপ হয়, কাজের মর্যাদার দ্বারা নয়। কোন বিশেষ মুহূর্তে দেশের পক্ষে সম্রাটের চেয়ে মুর্দাফরাসের ঐক্য বেশি দরকারী হতে পারে। মাতৃভূমির সেবামূলক সব কাজ সমান সম্মানজনক। বলিষ্ঠ, সুষম জাতীয় ঐক্যের জটিলতা তার দুর্বলতা নয়, বরং শক্তি।

অতীতে ভারত সুসংগঠিত জাতি ছিল না, এ কথা ভাবা ভুল। খ্রীষ্টে আড়াইশো বছর আগে অশোক, খ্রীষ্টের চার শো বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত বি দিত্য, আকবর ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটরা সবাই ভারতীয় জাতীয়তার ভাবধ... বুঝেছেন, ভালবেসেছেন, তার জন্য কাজ করেছেন। আগে যা সম্রাটের... স্বাভাবিক মনে হত, এখন সেই ভারতের প্রতি ভালবাসা, তার স্বার্থের দায়িত্ববো যদি সাধারণ মানুষের মনে না জাগে, তাহলে জাতীয়তাকে উদ্ধার করা যাবে না। এখন সিংহাসন নয়, জাতীয়তাবাদ মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে, বাঁচাবে। কিন্তু ঘটনা ঘটবেই! এ কথা ঠিক যে, বাড়ি তৈরির সব উপাদান প্রচুর রয়েছে: কিন্তু কথা ঠিক নয় যে, সেগুলি কাজে লাগানো হয়নি। বড় বড় রাজাদের সনাতন রাজাদের আনুগত্যের সূত্রে, শান্তিপর্বে যে জাতীয় ঐক্যের অপূর্ব ফল ও ... দেখা গেছে, জগৎ তা কখনো দেখেনি। রামের প্রতি সব সম্প্রদায়ের অ... আমাদের ততটা অভিভূত করে না, যতটা করে দু হাজার বছর আগে বাল্মীকি নেতার মত জাতীয়তার স্বপ্ন। কবির যুগে ভারতীয় জনগণ নিজেদের একটা ... জাতির অংশ ভাবতে অভ্যস্ত ছিল।

একই চিন্তা করতে তারা আবার শিখুক। সর্বতোভাবে ঐ চিন্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুক। এই চেষ্টার ফলে তারা নিজেদের উপলব্ধি সত্যরূপে দে... নিজেদের জাতি বলে স্বীকার করলেই আমরা এক জাতি। কি? দেশের রাজনীতি... গ্রাম্য দাঙ্গা খুব গুরুতর লক্ষণ? শিশু মায়ের রান্নায় ব্যস্ত থাকার সুযোগে টক চুরি করেছে, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, সে জন্মগতভাবে চোর! বন্ধুগণ, সাহস

চাই, সাহস। তুচ্ছ যা, তা তুচ্ছই থাক। আমরা দারিদ্র্যের হিসেব না করে প্রাচুর্যের হিসেব করি! আমাদের কি গ্রাম ও গৃহের প্রতি ভালবাসা নেই? আমাদের নদী-পর্বত কি আমাদের কাছে পবিত্র নয়? তাহলে কেন ভারতের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখা দেবে না? বিকৃত মুখে সৌভ্রাত্র কথাটা উচ্চারণ করার দরকার নেই। শুধু আমরা জানু পেতে বসে আমাদের মাকে ভালবাসা জানাব। এই ভালবাসা, এই প্রশান্তি থাকলে আমরা সহজে আর সব কাজ করতে পারব। আবার এ কথা প্রমাণিত হবে যে, "আমরা যা হয়েছি তা আমাদের চিন্তার ফল। এর ভিত্তি আমাদের ভাবনা। এ অস্তিত্ব আমাদের ভাবনা দিয়ে গড়া।"

জাতীয়তার আহ্বান

ভারতে যুগের পর যুগ আসে, প্রতিবার ভারতীয়দের মহত্ত্ব পুনর্জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের স্বর শোনা যায়, তিনি সন্তানদের নতুন উপচারে পূজা করার আহ্বান জানান। সংসারের মায়ের মত আজ তিনি তাঁর প্রসূত ও পালিত সন্তানদের বলছেন, তিনি আমাদের কাছে নম্রতা, আত্মসমর্পণ চান না, চান পুরুষের শক্তি, অদম্য ক্ষমতা। আজ তিনি চান,, আমরা তাঁর সামনে তরবারি নিয়ে খেলি। আজ তিনি নিজেকে এক বীর গোষ্ঠীর মাতারূপে দেখতে পান। আজ তিনি আবার আর্তনাদ করছেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত, শুধু শাসক রাজাদের জীবন ও রক্তে তাঁর মন্দিরকে বাঁচানো যাবে।

হে মুকুটধারী রাজগণ, তোমরা এগিয়ে এস! হে মহান জাতি, ভাবীকালের জাতি, তুমি জাগো! যে শোকবস্ত্র তোমায় ঘিরে রয়েছে, তাকে ফেলে দাও!

একজন সকলকে নেতৃত্ব দিতে পারে, সে যুগ ভারত থেকে চলে গেছে। এখন আধুনিক পৃথিবীর এমন অবস্থা যে, সব লোককে একটি ভাবধারা মেনে নিতে হবে। প্রাচীন জগৎ দেখেছে একজন রাজা, তার বহু লক্ষ লক্ষ প্রজা। নতুন পৃথিবী প্রজাদের প্রত্যেককে রাজা করেছে। কিন্তু রাজার দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ চালনা করার মত রাজার ক্ষমতার জন্য আধুনিক মানুষকেও এমন একটি মহৎ চিন্তা শিখতে হবে, যা সিংহাসনকে টলিয়ে দেয়, যে মহৎ নিয়মে সিংহাসনের জয় এবং পরাজয় ঘটেছে,—সেই নিয়ম, জনগণ ও দেশের কল্যাণ চিন্তা।

এইভাবে জাতীয়তার আহ্বান উদ্ভূত হয়েছে। অতীতে এ কথা বলা হয়েছিল, এখন সমগ্র জনগণকে, আমাদের জাতির পূর্বপুরুষদের, দেশের দেবতাদের বল।

আমরা তোমায় চেয়েছি, সঙ্গে থাক,
নিশ্চল, দৃঢ় হয়ে,
সবাই তোমাকে কামনা করুক,
ভেঙে ফেল সব ক্ষুদ্রতার বন্ধন!
খুলে ফেল শোক-আবরণ—
ভাঙো মৃত্যু সীমা—ওঠো জেগে!

আবরণের নীচে দেখো দীর্ঘদিনের মৃতদের আন্দোলন, সংগ্রাম। সময় এসেছে। নিশীথ নীরবে, ভয়ে প্রতীক্ষমাণ। দীর্ঘকাল পূর্বে বিস্মৃত জাতিগুলি যুগযুগব্যাপী নিদ্রায় আর্তনাদ করছে। আমাদের চারদিকে অতীতের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—"জাগো! জাগো!"

চুপ! এই মৃতদের কাননে সূর্যাস্তের শেষ দীর্ঘ রশ্মি প্রভাতের প্রথম আলো হয়ে জলে উঠবে। এখনি রাত শেষ হয়ে গেছে। আমাদের শোক শেষ হয়েছে। দিন আগত। নতুন যুগ দেখা দিয়েছে, মায়ের মুখ থেকে তাঁর সব জনগণের প্রতি শুনছি রাজাদের প্রতি বৈদিক আশীর্বচন:

"তোমার রাজত্ব যেন স্খলিত না হয়,
তুমি দৃঢ় থাকো, দুর্বল হয়ো না,
হও নিশ্চল পর্বতের মত—
ইন্দ্রের মত কঠিন হও,
রাজ্যকে রাখো আপন মুঠোয়।"

জাতীয়তার আবেদন হল, জনগণ যেন স্বাধীন হয়, স্থায়ী হয়।

বৈদিক জাতিসমূহ

যে মানুষ জাতীয়তায় বিশ্বাসী, সে দেখে ভারত তরুণ,—তারুণ্য তার হৃদয়ে পাঁচ হাজার বছরের স্মৃতিকে বহন করছে! বস্তুত ভারত জাতিগুলির মধ্যে ব্রহ্মচারী—ক্ষীণকায়, তেজস্বী, সংগ্রামোদ্যত, উদ্যমী, সাহসে দীপ্ত, শক্তি-সচেতন, জগতে স্বপ্নেও এমন মূর্তির কথা ভাবেনি।

মানবতার কাজ কখনো ব্যর্থ হয় না। যে জাতি ত্রিশ শতাব্দীরও বেশি ধরে একটানা চেষ্টা করছে তার সভ্যতাকে উন্নত করার জন্য, যারা এক হাজার বছর আগে বর্বরতা ত্যাগ করেছে, তাদের না পাওয়া কিছু ঐ জাতি পাবেই। সে কোন কষ্টকে ভয় পায় না। আজকের এই সংগ্রাম কি তার কাছে নতুন? সত্য বটে, এই ঐক্যের সংগ্রামের মত বিশাল, গভীর সংগ্রাম অতীতে কল্পনাও করা যায়নি। কিন্তু অতীত এই ঐক্যের প্রস্তুতি ঘটিয়েছে।

এখন যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, তারা দু-একজন নয়, সারি বেঁধে। এখানে আসছে মারাঠারা, ওখানে খালসার শিষ্যরা; এখানে মুসলমানরা, ওখানে বাঙালীরা। আরেকটা দল রাজপুতদের। এই হল ইতিহাসের কাজ। ভারত অতীতে জাতিগুলির জন্মভূমি—বলিষ্ঠ, রাজকীয় জাতির পালনাগার ছিল। আজ সে হবে জাতীয়তার, একক মহৎ ঐক্যের বিরাট ক্ষেত্র, যার জন্য অতীতের সব ক্ষুদ্র ঐক্য প্রস্তুতি ঘটিয়েছে।

প্রতিটি উপাদান—ভারতের অতীতস্মৃতি, তার শহর, ইতিহাস, শিক্ষা, মানুষ ও আচরণের ভেদ, সমগ্রকে গড়ে তুলেছে। সেই সমগ্র ভারত আনন্দিত তার বিরাট সম্পদের জন্য। কারণ, এগুলি ঐক্যের ক্ষেত্র, বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের নয়। এগুলি সহযোগিতার, ঐক্যবদ্ধ প্রসারের উপাদান—সত্যি যাদের ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য এক, কোন কিছু তাদের বিভক্ত করতে পারবে না।

আমাদের ইতিহাস মৃত নয়। সে আমাদের মধ্যে জীবিত। শুধু সে বৃহৎ অক্ষরে লেখা চরিত্র। চরিত্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ। যে শক্তি গোবিন্দ সিং-এর অনুগত হয়েছিল তা যে কোন সময়ে পাঞ্জাবীদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। যে কোন মুহূর্তে জহরব্রতের সাহস ও শক্তি রাজপুতের মধ্যে জেগে উঠতে পারে। শিবাজী মারাঠাদের মধ্যে মৃত হতে পারেন না। যে কোন মুহূর্তে মুসলমানের মধ্যে শাসক বা সৈনিক দেখা দিতে পারে। যে দেশে আমরা বাস করছি তা আমাদের পিতৃপুরুষদের রচিত। আমরা কি তাকে নতুন করে গড়ব না ? ইতিহাস সচল।

আমাদের শক্তির কি প্রমাণ আমরা পেয়েছি ? আমরাই ভারতে বেদকে এনেছিলাম। আমরাই উপনিষদ ও সূত্র শাস্ত্রগুলি ভেবেছি, লিখেছি ; আমরা প্রবল দর্শনগুলি, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তের জন্ম দিয়েছি, আমরা কপিল ও শঙ্করাচার্যের মত বড় বড় দার্শনিকের জন্ম দিয়েছি ; আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছি, জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের বাণিজ্য, বিপুল খ্যাতি, জাতিগুলির মধ্যে তার স্থান গড়ে তুলেছি—এই শক্তি আবার আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে। আমরা আমাদের দেশকে আবার গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাতে চাই—সে কাজ যাতে করতে পারি, সেজন্য আগে নিজেদের জাতি বলে, এক বলে ঘোষণা করছি।

আমাদের সামনে এখন কি কাজ ?

আমাদের আপন ঐক্যকে উপলব্ধি ও কার্যকরী করার জন্য আমাদের প্রথম সংগ্রাম।

ভারতের ঐক্য

ভারতের ঐক্যের বহু আলোচিত প্রশ্নের মত আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক আর কোন বিষয় নেই। যারা ভারতকে ভালবাসে না, তারা বলে, ভারতে প্রবল অনৈক্য। ভারতের সন্তান ও ভক্তরা বলে, ভারত এক!

সবচেয়ে খারাপ দিকটিকে গ্রহণ করে বলা যাক, আমাদের মাতৃভূমির অনৈক্য বহুত্ব সত্য কথা, এরকম ক্ষেত্রে আমরা কোন চিন্তাধারা অনুসরণ করব? ধরে নিতে হবে যে, আমরা সমস্যাকে বাড়াতে চাই না, বরং তার সমাধান করতে চাই এমন উপায়ে যে দিনে দিনে তা বৃদ্ধি না পেয়ে কমতে থাকে। প্রথমত ভারতে এখন ঐক্যের যে বহু উপাদান আছে তা নিয়ে আলোচনা করার পথ আমাদের খোলা। এই দেশের সর্বত্র বিদেশী প্রভাব ছাড়াও ভারতের নিজস্ব সভ্যতা অসাধারণ সামঞ্জস্য পূর্ণ। লোকে যা ভাবে তত ভাষার বৈচিত্র্যও নেই। প্রাচীন মাতৃভূমি সন্তানদের জন্য যত ব্যবস্থা করেছে, তার মধ্যে উত্তরাঞ্চলের জন্য একটা সাধারণ ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ভাষা নামে সুপরিচিত দক্ষিণ ভারতের ভাষা গড়ে তুলতে পেরেছে। আবার যদি ধর্মের কথা বলি, তাহলে লোকে যে তীব্র বিভেদের কথা বলে তা দেখতে পাওয়া কঠিন। সমগ্র হিন্দুধর্মের তত্ত্ব হল বিশ্বাসের এক বিরাট সমন্বয় এবং তার প্রসার এমন যে, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মত বিশিষ্ট ধর্মও তাতে জায়গা পেতে পারে।

বিপরীতপক্ষে, অন্যান্য দেশের সমস্যাগুলির দিকে তাকানো যাক। যে আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডে প্রতি বছর হাজার হাজার বিদেশী জড়ো হয়, তার সঙ্গে কি ভারতীয় অনৈক্য তুলনীয়? সুইটজারল্যাণ্ড ও ভারতের জনসংখ্যার অনুপাত দেখলে কি ঐ দেশের সঙ্গে ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যের তুলনা করা যায়? ঐ ছোট দেশটাকে জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে, এদিকে এই বিশাল ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হিন্দী তার নানা উপভাষাসহ প্রচলিত এবং কয়েকটি দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত, এইসব ভাষা একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রাচীন ভাষা এবং সাধারণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারায় যুক্ত।

ঐক্য একটা এমন বস্তু যার সম্বন্ধে বলা যায়, ঐক্য বাহ্যত থাকুক বা না থাকুক, আগে মনে তার সম্বন্ধে ধারণা করা চাই। এদিকে দেখলে, জীবনের সব বড় সত্য প্রধানত মনের ধারণা। পরে অবশ্য তাদের বাস্তবে রূপ দিতে হয়, কিন্তু ভাবনাগুলির জন্ম ঘটে মনে। মনে ভাবনাগুলি জন্ম নেয়, আকার গ্রহণ করে। সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠা হয়। এখান থেকে তারা বাইরে যায়। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কথা যে কত সত্য আমরা সবাই জানি। স্ত্রী কি কখনো স্বামীর চরিত্র ও ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কথা ভাবতে পারে? তাহলে শ্রেষ্ঠ সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে দ্রুত। স্ত্রীর ভক্তি সমর্থন পায়, এমন তথ্যের ওপরে শুধু সে নির্ভর করে। বাকী সব সে অপ্রয়োজনীয় বলে ত্যাগ করে। ওগুলির তার কাছে কোন মূল্য নেই।

তেমন, একটি অতি বাস্তববোধ যেখানে শুধু স্বীকৃতিই সত্য। শুধু স্বীকৃতির যথা

অস্তিত্ব রয়েছে। ঠিক যেমন, স্নেহের কাছে শুধু মধুর, সুন্দর বস্তুরই যথার্থ অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনই আরো অনেক বস্তুতে এ কথা সমান সত্য। এই অর্থে সামঞ্জস্য হল সত্য, বৈষম্য ও তার উপাদান মিথ্যা। সমগ্র মানবসমাজ এই ধারায় গড়ে উঠেছে। সন্তানের জন্য মায়ের তীব্র ভালবাসা দ্রুত ফুরিয়ে যাবে, যদি না সন্তানের প্রতি কাজে, কথায় তার প্রয়োজন ও নির্ভরতার তীব্র আবেদন প্রকাশ পেয়ে এই সম্বন্ধকে দৃঢ় ও গভীর করত। তাহলে একইভাবে বলা যায়, শুধু একতাই সত্য একতার বিপরীত হল বৈষম্য, তাই তার অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রিয় কি প্রমাণ দেয়, তাতে কিছু আসে যায় না। মন সত্যের জন্ম দেয়। মহৎ প্রাণদায়ী ধারণাগুলি মনে জন্ম নিয়ে পরে বাইরে প্রকাশ পায়। আমরা দেখছি ভারত এক, সে এক রয়েছে, এক থাকবে। আনন্দ ও শক্তির সঙ্গে এই ভাবনাকে যুক্ত করা প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর কর্তব্য।

আধুনিক ভারতের উন্নতিতে ইতিহাসের প্রভাব

১

আজকে ভারতের সামনে আধুনিক যুগে প্রবেশ লাভের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ যুগ হল বিশ্ব-চেতনার যুগ। বাষ্প ও বিদ্যুতের আবিষ্কারের ফলে এখনি অতি নিরুদ্যম লোকের পক্ষেও জগৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বাণিজ্য আগেই এ কাজ করেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও এই পথ অনুসরণের চেষ্টা করছে। বৈঠকখানায় সব দেশ, সব যুগের গৌরবচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বস্তুত সমগ্র মানবজাতির মত প্রত্যেক মানুষ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে দেখে।

এই আধুনিক যুগ শোষণেরও যুগ। অতি মূল্যবান বস্তুর জন্য ইউরোপকে যেতে হয় এখনো আধুনিক হয় নি, এমন যুগ বা এমন সম্প্রদায়ের কাছে। পারস্যের তুরস্কের কার্পেট, বোখারার সূচীকার্য, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির অপূর্ব চীনামাটি ও ধাতব কাজের চাহিদা রয়েছে, কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করতে হয় নির্জন, নিঃসঙ্গ প্রাচীন জগতের উদ্যানের ফুলের মত। শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি এই উদ্যানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে ওগুলি পিষ্ট, মথিত হয়ে যায়। কাশ্মীরের শিল্পও চলমান ভ্রমণকারীর পায়ের নীচে কুৎসিত হয়ে উঠছে। লণ্ডন আবাসিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ছবি আঁকা শেখাচ্ছে, কিন্তু কেন? যাতে তারা বত্তিচেল্লি আর মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি বুঝতে পারে। কিন্তু যে স্বপ্ন আর বিশ্বাসের ফলে এই ছবি সম্ভব হয়েছে, তা সে দিতে পারছে না। এখন প্রত্যেকে শেক্সপিয়র পড়তে পারে, কিন্তু নতুন শেক্সপিয়রকে কোথায় পাওয়া যাবে? যে স্তবমন্ত্র আমাদের গভীর তৃপ্তি দেয়, সেও কি দীর্ঘকাল আগে কর্মশালার বা মন্দিরের আনন্দময় জীবনের বাণী নয়? একঘণ্টায় হয়ত আমরা

ক্রিসোস্টোম, টেরেসা আর ইগ্নেশিয়াস লোয়োলার সব প্রার্থনা বলে ফেলতে পারি, কিন্তু ওর একটি কথাও প্রথম উচ্চারণ করতে বহু বছরের মনঃসংযোগের দরকার হত। আধুনিক যুগ শোষণের যুগ, সৃষ্টির যুগ নয়।

এ যুগ সংগঠনের যুগ। যন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা দুর্লভ শক্তির বিশাল ক্ষেত্রকে অধিকার করি এখানে একটা স্ক্রু, ওখানে একটা চাকার সাহায্যে। তেমনভাবে, এ যুগের সবচেয়ে বড় প্রলোভন হল মানবিক ক্ষেত্রকেও একই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা। আমরা সমস্ত মানুষের কথা ভাবি, যেন আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আমরা যন্ত্রের নিয়মানুবর্তিতা ও ত্রুটিহীনতা দিয়ে জীবন এবং মানুষকে সংগঠিত করতে শিখেছি। এ ঘটনা আমর দোকানে, অফিসে, কারখানায় দেখি, রাজ্যচালনায় দেখি, সরকারী কর্মীদের দ্বারা অনবরত এক দেশের অংশ অন্য দেশে যুক্ত হওয়ার ঘটনায় দেখি।

এ যুগ জনতার যুগ। এতদিন যে উপযোগিতা ও দায়িত্বের প্রশ্ন ছিল রাজা শাসনসভার একচেটিয়া, আজ আমরা সবাই তার সঙ্গে পরিচিত। আমাদের স্বভাব রাজাদের মত। তবু আমরা রাজা নই। আমাদের শিক্ষাও এমন, যা আগে শুধু সুবিধাভোগীরাই পেত। মানুষ শোষিত হলে লোকে সমালোচনা করে; এই চিন্তা, এই দায়িত্বের ফলে শেষ পর্যন্ত লোকে সংগঠিত হয়। তুসাঁ লুভ্রূচারের প্রতিভ বলেছিল, নেপোলিয়নের কথায় তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল যে, "সব জীবিকাই দক্ষতানির্ভর," কিন্তু ওঁরা এ কথা না বললেও কোন না কোন সময়ে এ ঘোষণা হতই কারণ, এটা আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বক্তব্য।

তাহলে এই হল আধুনিক জগতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। ভারত এখনো অনেক পরিমাণে মধ্যযুগীয়। এর অর্থ কি? মধ্যযুগ শোষণের যুগ না হয়ে ছিল উৎপাদনের যুগ। খাঁটি স্বপ্নদ্রষ্টারা অল্পবিস্তর শিশুসুলভ বিশ্বাসে স্বপ্ন দেখত। এখনকার চেয়ে জনগণ কম খবর পেত, তাদের উদ্দেশ্য ও অভ্যাস ছিল অনেক বেশি সরল। রাজনৈতি দায়িত্ব ছিল খানিকটা একচেটিয়া। এখনকার চেয়ে প্রত্যেক জীবন ও দল নিজ কাজে অনেক বেশি মনোযোগ দিত। বিজ্ঞান আধুনিক জগতের বিশিষ্ট উৎপাদন মধ্যযুগের বিশিষ্ট উৎপাদন ছিল শিল্প। কাজ হত হাতে, যন্ত্রে নয়। কাজে কাজের গতি ছিল ধীর, উৎপাদন খুব ধীরে বাড়ত। তাই একটা ঘরকে সাজাতে বা কাজে লাগাতে পুরুষের পর পুরুষ চলে যেত। সেই কারণে, জগতের যে কোন অংশে একটা পুরনে খামারের রান্নাঘর আধুনিক রান্নাঘরের চেয়ে অনেক সুন্দর বলে সর্বত্র স্বীকৃত।

আমাদের মধ্যে অনেকে বুঝবে, যেখানে আধুনিককে সরিয়ে দিয়ে মধ্যযুগকে রাখ সম্ভব, সেখানে তাই করাই কাম্য। কিন্তু ভারতে আমাদের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই মধ্যযুগ এখানে মরণ-যন্ত্রণায় ধুঁকছে। প্রথমত সে আহত হয়েছে বাণিজ্যের স্পর্শে পাশ্চাত্যের দ্রুত উৎপন্ন, দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত, দ্রুত পুনরুৎপন্ন যান্ত্রিক দ্রব্য মন থেকে যুগব্যাপ ধীর গতির উৎপাদনকে দূর করে দিয়েছে। বর্তমানের নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতা দুই চরম প্রান্ত ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভারতের সুন্দর, প্রাচীন সারল্যকে বিপন্ন কর তুলছে। এর অর্থ হল, শিল্পগুলি মরতে বসেছে—শিল্পসংঘ বা জাতির লোকের

উপবাস করছে অথবা এমন কাজ করছে, যাতে তাদের ইচ্ছাও নেই, দক্ষতাও নেই।

খ্রীষ্টীয় রূপান্তরের ফলে মধ্যযুগীয় ভারত মরণান্তিক আঘাত লাভ করেছে। খাঁটি স্বপ্নদ্রষ্টাদের সরল বিশ্বাস কিছুদূর বজায় থাকছে, কিন্তু তা আগের মত স্বতন্ত্র ও সংঘবদ্ধ নয়। মেয়েদের জীবন রয়েছে সেকেলে জগতে, পুরুষদের মনকে আধুনিকতা ছুঁয়েছে কিন্তু অনুপ্রাণিত করে নি, সুতরাং মেয়েদের সঙ্গে তাদের যোগ নেই। আরো হাল্কা নীতিবোধ হলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। এখন যা অবস্থা, তাতে তিন হাজার বছরের বিশ্বাস ও কাজের স্বাভাবিক উন্নতিতে যে চরিত্র গড়ে উঠেছে সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছে।

শেষত, যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের ফলে দেশ ইংরেজীভাষী অঞ্চল হয়ে পড়েছে তার অস্তিত্বের ফলে মধ্যযুগীয় ভারত মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা পীড়িত। ভাল বা মন্দ, যে ফলই হোক, আধুনিকতার প্রভাব এখন এতদূর ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাকে দূর করা যায় না। ভারত এখন জগতের বিংশ শতাব্দীর বাজারের একজন। আগের মত গর্বিত ও অনুভূতিপ্রবণ হলেও সে আর বিচ্ছিন্ন নয়, তার আত্মবিশ্বাস আর নেই, সে এখন আর নেই, সে এখন নির্দিষ্ট সাফল্যে সন্তুষ্ট নয়। যে পরিকল্পনার ফলে দেশের মহৎ সন্তানরা উৎসাহ ও উচ্চাশা লাভ করবে এবং ক্রমশ তার নিম্নতম লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে, সেই পরিকল্পনায় প্রত্যেক দেশের অধিকার আছে। এখন অবশ্য ভারতে নিম্নতমরা খোলাখুলিভাবে, প্রচণ্ডভাবে অনুকরণরত। লক্ষ্যের পথে অবিশ্বাস্য বাধার বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ কাজের কথা সমাজ বুঝতে পারে না। অধিকাংশ লোক রয়েছে এ দুয়ের মাঝে, তারা জানে না, কোন উদ্দেশ্যে কাজ করবে। বর্তমানের ভারতকে যদি আমরা হতবুদ্ধি সন্দিগ্ধ বলে ভাবি, তাহলে তাকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত এবং সামাজিক দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারব।

তখন নিজের প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটাতে স্পষ্টত তাকে বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাকে কাজে রূপায়িত করতে হবে, একে আমরা সুবিধার জন্য আধুনিক চেতনার সমন্বয় বলে অভিহিত করব। অর্থাৎ, আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রকাশপদ্ধতি গ্রহণ করে তাকে তাহলে বর্তমান প্রকাশের বিষয়বস্তুকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে যে দেশগুলির সঙ্গে সে সমান দরের প্রতিযোগিতায় নামবে, তাদের চেয়ে উঁচু না হোক, অন্তত তাদের সমান বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে।

শুধু আধুনিক বিজ্ঞান শেখার বদলে তাকে কিছু অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগে দক্ষতা দেখাতে হবে। অন্য লোকের বাষ্পীয় পোত আর যান্ত্রিক কৌশল গ্রহণ না করে তাকে এমন বড় বড় আবিষ্কারকের জন্ম দিতে হবে যারা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। বিদেশী সাহিত্যে উপভোগ না করে তাকে সেই সাহিত্যে নতুন ধরনের প্রতিভার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। অন্যান্য দেশের জাতীয় বিবর্তন এবং বীর নেতাদের প্রশংসা করার পরিবর্তে নিজের মাটিতে জাতীয় বাহিনী গঠনের জন্য তাকে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে ও নিজের বীর নেতাদের জন্ম দিতে হবে।

বোধ হয়, শিল্পের মত আর কোন ক্ষেত্রে এটা বোঝা এত সহজ নয়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারায় অতি অপূর্ব শিল্পকর্ম জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তার পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে আধুনিক পরিবেশে। এখন হাজার হাজার তরুণ শিল্প-শিক্ষার্থী ইউরোপীয় ধরনে ক্যানভাসে রঙ চাপানোর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে এমন ভাবে ভাবধারাকে প্রকাশ ও কবিতাকে চিত্রিত করতে পারে, যা ইউরোপীয় হলেও আসলে কিছুই হবে না। এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা চাই কর্মীর দল, তারা পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অনুভূতিতে যে ধরন উপযুক্ত মনে করবে, সেই ধরনে একটা মহৎ অনুপ্রেরণাকে গ্রহণ করবে এবং তা প্রকাশ করবে। স্বভাবত উপাদানের দক্ষতা অর্জন করতে গেলে আমাদের প্রকৃতপক্ষে চাই শিল্পীর এক বিরাট গোষ্ঠী, জাতীয় শিল্প-আন্দোলন। সেটা কাজের পদ্ধতি দিয়ে চলবে না, জাতীয়তাকে গড়ে তুলেছে যে বাণী তাকে বহন করা চাই।

অন্য কথায় বলতে গেলে, দেশের সব কিছু মূল্যবান সম্পদ, তা জগৎ থেকে চলে যাবে, যদি না দেশের সন্তানরা ভারতকে ভারত বলে ভাবতে না পারে এবং শুধু এই ধারণার প্রকাশের জন্য বাঁচতে, কাজ করতে না শেখে।

এরকম জাগরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনাভিত্তিক আন্দোলনে থাকবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। চর্মচক্ষের দৃষ্টিতে মানুষের মুখে থাকে তার সমগ্র অতীতের ছবি। জাতীয় চরিত্র জাতীয় ইতিহাসের প্রতিফলন। আমারা যদি জানি, আমাদের পরিচয় কি, কোনদিকে আমাদের প্রবণতা, তাহলে পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হব। আর ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় ভারতীয় জনগণের খুব আকর্ষণ থাকা উচিত, কারণ এ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি, এমন কি এর বিষয়ে জানাও যায়নি।

ভারতীয় বিবর্তন-পদ্ধতির চেয়ে সুন্দর ঐতিহাসিক দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না, যদি তা ঠিকমত বোঝা যায়। স্থায়িত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের যে সুশৃঙ্খল পর্যায়ের মাধ্যমে প্রতি যুগের জাতীয়তায় নতুন উপাদান দেখা দিয়েছে, তা এত নিখুঁত হতে পারত না, যদি হিমালয় ও ভয়ঙ্কর তটরেখা একত্রে এই পরীক্ষার ক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত।

আগে থেকেই দুটি ভারত রয়েছে,—অশোক সাম্রাজ্যের অধীনে হিন্দু ভারত এবং বাবরের অধীনে মোগল ভারত, আর জনগণের দায়িত্ব রয়েছে তৃতীয় ভারত, জাতীয় ভারত গড়ে তোলার। এর আগের বা পরের সব যুগগুলিকে এর প্রস্তুতির যুগ, নব উপাদানকে নিয়ে আসা ও সার্থক করার যুগ বলে ভাবতে হবে। একথা আমরা পারছি। কারণ, ইতিহাস গতিশীল, এ কথা আজ স্পষ্ট। সে কখনো মরে না। যদি কোন জাতি একটা বিশেষ যুগে বিরাট আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধিগত কৃতিত্ব অর্জন করে, তাহলে তা ফুরিয়ে যায় না, তা জাতীয় শক্তিকে রক্ষা করে, বাড়িয়ে তোলে। যে কোন রকম দৈহিক পরিশ্রমে ব্যয়িত শক্তি ফুরিয়ে যায়; কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও তার বুদ্ধি-উজ্জ্বল সভায় যে শক্তি দেখা দিয়েছিল, তা সমগ্র জাতির চিরকালের সম্পদ। এ ক্ষেত্রে, প্রাপ্তি ও সম্ভোগের মধ্যে মেরুবৎ পার্থক্য। মহৎ শিল্প, মহৎ বিজ্ঞান যা বিশ্বধর্ম সৃষ্টির চেষ্টা কখনো মানুষকে ক্লান্ত করে না। যদি তারা ক্লান্ত হয়,

তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, ভাল করে খুঁজলে দেখা যাবে বিলাসিতা ও বাড়াবাড়ির বীজ আগেই ক্ষয় পাচ্ছে। জল একবার যেখানে উঠেছিল, বরাবর সেখানে উঠতে পারে। তেমন একটা জাতি একবার যে উচ্চতায় পৌছেছে, সেখানে আবার যেতে পারবে।

এইভাবে অতীত ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলে। বিদেশীকে নকল করে নয়, নিজেদের উদ্দেশ্যকে নতুন করে নির্দিষ্ট করে আত্মপ্রকাশের নতুন চেষ্টার মাধ্যমে—অর্থাৎ, জাতীয় পুনর্জাগরণের চেষ্টার দ্বারা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাস হল আশীর্বাদ—জাতির প্রতি সন্তানকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। মানুষের মন এ কথা এত গভীরভাবে বোঝে যে, একটি চরিত্রকে নিয়ে একটা ধর্ম গড়ে ওঠে—যেমন, 'ঈশ্বর সিংহ' আলি বা মার্টিন লুথার, বা ইগ্‌নেশিয়াস লোয়োলা বা চৈতন্য—সেই ধর্ম একটা জাতির বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করে। অতীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ নিজের নিজের ধর্মের জন্য যে আকুলতা দেখিয়েছিল, তা আবার একটা জাতির মধ্যে দেখা যাবে, যেখানে সব গোষ্ঠীর সাধকরা সাধারণ ভূমি খুঁজে পাবেন, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব ভারতের। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইসলামে পাই, আলির ব্যক্তিত্ব এবং তুলনীয় অপূর্ব ফতিমার ব্যক্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা। হিন্দুধর্মে রয়েছে সাবিত্রী, বুদ্ধ, সীতা, সম্ভবত শৌনকের চরিত্রের জন্য অনুরূপ আশা।

অবশ্য, জাতীয় সাধকদের তালিকায় এসব নাম ছাড়াও আরো এক হাজার নাম রয়েছে। সেখানে অযোধ্যার আসফ-উদ্-দৌলার পাশাপাশি শিবাজী রয়েছেন এবং রাজপুত, শিখ ও মারাঠাবীরদের কাহিনী আকবর ও শের শাহের কাহিনীর ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করতে পারে না। ভারতীয়রা নিজস্ব জাতীয় চরিত্রযুক্ত জাতি, এ বিষয়ে কি ভারতীয় জনগণের সন্দেহ আছে? নিজেদের সাহিত্য, মহাকাব্য, বীরত্ব, ইতিহাস দেখে কি তারা সন্দেহ করতে পারে? নিজেদের সম্পদের সঙ্গে তারা কি অন্য জাতির সম্পদের তুলনা করে? স্থায়ী ভারতীয় জাতীয়তায় নিজেদের শক্তি, ভূমিকা সম্পর্কে ইন্দো-মুসলিমদের কি সন্দেহ আছে? যখন সে ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্য, ভারতীয় রাজা, সৈনিক ও বীরত্বের ইতিহাস আলোচনা করে, তখন কি দেখে?

না, ইতিহাসের তাঁতেই জাতীয়তার জাল বোনা হবে। নিজের অতীতের দর্শনে ভারত নিজের আত্মার প্রতিফলন দেখবে এবং তার ফলে নিজেকে চিনতে পারবে। অতএব, জাতীয়তাকে পূর্ণ পৌরুষ ও সাহসে পৌছতে গেলে কোন্ কোন্ উপাদান প্রয়োজনীয়, এটা সে ঠিক করতে পারবে ইতিহাস আলোচনা করে।

২

অশোকের সঙ্গে আকবরের সাম্রাজ্যের তুলনা করে উভয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক একটা সমন্বয় আমরা দেখতে পাই, হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয়। বুদ্ধের বাণী এক শূদ্র রাজার হৃদয়ে আঘাত করে সেই যুগের বুদ্ধিভিত্তিক অধিকার তাকে দিল, ফলে, দেখা দিল ব্যক্তিগত আনুগত্য ও সম্রাটসুলভ সুযোগ, এর তুল্য ঘটনা জগৎ অল্প দেখেছে অথবা একেবারেই দেখেনি। অন্যটির ক্ষেত্রে, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগত ভাব ধারা এবং মানুষের মৈত্রী সম্পর্কে ইসলামীয় ধারণার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। এই দুই প্রধান তথ্যের আলোকে ভারতের সিংহাসনে চারজন মোঘলের আনন্দ যে অশোকের সঙ্গে তুলনীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

অদূর ভবিষ্যতের ভারতীয় জাতির ক্ষেত্রে আধুনিক চেতনার অধিকার লাভ করে গণতন্ত্র প্রধান অংশ নেবে, আর তার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা জোগাবে জাতীয়তার ভাবধারা।

ভারত ভাবধারার বাহক হওয়ার জন্য সৃষ্ট দেশ। এখানে কাম্য এমন কিছু নেই, যা শিক্ষাগত পদ্ধতির দ্বারা লাভ করা যায় না।

এখন, খাঁটি সামাজিক অচলায়তনকে গলাবার মত কিছু বার করার চেয়ে কাম্য আর নেই। দুটি সম্প্রদায়ের মাঝের পাঁচিলের সব শক্তি নির্ভর করছে এ সম্প্রদায় গুলির সদস্যরা পাঁচিলকে কতটা মূল্য দেয়, তার ওপরে এবং কাল্পনিক আত্মছলনাকে দূর করার পক্ষে তথ্য জানার মত কিছু নেই। এই কারণে, যথার্থ মূল্যবান ভারতের ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন সমাজতত্ত্বে বিশেষ শিক্ষা। যখন নির্দিষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায়, তখন দলাদলি ক্রমশ থেমে যায়। জাতিভেদপ্রথাকে প্রশংসা বা নিন্দা করার চেয়ে তাকে বোঝা নিশ্চয় অনেক ভাল। কোথাও সম্প্রদায়ভিত্তিক, কোথাও পেশাভিত্তিক, কোথাও বা প্রবাস যাপনের সময় ভিত্তিক হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায়, এর তাৎপর্য বহুমুখী। এর মধ্যে রয়েছে, অলিখিত ইতিহাস এবং অজস্র লোক সঙ্গীত এর স্থানগত বিভেদ এত অগণ্য যে, সমগ্র জাতি নিয়ে গঠিত একটা পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ লাগবে এর হিসেব করতে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, জাতি ভেদের সীমাবদ্ধতা কোন মতে এক হতে পারে না। তবে অন্যান্য দেশের মত এখানেও আমরা অনুরূপ প্রথার ইতিহাসের দ্বারা উদ্ভব বৃদ্ধির নিয়ম জানতে পারব, ভারতীয় জাতিগুলির সম্বন্ধে আশা অথবা নিরাশা পোষণ করতে পারব।

কোথায় একটা প্রথাকে মাতৃতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক বা আদিম বলতে হবে তাও যে জানা দরকার সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্থানের সঙ্গে কাজের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেটাও বোধ হয় বোঝা দরকার,—কিভাবে নদীর তীর বা সমুদ্রতীর জেলেদের, উর্বর ভূমি কৃষকদের, মরুভূমি ও উঁচু জমি রাখালদের, অরণ্য-পর্বত শিকারী, আরণ্যক, খনিকর্মীদের তৈরি করে এই নির্দিষ্ট ধারণা মনে নিয়ে আমরা ভারতের ইতিহাস উন্মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এখানেও আরো কিছু দরকার। ভারতের

বাইরে জগৎকে একটুও না জানলে আমরা ভারতের কতটা জানতে পারব? পার্সিপলিস, পেত্রা, ব্যাবিলন, চীন এদের কথা, এদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা না জানলে কি করে প্রাচীন পাটলিপুত্র সম্বন্ধে সত্য তথ্য জানব? অথবা কোলোন, চার্ট্রেসের কথা, ডারহাম, মিলানের কথা না জানলে বারাণসীর উদ্ভব ও তাৎপর্য কি করে বুঝব? খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের কথা কখনো না ভাবলে হিন্দুধর্মের ইতিহাসের অর্থ আমাদের কাছে কি?

তাহলে প্রাগৈতিহাসিকের আলোচনাতেও তুলনামূলক পদ্ধতির দরকার। প্রাচীন যুগের ভারতকে পুনর্গঠিত করতে হলে আমাদের তার পাশে ফিনিশিয়া, মিশর, ক্যালডিয়া ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্যও তৈরি থাকতে হবে। আমরা অধঃপতিত আধুনিকরা রেলপথের সাহায্য ব্যতীত জগৎ আবিষ্কার করতে পারি না, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের মত ছিলেন, এ কথা ভাবার দরকার নেই। যে কোন ছাত্রকে দেওয়ার পক্ষে প্রথম যুগের আন্তর্জাতিক চেতনা হল অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় এবং তার জন্য সে যতই পরিশ্রম করুক, নিশ্চয় তার যথেষ্ট মূল্য পাবে। কাজেই ভারতীয় ঐতিহাসিককে শুধু সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং সভ্যতার উন্নতিসংক্রান্ত পরিচিত তথ্য জানলেই চলবে না; প্রাচীন সাম্রাজ্যের গঠন ও গতিবিধি সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা সম্বন্ধেও তার পূর্ণ অবহিত থাকা দরকার। এখানে আমরা ইতিহাসের শক্ত জমিতে এসে পৌঁছলাম। পুরাতত্ত্ব প্রতিদিন অতীতকে প্রকাশ করছে মিশরে, ক্যালডিয়ায়, হিটাইটদের প্রাচীন রাজত্বে, ক্রীটে, নোসোসে। ভারত প্রাগার্য দ্রাবিড় যুগে, অথবা দ্রাবিড়োত্তর আর্য যুগে পৃথিবীর অঙ্গ ও এইসব রাজত্বকালের অঙ্গ ছিল। অশোক নিজে তাঁর যুগে আধুনিক ছিলেন, এক অলিখিত, বিশাল, অথচ সম্ভবত স্মরণীয় ইতিহাসের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভারত নিজে এই অতীত সম্বন্ধে কোন্ কথা বলবে?

অলস লোক হয়ত নিশ্চিন্তে জবাব দেবে যে, এসব সমস্যা নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা কাজ করছে। তারা কাজ করছে না। কিন্তু যদি করত, তাতে ভারতের মানুষের কি বলবার থাকত? ভারত-ইতিহাসে অজস্র সমস্যা, অগণ্য কর্মধারা দে[illegible]য়েছে, যার বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা অন্ধ ও বধির। কিন্তু তা যদি না হত, তবুও [illegible] সমস্যার কথা ভাবে, বা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লেখার মত অন্যদেশীয় পাণ্ডিত্য [illegible] আছে, সেও দেখা যেত উচ্চতর গবেষণার প্রাথমিক শর্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ। এরকম কাজের প্রথম ও সবচেয়ে দরকারী বস্তু হল হৃদয়, গভীর ভালবাসা, শিশুর অন্তর্দৃষ্টি। কোন বিদেশী এ বিষয়ে গর্ব করতে পারে না। তার পরিবেশও এমন নয় যে, জীবনে[illegible] প্রবাহে ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের সূত্রগুলিকে অবিরাম চিন্তার সাহায্যে গুছিয়ে তুলতে পারবে। ভারতের অর্ধেক ইতিহাস লেখা রয়েছে ধর্মীয় ও গার্হস্থ্য প্রথায় বিদেশীরা এর কতটা জানে? সে প্রথা, জাতীয় প্রবাদ, শিষ্টাচার, ধর্মতত্ত্বের কি জানে? যদি এসব শেখার পথ উন্মুক্ত থাকে, তবু ভবিষ্যতে অতীতের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার নির্ভুল পথনির্দেশের জন্য আশা কই?

তার নিজের অতীতের যে কাহিনী শোনার জন্য তার মাতৃভূমি অপেক্ষা করছে,

সে কাহিনীতে আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডের সঙ্গে প্রাচীন লেখকের মহাকাব্যিক উৎসাহের সমন্বয় ঘটা চাই। সে কাহিনী উপকথাকে সহজে উড়িয়ে দিতে পারলেও ঐসব উপকথার মধ্যে প্রায়ই যে সত্যের মূল থাকে তাকে গ্রহণ করতে জানা চাই। বাহ্যিক জগতের জ্ঞানের সাহায্য ও সজ্জা নিয়েও সে কাহিনী হয়ে উঠবে ভারতবর্ষের কাব্য, গাথা। সর্বোপরি, তার সমাপ্তি অতীতে হবে না, ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশের উপায় তার জানা চাই। সে শুধু স্মৃতিকথা হবে না, নির্দেশকও হবে। সে শুধু বলবে না "মনে রাখো, চুপি চুপি বলবে", "সিদ্ধান্ত নাও!" সে শুধু সমালোচনা করবে না, তাকে দীপ্ত, গর্বিত, গঠনমূলকও হতে হবে। বিদেশী পণ্ডিত বিবরণ, স্মৃতিকথা, ইতিহাস লেখে, কিন্তু এই দেশের আপন সঙ্গীত কি তার আপন লোক ছাড়া কেউ গাইতে পারে?

নতুন হিন্দুধর্ম

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি নতুন যুগ হিন্দু পূজায় একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করে। যে ধারণাগুলি আমাদের ছোটবেলা থেকে ঘিরে থাকে, সেগুলি ভূতাত্ত্বিক স্তরের মত একটির ওপরে আরেকটি বিন্যস্ত, প্রতি স্তরে সংশ্লিষ্ট যুগের চিহ্ন রয়েছে। বর্তমান সঙ্কটের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের ধর্ম, চিন্তা ও প্রথায় চিহ্ন রেখে যাবে। অবশ্য এটা বোঝা যায়, নতুনকে স্থায়ী হতে হলে পুরনোর ওপরে গড়ে উঠতে হবে। তাকে উন্নত করতে হবে, আবিষ্কার নয়। এই জন্য আমরা লক্ষ্য করছি না যে, আমরা নতুন হিন্দুধর্মের মাঝে রয়েছি। নতুন হিন্দুধর্ম সেই সনাতনধর্ম, শুধু তার প্রকাশ ও প্রয়োগ নতুন। যখন আমরা বিবেকানন্দের মহৎ বাণী পড়ি, তখন তা আমাদের শৈশবে ঠাকুমার মুখে শোনা কথার এত অনুরূপ মনে হয় যে, আমরা ভুলে যাই, এসব কথা বিদেশী জনগণের মাঝে, অচেনা লোকদের বলা হয়েছিল। আমাদের ধর্ম এখন জগতের কাছে তার ন্যায্য স্থানের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—নিজে অনুগতদের খুঁজবার জন্য সে পৃথিবীর শেষ সীমায় যেতেও প্রস্তুত—এই ঘটনাই তো একটা অত্যন্ত গভীর ও অনুসন্ধিৎসু বিপ্লব। তাছাড়া, কেউ একে অস্বীকারের যে চেষ্টা করছে না, এও তো বিপ্লব। সারা জগৎ স্বীকার করছে যে, এরকম ঘটেছে। কিন্তু যথার্থ বিপ্লব শুধু নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত থাকে না। এ যেন জলে পাথর ছুঁড়লে প্রথম যে বৃত্ত হয় তার মত। ক্রমশ অন্য বৃত্তগুলি রচিত হতে থাকে। সেরকম, যে সমাজে বিপ্লব ঘটে, সেখানে প্রতিটি বিপ্লব হল নিয়মবদ্ধ পরিবর্তনের সূত্র, একটার পর একটা বিপ্লবে গৌণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে, শেষে যুগের অন্তে এগুলিকে গ্রাস করে পরবর্তী যুগ তার পারমাণবিক শক্তি দিয়ে এগুলিকে নতুন শক্তি দান করে।

জাতীয় আকারের আন্দোলনের পেছনে একটা নতুন দার্শনিক ভাবধারা থাকা চাই, অবশ্য সে ভাবধারা শুধু বাহ্যত নতুন হবে, আসলে তা জনগণের পূর্বপরিচিত সব ভাবধারার এক বিশাল গতিশীল সংহত রূপ ও পুনর্জাগরণ। সেই ভাবধারায় জাতি সগর্বে ও সানন্দে তার আপন জাতীয় প্রতিভাকে চিনে নেয়। প্রত্যেকে জানে, এই জাতীয় সম্পদের গঠনে, উন্নতিতে ও সংরক্ষণে তার এবং তার পূর্বপুরুষদের দান আছে। আত্মনির্ভরতার রোমাঞ্চ সমগ্র জাতি অনুভব করে। তাদের পা মজবুত হয়, মাথা উঁচু হয়, প্রথম তারা নিজেদের মধ্যে বিপুল শক্তির আলোড়ন অনুভব করে।

পনেরো শো বছর আমাদের সব বইয়ের মধ্যে গীতা জাতীয় গ্রন্থ হয়ে আছে। আজ এই নব আবিষ্কারের মত জাতীয় পুনর্জাগরণের বাণী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই নবীনতা চোখের ভুল মাত্র, তার কারণ, আজ প্রথম আমরা জগতের অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে এর সমগ্রতা দেখতে পেয়েছি। তার ফলে দেখছি, সে একক। বইটির যে অংশ খুলি, দেখি সেখানে রয়েছে সর্বব্যাপী অস্তিত্বের কথা, বহুর মধ্যে স্পন্দিত একের কথা, নামহীন, অপরিমেয় যে অনন্তকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, অথচ যা সব রহস্যের সমাধান করে, সব যুক্তি দান করে তার কথা। অন্যান্য ধর্মমত আংশিক

অভিজ্ঞতা ও আবেগের কথা বলে ; এখানে আমরা রয়েছি সর্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপী পূর্ণের ভূমিতে। মাত্র ছ' সপ্তাহ এই বই পড়ে মার্কিন এমার্সন যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "ওভার-সোল" নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ধর্মের মত এমন বিরাট কৃতিত্ব যদি জাতীয় প্রতিভারা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখাতে পারে, তাহলে ভারতীয় মনের শক্তির সীমা কোথায় ? "যে অজস্র লোক আমাদের বিরোধী তাদের সকলের চেয়ে একজন সঙ্গী বড়।"

কিন্তু শুধু ধর্মীয় দর্শনের ক্ষেত্রেই যে বর্তমান যুগ আর তার সমস্যা অবিস্মরণীয় ছাপ রাখবে, তা নয়। আনুষ্ঠানিক জীবনেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দু পূজায় কিছু বাস্তব ও সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক প্রকাশভঙ্গীর প্রয়োজন। হাওড়া সেতুর পাশের গাছের নীচে যে নৈশ উপাসনা হয়, তার জনপ্রিয়তার পেছনে কারণ হল, এখানে অচেতনভাবে ঐ প্রয়োজন সাধিত হয়। বাঙলাদেশে চৈতন্যের সাফল্যের একটা বড় কারণ তাঁর সঙ্কীর্তন, লোকেদের গান, আনন্দোন্মত্ত নাচ মানুষকে আত্মপ্রকাশের পথ করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সংগঠিত উপাসনা তাদের জনপ্রিয়তার বড় ভিত্তি।

খ্রীষ্টীয় গীর্জার সব অংশ হিন্দু মন্দিরে রয়েছে, এতে বোঝা যায়, খ্রীষ্টধর্মের স্থাপত্যও এসেছে প্রাচ্য থেকে। কিন্তু সংগঠিত সহযোগিতার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান জনগণের জাতীয় প্রতিভা তাদের উপাসনায় দেখা যায় এবং নাটমন্দির বা সঙ্গীতদল থাকে প্রকৃত উপাসনাস্থলের ঠিক সামনে, আর জনসাধারণের বসার জায়গা থাকত নাট-মন্দিরের সামনে। সব কিছু একত্রে থাকে এক ছাদের নীচে, বাড়িটা নাটমঞ্চের কাছে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, ফলে ঐ মঞ্চ এবং উপাসনাবেদী থাকে আলাদা, আর জনগণ থাকে তার পায়ের নীচে। এই ব্যবস্থার ফলে বাড়িটা যে দিক থেকে দেখি, তা ধীরে ধীরে বেদীর দিকে উঠে যায় এবং জনগণ যত দূরেই থাক, প্রতি প্রার্থনা-অনুষ্ঠান ও উপাসনায় অচ্ছেদ্য, প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে ওঠে।

আমাদেরও এমন উপাসনার আয়োজন করা উচিত যেখানে জনগণ প্রয়োজনীয়, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয়ে সংগঠিত উপাসনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে পারে। এজন্য, আমাদের পুরনো অনুষ্ঠানগুলিকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং পুরোহিতরা সব অনুষ্ঠানের একমাত্র ধারক ও চালক হওয়ার আগে সেসব অনুষ্ঠানের প্রাচীন জটিল অর্থ ফিরিয়ে আনতে হবে। কালক্রমে এই নতুন প্রবণতা নিশ্চয় আমাদের ধর্মীয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করবে। আমাদের কাছে অবশ্য এই মুহূর্তে এর কোন মূল্য নেই, কারণ, এটা শুধু কাজের ফল। আমাদের ভাবতে হবে কারণকে গতিময় করার কথা। যেমন, পারিবারিক উৎসবে, পরিবারের বিভিন্ন লোক—বাবা মা, মেয়েরা, অন্য সকলে, শাশুড়ী, ননদ প্রত্যেক্যের নির্দিষ্ট কাজ আর বিশেষ অংশ থাকে, তেমন এই ভবিষ্যতের নাগরিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানে নানা শ্রেণীর লোককে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখানে কলকাতায় নাগরিকসভার কল্পনা করতে পারি না, যে সভায় পুরসীমানার প্রদক্ষিণ ঘটতে পারে, কোন বিশেষ পবিত্র স্থানে হোমের আগুন জ্বালা হতে পারে, যদি না কলকাতার সব অংশ সেখানে উপস্থিত

থাকে। যদি একটা মহান পুরসঙ্গীতে ভবানীপুর, এণ্টালী, বড়বাজার ও অন্যান্য জায়গার লোকেরা যে যার দলের ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে এক-একটি স্তবক গায় এবং প্রতি স্তবকের শেষে থাকে সারা শহরের একতার কথা, তাহলে তার চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না।

নাগরিক মিছিলে প্রদক্ষিণ ও সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সেই প্রদক্ষিণের মূল্য বোঝা যায়। এরকম অনুষ্ঠানে আলো, পতাকা, শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, পুষ্পস্তবক, গঙ্গাবারি বিতরণ, সব কিছুরই স্থান রয়েছে। এই অনুষ্ঠান গড়ে তোলা, তাকে নতুন ও অদৃষ্টপূর্ব তাৎপর্য দান করা অতএব কঠিন হওয়া উচিত নয়। হিন্দু বিবাহের সুন্দর অনুষ্ঠান তাৎপর্যে ভরা। বই থেকে মূল বক্তব্য ও প্রার্থনা প্রশ্ন এবং উত্তরের আকারে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের জবাবে দু দল উপাসক যদি আবৃত্তি করে, তাহলে এই গণ-উপাসনার ধারা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। প্রার্থনা-নাট্যানুষ্ঠান উপাসকদের সংগঠিত করে একটা সাম্প্রদায়িক ভাবধারা গড়ে তোলে। এইসব অনুষ্ঠানে ভারতীয় পৃথিবী, জল ও পতাকা শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে তাদের সহজ সৌন্দর্য ও করুণভাবে আমাদের হৃদয় জয় করবে। এ বিষয়ে আমরা আর আলোচনা করতে পারব না। সুতরাং সকল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের আহ্বান জানিয়ে এ বিষয় তাদের বিবেচনার ওপরে ছেড়ে দিচ্ছি।

স্বাধীনতার তত্ত্ব

মুক্তি ব্যতীত আর কিছুতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। তবু ব্যক্তি চিরকাল সব ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। এই যে স্বাধীনতার সংগ্রামকে সে বুঝতে পারে, এর দ্বারা সে নিজেকে চরম প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত করে, তার ফলে একদিন সে চরম স্বাধীনতা বা মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষুদ্র রূপ সেই সর্বাতীত মুক্তির প্রতীক, তাই যারা একে বোঝে না, তাদের শ্রদ্ধার পরেও এর সমান দাবি, যেমন যারা ঈশ্বরের মূর্তি উপাসনা করে না, তারাও একে শ্রদ্ধা করে। বিনা সংগ্রামে যে স্বাধীনতা পায়, সে ভ্রান্ত, কারণ সে মুক্তির দ্বারের পাশ দিয়ে চলে যায়।

যে কোন ধরনের স্বাধীনতা উপস্থিত থাকলে তার প্রকাশের দুটি পথ আছে। পথ দুটি হল, ত্যাগ ও জয়। যাকে আমরা জয় করব, তাকে আগে আমাদের বুঝতে হবে। সেই বস্তুর অন্তরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে, স্বীকৃত পথে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, আমাদের সমস্ত জীবন তাতে নিবেদন করে শেষে জয়ী হতে হবে। প্রতিটি সাফল্যে অন্ততঃ একজন মানুষেরও আত্মত্যাগ থাকে। প্রভুত্ব এক জাতীয় স্বাধীনতা। যে আমাদের শক্তি দ্বারা আয়ত্ত করে, তাকে আমরা পরাজিত করতে পারি না।

যা আমরা জয় করি নি, তাকে আমরা ত্যাগও করতে পারি না। যে বস্তু স্পষ্টত আমাদের চেয়ে বলবান, তার বিষয়ে আমরা স্বাধীন হতে পারি না। ত্যাগে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করি, কারণ, ত্যাগে আমরা শক্তি ও দুর্বলতা উভয়কে অতিক্রম করে যাই। কিন্তু এই দুটি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না যে, একটি গভীরতর বন্ধনে নিচের দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যটি বাইরে মুক্ত বাতাস ও মুক্তিতে নিয়ে যায়; কোন্‌টি কি কাজ করে, সে বিষয়েও কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। ত্যাগের প্রয়োজনীয় পূর্বস্তর হল জয়। যে কোন যথার্থ ত্যাগ হল মুক্তির পথে পদক্ষেপ।

মানুষ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে, এ হল তার জীবনব্যাপী সাধনা। এ কাজ না করলে সে মানুষ নয়। সে জড়, নির্বোধ, মাতাল বা অলস হতে পারে। সে স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলে। কিছু লোক শুধু নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তারা নিজেদের ইচ্ছা বা বাসনাকে ঈশ্বরের স্থানে বসায়। এরা হল অপরাধী, পাগল, সমাজের ব্যর্থতা। এদের মধ্যে কখনো কখনো আমরা শিশুর প্রকৃতি দেখতে পাই। শিশুর কাছে ভাল ও মন্দে বিশেষ পার্থক্য নেই। সে খাবার চুরি করে, ফুল তুলে বা প্রজাপতি ধরে একই তৃপ্তি পায়। তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় সে সমগ্র মন ঢেলে দেয়, অথচ সে মন ভালবাসা ও ভালবাসা পাওয়ার শক্তিতে ভরা। যে অপরাধীরা সাধু হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে যারা জগাই ও মাধাই, তারাই এই শিশুমনের শ্রেণী। যথার্থ অপরাধী তামস ও দম্ভে ডুবে থাকে। সে যথেচ্ছাচারকে ভুল করে স্বাধীনতা বলে। যথেচ্ছাচার স্বাধীনতা নয় শুধু এই কারণে যে, প্রকৃত স্বাধীনতায় প্রভুত্ব থাকে। যথেচ্ছাচারী নিজের দোষের শিকার হয়। সে তার কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। সে নিজের বাসনাকেও উপভোগ করতে পারে না। অদম্য বাসনা ও অদম্য ভয়ের মাঝে বন্য জন্তুর মত তার জীবন কেটে যায়। যে স্বাধীন হবে, তাকে আগে সংযম শিখতে হবে। যে অসংযত, সে মোটেই স্বাধীন নয়।

যার ইচ্ছা উপযুক্ত সে স্বাধীন মানুষ। ইচ্ছাকে প্রথম যে শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় সে হল অজ্ঞতা, দ্বিতীয় শত্রু হল, অসংযত আবেগ। এসব যাতে সংযত হয়, সেজন্য আমরা দেহে দুর্বল হলেও বুদ্ধিগত শিক্ষা গ্রহণ করে দেহে পরিণত হয়ে আমাদের জাতির আদর্শের জগতে প্রবেশ লাভ করি। মানবজাতির জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে আমরা সংযত হয়ে চলে দেহকে পদানত রাখি; আমাদের দুর্বলতা বা স্থূলতা থেকে মুক্ত আদর্শকে দেখ এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সফলতার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা কর। পরিশ্রম করা, দেখা, কামনা করা ও লাভ করা, এই চার রকম ঋণ আমাদের জন্মগতভাবে পিতৃপুরুষদের কাছে রয়েছে। মানুষকে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে! যেহেতু সম্ভাব্য সফলতা ছাড়া প্রচেষ্টা বাড়ে না, অতএব, সে প্রায়ই সফল হয়। যে সময়কে সে স্বপ্ন দেখার উপযুক্ত মনে করে, সেই সময়ের পরে তাকে সংগ্রাম করতে হবে। বাইরে থেকে তার প্রচেষ্টায় কোন নিয়ম, সময়সীমা বা গণ্ডী আরোপ করা যায় না। অবিরাম কাজের দ্বারা নিজের ক্ষমতা বাড়াতে, অবিরত সংগ্রামে উত্তরাধিকারকে পরিণত করতে মানুষের জন্ম হয়েছে। তারা সীমাকে অতিক্রম করতে জন্মেছে। ঈশ্বরের নির্দেশই এইরকম যে, মানুষ ভাগ্যের সম্মুখীন হবে শুধু তাকে পরাজিত করে

তার প্রভু হওয়ার জন্য, অসম্ভব তার কাছে সম্ভব হবে, মানবজীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম হল, প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

দলীয় রাজনীতি বলে একটা বস্তু আছে। সেও ব্যক্তি-মানুষের আধ্যাত্মিক দাবি, মুক্তির জন্য তার আশাভিত্তিক সংগ্রামের অধিকারকে মেনে নেয়।

রাজনৈতিক সংগঠন যেসব অংশ নিয়ে গঠিত, সেখানে সে নতুন এবং জটিলতর বস্তুর সমাবেশ ঘটায়। রাজনৈতিক পরিবেশে আমাদের নতুন অধিকার, নতুন দায়িত্ব, নতুন উচ্চাশা দেখা দেয়। আবার, প্রাণপণ কাজ, যথাসাধ্য আত্মত্যাগ, আমার সেবা করার, আমার কষ্ট পাওয়ার, আমার ভালবাসার যে আত্মিক অধিকার, শ্রেষ্ঠ, বৃহত্তম ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা, তাকে পৃথিবীর কেউ তুচ্ছ করতে পারে না, একমাত্র আমার ভাই এই কাজগুলি আমার সমান বা আরো বেশি মহত্ত্ব সহকারে করতে পারে। যদি তার মধ্যে এই শক্তির দেখা পাই, তাহলে, যেহেতু আমি আদর্শকে পূজা করি, নিজেকে আদর্শের প্রকাশ বলে পূজা করি না, অতএব তার চরণ মাথায় নিয়ে তাকে অনুসরণ করব। কারণ, নিজের চেয়ে তার মধ্যে আমি আদর্শকে বেশি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এইভাবে জ্ঞান ও প্রেমের সহাবস্থানে জগতের কেউ বাধা দিতে পারে না। নাগরিক ও এক মায়ের অনুগত সন্তানরূপে ভাইদের এই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কর্তব্যপালন ও মায়ের উদ্দেশে জীবনদানে কারোর বাধা দেওয়া চলবে না। যদি কেউ স্বার্থরক্ষায় বা দেশের কল্যাণ কাজে রত কিছু লোকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্য-কলাপ করে, তাহলে সে বিশ্বাসঘাতক এবং সমগ্র রাজনীতির চাপে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু কোন শ্রেণীর জন্য তার কাজে যদি দেশের প্রতি ভালবাসা প্রধান হয়, তা হলে তা জাতীয় মঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা সেবা, বিশ্বাসঘাতকতা নয়। জাতির প্রাণপণে দেশের সেবা করার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, এটিই জাতির একমাত্র কর্তব্য। দেশের সেবা করে সে নিজেকে উন্নত করে। মানবতার ও জগতের ঋণ পরিশোধ করে। সে নিজের মাকে আবার সৃষ্টি করে। শিশু ও তার মার মাঝে কেউ এসে পড়লে তাকে পরাজিত করার অধিকার শিশুর আছে, যে কোন বস্তু, যা তাকে প্রাণপণ মায়ের সেবায় বাধা দেয়, যেখানে তার সন্তানের জন্মগত অধিকার সেখানে তাকে ভৃত্য বা দাস করে তোলে।

কিন্তু দলীয় রাজনীতির এই দায়িত্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে। জাতি এবং জাতির অঙ্গস্বরূপ ব্যক্তি দেশের সেবা করবে; কিন্তু তা বিচ্ছিন্ন হয়ে বা সম্বন্ধহীন হয়ে করবে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা এ সত্যকে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিলেন। জাতিভেদের মূলে এই ধারণাই অত্যন্ত প্রবল। এ কথা সত্য যে, আমরা জাতির অর্থ ভুলে গিয়েছি। আমরা জাতিকে কর্তব্যসাধনের উপায়রূপে না দেখে একে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বাধা বলে দেখি। অবনতির যুগে লোক যখন নিষ্ক্রিয় হয়, নিশ্চলতার ক্ষয়ে পতিত হয়, তখন এরকম ঘটে। এরকম জড়তা থেকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে পারে, এরকম যে কোন আঘাতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা যদি অধিকারকে কর্তব্য বলি এবং এই নতুন কথাটিকে মূল সূত্র রূপে প্রয়োগ করি, তাহলে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমরা, ভারতের

সন্তানরা জাতি অনুযায়ী সংগঠিত হয়ে একদা নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ব-বিভাগ করে প্রতিটি দলকে তার পক্ষে অল্পবিস্তর উপযুক্ত কাজ সফলভাবে দিতে পারি কিন্তু কারোর গৃহে স্বাচ্ছন্দ্য, নিজস্ব ধরনের সুখ এবং নিজস্ব ধারায় আত্মপ্রকাশে বাধা দেওয়া হয় না। জাতিভেদ প্রথা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের বিদ্যালয় ছিল, আজও পর্যন্ত এই প্রথা আমাদের ব্যক্তিগত মতের সমন্বয় এবং তার প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য শোভনতাকে মূল্য দেয়।

কিন্তু এ যুগে সব জাতি একত্রে হিন্দুধর্মের সামাজিক রূপ গড়ে তোলে, হিন্দুধর্ম আর এখন জাতীয় ঐক্যের বিরোধী নয়। একদা অপরিচিত বহু উপাদান এখন এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, যে কোন উপযুক্ত প্রগতিশীল বস্তুর মত হিন্দুধর্ম আকারে ও জটিলতায় অনেক বড় হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে, রক্ষণশীলতার একটা নির্দিষ্ট সাধারণ ভিত্তিভূমি, মুসলিম যুগের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী, বর্তমান যুগের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীগুলি। এইসব অংশগুলিরই হিন্দু নামে সমান অধিকার রয়েছে। সেরকম হিন্দু, জৈন ও মুসলমানের ভারতীয় নামে সমান অধিকার রয়েছে। জাতীয় একতা স্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভাষা, সম্প্রদায় বা প্রথার ভিত্তিতে নয়, যেটা অনেকের বিশ্বাস, এর ভিত্তি দেশ। সন্তানের স্বার্থ দেশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, কাজেই, তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কাজ হল, নিজেদের ঐক্যচেতনায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা। অবচেতন মনকে আমাদের এই চিন্তায় ভরে তুলতে হবে। এই চিন্তাকে এমনভাবে আমাদের অংশ করে তুলতে হবে, যাতে আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি-ক্রিয়া দেখা দেবে। রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রয়োজনীয় পূর্বস্তর হল, দলীয় রাজনীতির নিখুঁত সামঞ্জস্য ও মানসিক সংলগ্নতা, যাকে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা বলি, সেই আপেক্ষিক কল্যাণের এটা আরেক নাম।

এমন এক যুগ ছিল, যখন মানুষের পরিবার ছিল না। পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশ্বস্ততা ও একটানা সহযোগিতা তার ছিল না। এখন আমরা রক্তে পারিবারিক সম্মান নিয়ে জন্মাই। কনিষ্ঠতম শিশুও বাবা-মার ওপরে আক্রমণ দেখলে কাঁপে, দুর্বলতম লোকও বাড়ির লোকদের ওপরে বহিরাগতের আক্রমণ দেখলে বাধা দেয়। আমরা সবাই গৃহকর্তার প্রতি অনুগত, সবাই অন্যদের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগের আনন্দ অনুভব করি। আমাদের আদর্শ হল সাধ্বী স্ত্রী, নিষ্কলঙ্ক বিধবা, স্নেহময়ী কন্যা। মা পুত্রের জীবনের প্রধান আকর্ষণ। বাবার গম্ভীর মাধুর্য অজস্র দিনের বরণীয় স্মৃতি। জীবনের যুদ্ধে নিজের জন্য সংগ্রাম প্রিয়জনদের জন্য সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়।

এমন যুগ আসবে যখন মানুষ দেশের চিন্তায় এরকম দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হবে। পরিবারের প্রতি আমাদের অনুভূতি জাতি ও মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যের মাপকাঠি। এক জায়গায় যা পেয়েছি তাই দিয়ে আমরা অন্য জায়গার প্রাপ্তির অনুমান করতে পারব। আমরা আত্মোপলব্ধির বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছি। পরিবারের শিক্ষা গ্রহণ

করে এবার আমাদের জাতীয়তার শিক্ষা নিতে হবে। ব্যক্তি যেমন একটির উপাদান, তেমন তাকে এবার অন্যটিরও উপাদান হতে হবে। যে আত্মশক্তি তার মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে, সে শক্তিকে এমন এক পরিবর্তনের বিন্দু খুঁজে নিতে হবে, যেখানে তা দেশপ্রেমের শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এটা যেন নেকড়ের দলের আক্রমণের নামমাত্র না হয়, একে মহৎ, পবিত্র ভালবাসার দ্বারা উন্নীত, উত্তীর্ণ করতে হবে। মা ও সন্তানের প্রতীকের আড়ালের আধ্যাত্মিক সত্য হল প্রেম। এমন কি জীবন্ত মানুষ-মা তার অনন্ত ভালবাসার বাহ্যিক, প্রত্যক্ষ প্রতীক। মাতৃভূমিরূপে যে মহত্তর ভালবাসার প্রকাশ, তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? বলা হয়ে থাকে যে, একটি বিবাহের সব সন্তানদের মধ্যে যে বন্ধন সেরকম বন্ধন আর কিছু হয় না। তাহলে একই দেশের সকলের সঙ্গে ভালবাসায় আমরা কি এক হতে পারি না? মানুষের মস্তিষ্ক খাদ্যের শারীরিক শক্তিকে চিন্তার আত্মিক শক্তিতে যেমন রূপান্তরিত করে, তেমন প্রতিটি ভারতীয়কে ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতার সংগ্রামের রূপান্তরের উপকরণ হতে হবে। সে সংগ্রামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন ও চরিত্র মহত্তম প্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হবে তাদেরই জয় হবে—যতোধর্মস্ততো জয়ঃ।

অবশ্য অস্পষ্ট আবেগ যথেষ্ট নয়। আমাদের ভালবাসার বস্তুর জন্য সেবা করতে ও কষ্ট পেতে হবে। পরিবারকে আমরা কিভাবে সেবা করি, তার জন্য কিভাবে কষ্ট পাই? যে ঐক্যের লক্ষ্যকে যন্ত্রণা ও আনন্দের নেহাই-এর আঘাতে আকার দেওয়া হয়নি, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করব? আমরা দেখেছি, একটি শিশুকে স্বাধীন করার জন্য—সে যাতে যোগ্যভাবে, মুক্তভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে—সে জন্য তাকে শাসনে রাখা হয়, আশা করা হয়, সে জ্ঞানের জন্য সংগ্রামে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। জাতীয়তার সংগ্রামে এই পদ্ধতিকে আমরা কিভাবে স্বীকার করব? আমরা বাড়ির বাইরে পরিবারের মত দৃঢ় বন্ধন রচনা। করতে চাই। এটা কিভাবে করা যায়? আত্মীয়তার ঐক্যের জন্য সহযোগিতার সংগঠনের পরিবর্তে আমরা নতুন নীতি সৃষ্টি করতে চাই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা কি করে বোঝানো যায়? কিভাবে তাকে তার শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? যে সূত্রের সাহায্যে আমরা রহস্য সমাধানের আশা করি, তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোন্ প্রতীক আমরা সৃষ্টি করতে পারি।

প্রথম যে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তা হল ন্যায্যভাবে সংগঠিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য। এটা পিতার প্রতি আনুগত্যের অনুরূপ নয়। সেখানে থাকে ভালবাসার বন্ধনের সঙ্গে আত্ম-অধীনতার প্রবণতা। এখানে পিতা তাঁর স্নেহকে বজায় রেখেই কর্তৃত্ব চালনা করেন। আমরা আরো শিখব যে, বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের আনুগত্যের প্রয়োজন, সে আমরা মন থেকে চাই বা না চাই। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি না, তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘটতে পারে না। কিন্তু যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, অথচ ভালবাসি না, তার প্রতি দৃঢ় আনুগত্য সম্পূর্ণ শিক্ষার পক্ষে খুব দরকারী। বিদ্যালয়-শিক্ষক, মনিব, জাহাজের ক্যাপ্টেন, স্টেশন মাস্টার, অভিযানের নেতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে বহুভাবে এই শিক্ষা পাওয়া

যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব থাকে। যার দায়িত্বে আমরা আছি এক মুহূর্তের মধ্যে তার অধীনতা স্বীকার করতে আমাদের শিখতে হবে। দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষকে এখানে গ্রহণ করা যায় না, কারণ, তা অবৈধভাবে গঠিত ও আত্মিক অরাজকতার তুল্য। বৈধ কর্তৃত্ব আপন দায়িত্বে চালিত হয়, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। সম্পূর্ণ আনুগত্য এই বস্তুরই বিপরীত দিক, এর পরিপূরক, এই দুটি বিপরীতের অন্ত প্রান্ত।

যে সবচেয়ে অনুগত, সেইসব চেয়ে ভাল শাসক। যে সবচেয়ে ভাল শাসক, সেই সবচেয়ে আনুগত। এখানে আমরা যথার্থ অনুগত্যের প্রকৃতি, অতএব তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। ক্রীতদাস অনুগত হতে পারে না। সে শুধু বাধ্য হয়ে কাজ করে, যেটা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। যথার্থ ক্রীতদাসকে হয়ত প্রভুর নির্দেশে অন্যায় কাজ করতে হতে পারে, সেটা মানুষের বিবেকের পক্ষে অসহ্য। তার নৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে হয়ত অন্যায় করার প্রয়োজন দেখা দেবে। এক মার্কিন নিগ্রো বলেছিল, "আমি যখন ক্রীতদাস ছিলাম তখন সর্বদা চুরি করতাম। মুক্তিকে অনুভব করার ঐ ছিল আমার একমাত্র পথ।" যথার্থ আনুগত্য নিরবচ্ছিন্ন, কিন্তু স্বাধীন। তা জোর করে আদায় করা হয় না; যারা বোঝে যে, শাসক আর শাসিত এক উদ্দেশ্যে কাজ করছে, তাদের উভয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নীতির জন্য সহযোগিতা করছে, তারা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়। যে আনুগত্য বাস্তব বা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এরকম নয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা সত্য যে, অসংযত আবেগ-সম্পন্ন লোকেরা কখনো পরিচালনার কাজে সফল হয় না। যে শাসন করবে তার নিজের আগে কিছু পরিমাণ আত্মশাসন থাকা চাই। যথার্থ আনুগত্যের ভিত্তি হল চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। এই দুটির পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে বোঝা যায়, তত্ত্বগতভাবে সেই নিয়মই শ্রেষ্ঠ যাতে প্রজা ও রাজার মাঝে মাঝে স্থান বিনিময় হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজাতন্ত্র হল চরম রাজনৈতিক রূপ। অবশ্য এই বিষয়ের আরো কয়েকটি দিক আছে যাতে স্থায়ী রাজতন্ত্র বাস্তবে কাম্য হয়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ড এবং আর কিছু পশ্চিমী দেশ সংবিধানগত রাজতন্ত্র নামক ব্যবস্থার দ্বারা এই দুটি শাসনতন্ত্রের মাঝামাঝি অতি চতুর এক আপোস রক্ষা করেছেন, সেখানে প্রকৃত সরকার রয়েছে রাজনৈতিক দল ও তাদের উপদেষ্টা মন্ত্রিসভার মাধ্যমে জনগণের হাতে, ওদিকে রাজপরিবার প্রতীক ও অনুষ্ঠানের দায়িত্ব বহন করেন এবং দলীয় পরিবর্তনের আড়ালে রাজা হলেন জাতীয় স্থায়িত্ব ও ঐক্যের প্রতিনিধি।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বয়যুক্ত সহযোগিতার চূড়ান্ত। এইভাবে গণতান্ত্রিক সংগঠনের বিপুল ক্ষমতায় ইংরেজের প্রকৃত মহত্ত্ব, তার ব্যক্তিগত গুণাবলীতে নয়। তারা জন্ম থেকে এই নিয়মানুবর্তী সহযোগিতার আবহাওয়ায় বড় হয়। এটা তারা ক্রিকেটের মাঠে, ফুটবলের দলে দেখে। উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের সেবায় তারা এই শিক্ষা পায়। প্রত্যেক ছোট ছেলে বিদ্যালয়ে এলে কোন বড় ছেলের সহযোগী হয়, সেই বড় ছেলেটি সকলের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করে, যদিও সে তাকে ক্ষেপায়, মারে, ক্রীতদাসের মত তাকে দিয়ে কাজ করায়, সহযোগী ও

তার অভিভাবকের নির্বাচনে সামাজিক শ্রেণীভেদের ভাব থাকে না। বড় ছেলেটি হয়ত দর্জির ছেলে, তার সহযোগী হয়ত জমিদারের ছেলে। বিদ্যালয়-জীবনে তারা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু জানে না। একবার সম্বন্ধ গড়ে উঠলে জমিদারের উত্তরাধিকারীকে তার বাবার মুচির ছেলের জুতোয় বিনা আপত্তিতে কালি লাগাতে হয়। দশ-এগারো বছরের ছেলেকে অনাত্মীয় ছেলেদের মাঝে থাকার জন্য বাড়ি থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাতেই বোঝা যায়, ইংরেজরা পরিবারের বাইরের জীবনকে কতটা মূল্য দেয়। যে ছেলে বিদ্যালয়ে আছে, সে এখনই পরিবারের বাইরের বিরাট জগতে নিজের পথ করে নিতে শুরু করেছে। সে গভীর আবেগের উপযুক্ত সংযম ও গোপনতা আগেই শেখে। সম্পূর্ণ নতুন সব সম্পর্ক সে গড়ে তোলে এবং এর ফলে সৌজন্য ও সংযম অভ্যাসের সঙ্গে দুঃসাহসিকতা ও ব্যক্তিগত গর্বেও অভ্যস্ত হয়। বস্তুত সে ব্যক্তিরূপে নিজের শক্তির আভাস পেতে থাকে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় বড় স্বপ্ন দেখে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চর্চায় প্রত্যহ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। নিঃসন্দেহে এ শিক্ষার দোষ হল, পাশবিকতা ও বিবেকহীনতা, এগুলি এই শিক্ষায় জন্ম নিতে পারে। এতে এমন লোক দেখা যায় যে আমাদের সঙ্গে নিরাপদে থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে তার কোন নৈতিক সংযম নেই। যে ইংরেজ ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়েছে, সে ভাববে যে, জোর যার মুলুক তার এবং যা বাস্তব নয়, তার ক্ষেত্রে নৈতিক অনুশাসন প্রযোজ্য নয়। এসব যে ওদের শিক্ষার ত্রুটি, ওদের দেশের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়।

তবু শক্তি ভাল, নাগরিক ও জাতীয় ঐক্যও ভাল; জবরদস্তি বা ভয়ের দ্বারা নয়, শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্মান ও শুভেচ্ছাও ভাল, না, তার চেয়ে বেশি, এটা মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নামে পরিচিত তা সম্ভবত চরম লক্ষ্য নয়। তবু এই আপেক্ষিক কর্তব্যের এমন মর্যাদা রয়েছে যে, এটা না থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ নয়, ঠিক যেমন আমরা মনে করি, যার পারিবারিক গুণাবলী নেই, সে মুক্তি পেতে পারে না। সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের দ্বারা আমরা মনুষ্যত্বের যা অতীত, তাকে লাভ করি, আর সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অন্তর্গত হল নাগরিক ও দেশপ্রেমিক। উপনিষদ বলে "দুর্বল তাঁকে লাভ করতে পারে না।"

যে সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে রক্তের দ্বারা, আত্মীয়তার দ্বারা নয়, বরং সাধারণ ভূমির জন্য সকলের ভালবাসার অসাধারণ সূক্ষ্ম ও আত্মিক বন্ধনের দ্বারা, সেখানে মানুষকে নিজের ভূমিকা নিতে হবে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ এই কর্তব্য গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা নয়; যে কাজের জন্য আমরা সবচেয়ে উপযুক্ত সেই অনুযায়ী আনুগত্য বা কর্তৃত্ব লাভ করার জন্য এ স্বাধীনতা। সব জাতিগুলির মাঝে একটি জাতির স্বাধীনতা হল, আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টায় বাধাহীন হওয়া।

পূর্ববঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দর্শন

১৯০৬

১

জলপথের দেশ

ব্যাপ্তি ও উর্বরতায় পূর্ববঙ্গের ব্যাপক বিস্তৃত বদ্বীপ-ভূমির সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন আর একটি অঞ্চল কোথাও মিলবে না। এমনকি ভারতবর্ষেও না। পূর্বে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম, এবং উত্তরে ঢাকা ও মৈমনসিংহ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রত্যন্ত মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত বিশাল ত্রিভুজাকৃতি যে দেশ, সোজা পথে যে কোন দিক থেকেই তার দৈর্ঘ্য হবে দুশো মাইল বা তারও বেশি। আর ভূপৃষ্ঠে এই দেশ প্রকৃতির উজ্জ্বলতম হরিৎ ও নীল বর্ণে রঞ্জিত। মাঠ আর বন, তালগাছের সারি এবং বাগান এবং শস্যের রঙ সবুজ, আর সব কিছু শুধু নীল আর নীল, উপরে আকাশ নীল এবং নীচে জলও নীল। হল্যাণ্ড যাদের পরিচিত অথবা ভেনিসও, তাদের কাছে এ দেশ সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পূর্ণ এবং দূর সৌন্দর্যের স্মৃতি। কারণ, এও এক দেশ যাকে জল থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, যদিও মানুষ তা করেনি। এ দেশও নিরবচ্ছিন্ন নীলিমার তলদেশে সহিষ্ণু ও অর্ধ প্রত্যাশায় শান্ত সমাহিত। এ দেশেও দূর চারণভূমির ওপার থেকে যে কোন মুহূর্তে হঠাৎই নৌকার শুভ্র পাল দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এবং এ দেশও উজাড় করে দেয় আশীর্বাদের সেই অনিবার্য প্রশান্তি যা অসীম বিরাটের নিকট হতে নিঃসীম ক্ষুদ্রের প্রতি বর্ষিত হয়।

অবশ্যই বিষমতাও আছে। এ হলো এক গ্রীষ্মমণ্ডলের হল্যাণ্ড। দীর্ঘকায় পপলার বীথি এবং শীতকালীন মাথা ছাটা এল্‌ম গাছের সারির পরিবর্তে দীর্ঘ অবিন্যস্ত জঙ্গল প্রান্ত, দলবদ্ধ নারকেল ও সুপারি গাছ, সুদৃশ্য বাঁশঝাড়, এখানে সেখানে অপূর্ব সুন্দর কাঠবাদাম গাছ, যার প্রত্যেকটি সতেজ মসৃন শাখার প্রান্তে রক্ত পতাকার মত একটি পাতা, এবং বসতবাড়ির ফল ও সবজিবাগান ঘিরে সারি সারি ঋজু কলাগাছ এখানকার প্রশস্ত সবুজ সমতল ক্ষেত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বসতবাড়িগুলিও অদ্ভুতভাবে ডাচদের লাল টালির ছাউনি দেওয়া নিখুঁত খামারবাড়িগুলি থেকে স্বতন্ত্র। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। নদীর কিনারা থেকে হয়তো কোন বিশাল খড়ের চালা আমাদের চোখে পড়বে। এর চওড়া বক্রাকৃতি ছাওয়ায় সেই কুটিরের ওপর ঝুলে থাকে আপাতদৃষ্টে যাকে মনে হয় বুঝি বা এটি ঝুড়ির মত বোনা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐটি চেরা বাঁশ দিয়ে বোনা মাদুরের তৈরি। এই সাদাসিধে কাঠামোর বরগা ও খুঁটিগুলিও বাঁশের এবং এমনও হতে পারে যে একটিমাত্র চালাতেই বাসগৃহ ছাড়াও দু-চারটি গোরু থাকার জন্য একটি ছোট খোলা গোলা-বাড়িরও ছাউনি দেওয়া হয়ে থাকে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যাবে চেরা বাঁশ দিয়ে দোতলা করা হয়েছে। সেখানে খড় গাদা করে রাখা হয়। আর এইভাবেই খড় রাখার চিলে কোঠার প্রয়োজন মেটে। কুটিরের মেঝে, যে কোন ক্ষেত্রেই, শক্ত, নিকানো

মসৃন রূপালী পলিমাটি দিয়ে তৈরি। এবং পরিবারের সম্পদের অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাবে এর অনাড়ম্বর ভিতের উচ্চতায়। ভিতরে শয়নঘরটি মেঝে থেকে দু-এক ফুট উঁচু একতলায় হওয়ার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি, এবং ঐ চিলেকোঠার মতই, চেরা বাঁশের তৈরি ; আর এর উপর বালিশ, পাটি, এবং কাঁথা ইত্যাদি সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়েই পরিবার-পরিজনসহ তারা বসবাস করছে। একটি বড় ঘরকে প্রায়শই দুই বা তিনটি ছোট ঘরে আলাদা করে নেওয়া হয়। সব ক্ষেত্রেই বাইরে থাকে একটি বারান্দা। সেটাই পরিবারের অভ্যর্থনা-গৃহ। প্রায় সব সময়ই রান্না ঘরটি হয় ভিতরে অথবা বাইরে, বাড়ির অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি নিভৃত স্থানে। এবং প্রত্যেক বাড়িতেই মাথার উপরে থাকে কাঠ অথবা বাঁশের পাটাতন। যেমন যেমন প্রয়োজন একে গুদাম অথবা শয়নঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ছোট খামারবাড়িটির প্রবেশপথটি কিন্তু কোন ক্রমেই নিম্নতর মর্যাদার নয়। সামনের প্রবেশ পথটি নদীর পারের দিকে হলেও, এটা প্রায় নিশ্চিত যে খোলা বারান্দাটি দেখা যাবে দূরস্থ প্রান্তে, একটি সাদাসিধে খিলান ঢাকা পথের মত, ছোট উঠোনের মধ্যভাগের মুখোমুখি, যার অপর দুই অথবা তিন দিকে রয়েছে অনুরূপ অথবা সম্ভবত আরও সাধারণ বসতবাড়িগুলি। এখানেও খামারের কাছারিবাড়ি, ঢেঁকিশালা, গোয়াল, পায়রার খোপ, হাঁস-মুরগীর খাবার জায়গা, সবজি ও ফলের বাগানের খুব কাছাকাছি। এবং সুবিন্যস্ত এই নল-খাগড়ার খুপরিগুলি স্বদেশীয় তালকুঞ্জ ও ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা এবং একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত। এই খামারবাড়ির নিজস্ব লম্বা সরু তালগাছের তক্তার তৈরি নৌকা আছে। এক বা দুজন সর্বক্ষণ জল ছেঁচে ফেলতে থাকলে এই নৌকায় লম্বালম্বি এক সারিতে সাত-আট জন বসতে পারে। ছেঁচে ফেলতে হবে কেন না সর্বদাই নৌকা জলে ভর্তি হতে থাকবে। এবং সব শেষ কথা, এই গৃহগুচ্ছই একটি গ্রাম নয়। একটি গ্রাম গড়ে উঠবে, ধানক্ষেতের চারধারে এবং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা কুড়িটি অথবা তারও বেশি গৃহগুচ্ছ নিয়ে। সুতরাং এই বিস্ময়কর দেশে, জলপথ-গুলির নীচু নৌকায় বসে, কখনও কখনও একথা বলা সম্ভব যে গ্রাম দিগন্ত বিস্তৃত।

আবার নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিতে চাষা অর্থাৎ কৃষক, মাঝি অর্থাৎ নৌকা-বাহক অথবা জেলেরা পাশাপাশি বাস করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা মুসলমান এবং কেবলমাত্র মাঝে-মধ্যে হিন্দু। কিন্তু দুই সম্প্রদায় সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস করে না। তাছাড়া সভ্যতার বিচারেও তাদের মধ্যে পার্থক্য বড় একটা নেই। কয়েক শো বছর আগে সকলেই ছিল হিন্দু, কিন্তু ইসলামের গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃমূলক প্রেমের বাণী নিম্নবর্ণীয়দের নিকট এক মহান মুক্তি উপস্থিত করে। এবং পূর্ববঙ্গে এই বাণী একই সঙ্গে গ্রামের পর গ্রামকে আকৃষ্ট করে থাকবে। এরূপ ধর্মান্তরিতদের উত্তর-পুরুষদের নামের শেষে "শেখ" পদবী যুক্ত রয়েছে, এবং এখানে তারা সকলেই শেখ। কিন্তু চালচলনে এখনও তারা হিন্দুরই মত। তাদের বিধবারা পুনর্বিবাহকে ঘৃণা করে। হিন্দুবিধবাদের মতই তারা পাড় ছাড়া শাড়ী পরে এবং চুল ছোট করে ছেঁটে

ফেলে। হিন্দুদের মত তারাও গো-হত্যার বিরোধীতা করে। তাদের ছেলেমেয়েদের শুধু কোরানের বিদ্যাই নয়, ভারতীয় মহাকাব্যগুলির কাহিনীও শেখানো হয়। এবং সর্বশেষে তাদের বাড়িগুলিও হিন্দুদের ধর্মীয় চিত্র এবং দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়। বাস্তবিক, এটি দুই ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী একটিই জাতি, এমনকি ভারতবর্ষেও ধর্মের চেয়ে রক্তের সম্পর্কই অধিকতর জোরালো।

তারা গর্বিত এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটি জাতি, পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির এই মানুষেরা, সবদিক দিয়েই শালীন ও মিতব্যয়ী, আমাদেরই মত পদমর্যাদা এবং শিক্ষার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আত্মসচেতন, এবং স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতায় এদের অগাধ বিশ্বাস। এখানে এদের কাছ থেকে কোন প্রিয় সামগ্রী কিনে নেওয়া সহজসাধ্য নয়, সেটা একটি তুচ্ছ জিনিস হলেও। যতই দস্তুর-মাফিক এবং লৌকিকতাসহ কিনতে চাওয়া হোক না কেন, অব্যর্থভাবে তারা হাসিমুখে জিনিসটি উপহার দিয়ে দেবে। আমার একটি ছোট মাঝিদের ব্যবহারের কালো মাটির প্রদীপ আছে। এটি আমার হাতে এসেছিল এইভাবেই। এটি আমার দেখা সব থেকে সুন্দর জিনিসগুলির একটি এবং আমি শুনেছিলাম গ্রামের বাজারে এর দাম সিকি পেনি। আমি ঐ দামের ষোল গুণ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এর মালিক কিছুতেই দামের কথা শুনবে না, পরিবর্তে ওটা আমাকে উপহার দেবার জন্য সে জোর করতে থাকল। বরিশালের জেলে সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারও ছিল একই রকম তাৎপর্যপূর্ণ। এই নদী-নালার দেশে যাতায়াতের জন্য এক ধরনের ভারী সুন্দর এবং প্রশস্ত ভারতীয় হাউস-বোট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কালো মসৃন সেগুন কাঠের তৈরি খালি ঘরগুলি নিখুঁত পরিষ্কার। আমরা আমাদের নিজেদের কম্বল আর বালিশ সঙ্গে নিই এবং যাত্রাকালে মেঝের উপর বসি অথবা শুয়ে পড়ি। বাইরে নলখাগড়ার মাদুরের গড়ানে আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা বাঁশের ছইয়ের তলায় বসে মাঝিরা। কয়েকটি মাছ ধরার জাল, অথবা সূতা জড়ানো একটি তকলি অথবা একটি ছোট মাটির উনুন যাতে রান্না হচ্ছে, এইগুলিই যা কিছু আসবাবপত্র দেখতে পাওয়া যাবে। আবার এই কেবল চিত্রসদৃশ বিশৃঙ্খলাও। মাঝি-মাল্লারা সকলেই ঠাকুরদা অথবা বাবার খুড়ো থেকে কনিষ্ঠতম বালকটি পর্যন্ত একটি মাত্র পরিবারের লোক। মেয়েরা রয়েছে দূরের গ্রামের বাড়িতে গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ, সূতা কাটা এবং বাগানগুলির পরিচর্যা করতে। এমন এক জীবন ও কর্ম, পরিকল্পনায় খানিকটা হোমারের কৃষক-রাজাদের মর্যাদা আছে। প্রথম যে মাঝিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম, দুর্ভিক্ষ ও ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি তাদের ও তাদের পরিবারের লোকজনকে কতখানি পীড়া দিচ্ছিল জানতে চেয়ে লজ্জায় পড়েছিলাম। তাদের প্রথম কাজ হলো আমি যাতে দুশ্চিন্তা না করি সেটা দেখা। বিষয়টি তারা গুরুত্ব দিয়ে অথচ সহজভাবে আলোচনা করল। তারা বলেছিল সর্বত্র কাজের অভাব। এমন এক সময়ে, চালিয়ে নিতে পারলে কেউই সম্ভবত লোক নিয়োগ করবে না। স্বাভাবিক কারণে সকলেই ব্যয় সংক্ষেপ করছিল। যেমন, তারা নিজেরাই তো, আমরা যে ছোট নৌকা-ঘাটে তাদের দেখা পেয়েছিলাম

সেখানে গত দশ দিন বেকার বসেছিল, আর এই প্রথম তাদের কাজ জুটল। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপেই সমস্ত কিছুই কিছুটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা চালিয়ে নিচ্ছিল। হ্যাঁ, তারা চালিয়ে নিচ্ছিলই বটে। এবং তাদের সন্দেহ ছিল না যে কোন না কোনভাবে চালিয়ে যাবার একটা পথ বার করে নেবেই। এই আকস্মিক গাম্ভীর্য দিয়ে অর্থাৎ এইভাবেই মুখে কুলুপ এঁটে বিষয়টি শেষ করা হলো। এ বিষয়ে আর তাদের কথা বলানো যায়নি। তথাপি নবাগতকে প্রগল্‌ভতার জন্য তিরস্কার করা হয়েছিল মনে করার কারণ নেই, বরং অপরের নিকট নিজের অভাব মুখ ফুটে বলার আকস্মিক বেদনা অন্যদের মত আমরাও অনুভব করেছিলাম।

সর্বত্র দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট গ্রামগুলিতে আমি এই একই জিনিস দেখেছি। যেখানেই গিয়েছি, আমরা কোন না কোন ব্যক্তির দেখা পেয়েছি, যার আর্থিক পুঁজি অথবা সংস্থান তখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি, কেউ হয়তো তখনও আশা করছে তার পরিবারের জন্য জাতীয় তহবিল থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। যেখানেই এরকম ঘটেছে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি সেখানে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে শান্তভাবে অস্বীকার করা হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন এইসব গ্রামীণ ভারতীয়ের গভীর অনুভূতিশীলতা এবং শিষ্টতা আমাদের সর্বব্যাপী দুঃস্থতার অনুভব গভীর করতে সহায়ক হয়েছিল। উজ্জ্বল রুপোর মত নীল সুতায় তৈরি একটি বিশাল জালের মত, জলপথগুলি—প্রশস্ত নদী, সঙ্কীর্ণ খাল এবং সঙ্কীর্ণতম সব ছোট নালা—এই সুন্দর দেশটিকে সস্নেহে বেষ্টন করে রয়েছে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে যে দেশের পরিচয় "বাংলার শস্য ভাণ্ডার"। কিন্তু গ্রামগুলিতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে: 'রাজা, শিংবিশিষ্ট পশু এবং কোন নদীর সঙ্গে কোন মানুষের কখনও বন্ধুত্ব হতে পারে না।' অর্থাৎ হৃদয় হতে যত ভালোবাসাই ঝরে পড়ুক না কেন, এখনই অথবা পরে, এমন একটি বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্ত আসবে, যখন ভালোবেসেছে যাকে তাকেই প্রাণে বিনাশ করবে। হায়রে, আমাদের পূর্ববঙ্গের নদীগুলির ক্ষেত্রে এই সত্য হল, আর ঠিক এই বছরেই।

ইতিমধ্যেই অনেক মাস যাবৎ গ্রামগুলি দুর্ভিক্ষকবলিত। কারণ বছরের প্রধান ভারতীয় ফসল ঘরে তোলা হয় জানুয়ারিতে এবং ১৯০৬ সনে এই ফসল পাওয়া গেছে অত্যন্ত সামান্য। বারমাস আগে চাষের সময় বৃষ্টি হয়েছিল খুবই কম। তাছাড়া কতকগুলি সমুদ্র সংলগ্ন জেলায় লবণাক্ত বন্যা হয়ে ফসল ধ্বংস হয়েছিল। সুতরাং এবছর ফসল কাটার এক-দুই মাসের মধ্যেই নিশ্চয়ই বুভুক্ষার দীর্ঘ-শ্লথগতি জ্বালা মানুষ অনুভব করছিল। কিন্তু যতদিন সম্ভব মুখে বুজে তারা সেই জ্বালা সহ্য করেছিল এবং মাত্র জুনের মাঝামাঝি ভয়ঙ্কর 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটি এমন স্পষ্ট হবে যে বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডকে জনসেবার কাজ আরম্ভ করতে হয়, চেষ্টা করা হয় খয়রাতি সাহায্য বিতরণের। ইতিমধ্যেই মানুষ যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে সে কাহিনী কোন দিনই লেখা হবে না, কারণ কোন দিন তা অনুমান করাও সম্ভব হবে না। তথাপি দুঃখের পেয়ালা যেন তখনও পূর্ণ হতে বাকি। বর্ষার শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল এবছর অত্যধিক বৃষ্টি হবে; এবং

অবশেষে অগস্ট মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ এক মাস আগে নদীগুলি অতি বৃষ্টি এবং প্রত্যন্ত উত্তরের বরফ গলে ফুলে-ফেঁপে উঠে হঠাৎ কূল ছাপিয়ে গেল, এবং পূবের বাংলার সুন্দর দেশ হয়ে উঠল জলের তলায় এক পাতালপুরী। এই অবস্থা এখনও চলছে। একী আরো কিছু দিন চলবে এবং বন্যা কি মাসের চন্দ্রবিহীন রাত্রির সাথে প্রশমিত হবে? অথবা দক্ষিণের বাতাস বয়েই চলতে থাকবে এবং আরও এক পক্ষ কাল ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকবে?

কোন মানুষ বলতে পারে না। কিন্তু একটি জিনিস আমরা জানি তা হলো, আগে হোক বা পরে যখনই জল নামুক বন্যা দুর্ভিক্ষ-সৃষ্ট দুর্দশাকে দ্বিগুণিত করবে, এবং মানুষকে সে সমস্যার মুখোমুখি ও সমাধান করতে হবে, জটিলতায় এবং ব্যাপকতায় তা যে কোন মানুষের কল্পনাশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে।

২

আমরা যা দেখেছিলাম

সে দিন ছিল ৮ই সেপ্টেম্বরের প্রভাত কাল। সেই মণি-মুক্তা ঝরানো প্রভাতের একটি যা ভারতীয় শরৎকালের বৈশিষ্ট্য। শালুক ফুলগুলি তখনও ফুটে রয়েছে, যেমন তারা ফুটেছিল সারা রাত ধরে জলের বুকে। আমরা দাঁড় বেয়ে এক গোছা ফুলের কাছে গেলাম, ঐগুলি একটি আর একটির গায়ে ফুটে ছিল, যেন তাদের মাথাগুলি পরস্পরের কাঁধের উপর। এ ফুলের কেন্দ্রস্থলের রঙ সোনালী, পাপড়িগুলিতে গোলাপী ছোপ। আমরা গুণলাম, এবং দেখতে পেলাম সাতটি রয়েছে। প্রভাতকালে সাতটি প্রস্ফুটিতশালুক! বাতাস ছিল ঠাণ্ডা কিন্তু কন্‌কনে ঠাণ্ডা নয় এবং প্রশান্ত ও সুগন্ধযুক্ত। আমাদের চারধার ঘিরে সব দিকে,—আমাদের পিছনে নদী-স্রোতের প্রান্ত হতে কেন্দ্রমুখী, বসতবাড়ির ঝোপ-ঝাড়ের দূর সীমা পর্যন্ত এবং ডাইনে ও বাঁয়ে, এক বনপ্রান্ত থেকে অপর বনপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত পথ,—অপ্রতিহত রূপালী জল বিস্তারিত ছিল। এই জলকে স্পর্শ করে আছে নবীন ধানের উত্থিত শীষ, এখানে সেখানে সংখ্যায় সেগুলি এতই কম যে নীচে জলের আয়নায় স্বীয় প্রতিচ্ছবিই প্রতিটি খাড়া পাতার সহচরী। দেহ যার শিথিল, মন প্রশান্ত তার কাছে, অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ এক পৃথিবী,—এ আনন্দ স্থূল অথবা ইন্দ্রিয়পরায়ণ নয় বরং চেতনার উপর নিষ্কাম উল্লাসের প্রবাহ।

অনির্বচনীয় আনন্দের এক পৃথিবী। অদূরে ঐ যে মেয়েরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা যখন ধীরে ধীরে দাঁড় টেনে এবং লগি ঠেলে ওদের বাড়িগুলির দিকে যাচ্ছিলাম, ওদের চোখেও কি তাই? আমরা ভাবি, যারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে, নিজেদের ভেঙে পড়া বাড়ি থেকে, প্রতিবেশীর চিলে কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে, মানুষ নয় অনেকটাই পাখীর মত সেখানে বসবাস করছে—কে বলবে কতদিন ধরে! অতীন্দ্রিয় আনন্দ তারাই বেশি অনুভব করে। তা কিন্তু নয়, এদের এবং এদেরই মত আর যারা তাদের জন্য মানসিক আনন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ তাদের বর্তমান বিভীষিকাময়, আর কে বলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে কোন যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে?

অথবা হয় তো মধ্যাহ্নে, এবং দেশের কোন দূর অংশে, প্রকৃতপক্ষে শহর থেকে খুব দূরে নয়, আমরা হাঁটু জল ভেঙে, অথবা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে শালতি নৌকায়, এক কৃষকের বাড়ি থেকে অপর কৃষকের বাড়ি যেতাম। এবং তখনও আমাদের চারধারে পরিব্যাপ্ত দুঃখ সত্ত্বেও, যে কেহ নিঃশ্বাস বন্ধ করে কেবল এই কথাই অনুভব করবে, এই পরিবেশে যাদের জন্ম তাদের নিকট এইসব ধানক্ষেতের কানায় কানায় পূর্ণ

সৌন্দর্য কত বিস্ময়কর। ধূসর মেঘরাশি, ধূসর কুয়াশা, ধূসর জল এবং ঝির ঝির বৃষ্টি, আমাদের মনে হচ্ছিল অসীম বিশ্বে আমরা নিঃসঙ্গ, একা শুধুই একা। হঠাৎ হয়তো আমাদের চারধারে বনে বনে তীব্র ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো, আর সব আম আর তালগাছেরা আন্দোলিত হতে লাগল, গোঙানি এবং আর্তনাদ শুরু হলো। তারপর আবার এসব শেষ হয়ে নিস্তব্ধতা নেমে আসবে আমাদের চেনা পৃথিবীর সীমাহীন বৈচিত্র্যহীনতার উপর। ফিরে আসবে আমাদের প্রথম চেতনা, না জীবন না মৃত্যু অথবা দুইয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সীমানার উপর,—সম্ভবত উভয়েরই অস্তিত্ব।

আবার স্থান ও কালের পরিবর্তন হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসত। সূর্যাস্তে, আমরা—আমাদের তদন্ত পরিক্রমা শেষ করেছি এবং এখন আমরা একটি ঘরে ফিরে এসেছি—একটি বাঁশের কুটির, আমাদের চারধারের বাকি সব জেলেদের মত, তবে অধিকতর বড় এবং টিনের বেড়া দেওয়া—এখানেই আমরা রাত্রিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামনের দরজার সিঁড়ির সব শেষ ধাপ দুটি কেবল জলের উপর ছিল এবং এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাদের দলের কেউ একজন বসে থাকত, বসে বসে নদীর উপর ক্ষয়ে যেতে থাকা চাঁদের আলো দেখত, আর মাঝে মাঝেই সে বড় বড় সাপ, চৌকির নীচের বসবাসকারী ইঁদুর দিয়ে হয়তো বা নৈশভোজ সেরে নিত, বাড়িটির দিকে সাঁতরে আসতে দেখলেই, তার হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করে জল পিছন দিকে সরিয়ে দিত।

এমনই কিছু কিছু পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দুর্ভিক্ষকবলিত জেলাগুলি পরিক্রমা করেছিলাম।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবেই আমরা বরিশাল শহরের ভালোমানুষদের রাজি করাতে পেরেছিলাম শহরের খুব কাছাকাছি কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার খানিকটা আমাদের দেখাতে।

সন্দেহের অবকাশ নাই, পীত সাংবাদিকতার দৌলতে সমগ্র আধুনিক জগৎ দূষিত হয়েছে। যদি একই সঙ্গে ব্যথিত এবং বিদ্রোহী না করে গেলে, আমাদের সহানুভূতির উদ্রেকেই কি দুর্ভিক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ হবে? অথবা এটাই কি বরং সত্য নয় যে অনেক প্রয়াস ও পরাজয় হেতু ধীরে ধীরে হৃদয় দমিত হওয়ার মত ক্রমে ক্রমে সন্দেহ অনুপ্রবেশিত হয়ে সংগ্রাম স্তিমিত হওয়ার মত, যে সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করতে পারবে না শক্তি থাকতেও, তাদেরই স্নেহে অত্যধিক যন্ত্রণা পাওয়ার মত করুণ আর কিছু হতে পারে না? কারণ দুঃখই তো আমরা কল্পনা করতে পারি, দুঃখের কল্পনাই তো আমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায়। যখন আমরা বস্ত্রের অভাবে কলা পাতায় আচ্ছাদিত মূর্তিমান অথচ নির্বাক ক্ষুধার মুখোমুখি হই, সে দৃশ্যে এমন কিছু আছে উদ্দীপ্ত করার পরিবর্তে যা আমাদের ভাবাবেগকে মুহ্যমান করে ফেলে, এবং আমরা যে সাহায্য এগিয়ে ধরি তা গভীর এবং সহানুভূতিশীল, অনুভব না হওয়া বরং বুদ্ধিজীবির নীতিবোধে পর্যবসিত হয়। যে খুব বেশী এমন দুর্ভাগ্য দেখেছে তার ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। কারণ দুঃখ

যদি ভুক্তভোগীকে পশুতে পর্যবসিত করতে সক্ষম হয় আরও অনেক বড় সত্য হলো সে প্রত্যক্ষকারীকে নিস্তেজ করে। তাছাড়া, যতটা আমরা ভুক্তভোগীর সাধারণ সুখদুঃখ বুঝতে পারি তার দুর্দৈবের ব্যাপকতায় অবচেতন তুলনা তার অবস্থান থেকে মাত্র ততটাই করতে পারি। সুতরাং সম্ভবত বিস্ময়কর কিছু নয় যে আমি প্রায়শই আমার দুর্ভিক্ষ পরিক্রমার সঙ্গী বাঙালী যুবকদের চোখে জল দেখতাম, যখন আমি নিজে বিভীষিকার হৃৎস্পন্দন ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে সচেতন থাকতাম না। কিন্তু বিভীষিকা ছিল বিপর্যস্তকারী, প্রতিটি কোণায় কোণায় আত্মদলন অথবা আত্মহনন প্রচেষ্টার যে কাহিনী আমরা শুনতাম এর জন্য তা থেকে খুব বেশি নয়, এমনকি, কোন পৌরাণিক বলিদানের মত, জুলাই মাসে দ্বীপগুলির ওপার হতে ধ্বনিত হয়ে, অবশেষে এই দুর্ভিক্ষের জগতে সহকর্মীর সাহায্য নিয়ে এসেছিল যে অদৃষ্টপূর্ব মৃত্যু তাতেও নয়, এর জন্য চারিদিকে আমাদের দেখা ধ্বংসের লাঘবহীনতা হতে। ব্যক্তিবিশেষের দুঃখকষ্টের বেদনা বোধশক্তির অনধিগম্য ছিল যার ফলে যথোপযুক্ত বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নাই। আমার জীবনে আমি দারিদ্র্য অনেক দেখেছি। হৃষ্টচিত্তে সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণে আগ্রহী অথচ সামর্থ্য অস্বীকরভাবে অপ্রতুল তাও আমি জেনেছি—আর কেই বা তা না জানে? কিন্তু এর তাৎপর্য বুঝতে পারি, সরকারী হিসেব অনুযায়ী একটি মাত্র জেলাতেই যে এগার শো হাজার মানুষের মাসের পর মাস পর্যন্ত খাদ্য জোটেনি, এবং এখনও যারা এক মুঠো খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে এক অনিশ্চিত ত্রাণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে আছে, তাদেরই একজন হয়ে উঠতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। যদিও এখন আমি নিজের চোখে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছি, তথাপি আমি তা কল্পনা করতে পারি না, এই সত্য কথাটা বোধহয় খোলাখুলি স্বীকার করা ভাল।

সুতরাং, অতীতে যেমন প্রায়শই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনতা, অথবা ক্ষুধা-ক্লিষ্ট দুঃস্থ কৃশ মানুষগুলির পর্যাপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা না করে তাৎক্ষণিক পর্যবসিত কয়েকটি সহজতর দৃষ্টান্তের কাহিনীতে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। দুর্ভিক্ষকবলিত জেলাগুলিতে ক্লিষ্ট-জনতা আমি বহুসংখ্যকই দেখেছি। এবং যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দেওয়ার পর আন্তরিক অভিনন্দন প্রত্যাশা করায় আমি ত্রাণকর্মীদের দোষারোপ করতে পারিনি—বরং আমার মনে হয়েছে তারা প্রশংসা পাবার যোগ্য। সন্দেহ নাই যে মেকী জয়ধ্বনিও তাদের পক্ষে মানসিক, নৈতিক ও দৈহিকভাবে মঙ্গলজনক ছিল। তবে আমি তা না শুনলেই সুখী হতাম। এইসব উপবাস-ক্লিষ্ট ও ক্ষুধার্ত কণ্ঠ হতে স্বাভাবিক সতেজ ও স্পষ্ট না হয়ে কর্কশ এবং ম্রিয়মান শব্দ শুনতে পাওয়া ছিল অনুচ্চারণীয় ভয়ঙ্কর। আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনলে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা কপালে হাত ঠেকাতো এবং সমস্বরে শোক গম্ভীর চিৎকার করে বলতো "আল্লাহ দিন দিয়েছেন" সেটা অনেক স্বাভাবিক মনে হতো।

কাছাকাছি সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত যে এলাকাগুলি আমি পরিক্রমা করেছি তারমধ্যে

অবশ্য, একটি ক্ষেত্রে এমন কিছু ছিল যা অনুভব করা সম্ভব। আমরা নৌকায় করে "অসমতল ভূমির" মানবিক ও গঠন-সৌষ্ঠবে সুন্দর হওয়া উচিত ছিল এমন একটি গ্রামে, একদিন একটি জরাজীর্ণ কুটিরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ জলের ওপার থেকে হিন্দু বিধবার সুস্পষ্ট বিলাপ শুনতে পেয়েছিলাম। জানতে পারলাম যে মহিলার সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি সে চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে। এখন আমরা তাকে তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তাকে ঘিরে একদল শোকাকুল প্রতিবেশী। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কথা শুনলাম। ছ-সাত সপ্তাহ আগে ত্রাণকর্মীরা তাকে তার কুটিরের মেঝের উপর অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল। যাই হোক কিছু খেতে দেওয়ার পর সে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পায়। কী ভাবে সে তার স্বামী এবং চারটি ছেলেমেয়ে দিনের পর দিন শাকপাতা খেয়ে বেঁচেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে স্বামী কাজ ও তাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহের আশায় একটি দূরবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে গিয়েছিল সে কাহিনী তখন শোনা গেল। ক্রমে ক্রমে, ভারতবর্ষে সংবাদ আদান-প্রদানের নাম করে উল্লেখ করা যায় না এমন বহুবিধ পথ ধরে গ্রামে খবর পৌছালো, যে জেলায় লোকটি গিয়েছিল অবস্থা সেখানেও কিছু ভাল না, অথবা অন্তত সেখানেও প্রত্যাশিত সাহায্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত সকলেই জানত। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে অবশেষে নিরাশ হয়ে নিজের ছোট পরিবারের কাছে ফিরে আসবার জন্য সে গ্রামের দিকে যাত্রা করেছিল। তার অজ্ঞতায় সে হয়তো ভেবেছিল যে ইতিমধ্যে তাদের শুভানুধ্যায়ী জুটে থাকবে, অথবা নিঃসঙ্গ মৃত্যুর চেয়ে সকলে একত্রে মরাই ভাল। কিন্তু হায়, তার ভাগ্যে ছিল সেই ছোট বাড়িটি সে আর দেখতে পাবে না। এখন এই মুহূর্তে তার স্ত্রীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে গ্রামের উত্তর দিকে দুই অথবা তিন মাইল দূরের জঙ্গলে কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে মাঠে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

ক্রন্দনশীলা রমণীর সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম, কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দিতে আমি অথবা আর কেউ কীই বা বলতে পারতাম? "ওগো আমার প্রিয়তম, আমি কেন তোমায় রক্ষা করতে পারলাম না" তার এই আর্তনাদের হৃদয়-বিদারী মনস্তাপ কী, তার মত আমিও অনুভব করতে পারিনি?

একটি বিশেষ বাড়ি দেখিয়ে আমার চারপাশে হিন্দু বালকেরা যখন প্রথম সেখানে ত্রাণসামগ্রী পৌছানোর মুহূর্তটির বর্ণনা দিচ্ছিল। "এখানে ঠিক সেই সময়েই তারা একটি শিশুকে বিক্রী করতে উদ্যত হয়েছিল", তারা বলেছিল। তাদের সেই ভয়-বিহ্বল কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা আমার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন পাশ্চাত্য দৃষ্টি-ভঙ্গিতে রমণীয় অথচ কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। সর্বপ্রথম মনে হল ওদের কথাগুলি যেন স্বজাতীয়ের মাংস-ভক্ষণ প্রথার ইঙ্গিতবহ, আর তখনই আমার মনে জেরুসালেমের অবরোধের প্রতিবেদন ভেসে উঠেছিল। তারপর ক্রীতদাস প্রথার ধারণা মনে এলো, আসামের চা বাগানগুলির কথা, অথবা ওলন্দাজ কুলির দলের কথা স্মরণ হলো।[৮]

ভারতীয় পিতামাতার অবলম্বনের এই তো সহজতর চিন্তনীয় সংস্থান। যারা কথা বলছিল সেই সব যুবককে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম ঐ সংসারে দুটি সন্তান ছিল, তার একটিকে একজন সন্তান-প্রত্যাশী ধনীর কাছে "বিক্রী" করার কথা ভাবা হয়। আমার অধিকতর গদ্যসুলভ ব্যক্তিত্বে এটা খুব ভয়ানক মনে হয়নি, কেননা শিশুটি আদর-যত্নে প্রতিপালিত হবে। তথাপি এই ছোট ঘটনাও, যা একদিকে বেদনাদায়ক, এবং অপরদিকে পিতামাতার স্বস্তির সাক্ষ্য বহন করছিল, গ্রামের মানুষের মধ্যে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের উপর অতিরিক্ত আলোকপাত করেছিল, এবং পরবর্তী কালে বার বার তাদের বেদনার গভীরতর উৎসে পৌছোতে সহায়ক হয়েছিল।

অপর একটি প্রবেশপথেও অনুরূপ রহস্য ছিল স্পষ্ট অনুধাবনীয়। একটি দ্বারপথের ছায়ায় এক মা তার তিনটি শিশু-সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কুটির নদীর পারের খুব নিকটে, যেন প্রায় জলস্রোতেরই মধ্যে। একই সঙ্গে এমন দুর্বল এমন নিঃসঙ্গ কোন মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বাঁশের খড়খড়ির ধারগুলি পচে গিয়েছিল, এবং ভিতের উপরিভাগই কয়েক ইঞ্চি জলের তলায় ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল, পরিবারটি দুর্ভিক্ষের অতি মন্দ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু ওদের দেখে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতেই হয় যে মা অপেক্ষা শিশুরা অন্তত ছয়গুণ হৃষ্টপুষ্ট। অনাহারপর্বে মা শিশুদের থেকে কয়েক সপ্তাহ এগিয়ে। আর একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কেউ একজন টেনে হিঁচড়ে সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটিকে নিয়ে এল। বার চোদ্দ বছরের এক বালক। নিভৃত এক কোণায় সে লুকিয়ে ছিল যেন আমরা তাকে দেখতে না পাই। ছোট শিশুগুলির মত সেও ছিল উলঙ্গ। বালকটির আকৃতি মায়েরই অনুরূপ ইতিবৃত্তের সাক্ষ্য বহন করছিল। এই সেই একই বীভৎস হাড়ের খাঁচা, ছাপায় এবং ছবিতে দুর্ভিক্ষের যে দৃশ্য আমাদের বহু পরিচিত। এরা দুজন, মা ও ছেলে, দুগ্ধপোষ্যদের কথা ভেবে নিজেরা অনাহারে থাকত। আমার দিক থেকে আমি ভয় পাচ্ছিলাম এখন যে সামান্য ত্রাণ সামগ্রী এই পরিবারটিকে নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছিল, তার সামান্যও হয়তো মায়ের ভাগে জুটত না। এবং এই ভাবনা আমাকে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ়মূল এক কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নৌকায় আমাদের সঙ্গে কয়েক টিন বিস্কুট ও অন্যান্য বাদাম ও শুকনো ডুমুর ছিল, কারণ পথে কোন্ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি, অথবা ফিরে আসতে কত ঘণ্টা অতিক্রান্ত হবে, যাত্রার শুরুতে এ সব কিছু আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু এখন মহিলাটিকে তার সব খাদ্য শিশুদের দিয়ে দিতে দেখে, তার এই অভ্যাস ত্যাগ করানো আবশ্যক অনুভব করে, বাক্স থেকে একটি বিস্কুট আমি তাকে দিলাম, এবং বললাম, "মা! এটি তুমি নিজে খাও, এবং যতক্ষণ তুমি না খাবে আমি দাঁড়িয়ে থাকব!" সে আমার কথা শুনেছিল, বেচারা, তার তো আর কিছু করার ছিল না। তারপর একটা অপরাধ বোধ নিয়ে আমি ফিরে চললাম, বেশ বুঝতে পারছিলাম এবার আমি আমাদের সমস্ত দলটির উপর একটা সমস্যা চাপিয়ে দিলাম। কারণ, সামান্য তফাতে অনেকগুলি নৌকা-ভর্তি ক্ষুধার্তের দল আমাদের অনুসরণ করছিল, এবং সঙ্গতভাবেই সঙ্গে খাদ্য রয়েছে দেখতে পেয়ে ওরা আমাদের ঘিরে

ধরবে, এবং সেগুলির জন্য চিৎকার করতে থাকবে, তাদের অত্যধিক আগ্রহে, সে তো পরিতৃপ্ত হবার নয় হয়তো তারা আমাদের এবং নিজেদেরও নৌকাগুলি উল্টে দেবে।

কিন্তু বাস্তবে কী তেমন ঘটেছিল? না। সে রকম কিছু ঘটেনি, বরং যা ঘটল সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্য বটে তারা সবাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, ভিক্ষা চাইছিল তাদেরও খাদ্য দেওয়া হোক, অনুনয়-বিনয় করে জানাচ্ছিল তারা খুব বেশি ক্ষুধার্ত। সুতরাং প্রথমে আমরা শিশুদের দিলাম প্রত্যেককে একখানি করে বিস্কুট। তারপর মেয়েদের। এবং সব শেষে, সেখানে উপস্থিত পুরুষদের, যেসব শিশু বাড়িতে রয়েছে তাদের দেবার জন্য একখানা করে বিস্কুট দিয়েছিলাম, আর শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের জন্যও একখানা করে দিলাম। তারপরেও কি চেঁচামেচি অথবা বিশৃঙ্খলা থাকল? আমি যেমন খানিকটা আশঙ্কা করছিলাম তেমন বিকট ও বিরক্তিকর "আরও আরও চাই, আরও দাও" চিৎকার কী আর ছিল? মোটেই নয়। বাস্তবিক আমি জানি না গ্রামে আমার দেখা দুর্ভিক্ষের হৃদয়বিদারক বাস্তব ঘটনাগুলির আর কোনটি আমাকে এমন অভিভূত করতে পেরেছিল কিনা। এই যে এক আউন্সের এক-অষ্টমাংশ অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়ার বিরল সৌভাগ্যে উৎফুল্ল নৌকা বোঝাই বয়স্ক নারী-পুরুষেরা বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত শিশুদের নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে।

৩

বরিশাল

সারা পৃথিবীতে আমি আর কখনও জনগণের ঐক্য এমন প্রবলভাবে অনুভব করিনি, যেমন কিছুদিন আগে দুর্ভিক্ষাঞ্চল পরিদর্শনের অনুমতি পেয়ে, বরিশাল শহরের নিকটে নদীর অপর পারে গ্রামের একের পর এক খামারবাড়িতে পরিক্রমাকালে অনুভব করেছি। এই দুর্ভিক্ষকবলিত বসতবাড়িগুলির কতগুলি ছিল চাষা অথবা কৃষি-শ্রমিকদের—অর্থাৎ, যাদের দৈনিক অথবা মাস মজুরিতে ক্ষেতমজুর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এবং এগুলি ছাড়াও, সম্পন্ন স্বায়ত-কৃষকের বাড়িও ছিল। চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু, এই নিদারুণ দুঃখের বছরে বাকি বাড়িগুলির মত এগুলিও ভেঙে পড়েছে।

কারণ ভারতবর্ষে আমরা বলতে পারি না, যেমন আয়ারল্যাণ্ডে হয়তো বলা সম্ভব, যে উচ্চতর শ্রেণীগুলি এক রকম খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং নিম্নবিত্তরা অন্য রকম। এখানে তেমন কোন বৈষম্য নেই, গম ও আলুর বৈষম্যের মত, যার ফলে গ্রামের অর্ধেক মানুষ যখন হয়তো ক্ষুধার শেষ দংশন প্রত্যক্ষ করে চলেছে, তখন অপর অর্ধেক মানুষ নিজেদের ফসল প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হতে থাকবে। সমস্ত গাঙ্গেয় সমভূমিতে এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বত্র (এবং এই অংশের সব নদীর সম্পর্কেই একথা বলা সুবিধা- ... তাদের স্থানীয় নাম যাই হোক, যেমন 'গঙ্গা') সকল শ্রেণীগুলি একই রকম ভাত ... ধারণ করে। এবং যখন তাদের চালের উৎপাদন কম হয়, সকলেই ... উপবাস করে। অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মজুরের নিয়োগকর্তা অবশ্যই মজুর অপেক্ষা বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারে। তার কিছু টাকাকড়ি সোনাদানা থাকবেই। তার বাড়ি আছে, সাজসরঞ্জাম আছে, আসবাবপত্র এবং গোরু-ছাগল আছে (যদিও এসব কিছুতে অন্যের কোন আগ্রহ নেই) যা সে বিক্রী করতে পারে। এমনকি অতি মন্দ অবস্থা যদি আরও অতি মন্দ হয়, তার কিছু জমানো টাকা আছে। চরম বিপর্যয়ের সময় সে এই সঞ্চয় কাজে লাগায়। যদি কোন ব্যক্তিকে কোন ... অত্যধিক স্বল্প ফলনের বছরে সংস্থানশূন্য দেখা যায় তাহলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি এমন ঘটার কারণ ইতিমধ্যেই আগের কোন বছর ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য হেতু তার বাড়ি ও জমি খোয়া গেছে।

অন্যদিকে অভাবের মোকাবিলা করতে মজুর অথবা চাষার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকে নিজের উপস্থিতি এবং সাহচর্য ছাড়া আর কিছু দেবার নেই ; আর যখন কিছু ...বার নেই এটাই সব থেকে বীরত্বপূর্ণ উপহার। আমার পরিক্রমার প্রথম প্রভাতেই ... মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সে বিধবা হয়নি, তার ক্ষেত-মজুর স্বামী তাকে ...গ করেছে। আমরা বলি "ত্যাগ করেছে" কারণ স্বামী স্ত্রী ও শিশুর উপবাস দৃশ্য ... দূরে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে সে এখনও অন্যত্র তাদের জন্য খাদ্যের

সন্ধান করে চলেছে, এবং ভয় করার কিছু নেই যদি সে সংগ্রহ করতে পারে ফিরে এসে তা তাদের মুখে তুলে দেবে। ভারতীয় শ্রমিকরা লজ্জিতভাবে এবং সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদের বলেছে যে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে "ছেড়ে চলে যাওয়া" এখন প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। এবং প্রত্যুত্তরে বলতে গেলে আমি কদাকারভাবে হেসেছিলাম, কারণ আমি ভাবি, পাশ্চাত্য জীবনে শব্দটির অনুষঙ্গগুলি কত ভিন্ন।

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ হতাশার বহিঃপ্রকাশ পলায়ন নয়, মৃত্যু ; এবং ভাবলে শিহরিত হতে হয় কতবার এমন ঘটনা ঘটেছে, অথবা বাস্তবে কতজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে যাদের উদ্ধার করা হয়েছে। এই তিন দিনে আমরা সম্ভবত পাঁচ-ছয় জনের দেখা পেয়েছি। কিন্তু আমি মনে করি এখানে বলা ভাল যে এই দুর্ভিক্ষকালীন আত্মহত্যাগুলি কখনই আমার মতে, ব্যক্তিগত ক্ষুধা হেতু নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এগুলি অন্যের চাহিদার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণার কারণে ঘটেছে। ক্ষুধার সহজ পরিসমাপ্তি হয় মৃত্যুতে, অথবা চেতনাহীনতায়, অথবা কোন দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগে, এবং সর্বস্তরের ভারতীয়রা যথার্থতম দার্শনিকের মত এর শেষ দেখতে সক্ষম। কিন্তু না খেতে পেয়ে নিজের সন্তান-সন্ততির কান্না কে নিশ্চল হয়ে শুনতে পারে, দিনের পর দিন কে পারে স্বামী অথবা স্ত্রীর ক্রমবর্ধমান স্বার্থত্যাগ দেখতে ? তাছাড়া, এমন চিন্তাও তো মনে আসে, যখন সব শেষ হয়ে যাবে, অন্তত একটি কম মুখের জন্য খাদ্য যোগান দিতে হবে, এবং এইভাবে অপরের বোঝা খানিকটা লাঘব হবে। শারীরিক দুর্বলতার দ্বারা অর্ধোন্মাদ মস্তিষ্কে, সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হৃদয়ের তাড়নায় আত্মহনন অথবা দেবদেবীদের সঙ্গে বিনিময়ের কোন অস্পষ্ট কল্পনার উদয় হবে সে কথা কে বলতে পারে ?

আজ প্রভাতে আমি প্রথম যে বাড়িটিতে ঢুকেছিলাম সেটি আমার খুবই স্মরণীয় হয়ে থাকবে, একমাত্র এখানেই একজনের ভিক্ষাবৃত্তির কাহিনী শুনেছিলাম। তবে তার মন দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ ছিল দীর্ঘ দিনের রোগভোগ। পরিবারটিকে একটি ত্রাণ-টিকিট মঞ্জুর করা হয়েছিলবটে, কিন্তু স্ত্রীর এমন কেউ ছিল না যাকে শহরে সাহায্য-সামগ্রী আনতে পাঠাতে পারে এবং কাজেই আমরা যদি সেখানে সময় মত না পৌঁছোতাম তাহলে তাদের উপবাস চলতেই থাকত। বোধহয়, এক্ষেত্রে প্রধান:লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে এই বছরের দুর্ভিক্ষ তাদের এক দীর্ঘ বিপর্যয় পর্বের চূড়ান্ত পরিণতি। তিন-চার বছর ধরে লোকটি শয্যাশায়ী ছিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেকেই করুণা করতে অভ্যস্ত হয়েছিল ও অন্যের কাছে কিছু চাওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রথমবার হাত পেতে দান গ্রহণ করার সম্মানহানির গ্লানি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে চাহিদার তীব্র অনুভবে পরাভূত হয়। সে ক্ষেত্রে অন্য কিছু আশা করলে নিষ্ঠুরতার সামিল হবে। কলকাতায় ফিরে উৎসুকভাবে আমি প্রভাতী সংবাদপত্র-গুলিতে গোটা নয়েক ভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশে দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পড়ছিলাম। ওইগুলির উপসংহারে বিচক্ষণ মন্তব্য ছিল—"আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এই প্রদেশে (উত্তরের কোন প্রত্যন্ত স্থানের উল্লেখ করে), মানুষ ত্রাণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং

তারা এই ব্যবস্থা পরিহারে অনিচ্ছুক।" ভয়ঙ্করতম মানবিক পরিস্থিতিগুলি সম্পর্কে এমনই হলো সরকারী মন্তব্য (কারণ এ কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছিল না)। কিন্তু এ থেকে কি বোঝা গেল ? আমাদের হৃদয়গুলি কি পাথরের তৈরি ? আমরা কি চাই যে যাদের আমরা সাহায্য করি প্রথমবারের মত প্রতিবারেই তারা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার বেদনা অনুভব করুক ? আমাদের বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, মানবপ্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে এরূপ মাত্রার দুঃখানুভূতি অসম্ভব। বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চল পরিক্রমার পর এখানের সঙ্গে এই বিষয়ে রাজধানীর নিকটতর অপর একটি জেলার মানুষের তুলনা করার সুযোগ ঘটে। সম্প্রতি এই জেলাতেও দুর্ভিক্ষ এবং ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা পৌনঃপুনিক হয়ে উঠেছে। এবং এইভাবে চাহিদা ব্যক্ত করতে আত্মমর্যাদাহানির চিন্তা কতখানি ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে তাই দিয়ে ক্ষুধা কতদিনের সেটা পরিমাপ করতে শিখেছি।

দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক অথচ ক্ষয়ক্ষতি প্রবলতর হয়েছে আমাদের পরিক্রমিত এমন একস্থানে সদর দপ্তররূপে ব্যবহৃত আমাদের হাউস বোটের খোলা জানালা ঘিরে এক দল লোক ভীড় করেছিল। এই খোলা জানালা দিয়ে আমার ভ্রমণ-সঙ্গিনী অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ মহিলা গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলেকে খানিকটা পড়া দেখিয়ে দিলেন, এবং আন্তরিক চেষ্টা করতে থাকলেন সকলের সময়টা যেন সুখকর ও হিতকরভাবে অতিবাহিত হয়। সকলেরই জানা আছে সময় সময় জনতা কিভাবে নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে খানিকটা ভয়ে ভয়ে আমি ভিতরে এসেছিলাম, এবং নির্জনে অল্প কিছু সময় বিশ্রামের অনুমতি চেয়েছিলাম। আমরা সকলেই আশঙ্কা করছিলাম মেয়েদের চলে যেতে রাজী করানো কঠিন হবে। ওদের জীবনগুলি অতীব অস্বাভাবিকভাবে অর্থহীন ছিল। এবং আমাদের মধ্যে ছিল আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য দেখাবার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, সামান্য যুক্তি এবং মার্জনা চাওয়াতেই কাজ হলো। প্রস্থানকালে তাদের সকলের মুখে একই রকম মার্জিত ভঙ্গি, শুধু একটি কথা বলার জন্য তারা অপেক্ষা করেছিল "কিন্তু আপনারা খান! আপনারা খাচ্ছেন না কেন ?" এই কথা কটি বলেই মানুষগুলি, যারা নিশ্চিত প্রায় নিজেরা অভুক্ত রয়েছে অথবা খুব বেশি হলে আধপেটা খেয়েছে, আমাদের এক ঘণ্টার বিশ্রাম দিতে শালীনভাবে বিদায় নিয়েছিল। এরা কোন প্রিয় অতিথির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়।

এবং তথাপি, বরিশাল শহরের কাছের জেলাগুলিতে, সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলিকে অসাড় করার প্রক্রিয়া এখনও এখানের মত এতটা ব্যাপক নয়। নিজ খামারবাড়িতে যে সকল নম্র কৃষক রমণী ও বলিষ্ঠ ও সুকুমার কৃষক পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি তারা তাদের উদ্বেগ ও সর্বনাশ সম্পর্কে কথা বলতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের থেকে বেশি সরাসরি সাহায্য চাইতে পারেনি। কারণ বিশ্বের সর্বত্র কর্মঠ কৃষক সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বয়ম্ভরতা ও লোকতন্ত্রের জন্য গর্ববোধ নিশ্চিত যে কোন

স্থানের মত পূর্ববঙ্গেও প্রবল। এই লোকগুলি বোধ হয় ইউরোপে এদের সমগোত্রীয়-দের থেকে অধিকতর মার্জিত, এমনকি এশীয় ম্যাডোনায় সঙ্গে ওলন্দাজ বেটজি অথবা ব্রিটেনের ক্রানকয়েসের মধ্যে তুলনায় যে পার্থক্য দেখা যাবে তার চেয়েও বেশি। কিন্তু অন্তিমসজ্জায় তারা কৃষক, এবং সেইহেতু, সমগোত্র তাদের সঙ্গে এক মনপ্রাণ, যেখানেই তাদের দেখা নরওয়ে অথবা ব্রিটেনে, ফিনল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সে।

সেদিন সকালে আমি একটি বাড়িতে গিয়েছিলাম। সানন্দে আমি ঐ পরিবারের স্থায়ী বন্ধুত্ব কামনা করব। বাড়ির গৃহিণী এক অল্পবয়স্কা রমণী, কয়েক বছর আগে বিধবা হয়েছে। তার বড় ছেলেটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আমরা যখন সেখানে গেলাম ছেলেটি বাড়ি ছিল না, কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে। সে যদি চাল নিয়ে না ফিরতে পারে, সেদিন আর রান্না চরবে না। এমন নয় যে এসব আমাদের বলা হয়েছিল, অথবা জোর করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। বরং বলা চলে ফিরে আসার পর বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে খড়ের ছাউনি দেওয়া বারান্দায় বসে আমরা নিম্নস্বরে গল্পগুজব করছিলাম, যখন আমাদের মধ্যে একজন একটি বালিকাকে লক্ষ্য করল। বার-চোদ্দ বছরের কিশোরীর পরিধেয়ের স্বল্পতা সারা বছরের দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। হৃদয়ে তার কিশোরীর মর্যাদাহানির ক্ষত। বাড়িতে একজন পককেশ পিতামহীও ছিলেন। তিনি কিন্তু আমাদের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কিছুই বললেন না। তিনি বলছিলেন নুতন করে জেগে ওঠা গভীর এবং স্থায়ী অন্য সব দুঃখের কাহিনী—দীর্ঘ দিন আগে সাত সাতটি বলিষ্ঠ ছেলের মৃত্যুর কথা তাঁর মনে পড়ছিল। তারা সব কজন জোয়ান হয়ে উঠেছিল আর তারপর, এক এক করে, তাঁর আগেই, সব কটি ছেলে তাঁকে ছেড়ে গেল। বেহেস্তে পুনর্বার তাদের দেখা পাওয়ার আগে, তিনি এখন আল্লাহ্র পৃথিবীতে একা অপেক্ষা করছেন। একজন বিপত্নীক প্রতিবেশী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কিছু বলতে ও শুনতে। তার কোলে ছিল অত্যন্ত শীর্ণকায় একটি শিশুকন্যা। সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সে মা-হারা শিশুটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঐ নম্রস্বভাবা গৃহকর্ত্রী। কেমন করে বিশ্বস্তভাবে তার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে সে কাহিনী সে আমাদের বলছিল। পুনরায় বিবাহ তার কাছে অচিন্তনীয়। এইসব কাহিনী থেকে তার অতীত সুখের দিনগুলি অনুমান করে নেওয়া সম্ভব। আমরা থাকতে থাকতেই তার ছেলেটি শহর থেকে ফিরে আসে এবং পাউণ্ড চারেক চালের একটি থলে মায়ের হাতে তুলে দেয়। নদীর উপর একটি নৌকায় দুদিন ধরে ইট বহন করে সে ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে। ছেলেটি বলছিল কাজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এমন একটা সময়ে সম্ভব হলে কেহ মজুর নিয়োগ করে অর্থ ব্যয় করবে না। মুখ ফুটে না বললেও তার কথায় কাজ খুঁজতে বেড়িয়ে শূন্য হাতে ফিরে ফিরে আসার দুশ্চিন্তা স্পষ্ট অনুমেয় ছিল। ভরণ-পোষণের জন্য তারই উপর নির্ভরশীল এইসব পরিজনের সেদিন কি উপায় হবে ?

আমার ভ্রমণসঙ্গী সদাপ্রসন্ন হিন্দু ভদ্রলোক, অবশ্য ভবিষ্যৎ দুঃসময়ের জন্য

দুঃশ্চিন্তা করতে দিতে রাজী নন। "এসো, এসো মালক্ষ্মী! ভাগ্যবতী!" দীর্ঘ উপবাসে দুর্বল মাকে তিনি সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। সে তখন নিশ্চল ও নীরবে চোখের জল ফেলছিল। "আমরা তোমাদের সাহায্য পাঠাবো—ভয় করো না! আর শীঘ্রই সুদিন আসবে—ঐখানে! ঐখানে! ভুলে যেও না! আবার সুদিন আসবে।" ঝড়ো আবহাওয়ায় জাহাজের কাপ্তেনের মত, যখন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেশের দানে সংগৃহীত অর্থ এবং অনাহারী মানুষের জমিয়ে রাখা চাল দুই-ই নিঃশেষিত হবে এবং ঈশ্বর জানেন সাহায্যের জন্য সে কার কাছে হাত পাতবে, সেই ভয়ঙ্কর দিনের দুঃশ্চিন্তা যে তাঁর দয়ার্দ্র মনে পাথর হয়ে চেপে বসেছিল সেকথা তিনি মেয়েদের কাছে স্বীকার করবেন না।

ক্রন্দনরতা স্ত্রীলোকটি তার চোখের জল মুছে ফেলে নীরবে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করতে লাগল, কারণ কথাগুলো বলেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, এবং তিনি যে ছিলেন জনগণের পিতাস্বরূপ এবং তারপর প্রবীণা রিজফার প্রার্থনা ও আশীর্বচন শুনতে শুনতে তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ নৌকার উদ্দেশ্যে উঠে পড়লাম। কিন্তু আমাদের বিদায় জানাতে মেয়েরা জলাভূমির সেই কিনারা পর্যন্ত এসেছিল। এবং শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকিয়ে, আমি তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাদের হাতগুলি ঊর্ধ্বমুখী। "এবং আমি জানতাম যে তারা, অভাব ও দুশ্চিন্তার মধ্যেও, এই আমাদের, ভরপেট ও সুসজ্জিত মানুষদের উদ্দেশ্যে সকলের তরফে মনোহর অভিবাদন জানাচ্ছিল, "আপনাদের জীবন শান্তিময় হোক! সালাম-আলায়-কুম।"

৬

মতিভাঙা

বরিশালে যাদের অতিথি হয়েছিলাম তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, যদি আমরা একদা "বাংলার শস্যভাণ্ডার"-এর সমগ্র সবুজ সীমানায় চরমতম ক্ষতিগ্রস্থ কে: একটি অঞ্চল পরিদর্শন করি। তাঁরাই বলেছিলেন মতিভাঙাতে গেলে সে উদ্দেশ্যপূ হতে পারে ইতিমধ্যেই, খুলনা থেকে স্টীমারে আসার পথে গ্রামটি আমরা অতিক্রম করেছি। তাঁরা বলেছিলেন, "সেখানে কলাপাতা মানুষের পরিধেয় এবং শাকপাং খেয়ে তারা বেঁচে আছে।"

বাস্তবে, অবশ্যই, সেখানে লোকেরা ঐ ধরনের কিছু পরিধান করছিল না, কারং ত্রাণকর্মীরা প্রথমেই কাপড় চোপড় বিতরণ করে এরূপ অবস্থার অবসান ঘটাতে যত্নবান হয়েছিল। সংখ্যাল্পতা সত্বেও কাপড়গুলি মোটামুটি ভালই। তথাপি মতিভাঙায় এমন কিছু লোকের দেখা পেয়েছি যারা দুঃখকষ্টের চরম প্রান্তে উপনীত হয়েছিল, এবং আমি নিজে একজন মহিলার সাথে কথা বলি, পরিধেয় বলতে যার একখণ্ড পুরানো মশারি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

সমগ্র এলাকাটি তখনও বন্যার জলে ডুবে আছে। আমরা যখন স্বাচ্ছন্দ্যক স্টীমার থেকে দেখতে বিপজ্জনক নৌকাগুলিতে নেমে এলাম, আমাদের অভ্যর্থনা করতে সমবেত জনতা কোমর-জলে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী অপেক্ষ শীর্ণতর ও বিবর্ণতর দেখাচ্ছিল, চতুর্দিকে "মা! মা! দিন! দিন!" রব শোনা যাচ্ছিল সে যা হোক, তাদের বাড়িগুলি দেখার পর প্রকৃত দুর্গতি আমাদের বোধগম্য হয়। তাদের অধিকাংশই মূল নদী থেকে বিপজ্জনক একটি বদ্ধ জলা দ্বারা বিচ্ছিন্ন গ্রামে বাস করত, এবং এখানে আমরা ভেঙে-পড়া বাড়িগুলি দেখতে পাই, ঘূর্ণি জলে খড়ের চালাগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। যে-কটি আরও দু-চার দিন টিঁকে থাকবে, সেগুলিরও পতন অবশ্যম্ভাবী। ত্রাণকর্মীরা বলেছিল, সাত মাইল দূরে গ্রামের ভিতরে আমর আরও বেশী অভাব দেখতে পাব। কিন্তু আমাদের সময় অল্প ছিল, তাছাড়া আমার যথেষ্ট দেখা হয়েছে। মানব দুর্দশার প্রতিচ্ছবিতে কোন সূক্ষ্ম রুচি আছে এমন ভণিত আমি করতে পারি না। জলে ডুবে, ঝড়-জলে অথবা অপুষ্টিজনিত অবসন্নতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা, অথবা কোন মা যদি সন্তানকে মরতে দেখে যদিচ প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষ সংগ্রহ করতে পারলেও কে তাঁকে বাঁচাতে পারত, এর যে কোন একটাই আমার বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট যে এদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দেওয়া উচিত এরূপ ক্ষেত্রে আমি মন্দ, অধিকতর মন্দ এবং অতি মন্দ অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করি না

এই মতিভাঙাতেই আমি খড়ের চালায় বাস করতে দেখেছি—কিন্তু চালাগুলি তিন দিক খোলা, এবং মনে রাখতে হবে, ইংরেজদের ধারণানুসারে অকল্পনীয়ভাবে

ছোট—এ যেন উন্মুক্ত বাসায় পাখিরা। আমাদের নৌকাগুলির একটি ঐ রকম এক চালার নীচে গো-শালার মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল, এবং বৃষ্টি হতে মাথা বাঁচাবার জন্য সেখানে কিছুক্ষণ থেমে ছিল, জল সেখানে এত গভীর যে নিশ্চিত ধীরে ধীরে ঐ ছোট ছোট বস্তীর ভিত ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

বন্যাপ্লাবিত নদীর ধারে গ্রামগুলিতে একটি অদ্ভুত ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য ছিল হাট-বারে হাট বসতে দেখা। যেহেতু দোকানঘরগুলি এখন আর এ কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, খোলা নৌকাতেই বেচাকেনা হতো। এই নৌকাগুলিতে পুঁজিপাটার করুণ স্বল্পতা বর্ণনার অতীত, কোন ক্ষেত্রে হয়তো এখনও সম্পূর্ণ জলে ডুবে যায়নি দূরের এমন কোন কুটির হতে কটি শশা কিংবা কলা, অথবা চারটি লঙ্কা এই যা কিছু। মাথা-ভাঙায় কোন নির্দিষ্ট হাটবার ছিল না। কিন্তু একদিন খুব সকালে আমরা যথারীতি পরিক্রমায় বেরিয়েছি, দেখলাম একটি ছোট ভাসমান দোকান দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। আমরা নৌকা বেয়ে সেটির কাছে গেলাম, স্থির করেছিলাম যা হোক কিছু কিনব। কিন্তু হায়, বিক্রয়-সামগ্রী প্রায় কিছুই ছিল না। কয়েক ডজন, নয়-দশ বছরের বালিকাদের উপযোগী কাচের চুড়িই ছিল প্রধান পণ্য, এমনকি যেগুলিকে শাঁখা মনে হয়েছিল তাও ঝুটো এবং কাচের চুড়িরই রকমফের। আর ছিল কিছু মশলাপাতি, কয়েকটি কালির দোয়াত, আধ ডজন কাঠের চিরুনী, পুরো মজুতের দাম বোধ করি এক ইংরেজ শিলিং হবে। আমরা যা হোক কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বেছে নিলাম। এবং নিজেরাই দাম ঠিক করে, অতিকষ্টে হতভম্ব মাঝির হাতে অবিশ্বাস্য বড় অঙ্কের আট আনা পয়সা গুঁজে দিতে সক্ষম হলাম। তারপর আরও কিছু আমাদের চোখে পড়েছিল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম, "দাম কত?" আমাদের পিছনের উৎসাহী ছেলেদের একজন সনির্বন্ধভাবে বলল, "খুবই কম বলবেন না যেন," এবং প্রতিটি এক পয়সা করে চাইল। আমরা দু'পয়সা দেওয়া ঠিক করলাম এবং কয়েকটি নিলামও। কিন্তু এবারে দোকানী বিদ্রোহ করল। আমাদের কৌশল তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবং আমি জানি না অবশেষে কীভাবে তার সঙ্কোচ কেটেছিল।

অন্য দেশে কী হতে পারত, আমি বলতে পারি না, কিন্তু এখানে এই ভারতবর্ষে যে কেউ আমার মত উদ্দেশ্য নিয়ে সাফল্যজনকভাবে কোন অঞ্চল পরিক্রমা করতে চাইবেন, গ্রামবাসীদের পরিচিত ব্যক্তিরা তার সঙ্গী হবেই। গোপনে কিছু করা সম্ভব নয়। সমাজের স্বীকৃত নেতা ও জনমতকে সম্ভ্রম এবং তাদের উপর নির্ভর না করে ফলপ্রসূ কিছু করা যাবে না। সুতরাং, মতিভাঙায় অবস্থান কালে আমার চারদিকেও সহকারীরা ভীড় করেছিল। ত্রাণ-সমিতিগুলির না হোক চারজন অফিসার, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে আমাকে সমৃদ্ধ করতে হাজির ছিলেন। তাছাড়া আমার নিজের দলের কয়েকজন নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসী,—একজনকে প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে ডেকে আনা হয়েছিল, তার প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে এবং আমার তত্ত্বাবধানকারী অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ মেয়েটিও ছিল। খবরাখবর সংগ্রহ এবং মতামত গঠনে সাহায্য করে, এরা সবাই কোন না কোন ভাবে এক-একজন সংবাদ-সংগ্রাহক হয়ে

উঠেছিল। সর্বোপরি, আশাতীত সৌভাগ্যক্রমে, যে তরুণ ডাক্তারবাবু সকলে আগে জুলাই মাসেই মতিভাণ্ডার ভয়ঙ্কর অভাবের কথা জানতে পেয়েছিলেন, এদের মধ্যে তারও দেখা পেয়ে গেলাম। আমার নিজস্ব পরিক্রমা যখন শেষ হলো, তাে অনুরোধ করলাম প্রথমবার এসে তিনি কি দেখেছিলেন, এবং এ স্থানের কথা তিনি কীভাবে শুনলেন সে কথা বলতে। যে আগ্রহের সাথে তিনি বলতে লাগলেন, তাতে মনে হয়েছিল অবশেষে হৃদয় হালকা করার মত একজন শ্রোতা তিনি পেয়েছেন ২০শে জুলাই নাগাদ তিনি এসেছিলেন। অগস্ট মাসের মাঝামাঝির আগে বন্য শুরু হয়নি; সুতরাং তিনি যখন প্রথম আসেন বাড়িগুলি শুকনো মাটির উপরেই দাঁড়িয়েছিল। শুধু বৃষ্টি হয়েছিল অত্যধিক এবং খাল ও জলপথগুলি ভর্তি ছিল যার ফলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ছোট দেশী নৌকায় অনেক দূর পর্যন্ত যাও সম্ভব ছিল।

নিজে থেকেই তরুণ ডাক্তারবাবু বলে চলেছিলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের আমন্ত্রণে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পিরোজপুর নামে একটি জায়গায় যান এবং শুনতে পান প্রতিবেশী নাজিরপুরে খুব অভাব চলছে। নাজিরপুরে তাঁরা মতিভাণ্ডার ক শোনেন, তা না হলে এখানকার কথা অজানাই থাকত, এবং অনতিবিলম্বে দুই যুবক সেখানে উপস্থিত হন। যেন বিভীষিকার দ্বারা বিমোহিত হয়ে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বার ঘণ্টায় বারটি গ্রাম পরিক্রমা শে করেছিলেন। সেদিন মধ্য রাত্রের আগে তাঁরা সদর-দপ্তররূপে ব্যবহৃত আস্তান ফিরে আসেননি। তাছাড়া ফিরেছিলেন কেবল রাত্রির সেই মধ্য প্রহরেই দূরবর্তী বাজারে চাল কিনতে লোক পাঠাবেন বলে, যাতে তখনই বিতরণ করা সম্ভব হয় তাঁরা সামান্য অর্থ সঙ্গে এনেছিলেন, এবং গ্রামে ছিলেন এক সপ্তাহ। সুতরা ত্রাণের জন্য তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ঋণ করতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ের মত চাল তখনও ততটা দুর্মূল্য ছিল না।

তরুণ ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, "কখনও ভাবতে পারিনি এমন দৃশ্য দেখব অসংখ্য মানুষ সংজ্ঞাহীন। চলাফেরায় অক্ষম শিশুরা মাটিতে পড়ে আছে। মায়ের চিৎকার করে কাঁদছে। লোকের পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া। সন্ধ্যার পর কোথাও আে দেখতে পাওয়া যেত না। সন্ধ্যা আটটা অথবা ন'টার সময় আমরা একটি বাড়িতে ঢুকেছিলাম। সেখানে শিশুরা মাটিতে সংজ্ঞাহীন হয়েছিল, আর কোলে একটি শি নিয়ে মা প্রবেশপথের ওপরে। অন্ধকার থাকায় আমি তার উপরই পা ফেলেছিলাম তারপর দেশলাই জ্বেলে দেখতে পাই। পাশের গ্রামগুলিতে কিছু মেয়ে ছিল সম্ উলঙ্গ, এবং আমি যাতে দেখে না ফেলি সেজন্য তারা আড়ালে লুকিয়ে থাকত। তিন-চারজন স্ত্রীলোকের স্বামীরা শিশুসন্তান সহ তাদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সরকার কৃষি-জীবিদের ঋণ দিচ্ছে শুনে এদের মধ্যে একজন দরখাস্ত করে। নাজিরপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং পিরোজপুরে উচ্চতর অফিসার তাকে ফিরিয়ে দেয়। সুতরা

তার চাল কেনা হলো না। অথচ পুরো তিনদিন সে গ্রামে ছিল না, আর তার অনুপস্থিতিকালে ঘরে কোন আহার্যও ছিল না। ফিরে এসে পরিবারের সকলকে সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল। এটা ঘটেছিল প্রথমবার যখন আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের সুস্থ করে তুলতে অন্তত এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

"এই সময় একদিন সকালে জলার ধারে একটি গ্রামে এসেছিলাম। সেখানে দেখলাম বেশ কিছু স্ত্রীলোক গলা-জলে দাঁড়িয়ে গাছের বোঁটা থেকে খুঁটে খুঁটে কাঁচা ধান সংগ্রহ করছে। আমি তাদের সাহায্য করতে চাইলাম এবং আমার নৌকায় উঠে আসতে বললাম। কিন্তু তারা রাজী হলো না, বলল 'আমাদের পরনে কিছু নেই'।"

তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরেছিলেন যে অন্তত তের ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল, একটি পরিবারে বাবা এবং অপর একটি পরিবারে মা দুর্ভাবনায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ত্রাণকর্মীরা বলে, তারা ভেবেছিল যেহেতু ত্রাণ-ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়েছে, কেউ অনাহারে মারা গেছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু অন্তত এমন ৫০০০ ব্যক্তি ছিল যারা তিন-চার দিনের ব্যবধানে মাত্র এক বেলার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য পেত।

এই সমস্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, আমায় সহযোগিতা করতে নোয়াখালির দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকেন্দ্র হতে ডেকে আনা নবীন সন্ন্যাসীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন গভীরতর হতে দেখেছিলাম। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখার পরেই দারিদ্র্য সম্পর্কে শিক্ষণপ্রাপ্ত অনুভূতি দিয়ে সে আমাদের চারিধারের নিদারুণ দুঃখের ব্যাপকতা অনুমান করে নিতে পেরেছিল। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তার নিজের জেলার অবস্থা এখানকার সাথে কতটা তুলনীয়, সে বলেছিল সেখানে নিম্নতর শ্রেণীগুলির অভাব তার মতে এমন সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির দুঃখকষ্ট এমনকি এর থেকেও বেশী, এবং সম্ভবত অধিকতর দুঃসহনীয়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অভাব গোপন করার প্রবণতা এর জন্য দায়ী। এই শেষ বৈশিষ্ট্যটি যে দুঃস্থদের মধ্যে আছে, বাস্তবিক আমি সেটা প্রথম থেকেই জানতে পেরেছিলাম। বরিশালে আমাকে একটি বাড়ির কথা বলা হয়েছিল যেখানে ত্রাণকর্মীদের রাত্রি দুটোর সময় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যেতে হতো।

সুতরাং রূপসী বাংলার বিরাট ব্যাপক অঞ্চলের এখন এমনই চেহারা হয়েছে। মনে করার হেতু নেই যে অভাব কেবল বদ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। অত্যধিক বৃষ্টিতে উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলও ক্ষয়ক্ষতিগ্রস্ত। শস্যশ্যামল হওয়া উচিত ছিল যে দেশ সেখানে সর্বত্র দুষ্প্রাপ্যতার জন্য চাল অগ্নিমূল্য হয়েছে, এবং আমাদের সকলকে অভাবের পঙক্তিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনও শঙ্কা

করা হচ্ছে যে দূরে রেঙ্গুনে, যে মানুষেরা আমাদের বাজারগুলি পূর্ণ করার জন্য অতি দ্রুত নিজেদের চাল হাতছাড়া করছে, এক-দু মাসের মধ্যেই দুর্ভিক্ষের দংশন হয়তো তারাও অনুভব করবে। কলকাতাতেও দাম দ্রুত বেড়ে চলেছে, ইতিমধ্যেই তা স্বাভাবিকের দ্বিগুণ। সর্বত্রই আমাদের একই ভবিষ্যতের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ত্রাণকর্মীদের একমাত্র দুশ্চিন্তা "প্রহরী, রাত এখন কত চলো?" কারণ চাল ছেড়ে ক্ষুধার্ত বীজ মজুত করতে পারে না। জলে বিনষ্ট শস্য থেকে স্বাভাবিক ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। আগামী বছরের সংগ্রহও কি গত বছরেরই মত হবে? যদি তাই হয়, তখন বাস্তবিক, আমরা কেবল প্রার্থনা করতে পারি "ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করুন!" কারণ নিশ্চিত তখন মানুষের আর সাহায্য করার ক্ষমতা থাকবে না।

৫

চাল-ভিত্তিক জনরাষ্ট্র

দুর্ভিক্ষের অন্য নাম পক্ষাঘাত। হাজার হাজার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা এক সভ্যতাকে মাত্র এক বছরের দুর্ভিক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। কারণ, অঞ্চল বিশেষে, একত্রে সকল শ্রেণীগুলির দারিদ্র্য সমাজব্যবস্থার যোগসূত্র ও বন্ধনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্তমান সময়ের কথাই ধরা যাক না কেন। শ্রমের বিনিময়ে দেবার জন্য জোতদারদের না আছে এখন অর্থ, না খাদ্য এবং শ্রম ব্যতীত, পরবর্তী বছরের ফসল রক্ষা করা যায় না, এমনকি এই অবস্থাতেও যেটুকু সম্ভব ছিল। এমন পরিস্থিতিতে, সুস্পষ্টতই জোতদার এবং তার বর্গাদার উভয়কে খাদ্য যোগান এবং জোতদার তার বর্গাদারকে খাদ্য যোগান এক জিনিস নয়। কেননা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খাদ্য শুধু পুষ্টি যোগায় না, পরবর্তী বছরের ফসলের জন্য জরুরী শ্রম বিনিয়োগও করে। প্রাচ্যে হয়তো, আমাদের অধিকতর বেশী চেনা কনিষ্ঠতর দেশগুলি অপেক্ষা, আকস্মিক স্নায়বিক বিপর্যয় কেটে যাবার পর ভারসাম্য ফিরে আসার মানসিক প্রস্তুতি অধিকতর বেশি থাকে। হয়তো থাকে। আছেই এমন কথা নিশ্চিত জানি না, কারণ আমার এখনও দেখার সুযোগ হয়নি। তবে পার্থক্য খুব বেশি হয়তো মাত্রার। দুর্ভিক্ষজনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা গৌণ, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

কারণ ক্ষুধা ছাড়াও দুর্ভিক্ষ আরও অনেক কিছু। সত্য, এই ক্ষুধা এত তীব্র যে আমার পরিচিত এক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের প্রশমন হয়নি এমন একটি জেলায় কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর রাত্রে ঘুমাতে পারেনি, কারণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের করুণ বিলাপ তার কানে বেজে চলেছিল। ক্ষুধা কী তীব্র! হায় ভগবান! কত ক্ষুরধার! কিন্তু এর তাৎপর্য যে আরও বেশি ইতিমধ্যেই আমরা সেটা দেখেছি। দারিদ্র্যের চরম পর্যায় হলো ক্ষুধা, সঙ্গে নিয়ে আসে উলঙ্গতা, রাত্রির অন্ধকার, অজ্ঞতা, এবং কর্কশতা, এবং অন্যান্য। এ হলো দারিদ্র্য হতে দারিদ্র্যের জন্ম। ক্ষুধার জ্বালায় কখনও কখনও আট আনা অথবা এক শিলিং-এর পরিবর্তে দুগ্ধবতী গাভী কশাইকে বিক্রী করে দেওয়া হয়, কারণ মালিক আর ওগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না। আর নতুন মালিক অনতিবিলম্বে জবাই করে চামড়ার জন্য, যে দামে কিনেছিল সেই দামেই বিক্রী করে দেয়। দুর্ভিক্ষ যখন আসে, পরবর্তী বছরের বীজধান খেয়ে ফেলা হয়, সমস্ত জীবনের সঞ্চয় বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সমাজ কাঠামোয় যে পারস্পরিক আত্মীয়তা সহজাত মনে হতো তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কিন্তু এসব কিছুর উপরেও দুর্ভিক্ষ আরও বেশি কিছু। এই তো সেই মৃত্যুর

কান্তে, এক অদৃশ্য অথচ পূর্বনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে শিকার নির্বাচন করে চলেছে, কি সে অভিপ্রায়, সেটা আমাদের অনুসন্ধানের উপযুক্ত।

কয়েক বছর আগে লণ্ডনে একটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। আমার যদি স্মৃতিভ্রংশ না হয়ে থাকে, সে ছবির নাম ছিল "জীবনের সিঁড়ি"। সুপ্রশস্ত ধাপগুলির শীর্ষে হাত ধরাধরি করে যুবক ও যুবতী দাঁড়িয়েছিল, আর তারপর নিম্নগামী প্রতি ধাপে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে, নীচে মৃত্যু নদীর দিকে, বার বার, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, সেই একই দম্পতিকে দেখা যাচ্ছিল। আমি যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলিতে গেছি, বার বার আমার এই ছবিটির কথা মনে এসেছে। পার্থক্য মাত্র, মানস চক্ষে যে মৃত্যুর নদী দেখি, এখানে তা বন্যা, এবং সিঁড়ির প্রতি ধাপে স্বাস্থ্য ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ভুক্তরা, বর্ধিষ্ণু জলে ভেসে যাওয়ার সম্ভাব্যতা অনুসারে তাদের শ্রেণীবিন্যাস।

ভিক্ষুকদের অবস্থান সর্বনিম্নে কারণ প্রত্যেক ভারতীয় সম্প্রদায়েই এদের একটি নির্দিষ্ট কোটা আছে। এখানেও এদের সংখ্যা কম নয়, এবং নৈরাশ্যকর দীন ও অসহায়জনক দুর্বলকে গ্রামের বেসরকারী দাতব্যে প্রতিপালন করার অবশ্য প্রয়োজন দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, সকল ঋতুর ঝড়ঝাপটায় শুষ্ক ও বলিরেখা যুক্ত। এরা দাঁড়িয়ে থাকে স্টীমার ঘাটে অথবা বাজারগুলিতে, হাতে যষ্টি ও ভিক্ষাপাত্র। কোন ক্রমেই এ দৃশ্য চিত্রসদৃশ মনে হতে পারে না, ভারতীয় জনতা দেখলে সাধারণত যেমন মনে হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক, গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এরাই সকলের আগে প্রতিকূলতার তীব্র দংশন অনুভব করে, সর্বাগ্রে এক ব্যাপকতর প্রসারিত দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাস্তবিক বাংলা শব্দ দুর্ভিক্ষ, 'কষ্টসাধ্য-ভিক্ষাবৃত্তি', তাদের দৃষ্টিকোণ হতে দুর্দশার এক অত্যাশ্চর্য ছবি উপস্থাপিত করে। এই শব্দের দ্বারা ভিক্ষুকের যে চিত্র উপস্থিত তাতে দেখা যাবে এরূপ ব্যক্তি এক মুঠো আহার্য খুঁজে পেতে দিক নির্বিশেষে দূরে বহু দূরে হেঁটেই চলেছে। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের অবস্থায় একমাত্র বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা ছাড়া মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ ও সুকুমার উপাদানগুলির প্রকাশ সম্ভব নয়, এবং ভারতবর্ষে গ্রামের ভিক্ষুকেরা ভিন্ন দেশের সমগোত্রীয়দের অপেক্ষা না অধিকতর ভাল, না মন্দ। সময় সময় তাদের সরস প্রত্যুত্তর চটপটে ও অর্থপূর্ণ, এবং মজাই পাওয়া যায়, যখন যে হয়তো তাকে খানিকটা চাল দিয়েছে তারই মুখের উপর গম্ভীরভাবে সে বলে দিল আগের দিন রাত্রে তার নৈশভোজ ছিল 'ঘোড়ার ডিম' (চলতি বাংলায় অনাহার বোঝায়)। অবশ্য এ কথাও নিশ্চিত সত্য, আধ্যাত্মিক ভাবে ভিখারী লাখপতির যমজ ভাই। কারণ উভয়েরই মন সম্পদ অর্জনে নিবিষ্ট। এই মাত্রায় নিবিষ্টতা অন্তর্বর্তী কোন শ্রেণীর মধ্যে থাকা অসম্ভব।

তবে অনাহারক্লিষ্টদের মধ্যে তীর্থযাত্রাকালে আমার একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এক বিশাল ব্যবধান দরিদ্রতম নাগরিক এবং এইসব পৌর ভিক্ষাজীবীকে পৃথক করে রেখেছে। ভারতের দরিদ্রতম গৃহস্থকেও ভিক্ষুকে পরিণত করতে অনেকগুলি ফসলহানির প্রয়োজন। এটা না বুঝলে, সমস্ত নৈতিক উপদেশ আমাদের অনাস্বাদ্য থাকবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্লাবনের শিকার হয় সম্ভ্রান্ত বিধবা, এবং তাদের রক্তের সম্পর্কের

অবিবাহিত মেয়েদের মতো নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকেরা। এদের ভরণ-পোষণের কেউ নেই, এবং কাজেই শহরের বাজারের জন্য কৃষকের ধান ভেনে জীবনধারণ করতে হয়। এশীয় গ্রাম্য-জীবনে এরাই ধান-কুড়ানি। কারণ কৃষক যখন ফসল কেটে ঘরে তোলে, এরা পিছনে পিছনে ঝরে-পড়া শস্যের দানা কুড়ায়। তা দিয়েই বার মাসের এক-দুই মাস চালিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের মজুত কোন বাজার থেকে কেনা নয়। বাস্তবিক, এদের হাতে পয়সা আসা দুরূহ। তারা যখন ধনী কৃষকের বাড়িতে কাজ করে অর্থের পরিবর্তে মজুরি সাধারণত দেওয়া হয় পণ্যে। কোন বড় উৎসবের সময় জোতদার গৃহিনী এক-আধখানা কাপড় দিলে তাই দিয়েই সম্ভবত তারা সারা বছরের প্রয়োজন মেটায়।

মতিভাঙার বিষাদজনক পরিবেশে একটি বিষাদতম নিদর্শন ছিল যখন একটি ছোট বাড়িতে এক বৃদ্ধা ও তার যুবতী নাতনীকে—এরা দুজনেই সেই ধান-কুড়ানি শ্রেণীর—এক সঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেল। ক্ষুধার জ্বালায় মেয়েটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল, আর তার ঠাকুরমা এত দুর্বল যে সাহায্য দূরস্থান, নড়াচড়া করার ক্ষমতাও তার ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে ত্রাণকর্মীরা এই অবস্থায় তাদের আবিষ্কার করে। সুতরাং প্লাবন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে।

পরবর্তী স্তরে সে পৌঁছায় কৃষক এবং খামার-মজুরের বাড়িতে। বড় কৃষক, ছোট জোতদার অথবা জমিদাররা সব শেষ, কিন্তু কেন্দ্রীয়, গ্রামীণ গোষ্ঠী এরা হয়তো প্রথমে বহুদূর থেকে জল বাড়তে দেখে থাকবে।

এরা ছাড়াও অবশ্য আরও কতগুলি শ্রেণী আছে, প্রত্যেকে কোন না কোনভাবে সারা বছরের খাদ্যের জন্য সেই বছরের ফসলের উপর প্রত্যক্ষরূপে নির্ভরশীল। এরাও পরোক্ষ কিন্তু অপরিহার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামগুলিতেই আছে জেলে ও মাঝিরা। যদিও অন্য এক ধরনের খাদ্য সরবরাহে কার্যত নিযুক্ত, তারাও বছরের ধান যথেষ্ট হবে কি হবে না সে প্রশ্নে তাদের প্রতিবেশীদের সমরূপ উদ্বিগ্ন থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও এক খণ্ড জমি খাজনা নিয়ে চাষ করে।

অধিকন্তু, জেলার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত, গ্রামাঞ্চলের গঞ্জগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবীরাও আছে। যেমন ব্রাহ্মণ, অথবা গ্রামের পুরোহিত সম্প্রদায়; স্কুল শিক্ষক; রেল কর্মচারী। ছোট স্টেশন মাস্টার ও অন্যান্যরা; গ্রাম্য কারখানা ও দোকানের কেরানী; পত্রলেখক; ডাক্তার; এই রকম আরও সব। এই সকল ব্যক্তিদের নিকট কৃষিনির্ভর শ্রেণীগুলি যথার্থ সোপানস্বরূপ যার উপর তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষণ প্রত্যাহৃত হলে ক্ষুধার প্লাবন, অধিকতর নৈরাশ্যকর ও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের সকলকে গ্রাস করবে, কারণ তাদের অতিক্রম করার মত সামাজিক অবনয়নের কোন অন্তর্বর্তী পর্যায় নাই। কৃষক হয়তো দুঃখকষ্টের এক মন্থর সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রথমে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে রূপান্তরিত হবে। তারপর, তার মৃত্যু অথবা গৃহত্যাগের দরুন, তার পরিবারের

মেয়েরা, চাষীর ঘরের আত্মসম্ভ্রমযুক্ত গৃহবধূর পরিবর্তে ধান-কুড়ানিতে পর্যবসিত হবে। কল্পনা করা সম্ভব শেষ পর্যন্ত সেই ছোট পরিবারের একজন অথবা সকলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে পশুর জীবন-যাপন করবে। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে—এবং গ্রামের স্কুল মাস্টার অথবা ডাক্তার অথবা ছোট জমিদার সম্ভবত পাশ্চাত্য দেশগুলির যে কোন বিরাট ভূখণ্ডের অধীশ্বর অপেক্ষা ভদ্রসমাজোচিত অহংকার বিষয়ে অধিকতর আত্মসচেতন—একজন ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে যখন অনাহার আসে, মাথা লুকানো এবং মৃত্যুবরণ ছাড়া তার আর করার কিছু থাকে না। সুতরাং সবুজ এই দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে, মৃত্যুর নদী জোয়ারের বাণে কানায় কানায় পূর্ণ, এবং ছোট জনরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও আনন্দ এখন অবসৃত। চাক থেকে মধু অপহৃত। শুভ বছরগুলির সূর্য-কিরণ ও প্রাচুর্যে সংগৃহীত আশা ও আনন্দের পুঁজি আর অবশিষ্ট নাই। আবার পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কেমন করে নিরুদ্যম মৌমাছিরা কাজ শুরু করবে?

আরও গৌণভাবে ও পরোক্ষে হলেও, সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে। এখানে এই দূরের শহর কলকাতায়, এখন গরিবের খাদ্য চাল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দুর্মূল্য। প্রতিমণ তিন ফ্লোরিন থেকে বেড়ে হয়েছে ছয় ফ্লোরিন বা তারও বেশি। এর মানে হলো, অনেক অনেক পরিবারে, স্ত্রীলোকেরা এখন এক বেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, যাতে শিশু ও উপার্জনকারীদের যেটুকু প্রয়োজন তা দেওয়া যায়।

যে লোক সব সময়েই দারিদ্র্যের কিনারায়, খাদ্যদ্রব্যের সামান্যতম মূল্যবৃদ্ধিও তার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট বয়ে আনে। অন্য খাদ্যসামগ্রী অবশ্যই কিছুটা পরিমাণে পরিবর্ত হতে পারে, কিন্তু চালে যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে হঠাৎ গম খাওয়া অভ্যাস করা সহজ নয়। বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে এই চিন্তাটাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর তা যদি নাও হতো, চাহিদা বাড়ায় গমের দামও চালের সঙ্গে সমান তালে, বেড়ে চলেছে।

তাহলে, কলকাতায়ই এখন খাদ্য সামগ্রীর দাম স্বাভাবিকের দ্বিগুণ। কিন্তু ঢাকা ও মৈমনসিংহে প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য না হোক চারগুণ বেড়েছে। কোন সাধারণ বছরে চার ফ্লোরিণে যে পরিমাণ চাল পাওয়া যেত এখন ঐসব বাজারে, আমি শুনেছি, সেই একই পরিমাণ বিক্রী হয় পনের ফ্লোরিণে, অর্থাৎ সঠিক অঙ্কে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের দাম পাঁচ শিলিং থেকে বেড়ে হয়েছে আঠের শিলিং আট পেনি। কেহ কী কল্পনা করতে পারবে এই ভয়াবহ ঘটনার মানবিক অর্থ কি?

দিন মজুর ও শ্রমজীবী, রাজমিস্ত্রী, তাঁতী, কারিগর, রাখাল ও মৎসজীবী, অথবা ছোট দোকানী অথবা ব্যবসায়ীরাই বা কেমন করে এত চড়া দামে খাদ্য কিনবে?

শুধু তারা কেন, সামাজিক মানদণ্ডে উচ্চতর, যারা এদের কাজ দেয়, তাদেরও কি সম্ভব খাদ্য ক্রয়ের অর্থ দিয়ে মজুরের পারিশ্রমিক দেওয়া? যদি আমরা কেবল অবসরবৃত্তির উপর নির্ভরশীল শ্রেণীগুলির দিকে তাকাই, দেখব, অবসর বৃত্তির আর্থিক অঙ্ক আগের হারে থাকলে তার ক্রয় ক্ষমতা অর্ধেক থেকে এক ষষ্ঠাংশে অবনমিত হয়েছে।

কিন্তু কৃষকের জগতেই ফিরে যাওয়া যাক না কেন। এইখানেই তো সারা

দেশের সম্পদ ও দারিদ্র্যের পীঠস্থান। কেমন নীরব এ জগৎ। কেমন কষ্টবাহ।
আমরা মতিভাঙার ক্ষেত্রে দেখেছি, নিতান্ত দৈবক্রমেই আমাদের সেই ডাক্তার বন্ধু
২০শে জুলাই, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যার ফলে সম্ভব হয়েছিল দূরে শহরে কৃষক
সম্প্রদায়ের অবস্থার কথা জানানো। এবং তিনি যখন এসেছিলেন তখনই দুঃখকষ্ট
কোন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, সেকথা আমরা তার মুখেই শুনেছি।

তথাপি সেখানে এমন কেহ ছিল না প্রতিবেশীর স্বার্থে অনাহার জনিত সংকটের
কথা মানুষের কাছে পৌছে দেবে। স্মরণ করা যেতে পারে, এক ব্যক্তি দুঃস্থ
কৃষিজীবীদের জন্য সরকারী ঋণের কথা শুনেছিল, এবং তা পেতে গ্রামের বাইরে
গিয়েছিল। কিন্তু নাজিরপুরে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং পিরোজপুরেও
সুতরাং তিন তিন দিন কাটিয়ে চাল না নিয়েই সে ঘরমুখো হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের গ্রামগুলি দেখার পর, যে কোন ব্যক্তির প্রবল ধারণা হবে যে আধুনিক
পৃথিবীর সর্বত্র দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে। একদল যারা অল্পবিস্তর নিরক্ষর কৃষক
তারা কেন্দ্রকে দেয়। আর শিক্ষিত স্বাক্ষর ও শহরবাসীরা, কোন না কোন ভাবে
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে, কেন্দ্র থেকে নেয়। এবং দুই দলের বিস্তর ব্যবধান।
গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী ও আমাদের বিংশ শতাব্দীর ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী মানুষের
মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে মনে হয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি আধুনিক যুগের
অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্যে অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজন করেছে।

রাষ্ট্রকে যদি মানব দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে কৃষি নির্ভর শ্রেণীগুলি
যেন রয়েছে এই দেহে রক্ত-সঞ্চালন করার জন্য। শহরের যারা বাসিন্দা, শহরের
শিক্ষা-দীক্ষা, তারা রক্ত যোগায় ফুসফুসে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে, সামগ্রিকভাবে
দেহের দ্বারা উদ্দীপ্ত হবে, তার প্রতি সংবেদনশীল থাকবে, তার যে কোন অংশের
শুভাশুভের দ্বারা প্রভাবিত হবে এমন একটি হৃদয়যন্ত্র অনুপস্থিত। যা আছে সেটা
সম্ভবত এক অনুপ্রবেশকারী জড়পিণ্ড বিশেষ, অনভিজ্ঞ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে নির্লি-
অস্পষ্টভাবে হৃৎপিণ্ডের করণীয়গুলি অনুসরণ করে চলেছে মাত্র। একটি বিদেশী সর
থাকার অর্থ কি তাহলে এই? এই রকম হালচালই কি তাহলে বিদেশী সরকারী
কর্মচারীদের স্বভাবসুলভ?

তাহলে কি আমরা আরেকবার সেই চিরকালীন সত্যের প্রমাণ পেলাম, "
কেবল একজন বেতনভুক মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে
মেষগুলিকে ফেলে রেখে সে পালিয়ে যাবে। বেতনভুক ব্যক্তি পলায়ন করে তার
কারণ সে বেতনভুক, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন মাথা ব্যথা নাই।"

৬

অভাবের অগ্রগমন

একটি দুর্ভিক্ষ দেখার পর, অতীতে ভারতবর্ষ আর কখনও এরূপ বিরাট বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছে কি করেনি সে আলোচনা অন্তঃসার শূন্য। একটি বিরাট নদীর তীরে অবস্থিত সুদৃশ্য অট্টালিকা এক বছরের বন্যায় ভেঙ্গে পড়ল, তারপর যা অবশিষ্ট থাকল সে শুধু এক ধ্বংসস্তূপ। বাড়িটি ভেঙ্গে পড়েছিল ফলে একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছাবার মুহূর্তে। হ্যাঁ। এভাবে একবার স্পর্শেই সেটা ভেঙ্গে পড়ত না, যদি না আগে বেশ কয়েক বছর ধরে নীচের জোর ও ভিতের গোড়া জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিশ্চিত ক্ষয়ে যেতে থাকত। চূড়ান্ত বিপর্যয় নিঃশব্দে অগ্রগমিত দুর্গতের নাটকের শেষ দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এরূপ পরিস্থিতিতে বাড়িটি নির্মাণই সম্ভব ছিল না। সার কথাটি এই। এরূপ পরিস্থিতিতে এই জনরাষ্ট্র কখনই গড়ে ওঠেনি।

পূর্ববঙ্গে আজকের এই সমৃদ্ধি সুখের দিনের সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে। একি মৎসজীবী ও কৃষকের অহঙ্কার এবং আত্মনির্ভরশীলতা? একি ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীর রুচিশীল আতিথেয়তা? যদি বর্তমান যন্ত্রণা অনুক্রমণিত হতে থাকে দুই-এ মিলে, নিশ্চিত ভাবে এক হীন দারিদ্র্যের উদ্ভব হবে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তারা কখনও আত্মস্থ হতে পারে না।

অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, অথবা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বিধ্বংসী লীলা এক ঘণ্টায় ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যাপকতায় আমরা দুর্ভিক্ষ দেখলাম সেই প্রতীয়মান ধ্বংসের কারণ বছরের পর বছর ফসলহানির সুদীর্ঘ প্রস্তুতি পর্বেই অকস্মাৎ সংযুক্তি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক শতাব্দী অথবা অর্ধ শতাব্দী কালপর্বে কোন না কোন সময়ে যে ফসল হানি ঘটে, দৈবে বিশ্বাসী কোন গণিতজ্ঞের কাছে সেটা স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। এবং সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে সমভাবে স্বতঃসিদ্ধ যে তিন হাজার বছরের এক কৃষি নির্ভর সভ্যতা অনুরূপ পৌনঃপুনিকতায় অভ্যস্ত এবং মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।

এই বাস্তব সত্য অনুসারে পূর্ববঙ্গের লোক সর্বদা এক সময়ে দু-তিন বছরের উপযোগী মজুত ধরে রাখতে অভ্যাস করেছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র, ধনী পরিবারগুলি, মণের হিসাবে, মাস অথবা বছরের প্রয়োজনানুসারে চাল কেনে, যেমন আমরা লণ্ডনে টনের হিসাবে কয়লা কিনে থাকি। ভাবা যায়নি, বিক্রয়ের জন্য, যে মজুত তার পোষ্য পরিবারের, কেবল চলতি বছরের নয় যদি দেশের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে যে পরপর দু'বছর ফসল হল না তখন খাদ্য নিশ্চিত করবে, তাতে কৃষক হাত দেবে। এখন আমার কথিত কাহিনী যারা অনুসরণ করেছেন, তারা এর প্রয়োজন বুঝবেন। এই রেওয়াজটাই ছিল শিষ্টাচার। ছিল আরও কিছু বেশী

নীতিজ্ঞান, ধর্ম, জাতীয় ন্যায়বোধ। এবং আরও অধিক কিছু। এটি পরিষ্কার বাস্তববুদ্ধি। কেন না আমরা দেখেছি, যে কৃষক ফসলের উৎপাদন হতে ব্যাংত হবে জেনেও মজুরের বেতন যোগাতে পারে না (ঠিক যেমন বাণিজ্যিক অথবা উৎপাদনকারী সংস্থায় লাভের পরিবর্তে ঘাটতি চলতে থাকলে), সে নিয়োগ কর্তার আসন চ্যুত হয়ে নিজেই নিয়োজিত দিন মজুরে পরিবর্তিত হবে। কৃষক না হয়ে সে তখন চাষা, অথবা হলধর ছাড়া আর কিছু নয়। খাদ্য হয়তো আবার জেলায় ফিরে আসবে, ত্রাণ সমিতিগুলির মাধ্যমে অথবা রেলপথ ধরে, তবে সেটা তার হাতে ফিরে আসা হলো না। সে তার সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছে, আবার সে মর্যাদা ফিরে পেতে হয়তো বা বহুকাল অতিবাহিত হবে। অতএব পুঁজিপতিরূপে কৃষকের নিরাপত্তার এক মাত্র শর্ত নিজের হাতে তিন বছরের উপযোগী চালের যোগান মজুত রাখতে হবে। কলকাতার খুব কাছেই, মগরাহাট জেলায়, যেখানে কৃষকদের বাড়িগুলি আরও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী উপকরণে নির্মিত, সারি সারি ধানের গোলা—গঠনে এর অনেকগুলি অতি সুন্দর শূন্য দেখতে পাওয়ার মত হৃদয়বিদায়ক আর কিছু আমার জানা নাই। এবং সেখানে একজনও, তিন বছরের দুরস্থান এক মাসেরও যোগান ধরে রাখেনি।

খাদ্যের অস্বাভাবিক আর্থিক মূল্যই আমাদের নিকট যথেষ্ট ব্যাখ্যা কেন পূর্ববঙ্গের কৃষক এই বছরগুলিতে পূর্বপুরুষের নির্দেশমত গোলাগুলিতে চাল মজুত করে রাখতে পারল না। তারা এমন এক জগতের বাসিন্দা যেখানে আর্থিক পুঁজিকে অধিকতর গুরুতর গণ্য করা হয়। সকলেরই জানা আছে একটি প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রাকে ভারতবর্ষে এক টাকা বলে এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তত্ত্বগতভাবে এক ইংরেজ ফ্লোরিণের সমমানের ধরে নেওয়া যেতে পারে। কয়েকশত বছর আগে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের যুগে ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। এই নবাব নিশ্চই মহৎ ও মহান ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের আসফুদ্দৌলার মত, আজ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একদা যারা তাঁর প্রজা ছিল তাদের মনে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কারণ একটি কৃষি নির্ভর জাতির রাজার প্রকৃত গৌরব কি হতে পারে তিনি সেটা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ঢাকায় তিনি এক বিরাট তোরণ নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং তার উপর এটি ছিল এক ধরনের কৃষি সংক্রান্ত আর্ক অ্য ট্রায়ামফ—খোদাই করা ছিল যে তাঁর চেয়েও অধিকতর প্রজামনোরঞ্জক কোন শাসনকর্তার উত্থানের আগে এর দ্বারগুলি খোলা যাবে না, কারণ তাঁর শাসনকালে বাজারে টাকায় আট মণ চাল বিক্রী হতো, অর্থাৎ এক ফ্লোরিণে পাওয়া যেত ছয় ইংরেজ শতক।

কিন্তু কেহ হয়তো বলবেন, সে সময় চাল অনেক থাকলেও, টাকা দুষ্প্রাপ্য ছিল। কথাটি সত্যি। কিন্তু তা হলেও, এই কাহিনী দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি। কারণ দ্বারগুলি কখনই খোলা হয়নি। ঢাকার শায়েস্তা খাঁকে তার নির্বাচিত সাফল্যের ক্ষেত্রে কেহ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

পঁচিশ বছর আগে, সে যা হোক, পূর্ববঙ্গে টাকা বর্তমান সময়ের মতই সুগম ছিল। এ বিষয়ে তখন আর এখনের মধ্যে পার্থক্য খুব একটা ছিল না। আর বরিশালে, পঁচিশ বছর আগে, এক মণ চাল সোয়া ফ্লোরিণে কিনতে পাওয়া যেত। শ'য়েস্তা খাঁর সময় থেকে অবস্থার নিশ্চয়ই অবনতি ঘটেছিল, কিন্তু আজকের দামের সঙ্গে তুলনাটা কেমন হয়, ঐ একই পরিমাণের পণ্যের দাম এখন ছয় থেকে সাড়ে সাত ফ্লোরিণ, এবং মূল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে নয় কি? এমন কি দশ-এগার বছর আগেও, বরিশালে চাল বিক্রী হতো প্রতি মণ দুই ফ্লোরিণ করে।

আবার, রাজধানী বরিশাল সহ বাখরগঞ্জের সামান্য পূর্বে, নোয়াখালি জেলার কতগুলি দ্বীপে, মাত্র ছয় বছর আগে মাটি এত উর্বর ছিল, চাষবাস এত সহজ ছিল, এবং রপ্তানি এত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে এক মণ চাল এক ফ্লোরিণেরও কম দামে বিক্রী হতো। অনুধাবন করা যায় যে এরূপ পারিপার্শ্বিকতায় টাকার হাত বদল সামান্যই হতো, বেশীর ভাগ বাণিজ্য এবং শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করা হতো পণ্যে। একটি কৃষি নির্ভর পৃথিবীতে এ ঘটনা নিশ্চিত সমৃদ্ধির লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, খুব বেশীদিনের কথা নয় যখন এক ব্যক্তি এ অঞ্চলের একটি দ্বীপে রাস্তার ধারে এক বাণ্ডিল ব্যাঙ্ক নোট কুড়িয়ে পায়। সব সমেত তার মূল্য হবে তিন হাজার দুই শত ফ্লোরিণের মত। কিন্তু সে অথবা তার প্রতিবেশীরা ইতিপূর্বে কখনও এমন অদ্ভুত ছবি দেখেনি, তবে ছবিগুলিতে এক ধরনের সৌন্দর্য আছে বলে তাদের মনে হয়েছিল। সুতরাং ওইগুলি গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় দেওয়ালে সেঁটে ঘর সাজাবার জন্য। তারপর পুলিশ এ-কাহিনী শুনলো, আর তখন ইডেন উদ্যানে সরিসৃপের প্রবেশ ঘটল। কারণ প্রকৃত মালিককে নোটগুলি খুঁজে ফেরৎ দেওয়ার পর যে অস্বাভাবিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সরল গ্রামবাসীরা তা থেকে টাকার মূল্য শিখল।

কিন্তু কৃষকের উচ্চাকাঙ্খা যে চাল থেকে রৌপ্য মুদ্রায়, ভরা গোলা থেকে ভরা সিন্দুকে রূপান্তরিত হলো, তার কারণগুলি কি ছিল? কারণ উচ্চাকাঙ্খার পরিবর্তন না হলে, এটা স্পষ্ট যে শস্যের আর্থিক মূল্য এত দ্রুত বাড়ত না। সাড়ে ছয় থেকে চৌদ্দ ফ্লোরিণ ব্যবসায়ীর ধার্য, এমন অস্বাভাবিক দাম কৃষক নির্ধারিত করতে পারে না। অর্থাৎ, কোন প্রদেশ যখন ভাঁড়ার শূন্য, খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর, মাত্র তখনই দেশের শস্য এত দুর্মূল্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সম্ভবত এ কথা বলাই যথেষ্ট যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটি প্রক্রিয়া চলেছে, যার ফলে কৃষক এখন অর্থকে সম্পদরূপে গণ্য করে। এই প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ করতে পারে যে তথ্য তা হলো খাজনা এবং ট্যাক্সগুলি মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। বিদেশী ট্যাক্স-আদায়কারীও বিদেশী রাজস্ব মন্ত্রীর চালের মৌলিক মূল্যমান সম্পর্কে কিছু জানা নাই। তাদের বিচারে, মূল্যবান ধাতুগুলি এই স্থান অধিকার করে আছে। এই একটি ঘটনাই কৃষককে আপেক্ষিকভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলির তুলনায় দারিদ্র্যে পর্যবসিত করতে পারত। এমন কি ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ দেশের সীমানার বাইরে না গেলেও। তা যে হয় না সেটা সকলেই

জানেন এবং এই পর্যায়ে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। বর্তমানে আমার একমাত্র লক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যে পূর্ববঙ্গের সম্পদ ধীরে ধীরে ক্ষয় করে বর্তমান বিপর্যয়ের পথ প্রস্তুত করায় কোন স্থানীয় অথবা স্বল্প পরিচিত ঘটনার খানিকটা পরিমাণে বিশেষ ভূমিকা আছে কিনা। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে করের বোঝা অত্যন্ত গুরুভার। বলা হতে পারে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত আছে, অতএব করের হার অপরিবর্তনীয় যুক্তিটি সামান্যই বুদ্ধিদীপ্ত বলে গণ্য করা যায়। অনেকদিন আগেই নানা সেস্ বসিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বে-আইনী হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। রোড সেস্ আছে, জেলা সেস্ আছে, এবং মনে হয় সাম্প্রতিক কালে দ্বিতীয়টিকে দ্বিগুণ করা হয়েছে। তাছাড়া, জেলা বোর্ড এই সব রাজস্ব জেলার প্রয়োজন ও সভ্যতার উপযোগী কাজের পরিবর্তে ইংরেজদের আদর্শানুযায়ী ব্যয় করার অনুমোদন পায়। প্রথম ক্ষেত্রে, সব কিছুর আগে জলপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি বিধান প্রয়োজন। এখন হয়তো, বোর্ডে ইংরেজ সদস্যরা সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়, কিন্তু যাদের নিয়ে গঠিত তারা অধিকাংশই ইংরেজদের মনোনীত এবং ইংরেজ ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বড় বড় রাস্তা ও হালকা লোহার পুল নির্মিত হয় দেশে গমনাগমন সুলভ করার উদ্দেশ্যে। এ সব বিদেশী ইঞ্জিনীয়ারদের পেট ভরায়, কিন্তু দেশীয় জলাশয়গুলি অসংস্কৃত থাকে। এই সব উপকর চাপানোর পরেও, জনসাধারণের ক্ষোভের আর একটি কারণ হলো যাকে তারা বলে "জরীপ ব্যবস্থা"। তারা মনে করে এই ব্যবস্থা বিগত তিন বছর ধরে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। অর্থাৎ জমি ভিত্তিক স্বার্থ সম্পর্কিত সমস্ত বকেয়া বিবাদ ও বিক্ষোভ খতিয়ে দেখে স্থায়ী মীমাংসার দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে নিয়েছে। ইতিপূর্বে এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন অফিসার নিযুক্ত ছিল, এবং কোন জমির মালিক জমির স্বত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে চাইলে একটি নির্দিষ্ট ফী দিয়ে এই ছোট কর্মচারীদের সাহায্য নিতে পারত। যাই হোক, কয়েক বছর আগে সাধারণ মানুষের বিবেচনায় অবিমিশ্রকারী ও অনধিকার চর্চাশীল এক ব্যক্তি সরকারের নিকট দাবি করে, মালিকরা সরকারী বিচার নিষ্পত্তি চায় বা না চায়, সমস্ত জমি স্বত্বের জরীপ করান হোক। ফল যা হবার তাই হলো। দেশের উপর জরীপ কর্মচারীদের এক বিরাট বাহিনী চেপে বসল, উদ্ভব হলো বিশাল সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমার আর দরিদ্র শ্রেণীগুলি থেকে যাদের সাক্ষী দিতে ডাকা হয়েছিল তাদের কাছে সমস্ত বিষয়টি সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ উকীল-মোক্তারদের বখশিস আদায়ের অতিরিক্ত উপায় ছাড়া কিছু মনে হয়নি। আইনের কালক্ষেপ হেতু আদালতের চারপাশে অপেক্ষা করে করে ক্ষেতমজুরদের অবর্ণনীয় ভাবে অমূল্য সময় নষ্ট হতো। সুতরাং এইভাবে বহু অনভিপ্রেত ব্যয় নিঃসন্দেহে বাংলার শস্য ভাণ্ডারের সৌভাগ্যশালী অঞ্চলে রক্ত ক্ষরণের কারণ হয়েছিল। নিঃশেষের সীমানায় ইতিমধ্যেই উপনীত হয়ে পরের পর ফসল হানির দুর্দৈব সহ্য করা কঠিন ছিল। তাহলেও, এটাই কেবল ব্যাপক অনিষ্টের কারণ ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে এসব কিছু থেকে আরও গুরুতর দুর্ভাগ্য চলেছে। সে বিষয়ে আমি পরবর্তী প্রবন্ধে কিছুটা আলোচনা করব।

৭

পাটের শোকাবহ পরিণতি

কোন কোন সমাজবিদ্, বিশেষত অধ্যাপক প্যাট্রিক গেদ্দেশ এবং তাঁর অনুগামীরা, বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত উৎপাদনের সামাজিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। সুতরাং এঁদের কথা মানলে, একটি সম্প্রদায়ের পশম ছেড়ে রেশম উৎপাদনের ঘটনা কোন ক্রমেই সাদা চোখে যত স্বাভাবিক মনে হয় তা নয়। প্রত্যেক ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ভিন্ন শ্রম শর্তাবলী নির্দিষ্ট আছে, আর আছে তার হাজার রকম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপযোগিতা। সুতরাং *এই চিন্তাবিদদের মতানুসারে, আমরা যদি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখি, প্রত্যেক* উৎপাদিত অথবা নির্মিত দ্রব্যের অনিবার্য কতগুলি সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মানবিক উপযোগিতা আছে। একে আমরা সামাজিক মূল্যরূপে উল্লেখ করতে পারি।

আমাদের অধিকাংশেরই অবশ্য, *এখন পর্যন্ত এদিকটি নজরে আসেনি।* আমরা স্বপ্নেও ভাবি না শ্রমিক অথবা ভোক্তার হিতের আর্থিক ব্যতীত অন্য কোন মান থাকতে পারে। কাজেই এখন আমি বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলের যে কাহিনী বলতে চলেছি তা যথেষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে বলতে হবে।

বছর কুড়ি আগে, পূর্ববঙ্গে প্রত্যেক বসতবাড়ি সংলগ্ন বাগানে এক খণ্ড, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বেশী জমিতে এক ধরনের লম্বা ধূসর রঙের গাছ দেখা যেত। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এগুলির অবস্থান মেস্তা ও শণ গাছের মাঝামাঝি। আমরা এগুলিকে পাট বলে জানি।

কৃষকরা এই গাছ জন্মাত প্রধানত এর তন্তুর জন্য। অমসৃণ দড়ি ও বাঁশ যে দেশের গৃহ নির্মাণের প্রধান উপকরণ সেখানে এগুলি খুবই মূল্যবান ছিল। এ থেকে সারা বছর প্রদীপের পলতের যোগান হত। তাছাড়া, গাছের পাতা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধরূপে ব্যবহার করা হতো। এবং সব শেষে, হিন্দু বাড়িতে কোনক্রমেই এগুলি না হলে চলতো না, কারণ সারা বছরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কতগুলিতে এগুলি অপরিহার্য ছিল। আমার মনে আছে মাত্র গত বছর, পূর্বাঞ্চলীয় দীপাবলীর সুন্দরী রাত্রে যখন পাড়ার অলি-গলিতে ঘুরছিলাম, হঠাৎ অদ্ভুত স্তূপাকৃতি অপরিচিত কোন বস্তু পায়ে ঠেকে চমকে উঠি। ওগুলি পড়ে ছিল সরু রাস্তার একটি বিশ্রী বাঁকের মাঝখানে। তখন একটিও আলো জ্বলেনি, খড়ের ধিকি ধিকি আগুনে দেখতে পেলাম আমি কোন পূজার বেদীর উপর উঠে পড়েছি। ঘুরে আমার সঙ্গীর কাছে জানতে চাইলে সেই বালক সহজ হেসে বলেছিল,

"এ হচ্ছে অলক্ষ্মী পূজা। শাস্ত্রে আছে আজকের রাত্রে পাটকাঠি ও এই সব সামান্য জিনিস দিয়ে 'কোন অশুভ স্থানে' দুর্ভাগ্যের দেবীর পূজা করতে হবে।" অদ্ভুত মতবাদ অবশ্যই! এই কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দু ধর্ম দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে পাটকাঠির পূজা করে আসছে।

আয়ারল্যাণ্ডের শণ গাছের মত, এই গাছকেও কখনই সুনজরে দেখা হয়নি, কেন না, তন্তু পাবার জন্য দীর্ঘ বোঁটা কেটে জলে ডুবিয়ে কার্যত পচিয়ে নিতে হয়। প্রক্রিয়াটিকে হিন্দুরা সর্বদাই অপছন্দ করেছে। তবুও এর অর্থনৈতিক মূল্য ও ধর্মীয় প্রয়োজন খুবই জরুরী। তবে গৃহস্থরা বছরে নিজ পরিবারের যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেটুকুই উৎপাদন করত।

কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে অবশ্য,—আমি জানি না কোন ঘটনাবলীর দরুন, কারণ একটি বাণিজ্যিক সামগ্রী হিসেবে পাটের ইতিহাস খতিয়ে দেখিনি, বাইরের পৃথিবী সম্ভবত এর খোঁজ পেয়েছিল, এবং একটি তন্তু হিসেবে এর মূল্য দ্রুত স্বীকৃতি লাভ করে। আমরা সকলেই জানি, সহজেই এই তন্তু দিয়ে অনেকগুলি আকর্ষণীয় সামগ্রী বোনা যায়, যার কতগুলি দেখতে শিল্কের মত আর কতগুলি ফ্লানেলের। ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত লাভ, এগুলি বেশী দিন টেঁকে না, সুতরাং একটির পর একটি পোশাকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ফ্যাশানেও পরিবর্তন আনা যায়।

শুনেছি সারা বিশ্বে একমাত্র বাংলা দেশেই এর উৎপাদন সম্ভব। এখানেই তাহলে দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল। কথিত আছে, কুড়ি বছর আগে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে কতকটা ব্যবসায়িক পরিসরে পাট চাষ হতে দেখা যায়। প্রথমে অবশ্য চাষের প্রসার ঘটে ধীরে ধীরে। কিন্তু সাত-আট বছর আগে হঠাৎ তা ছড়িয়ে পড়ে, এবং এখন পাট চাষ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। নদী পথে খুলনা থেকে বরিশাল যেতে যেতে চোখে পড়বে সব দিকেই একখণ্ড ধানের জমির পরেই আছে একখণ্ড পাটের জমি, অথচ দেশের এই প্রান্তে সংক্রমণ এখনও খুব বেশী নয়। নৌকায় পণ্য বোঝাই হতে দেখা গেলে সর্বদাই তা হবে পাট। এমনকি কলকাতার আশেপাশেও, গ্রামের খোলা পথ ধরে গাঁট গাঁট পাট বোঝাই গরুর গাড়ি আসছে আর আসছে। এইভাবে 'বাংলার শস্য ভাণ্ডারের' এক বিশাল পাট আবাদে রূপান্তর ঘটেছে। সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে, কৃষক ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন থেকে আর্থিক পুরস্কারের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল, পাটের জন্য সে এখন বেশ ভাল দাম পাচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, একই ভাবে নরওয়ের কৃষক অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সুন্দর পর্বতশ্রেণী ও সেখানকার বনসম্পদগুলি নিঃশেষ করেছে। বর্তমান ভয়ঙ্কর অভাবের মুখে তারা সব সময়েই ভবিষ্যতের স্বার্থগুলি অগ্রাহ্য করে। বর্তমান এবং বিশেষত দরিদ্রতর বিশ্বে এ এক অভিশাপ। এবং পূর্ববঙ্গে পাটের আবিষ্কার হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে যখন অপর এক প্রক্রিয়াও

চলেছে। সে বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি এইভাবেই চালভিত্তিক জনরাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থ ভিত্তিক জনরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

প্রলোভন যত বড়ই হোক, উৎকোচ ছিল প্রবঞ্চনাপূর্ণ। পাট জমির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়, এবং পর পর কয়েক বছর চাষের পর উৎপাদন কমতে থাকে। সফল চাষের জন্য ধান বোনার অনুকূল জমিতেই পাট বোনা প্রয়োজন। সুতরাং পর্যায়ক্রমে দুটি ফসলের সন্তোষজনক উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ পরবর্তীকালে মাটি যথেষ্ট ধান ফলাবে না, বাস্তবিক পক্ষে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, কৃষক না জানলেও আমরা জানি, উৎপাদন যখন সার্বিক হবে তখন আর চড়া দামও পাওয়া যাবে না।

তাহলে এই হলো সেই কারণ যার ফলে বর্তমান পরিস্থিতি এমন নৈরাশ্যজনক হয়ে উঠেছে। গ্রামে চাল নাই শুধু তাই নয়। এমন কি অনেক দূরের যেখান থেকে গ্রামে সরবরাহ সম্ভব ছিল, অথবা অন্তত যে কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুলভ, চাল সেখানেও নাই। কারণ কয়েক বছর যাবৎ, ক্রমবর্ধমান গতিতে সকলে একযোগে, বর্তমান যুগের নতুন সম্পদ উৎপাদকের স্বপক্ষে, চাল মজুত করার পুরাতন চিন্তাধারা বর্জন করছে। আজ পর্যন্ত, এমনকি ত্রাণ ব্যবস্থার প্রয়োজনেও, বহু দূরে রেঙ্গুন ব্যতীত অন্য কোন স্থান হতে আমদানি সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমান বিরামহীন রপ্তানি অব্যাহত থাকলে, রেঙ্গুনেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি এখন এমত। সন্দেহ নাই কেহ সেটা বুঝতে পারছে না। গ্রামের অসহায় মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ভিখারীতে পর্যবসিত করার কোন অমানবিক বাসনা আছে, পাট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ অবশ্য করা হচ্ছে না। তারা শুধু তাদের ব্যবসার স্বার্থ দেখে। কিন্তু পাটের দালালরা সর্বত্র আছে। প্রতিটি হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে সেই সব অসাবধানীর কান ধরে টেনে আনে যারা এখনও পাট চাষ শুরু করেনি। তাদের চড়া দাম আর বিনামূল্যে পাটবীজ সরবরাহের লোভ দেখায়। এটা ঈর্ষাপরায়ণতা নয়। স্বার্থপরতার সঙ্গে অজ্ঞতার সংযুক্তি মাত্র। এতটা পর্যন্ত আমরা অনুমোদন করতে পারি। কিন্তু ক্ষমা করা যায় না যখন আমরা রয়টার প্রেরিত সংবাদে পড়ি যে সরকার নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর স্কটিশ ভদ্রলোক, স্যার এ্যানড্রু ফ্রেসার, ডাণ্ডিতে ইউরোপীয় শিল্পপতিদের এক জমায়েতে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ইউরোপীয় দালালদের মধ্যমে তারা যাতে সরাসরি পাট-উৎপাদনকারী কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সে জন্য তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব তিনি তা করবেন। তাহলে কী ইংল্যাণ্ডে আদর্শবাদের আর কিছু অবশিষ্ট নাই? তা না হলে কোন ব্যক্তি কী সারা বিশ্বকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার বন্ধু পরিজনকে বলতে পারে যে, দেশ তার উপর যে সম্মান ও দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা তাদেরই স্বার্থ-সংরক্ষণের একটি সুযোগ বলে সে গণ্য করে?

আমি যা বললাম তা যদি বাস্তব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বাঙ্গালীর ক্ষতিপূরণে একমাত্র অবশিষ্ট উপায় যতটা সম্ভব লাভের একটা বড় অংশ তাদের দেওয় বর্তমানের মত বাঙ্গালী দালাল ও ফড়ে নিয়োগ যদি অব্যাহত থাকে তা সম্ভব।

সুতরাং প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের বিস্ময়কর পরিণামদর্শিতা যুক্তিযুক্ত। রোম সাম্রাজ যখন সবে মাত্র গড়ে উঠেছে, হয়তো তখন থেকেই, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সরল ক দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে অদ্ভুতভাবে পাট গাছকে বেছে নিয়ে আরাধনা করে আসছে আর এখন, এক মরুদেশীয় হিমের চাদর তাদের উপর বিস্তৃত হয়েছে, বহুলাংশে সুদীর্ঘ কালের পরিচিত পাটেরই মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের কি বলার আছে আমরা অন্যরা, যারা লোভ ও বিলাসিতার বশবর্তী হয়ে মানব জাতির আত্মবলিদানের কাহিনী লিখেছি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, যথা নীল, আফিম, ইণ্ডিয়া রবার,— এখন পাট ?

৮

বরিশালে সর্বকালের মহত্তম কর্মপ্রয়াস

১৯০৬ সালের শেষের মাসগুলিতে বরিশাল অপেক্ষা সমস্ত পৌর ও মিলিত প্রয়াসের উপর রাজনৈতিক শক্তির উৎকৃষ্টতর উদ্দীপক প্রভাব আর কখনও দেখা যায়নি। জনগণ বঙ্গভঙ্গ, গোর্খা হানাদারি, লেফটেন্যান্ট গভর্নররূপে ফুলারের কার্যকলাপের জোরাল প্রতিবাদ করায় ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে এই স্থান খ্যাতি লাভ করেছিল। কিন্তু খুব কম লোকই অনুভব করেছে যে এই বিক্ষোভ থেকে যে স্থির সংকল্প সহযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল তা না থাকলে গত কয়েক বছরে হাজার হাজার মানুষের ত্রাণ সম্ভব হতো না এবং দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর হাত তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। যে পদ্ধতিতে তাদের জীবন রক্ষা করা হয়, তা ইতিহাস হয়ে থাকার যোগ্য।

আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধেই বলেছি, বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ড প্রাথমিকভাবে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ক্রমাগত গুজবের সত্যাসত্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে জনগণের ত্রাণ কাজ আরম্ভ করেছিল ১৯শে জুন। ১২ই জুলাই লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার সমস্ত ত্রাণ ব্যবস্থা বন্ধ করার হুকুম দেন। তাঁর অজুহাত ছিল বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়, প্রাদেশিক সরকারের। সব কিছুর ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করার জন্য তিনি নিজেই বরিশাল এসেছিলেন। এই ব্যক্তিগত অনুসন্ধান কি ধরনের অথবা কোন উদ্দেশ্যে ছিল বোঝা কঠিন, কারণ ছ সপ্তাহ পরে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং সরকার বিবৃতি দেন দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব নাই। বিবৃতিতে কিছু স্ববিরোধীতা ও কিছু পরস্পর বিরোধী স্বীকৃতি থাকা স্বত্বেও, সেই থেকে সরকার এক কথা বলে আসছেন, পূবের বাংলায় দুর্ভিক্ষ নাই এবং কোনদিন ছিলও না। এই বিবৃতিকে কি আমরা বিদ্বেষপ্রসূত বলব, অথবা বিবৃতি যাঁরা দিলেন, যাঁদের উপর এই লোকদের শাসনভার ন্যস্ত রয়েছে, পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁদের প্রকাণ্ড অজ্ঞতাপ্রসূত কাজ এটি? তাছাড়া, আমি যখন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি, স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯০৬ সালের শেষার্ধে, এখানে বাংলাদেশে, বার বার একটি গুজব পৌঁছোচ্ছিল যে সেই একই সময়ে কোন কোন মাদ্রাসী অফিসার দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের জন্য মাদ্রাসী জনগণের ত্রাণ সংগ্রহ এই অজুহাতে বন্ধ করার নির্দেশ দেন যে যেহেতু সরকার এখন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেন নাই, এই নামে তহবিল সংগঠিত করা রাষ্ট্রদ্রোহের তুল্য হবে। এ ঘটনা যদি সত্য হয় জনসাধারণের নিজেদেরই উচিত, এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া। সেটি দায়সারা ব্যবস্থা হওয়া

চলবে না। এমনও নির্বোধ কি আছে যে ভাবে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ঘোষণা করা কখনও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়তে পারে? সমুদ্রকে পিছনে হঠার আদেশ দিয়ে ক্যান্যুট সম্ভবত এর বেশী নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন নাই। দুর্ভিক্ষ সর্বদা, এমন কি সামান্যতম প্রকোপের পরিস্থিতিতেও, যারা আক্রান্ত তারাই ঘোষণা করে এবং তাদের দ্বারাই সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, বর্তমান ক্ষেত্রে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ তাদের নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য অগ্রাহ্য করেছে। বরিশালের কাছে একজন মুসলমান কৃষক থানায় গিয়ে তার তিন ছেলেকে হত্যার অভিযোগে নিজেকেই অভিযুক্ত করার পর, সেই জানুয়ারী মাসেই সমগ্র জেলায় বিভীষিকার শিহরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয়, অনেকদিন ধরে তার বিধবা বোনকে অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে দেখে লোকটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হতাশায় এমন নৃশংস কাজ করেছিল। সব থেকে ছোট ছেলেটি, অবশ্য মারা যায়নি, সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল মাত্র এবং শুশ্রূষার পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে। পিতা তখন শুধু কাঁদছে আর বলে চলেছে, "আমাকে মরতে দাও! যারা আমার উপর ভরসা করে আছে আমি তাদের মুখে খাদ্য দিতে পারি না, আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত!"

এই ঘটনা বাঙ্গালী জাতিকে তাদের ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতি মনযোগী করে। কিন্তু যেহেতু মে মাস পর্যন্ত খাদ্যশস্য একেবারে নিঃশেষিত হয়নি, কেবল মাঝে মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হতো। দুঃস্থ এলাকার প্রতিটি অঞ্চলে শহরগুলি থেকে সাহায্য পাঠানো আরম্ভ হয়। দুর্ভিক্ষের কারণে জমিদারদের নিজেদেরই আমানতের ক্ষতি হচ্ছিল, তবুও তারা কৃষক সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার কসুর করে নাই। কলাপাতায় স্কুলের ছেলেমেয়েরা "দুর্ভিক্ষের জন্য" তাদের দুপুরের খাবারের পয়সা বাঁচিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ভারতীয় স্কুল ও অফিস নিজ নিজ তহবিল সংগঠিত করেছে। কিন্তু বরিশালেই সব থেকে শক্তিশালী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এখানে পূর্ববর্তী কয়েক মাসের পরিস্থিতির চাপে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল কর্মতৎপরতা অনতিবিলম্বে এই নতুন খাতে বইতে থাকে, এবং বরিশাল শহরে ১১ই জুন একটি ত্রাণ সংগঠন খোলা হয়। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল শহরের যুবকদের গ্রামে পাঠানো এবং তাদের সাহায্যে বাখরগঞ্জ জেলার ১৬০টি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ত্রাণ শিবির খোলা। তাছাড়া প্রত্যেকটি ত্রাণ কেন্দ্র চার পাশের ৬ থেকে ১২টি গ্রামে সাহায্য বিতরণ করত। এবং প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য ত্রাণ কেন্দ্রগুলির একটি নিজস্ব গ্রাম কমিটি ছিল।

রাষ্ট্র অথবা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই, অভাবের মুখে এবং মোকাবিলা করার উদ্দেশ্য নিয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মধ্যে এটি আমার বিবেচনায়, সংগঠন তৎপরতায়, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যে, সহমর্মিতায় এবং দক্ষতায় যে কোন দেশে অতুলনীয়ত্বের দাবি করতে পারে। যে বিপুল পরিমাণ দান সংগৃহীত হয়, বিপর্যয়ের ব্যাপকতা বিচারে তা হয়তো সামান্য ছিল কিন্তু যেহেতু অযাচিত

অমূল্য সে দান-সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকে ডিসেম্বরে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কয়েক মাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর কর্মীরা সব সমেত ৩১,১৭২ টাকা, ৫,১৬৬ মণ চাল, এবং ৩,৫১০ থানি কাপড় বিতরণ করতে পেরেছিলেন।

তাঁরা সর্বমোট ৪৮৯, ৩০১ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। সরকার খয়রাতি সাহায্য দিয়েছিল ২৭, ৩৫৭ জনকে, এবং টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে সাহায্য করেছিল ১৫, ৪৮৩ জনকে, মোট ৪২, ৮৪০। জেলা বোর্ড খয়রাতি সাহায্য দেয় ৬৪, ৩২১ ব্যক্তিকে, এবং টেস্ট রিলিফ দেয় ১০১, ৩৪০ ব্যক্তিকে, মোট ১৬৫, ৬৬১। এখানে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে বিতরিত সাহায্যের কার্যকারিতা বিচার করতে ত্রাণের পরিমাণ ও স্থিতিকাল জরুরী বিষয়। অশ্বিনী বাবুর সংগঠনের ক্রিয়াকর্ম ২২শে ডিসেম্বরের আগে বন্ধ হয়নি, এই তথ্য ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের আর কিছু জানা নাই। আমি মনে করি, একে বাঙলা দেশে সর্বকালের মহত্তর প্রয়াসরূপে গণ্য করার অধিকার আছে। যদি ফুলারকে প্রত্যাহার করে নেবার পরেই পূর্ববর্তী মাসগুলির রাজনৈতিক বিক্ষোভ শেষ হতো, অথবা যদি শহরের চার দেওয়ালের বাইরে এই আন্দোলন কোন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হতো, তাহলে বরিশালের জনগণের উপহাসই প্রাপ্য হতো। যারা তাদের প্রীতির চোখে দেখে তারা সেটা না করলেও। কিন্তু মানুষের খাদ্যের সংস্থান করা সকল রাজনীতির অন্তিম লক্ষ্য, সুতরাং এই বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের অকাট্যতা, আন্তরিকতা, এবং উপযোগিতা পূর্ণ প্রত্যায়িত হয়েছে। তথাপি যেহেতু যা করা হয়েছে তা বেশ ভালভাবেই করা হয়েছে, অতএব যা কিছু করার ছিল তা সবই করা হয়েছে, এমন আত্মসন্তুষ্টি মূর্খামি হবে। অভাবের নিদারুণ যন্ত্রণা কবলিত পূর্ববঙ্গের অনেক অনেক জেলায় কোন সংগঠন পৌছোতে পারেনি। ইতিপূর্বে আমি একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। বাস্তবিক, সেখানে সারা রাত ধরে এক বিরাট জনতার কান্নার রোল শোনা যেত—এ এমন এক পরিস্থিতি যা আমি শুধু কল্পনা করতে পারি, কারণ মতিভাঙাতে, অতি প্রত্যুষে, আমি দেখেছি মায়েরা তাদের ক্ষুধার্ত সন্তানদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে অপারগ। উপরন্তু, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চতর শ্রেণীগুলি ঠিক ফসল হানির সময়ে দুঃস্থতার গৌণ ও পরোক্ষ শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত অনাহারী কৃষক সম্প্রদায় অপেক্ষা কম দুঃখ কষ্ট সহ্য করে না। ত্রাণ সংগঠনগুলি একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে এবং গোপনে তাদের কাছে পৌছোতে পারে। আমার একটুকুও সন্দেহ নাই যে এখন (মার্চ, ১৯০৭) এই শ্রেণীগুলির যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। কারণ এবার কি তাদের পালা আসেনি? ঘটনা যে তাই সেটা বুঝতে পারার জন্য গাণিতিক তথ্যের প্রয়োজন হয় না। এটি প্রত্যক্ষ এবং স্বতঃপ্রমাণিত বাস্তব, কেহ দ্বিমত পোষণ করবে না।

অবশ্য, এমন ভাবার কারণ নেই যে সারা পূর্ববঙ্গে মানুষ নিজেরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থেকেছে কল্পনা করা কঠিন। এক শক্ত সমর্থ মুসলমান কৃষক সমাজ সংগঠিত হামলায় অভ্যস্ত এবং খাদ্যের অভাবে মর মর হয়েও সুবোধ বালকের মতো ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অতএব, পূর্ববঙ্গে এই দুর্ভিক্ষের সময় যাকে বলা হয় "লুঁঠতরাজ"

ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। নানা স্থানে শত শত মানুষ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট চাল গুদামজাত করার কালে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিয়েছে। এরূপ ঘটনার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে পুলিশ খুব বেশি দুষ্কৃতিকারীকে (প্রয়োজনবোধে আমরা তাদের সম্পর্কে এই কঠিন শব্দটি প্রয়োগ করব) গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। যাদের বা ধরা হয়েছিল, জেলা শাসকের কাছে হাজির করা হলে তারা অবলীলাক্রমে বলত, "হাাঁ চাল আমরা নিয়েছি। কিন্তু পৌষ মাসেই (অর্থাৎ ফসল কাটার সময়) ফিরিয়ে দেব।"

এক স্থানে আমি শুনেছি, ইংরেজ জেলা শাসক নিজেই কিছুটা হৃদয়বান ছিলেন। এই অঞ্চলে একটি ইউরোপীয় চালের কারবারী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে তাদের গুদাম ভর্তি খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে। এমন কি জেলা শাসক পর্যন্ত আপত্তি করায় তারা স্পষ্ট জানায় ভাবপ্রবণতা নয়, তাদের প্রধান বিবেচ্য "ব্যবসা", এবং মুনাফা করবার এটাই মোক্ষম সময়। যাইহোক, দৈবক্রমে, জনতা নেতৃত্বশূন্য ছিল না, এবং বীরপুঙ্গব দালালদের কাছে খবর পৌছোলো সেই রাত্রেই তাদের গুদামগুলি লুঠ করা হবে। তারা, মনে হয়, জনতাকে শায়েস্তা করতে পুলিশের বড় কর্তার কাছে অতিরিক্ত পুলিশ চেয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি খুব সঠিক ভাবেই অব্যবস্থিত চিত্ত অমঙ্গলের আশঙ্কার ভিত্তিতে, এবং প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষগুলিকে অনাহারে রাখার মতলবে আবেদনের গুরুত্ব দিতে রাজী হননি। ফলে এই প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে তারা চালের দাম বাড়াবে না। তখন একটি ছোট নিরস্ত্র প্রতিনিধিমণ্ডলী তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রতিশ্রুতি মেনে নেয়। সেই সঙ্গে তারা আর বেশী একগুঁয়ে হলে কি হতে পারত সেটাও সম্ভবত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে আসে।

অনবহিতদের একটি প্রিয় তত্ত্ব হলো, দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় বাণিজ্যে এই "সম্পূর্ণরূপে নিমগ্নতার" বিশেষ প্রক্রিয়া হেতু, অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী মজুত করে অত্যধিক চড়া দাম ছাড়া বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে। এরূপ করার সুযোগ যে দুর্ভিক্ষেরই ফলশ্রুতি, শুধু তাই নয়, আমি বলতে পারি এমন বিজ্ঞ ব্যাখ্যা শুধু শহরগুলিতেই শোনা যায়। আমি বহু সংখ্যক স্টীমারে ডেকের সম্পন্ন কৃষক যাত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, এ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চেয়েছি। তারা কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। কাছাকাছি একটি দ্বীপ বোগ্‌গা বন্দরের উল্লেখ করে বলেছে সেখানে সাধারণত কুড়ি লাখ মণের মত চাল মজুত থাকে, কিন্তু এ বছর আছে খুব বেশী হয় তো দু লাখ মণ। তারা আমাকে বলেছে, এই বিপদ শুধু শহরগুলিতেই আছে, এবং দুর্ভিক্ষ মূল্য সৃষ্টি করার বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামে, কিংবা নিজেরাই কৃষি নির্ভর শ্রেণীভুক্ত যে ব্যবসায়ীরা তাদের মধ্যে নাই।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সংগঠনের কর্মপদ্ধতি বিষয়ে দু-এক কথা বলা সম্ভবত প্রাসঙ্গিক হবে। এই কর্মকাণ্ডের নিজস্ব পরিদর্শক ছিল, সদর দপ্তরের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হতো, এবং এর তালিকা ও দৈনন্দিন কার্য বিবরণী রাখা হতো।

ত্রাণ বিতরণকারী যুবকদের ব্যবহার ছিল খুব কোমল ও সম্ভ্রমপূর্ণ; যন্ত্রণা ক্লিষ্টের প্রতি তাদের অত্যন্ত গভীর সহানুভূতি ছিল। একটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এই কর্মীদের একজনকে তার চার পাশের ক্ষুধার্ত মানুষের বাহ্যিক অবস্থা হতে আপাতদৃষ্টে কেবল সামান্য দূরে স্থানান্তরিত করা হলে, সে অনুভব করে যে যখন সে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোন জেলায় থাকত, তার পক্ষে একজন মানুষের দৈনিক বরাদ্দের অর্ধেকের বেশি খাদ্য গ্রহণ কল্পনার অতীত ছিল। সুতরাং কাজের বোঝা যখন ছিল সব থেকে বেশি, তখন সে ক্রমশ ক্রমশ কম খেত।

সন্দেহ নাই যে ভারতবর্ষকে বিশাল সংগঠন গড়ার এই সকল সাম্প্রতিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে হবে। যদিও আর কখনও সেগুলির প্রয়োজন না দেখা গেলেই মঙ্গল। সামাজিক দান-ধ্যানের উৎসরূপে, কোন ক্ষতিগ্রস্থ জেলায় সব সময় কয়েকটি ধনী পরিবার থাকতে হবে এমন প্রাচীন প্রথা বহুকাল আগে বাতিল হয়ে গেছে। এরূপ পরিবারও তাদের সমগোত্রীয়দের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত নিঃশেষিত হবার পর তবে আমরা বাধ্য হয়ে ইউরোপের যান্ত্রিক এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়া পথে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু পদ্ধতিটির নিজেরই মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। এবং যাকে যান্ত্রিক সামাজিক যুগের সূচনা মনে হয়েছিল, এখানে দেখছি প্রকৃতপক্ষে তা গ্রামাঞ্চলের জন্য শহরের মানুষের হৃদয়ে মাতৃত্ব ও প্রতিপালনের অনুভব জাগিয়ে তুলেছে।

ইওরোপীয় ত্রাণ কর্মীদের ত্রুটিগুলি ভারতীয় ছেলেরা আমাদের থেকে অনেক সহজে শুধরে নেয়। তথাপি, প্রথমে সেই একই কুসংস্কার তাদের উপর ভর করে। আমাদের সমাজগুলির প্রবল সুরাসক্তি অসম্ভব কুৎসিৎ এবং অপমানজনক পরার্থবাদের ভজনা করার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এবং সমালোচনার মাধ্যমে, এই কল্পনা বিলাস আমরা অপরের মধ্যেও প্রবিষ্ট করাতে পেরেছি। মতিভাঙাতে আমি এরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম।

আমাদের দরজায় কিছু অতিরিক্ত খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করা হচ্ছিল। একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়ে কর্মীদের বলেছিলাম সে যেন বাদ না পড়ে। প্রথম থেকেই তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম সে বলছে গত তিন দিন কিছু খায়নি। সম্পাদককে সে কথা বলতে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "মিথ্যা কথা!" বলে, "ও নিশ্চয় খুব অসৎ। আমি নিজে আজ ওকে পাঁচ সের চাল দিয়েছি।" যে খুদ-কুড়ো দেবার কথা, তা অবশ্য দেওয়া হয়েছিল—অন্তত অন্যান্যদের মত তারও পাবার সমান অধিকার আছে। কিন্তু আমার মনের বিভ্রান্তির ছায়া দূর হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। স্ত্রীলোকটিকে সেদিনই পাঁচ সের চাল দেওয়া হয়েছে। অথচ এই পরিমাণ একটি গোটা পরিবারের এক সপ্তাহের বরাদ্দ। সে নিজে হয়তো সত্যি তিনদিন অভুক্ত থেকেছে। তবুও কি সংগঠনের কাছে আরও চাইতে পারে? তার সাথে এরূপ কোন চুক্তি করা হয়নি। তাহলে কি সে একে ঈশ্বর গণ্য করছে? তুলনায় ধনী, এবং চালচলনে লাখপতির তুল্য বিদেশীর দেখা পেয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের

দুঃস্থতার কাহিনী পেশ করা কি তার কর্তব্য নয়? পাঁচ সের চাল! কোন মা বা কোন স্ত্রীর কাছে সেটা কি অকথিত সম্পদ?

এ হলো সংগঠনের জন্ম দেওয়া অনিষ্টের একটি। যে অহমিকা হয়তো ব্যক্তি হৃদয়ে কিছুটা পরিমাণে জয় করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের বিশাল অনুভূতিশূন্য সংগঠন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাই আবার জন্ম নেয় পূর্ণ-প্রাণ ও শক্তি নিয়ে। একটি আভূমি-নত জগতের প্রতি আমরা তারই নামে তর্জন-গর্জন করি। কিন্তু যাকে আমরা আধুনিক কালে ভুলক্রমে বদান্যতা আখ্যা দেই তা নিশ্চিত দেবদূতের চোখে জল আনার পক্ষে যথেষ্ট কদাকার। দাতার যত ভয় তা হলো সে বুঝি অত্যন্ত বেশি দিয়ে ফেলল। আমি কখনও এমন একটি সংগঠন দেখিনি যার একজন অন্তত সমান ভীত, বুঝি বা অত্যন্ত কম দেওয়া হলো!

৯

দুর্ভিক্ষ নিবারণ

তাহলে দাঁড়াচ্ছে একজন স্কুল শিক্ষক এবং তাঁর ছাত্ররা বাখরগঞ্জের ত্রাণ সংগঠিত করেছিল। কারণ অশ্বিনীকুমার দত্ত তো একজন বরিশালের স্কুল শিক্ষক ছাড়া আর কিছু নন। মধ্যযুগের দিনগুলি পার হয়ে এসে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার পর প্রাচ্যের দেশগুলিতে স্কুল এবং কলেজ অপরিহার্যভাবে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এখানেই নতুন ধ্যান-ধারণাগুলির দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়। এখানে দেশের সম্ভাব্য দুঃখ-কষ্টগুলির বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের কিছুটা সুযোগ থাকে। তাছাড়া, বর্তমানের শিক্ষার জগৎ হলো প্রাচীন গীর্জাগুলির সমতুল্য। নর্মান ব্যারণ এবং স্যাক্সন-কৃষক সমমর্যাদা দাবি করতে পারত শুধু ঈশ্বরের সামনে। কেবলমাত্র আশ্রমে এবং যাজক সম্প্রদায়ে তাদের এক সারিতে দাঁড়াবার সামান্যতম সুযোগ ছিল। অনুরূপভাবে, ইসলাম ধর্মে, তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায় ও মিশরীয় কৃষিজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের অনুমোদন আছে। ধর্ম বিশ্বাস সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগায়। সমধর্মীরা বিশ্বাসযোগ্য: তার বাইরে যারা তারা কাফের। একই ভাবে, বৌদ্ধ সঙ্ঘে, নিম্নবর্ণ-জাত সম্রাট অশোক সামাজিক পদমর্যাদায় সর্বোচ্চদের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষায় এবং আধ্যাত্মিকতায় সমমর্যাদাসীন হয়েছিলেন, সে জগতে প্রবেশ করলে এমনকি একজন দরিদ্রতম কৃষকেরও শ্রেষ্ঠতর কেহ থাকত না।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অধীনে, শোষণের পদ্ধতি অতীত অপেক্ষা ভিন্ন। সেগুলির বাইরের পোশাকটি শুধু এক রকম। সব সময়েরই সাম্রাজ্যের অর্থ এক দেশের দ্বারা অন্য দেশের অবদমন। কিন্তু অ্যাসিরিয়া যখন জুডিয়াকে পরাভূত করে, স্পেন মেক্সিকোকে, অথবা বেলজিয়াম কঙ্গো ভ্যালিকে, এই অবদমনের পদ্ধতি গলে রোম, অথবা ভারতবর্ষে ব্রিটেনের দ্বারা অনুসৃত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হয়। শেষোক্ত নামের ক্ষেত্রে, এই অবদমন অর্থনৈতিক, এবং ক্রমবর্ধমান শোষণ অর্থ-সংশ্লিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ, রেলপথ নির্মাণ, দেশী শিল্পগুলির বিনাশ, এবং সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি,—আরও এমন কত উল্লেখ করা যায়, এগুলি যেন অবদমন ও শোষণের এক একক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার একটি বিচিত্র দিক হলো ইংরাজের হাতে স্বীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে একটি পরাধীন জাতির ব্যক্তি-বিশেষ নিজেই নিজ অথবা অপর কোন জাতির শোষকে পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং, কোনও না কোন ভাবে শাসক জাতির মাধ্যম ছাড়া, যখন ব্যক্তি-বিশেষের বিনিয়োগের বিকল্প পথ থাকে না, তখন সে যথার্থ সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

এ এমন এক পরিস্থিতি কোন গীর্জার পক্ষে যার সমাধান সম্ভব নয়। খ্রীষ্টীয় যাজক নর্মান ব্যারণকে স্যাক্সন গেঁয়ো মজুরের বিরুদ্ধে সংযত করতে পেরেছিল, কারণ শোষণের পদ্ধতি তার বুদ্ধির সীমানার মধ্যে ছিল। জোর করে মজুতের হদিস বের

করার জন্য যখন কোন ব্যক্তিকে ঝুলিয়ে রেখে বুড়ো আঙুলে আগুনের ছ্যাকা দেওয়া, অথবা তার দাঁতগুলি একটি একটি করে উপড়ে ফেলা হতো, সব কিছু যে ঠিক ঠিক চলছে না সেটা বোঝা তখন কঠিন ছিল না। একজন কৃষকেরও অধিকতর মানবিক আচরণ প্রচার করার মত বোধশক্তি ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রথায় দৈহিক নির্যাতন, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না হলেও, গৌণ এবং যদিও ধর্মযাজকগণ নিঃসন্দেহে এখন অধিকতর শিক্ষিত, তারা নিজেরাই শোষক শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে। বিশপ কেমন করে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা দেখতে পাবে, যখন সে নিজেই এই জাহাজে নিজের ও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ করেছে?

জগৎ একটিই, সেটা স্পষ্ট—বিদ্যা, জ্ঞান, এবং বর্ণ বিদ্বেষ মুক্ত সত্যের জগৎ। এখানে মানব জাতি এখন আত্ম-নিয়ন্ত্র ও আত্ম-প্রত্যয়ের ফসল প্রত্যক্ষ করতে পারে। কারণ সর্বজনীনতা ও সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ এক সত্যের কল্পনা সম্ভব করে আধুনিক পৃথিবী একদিকে মঙ্গল সাধন করেছে। সত্য ব্যক্তি বিশেষের পছন্দানুগ নয়। এ হলো এক ভাবমূর্তি যার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়, আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। এখানে এবং একমাত্র এখানে ইহুদী অথবা অ-ইহুদী, গ্রীক অথবা শিথিয়াবাসী, খৎবন্দী অথবা স্বাধীন ভেদাভেদ নাই। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক জাতিগুলির ক্ষেত্রে গীর্জার যে ভূমিকা ছিল, সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলিতে স্কুলগুলির সেই ভূমিকা নিতে হবে। ইংরাজ ভূমিদাসদের জন্য খ্রীষ্টধর্ম যা করেছে, পরাধীন প্রাচ্যদেশীয়দের জন্য ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাকে তাই করতে হবে।

তাছাড়া লোকসভা নয়, স্কুলগুলিকেই নতুন সামাজিক সম্মেলনের শৈশবাবস্থা হতে হবে। ব্রিটিশ ভারতে স্কুলগুলি বহুকাল উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছিল, কারণ যাকে ঘিরে নতুন যুগের নতুন মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটতে পারত এমন কোন কেন্দ্রীয় নৈতিক অনুজ্ঞা ছিল না। কিন্তু এখন, কেন্দ্রীয় নৈতিক অনুজ্ঞা শোনা গেছে। ভারতের সকল প্রদেশের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ছাত্র নির্দেশের মর্মকথা অনুধাবন করেছে "জাগো এবং এক জাতি এক প্রাণ হয়ে ওঠো! স্বীয় জনগণের সেবক প্রতিপন্ন হও! জন্মভূমির আপনজন হও!" প্রয়োগ পদ্ধতিতে তারা ভুল করতে পারে। এমনকি আহ্বানের তাৎপর্য অনুধাবনে আরও কিছুকাল অতিক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু নিবিষ্ট তাদের মনযোগ, দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এবং মহৎ ও নবীন চিন্তা সমূহের সূচনা চলেছে। নিশ্চিত, তার প্রথমটি হবে এক নতুন নৈতিকতা। ইতিমধ্যে আমরা সে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, নিজে এখন পর্যন্ত আত্ম-সচেতন না হলেও। কারণ এই নতুন নৈতিকতাকে গুরুত্ব সহকারে যে সমস্যাটির সমাধান সর্বাগ্রে করতে হবে, সেটি হবে দুর্ভিক্ষের সমস্যা, এবং যে ব্যক্তি সেই সমাধান করতে সক্ষম হবেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তিনিই হবেন দশম অবতার কল্কি। শিল্পের পুনর্গঠন, অথবা জাতির অর্জন, দুর্ভিক্ষের বিরাট সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছু নয়, যেমন, এমনকি সংবাদপত্র ও কংগ্রেস স্কুলেরই বিভিন্ন বিভাগ মাত্র। সর্বদা, সকল রাজনীতির এবং

হিন্দু জাতীর গভীর বিশ্বাসানুযায়ী সকল ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানব সমাজের খাদ্যের সংস্থান করা এবং দুর্ভিক্ষের সমাধানের উপর এটি নির্ভর করে। নিয়মিত ব্যবধানে নিশ্চিত ফসল হানি ঘটে থাকে। একটি কৃষি-নির্ভর দেশের সম্পর্কে প্রশ্ন হওয়া উচিত নয়, এবার কি ভাল ফসল হবে? বরং প্রশ্ন করা উচিত, কৃষক সম্প্রদায় কি আরও কয়েকটি দুর্দৈবের বছরে টি঺কে থাকতে পারবে? পূর্ববঙ্গে এখন,—ভারতবর্ষের যে অংশের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি সব থেকে ভাল উত্তর দিতে পারি,—এক মাসের অভাবেরও মোকাবিলা করবার মত সংস্থান তাদের নাই। সুতরাং এর নিরাময় করা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে?

সরবরাহ বন্ধ না করে, অবশ্যই আবার চাল সংগ্রহ করতে হবে। সমৃদ্ধে বৃদ্ধি হতে না থাকলে, একটি জাতিকে সমৃদ্ধ বলা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষ সমৃদ্ধ না হলে, একটি জাতি সমৃদ্ধ হয় না। সরকারী উদ্বৃত্ত কোন দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে, অথবা বিপক্ষে, নিদর্শন হতে পারে না। কোন দেশের উৎসন্নে রত এক সৈন্যবাহিনীর দখলে এরূপ এক "উদ্বৃত্ত" থাকতে পারে। অচল বাকধারা শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে মাত্র। আমাদের উচিত এগুলি পরিত্যাগ করে বাস্তবে ফিরে আসা। মৌলিক সত্য হলো, যে কৃষি-নির্ভর দেশে কৃষক পরিবারগুলি সম্পদশালী, সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, অথবা পরিমিত প্রতিকূলতার মোকাবিলায় প্রস্তুত, সেটি সমৃদ্ধশালী দেশ; আর যে কৃষি-নির্ভর দেশে কৃষক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এই মানানুযায়ী স্বল্পতর, আইনজীবীরা যতই সোনার থালায় ভাত খান আর রাজারা হীরে, জহরৎ পরুন, সে দেশ সমৃদ্ধশালী নয়। কৃষকের অবস্থাই একমাত্র পরীক্ষা। সোজা যুক্তি। সরকার ট্যাক্সের জন্য কৃষকের উপর নির্ভর করে, শহর তাকিয়ে থাকে যোগানের জন্য। তাকে মেরে ফেলে ভবিষ্যতে ট্যাক্স আদায় আর চাল উৎপাদন বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতেও, কোন দেশের শাসন পদ্ধতি যদি, সামান্যতম ওজরে, অবিরত দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে, তা হবে স্বর্ণ-প্রসবিনী রাজহংসীকে হত্যার সামিল। একজন অশোক কখনও এরূপ করতে পারতেন না। একজন আকবর কখনও তা করতেন না। এরূপ কাজ সেই করতে পারে, দেশের উপর নিশ্চিত যার কোন স্থায়ী স্বার্থ নাই।

কিন্তু নিরাময়ের উপায় যাই হোক না কেন, স্পষ্টত দেশবাসীকেই তার সন্ধান ও প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে পুনরায় চাল উৎপাদনে মনোনিবেশ করে, সম্ভব হলে পাট চাষ বন্ধ করে দিতে হবে। যদি ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত তাহলে বিষয়টি এত জরুরী হতো না। কিন্তু তা হচ্ছে না। সাধারণভাবে মনে করা হলেও ভারতবর্ষ কোনক্রমেই অত্যধিক জনবহুল নয়। এ দেশ শোচনীয়ভাবে জনবিরল। যে কোন রেলপথ জরিপ সেটা প্রমাণ করবে। বর্তমান খাদ্য-উৎপাদক জনসমষ্টির বহুগুণ সংখ্যককে আশ্রয় দেওয়ার সামর্থ্য তার আছে তাছাড়া, সম্ভবত কৃষক সম্প্রদায়ের মাথা পিছু চালের উৎপাদনও কমেছে। কারণ এটা স্পষ্ট যে অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা আবাদী জমি সীমিত করে। ট্যাক্স আদায়-কারীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেই যে বীজ ধান আর হালের বলদ হস্তান্তর করা ছাড়

গত্যন্তর থাকে না। তাহলে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিতে পুনরায় চাল উৎপাদনে মনোনিবেশই জরুরী। চাল উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শহরগুলিতে সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এগুলি বিনামূল্যে সর্বোত্তম মানের বীজ সরবরাহ করবে। পাট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাট বীজ সরবরাহ যদি লাভজনক হয়, তাহলে চাল ব্যবসায়ীরা নিজ ব্যবসার স্বার্থে, জমিদারগণ জমিদারীর স্বার্থে, এবং দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-সেবী নাগরিকরা চালের জন্য অনুরূপ সাহায্য দিলে কিছু কম লাভজনক হবে না! এই সংগঠনগুলিরই পাট উৎপাদনের বিরুদ্ধতা করার জন্য নির্দ্বিধায় প্রতিনিধি পাঠান উচিত। প্রাঞ্জলভাবে শেখানো উচিত অর্থ কখনই চালের পরিবর্ত হতে পারে না। আমাদের সকল দুর্দশার মূলে রয়েছে বিপরীত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। অর্থ কখনই চালের বিকল্প নয়। বাঙলা দেশ যে বিদেশী সামগ্রী বর্জনের ডাক দিয়েছে, পাটের বিরুদ্ধে একই পথে, যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে প্রসারিত ও জোরদার করা উচিত। পুনরায় হাল-বলদ কিনতে মূলধনের যোগান, অথবা অল্প সুদে ঋণ দিতে হবে। এসব করলে, শহর ও গ্রামের মধ্যে নিবিড়তর ঐক্য গড়ে না উঠে পারে না। যে ছাত্ররা দুর্ভিক্ষ-কবলিতদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বয়ে এনে, এবং আরও নানা ভাবে, ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আত্মত্যাগ করেছে তারা যদি যে সকল গ্রামে কাজ করে সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তাহলে আরও অনেক বেশী মঙ্গল সাধন করা হবে। এটা করা হলে, এরূপ প্রত্যেকটি গ্রামের বাড়িকে আমরা পাশ্চাত্য কারুশিল্পীদের গ্রামে পাদরির বাড়ির অনুরূপ এক-একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে উঠতে দেখব। এখান থেকে গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জ্ঞান ও প্রেরণা উৎসারিত হবে। এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় উপদেশ দেবার যোগ্য পুরুষ, রোগ ও অভাবজনিত সঙ্কটে সাহায্য করার মত স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া যাবে। অপরপক্ষে, শহরের ক্ষেত্রে এরূপ একটি বাড়ি হবে জ্ঞানের উৎস, ঐক্যের সেতু। তাছাড়া, গত জুন মাসের মত নিঃশব্দে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বিস্তৃতি অসম্ভব হবে। বাস্তবিক, আমরা অন্য বহুবিধ বিষয়েও যথেষ্ট অবহিত হওয়ার সুযোগ পাব। জানতে পারব বিদেশী যন্ত্রবিদ্যার দৌলতে রাস্তা ও রেলগাড়ির জন্য নির্মিত সেতু দ্রুত খালগুলির প্রবাহ বন্ধ করে মৎসাধার ধ্বংস করছে, এবং বিশাল বঙ্গভূমি ম্যালেরিয়া জীবাণুর এক বদ্ধ প্রজনন শয্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। জীবিকাসংস্থানের প্রতিকূলতাগুলি সম্পর্কে জনগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা আমরা অবহিত হব। ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠা, তাঁত ও বয়ন-শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এবং জীবন সম্পর্কে এক নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি নিশ্চিত আমাদের চোখে পড়বে। কারণ দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট গ্রামগুলিতে, স্বীয় ক্ষুধার মাত্রা ব্যতীত ভাবনা রহিত মৃত্যুর নিকট হতে নিকটতর আগমনের বিভীষিকার মত অন্য কিছু আমাকে অভিভূত করে নাই। এবং আমি অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম একটি ব্রাহ্মণ অধ্যুসিত গ্রাম ইতিমধ্যেই বয়ন-যন্ত্র ও কাঁচা তুলার জন্য দরখাস্ত পেশ করেছে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যদি তাদের তা দেওয়া হয় তাহলে জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন নিজেরাই উপার্জন করবে। জনগণের আত্ম-নির্ভরতা এরূপ হয়ে থাকে। তাছাড়াও

দেখেছি, উপকরণ সরবরাহ করা হলে তারা সাধারণ মাদুর, মাছ ধরার জাল তৈরী, এবং বন্য এ্যারারুট প্রস্তুত করা প্রভৃতি বহুবিধ কুটির-শিল্পে নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু কথায় আছে, "যে বাড়িতে আগুন লেগেছে, সেখানে কূপ খনন আরম্ভ করা বৃথা," তেমনি দুর্ভিক্ষের কাল বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া উপযুক্ত সময় নয়। অভাব শুরু হওয়ার আগেই সেটা করা উচিত—এবং এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব আমি যে পথের নির্দেশ দিয়েছি সে মত কোন পথে। হিন্দুরা সম্যক অর্থোপার্জনে সচেষ্ট হলে, এই গ্রামীণ প্রচার সমিতিগুলি বেতন-ভিত্তিক পরিচালনা করা সম্ভব। পুনরুজ্জীবিত বয়ন-শিল্পকে অন্তত একজন নিযুক্তকের পক্ষে লাভজনক হতে হবে। বিবিধ ফলের গাছ জন্মান যেতে পারে। শুনেছি, খেজুর গাছের প্রতি বছর পরিচর্যা করা প্রয়োজন। পৌরসভাগুলি শিবের বাহনদের দখল নেওয়ার পর, গাভীর বংশবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে, প্রজননের জন্য, অতএব শিক্ষিত শ্রেণীর যত্নবান হওয়া উচিত। এসব লাভজনক হোক বা না হোক, একটি বিষয় নিশ্চিত, এসব করা বাঞ্ছনীয়। এতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার হবে। শুধু তাই নয়, এ সমস্ত কাজ অধিক মূলধন বিনিয়োগের উপযুক্ত। এমত কর্মপ্রয়াসগুলি উদ্যোক্তার সম্মুখে আত্মত্যাগ এবং সাহায্যের মহত্তম পথ উন্মুক্ত করে।

পরিশেষে একটি বিষয় ভুললে চলবে না। এখানে-সেখানে হয়তো একটি কি দুটি পদক্ষেপ বাদ পড়তে পারে। কিন্তু সাধরণ মানুষকে যদি সাধ্যাতীত ট্যাক্সের বোঝা ক্রমাগত বইতে হয়, প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির পুনরুজ্জীবন কোন মতেই সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে কৃষককুলের সাধারণ বিচার বুদ্ধির ঘাটতি নাই। এই অনিবার্য বাস্তব অনুধাবন করতে তারা ভুল করে নাই, এবং নিশ্চিত, এমন একদিন আসবে যখন দেশ বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নেবে এবং নিজ বিবেচনানুগ শর্তে নিষ্পত্তি করার দাবি করবে। যে রাজস্ব দেয় তার যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আছে, এ মতবাদ কোন ইংরাজ ব্যক্তি অস্বীকার করতে সাহাসী হবে না। এটি কোন বিপ্লবী তত্ত্ব নয়, বরং সকল জাতীয় অস্তিত্বের স্বয়ংসিদ্ধ ভিত্তিরূপে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। ভারতবর্ষ যে দীর্ঘকাল বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করায় সম্মত আছে সেটা কতটা ছাড়া যায় আর কতটা ছাড়তে রাজী নয় সম্ভবত সে বিষয়ে তার বাস্তব-অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। যুক্তি-তর্ক কখনই বিপদজনক নয়। কিন্তু যদি এমন দিন আসে যখন সে আলাপ-আলোচনায় বিরত হলো? যদি সে অকস্মাৎ ঘোষণা করে তবে তার আর আগ্রহ নাই, কারণ ত্রিশ কোটি মানব-সত্তা একটি নতুন যুক্তিতে স্থির সঙ্কল্প হয়েছে? "আমাদের অধিকার নয়, বরং আমাদের অভিপ্রায়!" যদি এই ধ্বনি সমগ্র দেশে শ্রুত হয়? ট্যাক্স আদায়কারীদের তখন কী বলার থাকতে পারে? তখন কী হবে? তখন কী হতে পারে?

ভারতে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কথা

প্রাথমিক শিক্ষা : পথিকৃৎদের আহ্বান

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর। শিল্প-বাণিজ্য যে অপ্রয়োজনীয় তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সবই সম্ভব আর অশিক্ষিতের দ্বারা কোন কিছুই নয়। আমরা এটাও জানি যে এই শিক্ষাকে কোন কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই ব্যাপক করতে হবে, নিম্নতম শ্রেণী থেকে সকল বিভাগেই। আমাদের কর্ম-শিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে আর থাকবে উচ্চ গবেষণার ব্যবস্থা, কারণ উচ্চ গবেষণা ছাড়া কর্মশিক্ষণ হচ্ছে শাখাবিহীন বৃক্ষ, মূল ছাড়া ফুল। আমাদের স্ত্রী-শিক্ষা চাই, পুরুষের শিক্ষা চাই। আমাদের যেমন ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা চাই, তেমন ধর্মীয় শিক্ষা চাই। আর এ সবের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের গণ-শিক্ষা চাই এবং তার জন্য আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে।

সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির দায়িত্ব ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেবার মতো অনগ্রসর আমাদের সমাজ কোনকালে ছিল না। এত দরিদ্র কেউ ছিল না যে উপবাসীকে কখনও অন্নদানের চেষ্টা করেনি। এখন থেকে আমরা তার চেয়ে জরুরী যে জ্ঞান দান করা এটা বুঝব। আমাদের দেশের ঐক্য কার্যকর করার এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। যদি এক শ্রেণীর লোক এক রকম ধারণা থেকে তাদের মানসিক খাদ্য গ্রহণ করে এবং জনসংখ্যার বৃহদাংশ অন্য কিছু থেকে, তাহলে এই জাতীয় ঐক্য যদিও অবশ্যই আছে, তবু তা সহজে কার্যকর হয় না। কিন্তু যদি সব লোক এক ভাষায় কথা বলে, নিজেদের মনোভাব একই রকম ভাবে প্রকাশ করতে শেখে, একই তত্ত্বের উপর তাদের উপলব্ধি গড়ে ওঠে, যদি সকলে একই শক্তির প্রতি একই ভাবে সাড়া দেবার শিক্ষা ও প্রস্তুতি লাভ করে, তবে আমাদের ঐক্য স্বপ্রকাশিত ও অবিচল হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জাতীয় দৃঢ়তা ও দ্রুত বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্ষমতা লাভ করব। সর্বজনীন শিক্ষার বাস্তবক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারব এবং কেউই আমাদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হবে না।

পিছু হটে এলেও আমাদের আফশোস করার কিছু নেই, কারণ তা আমাদের নিজেদের শক্তির জন্যই হয়েছে। জনশিক্ষায় সর্বপ্রথম হচ্ছে পঠন, লিখন ও গণিত। যতদিন আমরা নিজেরা এই ভার বহন করছি, ততদিন ভাষাগত ভৌগোলিক বিভাগ নিয়ে বাহাদুরি করার কোন প্রয়োজন নেই। বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ না করলে এতদিনে হয়তো ওড়িয়া, বাংলা ও বিহার একই ভাষায় কথা বলত, একই লিপি ব্যবহার করত, একত্রীকৃত বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃতি দিত।

আমরা সকলে যতটা পারি ভাষা-সমস্যাকে সরল করব এবং তার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কার্যের চেয়ে প্রভাবকর কিছু হতে পারে না। যা কেন্দ্রীভূত যান্ত্রিক সংগঠনের চেয়ে অসংখ্যগুণ কাম্য।

আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার আর একটি সুবিধা হচ্ছে যে এটিই একমাত্র স্থায়ী শক্তি হতে পারে। বাইরের কোন প্রভাবের উপর এটি নির্ভরশীল নয়। কেন্দ্রীভূতকারীরা আসবেন-যাবেন, তাঁরা বদলালেও স্নায়ু-প্রান্তে যে প্রাথমিক কর্মপ্রেরণা রয়েছে তা ঠিকই থাকবে, তাকে কখনও রদবদল করা যাবে না।

আমাদের সভ্যতার অন্যতম উপাদান হচ্ছে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের পবিত্র কর্তব্য—এই ধারণাটি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। ভিক্ষাদানের ধারণাটি আমাদের পূর্ব থেকেই আছে। একটি অন্যটির বিস্তৃতিমাত্র।

বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যদেশে যুবকদের শিক্ষা সম্পন্নের পরে তিন, চার বা পাঁচ বছর সামরিক কর্মের প্রয়োজন হয়। সে সেনানিবাসে যায়, সামরিক শিক্ষা লাভ ও ড্রিল করে; স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর এক দলভুক্ত হয়। তার শিক্ষাকাল শেষ হলে স্বভাবত পাশ করে বেরিয়ে আসে এবং কুশলী সৈনিকরূপে থাকে তার বাকি জীবনটুকু, তার দেশের রক্ষী বাহিনীতে যে কোন মুহূর্তে যোগদানের জন্য প্রস্তুত।

তেমনিভাবে আমাদেরও শিক্ষার সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হবে। এটা অসম্ভব কেন ভাবা হবে যে প্রতিটি যুবককে তার শিক্ষা শেষ হলে জনসাধারণকে তিনটি বছর দেওয়ার জন্য আহ্বান করা যাবে না? এটা অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, পাশ্চাত্যে যেমন বিধবার একমাত্র পুত্রকে সামরিক-কার্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তেমনি যার উপার্জন অন্যদের একান্ত প্রয়োজন, তাকে শিক্ষাকার্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। অন্যদিকে, গ্রামবাসীরাও স্কুল শিক্ষকরূপে তাদের মধ্যে বসবাসকারী একটি ছাত্রের ভরণপোষণের ভার সহজেই নেবে। আর যখন তার তিন বছর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সে তার পুরনো স্কুল বা কলেজ থেকে আর একজনের ব্যবস্থা করবে, যে তার স্থান পূর্ণ করবে। অনেকেই হয়তো সরল গ্রাম্যজীবনকে ভালবাসতে শিখবে এবং দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের জীবনই বেছে নেবে। যাহোক, বেশির ভাগই তাদের সঙ্কল্পিত কার্যকাল কাটিয়ে শহরে ফিরে আসবে জটিলতর সমাজ জীবনের মধ্যে অংশ গ্রহণের জন্য। একদিকে শিক্ষাদানের কর্তব্য, অন্যদিকে শিক্ষককে ভরণপোষণের কর্তব্য, এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্ররা একটি পূর্ণ সামাজিক 'ইউনিট' গঠন করবে। এইভাবে জনসংখ্যার বিরাট অংশকে কর্মের বৃত্তের মধ্যে টেনে আনা চলবে। সব লোককে সাক্ষর করে তুলতে ত্রিশ বছর লেগে যাবে, তাও এই পরিকল্পনাকে পুরোপুরি কার্যকর করা হবে ধরে নিলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এশীয় কার্যপ্রণালীটি আমরা অবহেলা করব না, যেটি প্রতিবিন্দু সমাজসেবাকে আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-সম্প্রসারণশীল করে তোলে। ভারতবর্ষ যে ফলকে পরিপক্ব করে তোলে, তার বীজের যত্ন নিতে ভোলে না। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর

শিক্ষার দায়িত্বও জাগিয়ে তুলতে হবে। 'শিক্ষককে অর্থদান' ও 'জনগণকে জ্ঞানদান' দুই পরিপূরক সত্য একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে।

কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন এ ধরনের ব্যবস্থা করতে পারে না। শুধুমাত্র জনগণের সাধারণ উদ্দীপনা ও ছাত্ররা নিজেরা এটিকে বাস্তব করে তুলতে পারে। এটি কিন্তু অসম্ভব নয়। সত্যি কথা যে প্রথম প্রেরণা শহর থেকে আসবে, কিন্তু একবার সেটি প্রচারিত হওয়ার পর সব কিছু নির্ভর করছে এর বেদীমূলে কটি প্রাণ উৎসর্গীকৃত হবে তার উপর। সব কিছুই শেষ আশ্রয় রূপে এরই উপর নির্ভর করছে,—এর জন্য বলিপ্রদত্ত মানব জীবনের সংখ্যা ও গুণের উপর। মানুষের জীবন না পেলে মনের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কতজন সুখ-শান্তি আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য সুযোগ, এমনকি হয়তো তাদের সারা জীবন উৎসর্গ করবে ভারতের জনগণের এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ?

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ—১

আমাদের সন্তানদের যে শিক্ষা আমরা দিই, তা আমাদের জীবন যে সামগ্রিক বিষয়ের অংশ, সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে। তাই মার্কিন বিদ্যালয়গুলি নিজেদের অসম্পূর্ণ মনে করবে, যতক্ষণ না যান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে যুবকদের কীভাবে দীক্ষিত করবে তা খুঁজে পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিদ্যালয় সম্ভবত চেষ্টা করবে কৃষিকর্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করার। বিজ্ঞানে যুগের বিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করবে এবং প্রাচীন বিদ্যার পুনরুত্থানে বিদ্যালয় মৃত ভাষাগুলির গুরুত্ব। এর থেকে বোঝা যায় দুটি পৃথক যুগ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের পুনরাবৃত্তি করবে না। শিক্ষার ব্যাপারেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে জাতি সহজ কারণেই শিক্ষার বিভিন্ন শাখাকে বেছে নেয় তাদের শিশুদের প্রধান প্রয়োজনরূপে, কারণ জাতীয় জীবনের বিশেষ মুহূর্তে সেইগুলি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলাদেশে গুপ্তযুগের 'সংস্কৃত-রেনেসাঁস' কালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান ভদ্রলোকের বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। হাজার বছর পরে সেই একই অবস্থার মানুষকে ফার্সীও জানতে হতো। বর্তমানে ইংরাজি হচ্ছে সেই লক্ষণ। এইভাবে বিভিন্ন যুগে মানসিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করা যায় উপায়গুলির পরিবর্তন করে।

ভারতীয় সভ্যতার সৌভাগ্য হিন্দুরা সর্বদা পরিষ্কারভাবে ধারণা করতে পেরেছিল পদ্ধতির পিছনের মনকে, যে বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার মূলত কাজ। বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও অতীতে এটিই ভারতীয় প্রতিভাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল। আর এটিই ভবিষ্যতে তার সবচেয়ে ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। যতকাল তরুণদের মনের একাগ্রতা, শিক্ষার প্রত্যক্ষ 'ব্রাহ্মণীয় ব্যবস্থা' বর্তমান থাকবে, ততকাল পরিবর্তনশীল যুগ যা কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করবে তা জয় করার মতো ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের মধ্যে নিহিত থাকবে। কিন্তু একবার এই শিক্ষণ অবহেলিত বা লুপ্ত হলে জাতির বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় মনের শক্তি নেমে আসবে বর্তমান কালের সাধারণ লোকের মনের সমস্তরে, যা পরিবর্তনশীল যুগপ্রদত্ত আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার মাত্রানুযায়ী বিকশিত ও সঙ্কুচিত হয়। বর্তমানে হিন্দু বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শক্তির সঞ্চয়, সামর্থ্য-সংরক্ষণ, যার প্রধান কারণ হচ্ছে বালক ও বালিকার আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত বিশেষ মানসিক শৃঙ্খলা। দেশের ইতিহাস যখন আমরা পড়ি, তখন প্রতিভার অভাবিত বিকাশ ও তার বিচ্ছিন্ন সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য দেখে আমরা বিস্মিত হই। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় ভাস্করাচার্য মাধ্যাকর্ষণের ঘটনা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, ঠিক যেমন পাশ্চাত্যবাসী নিউটন করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা তাঁকে নিউটনের মতো ব্যাপকভাবে প্রচারের

সুযোগ দেয়নি। পর্দানসীন অন্তঃপুরবাসী মহিলা জাতি অকস্মাৎ বিকশিত হয়ে উঠল এক চাঁদবিবির মধ্যে। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন কেরানীগিরি সত্ত্বেও আমরা এমন মানুষ জগৎকে দিয়েছি, যাঁরা মানবজাতিকে ধর্মে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে সম্পদশালী করেছে। ধূমহীন পাউডার আবিষ্কার ও শল্য চিকিৎসার উন্নতি শুধুমাত্র জ্ঞানের বিস্তৃত প্রয়োগ। ভারত দেখিয়েছে সে ওই জ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।

এই বিষয়গুলি ভারতীয় মনের সুপ্ত ক্ষমতার কয়েকটি লক্ষণ। হঠাৎ ফুটে ওঠা ফুলগুলি প্রমাণ করে সারা গাছের সজীবতা। তারা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভারতীয়রা অতীতে যা করেছে, তা ভবিষ্যতেও করতে পারে। আর যদি তাই হয়, আমরা ঋণী সেই অমর প্রাণশক্তির কাছে, যার কারণ হচ্ছে কোন বিশেষ সময়ে প্রকাশশক্তির সর্বাপেক্ষা আদরণীয় বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা সংস্কৃতি ও মনের উন্নয়নকে কখনও অবহেলা করেননি। কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা বা কোন বিশেষ বৃত্তির বিকাশের চেয়ে মনোযোগের শিক্ষা চিরকাল হিন্দুদের বিদ্যা দানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, যা স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করতেন। মনের নিয়ন্ত্রণ ও স্ব-পরিচালন-লাভে জাতীয় প্রচেষ্টার কাহিনীতে মহান পুরুষেরা হচ্ছেন শুধু ঘটনাস্বরূপ।

তাহলে মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার স্বভাব ও বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌দের ভারতকে শিক্ষা দেবার কিছু নেই। এর পরিবর্তে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার মূল্য উপলব্ধিতে যে, যে কোন দিকে সমবেত প্রচেষ্টা—এমনকি আত্ম-শিক্ষাতেও—এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রতিফলন প্রয়োজনে ইচ্ছানুযায়ী সংশ্লেষণে। তাই সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায়, ভারত জার্মানীর চেয়ে তার জনসংখ্যার প্রতি হাজারে অনেক বেশী প্রতিভা উৎপন্ন করতে হয়তো পারে, কিন্তু জার্মানী জানে জার্মান-সমস্যা সম্পর্কে 'জার্মান-মনকে' কীভাবে সচেতন করা যায়। তার অর্থ, জার্মানী তার সাধারণ জনমনকে সংগঠিত করেছে এবং এই সংগঠিত মনের কাছে সে উপস্থিত করে যে ধাঁধার উত্তর প্রয়োজন। যে প্রশ্নের উত্তর সে চায় তার সংস্পর্শে যে চিন্তাকে আনে, তার মানসিক ওজন ও ক্ষেত্র, বাস্তব পরিমাণ ও শক্তি আমাদের ভেবে দেখা যাক। সেই প্রশ্নটি কী? খুব সম্ভব এটি তার চরিত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। কোনরকম অবিচার না করে আমরা বোধহয় ধরে নিতে পারি সেটি হচ্ছে জার্মানী ও জার্মান জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি। এটি নৈর্ব্যক্তিক নয়, পরম লক্ষ্য নয়, যেমন বৈরাগ্য ও মুক্তি, যা ভারতবর্ষ তার সন্তানদের কাছে প্রস্তাব করে। খুবই সত্য। তবুও জার্মান ব্যক্তির মন ও আত্মার কাছে তার দেশের সমৃদ্ধি নৈর্ব্যক্তিক লক্ষ্য বলে বোধ হবে। এমনকি হিন্দুকেও তত্ত্বগতভাবে বৈরাগ্যের পথে আরোহণ করতে হয় প্রথমে বাস্তবে অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এমনকি হিন্দুরা পরিবারের চিন্তাও সর্বপ্রথমে এমনভাবে করে যেন 'সেগুলি বেদীর সোপান যা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উঠে গেছে।' যদি তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাহলে সে বলবে, তার উপর নির্ভরশীলরা তার হস্তে প্রদত্ত ন্যাস, তার নিজের কর্মক্ষয় ও প্রকৃত

বিচারবোধে পৌঁছোবার এক উপায়। জার্মানরা নিজের দেশ সম্পর্কে একই রকম কেন বোধ করবে না? তার কাছে এটি 'জীবন বেদীর সোপানের' বিরাট শেষ ধাপ কেন হবে না?

ধরা যাক এটি এমন ধারা, প্রতি জাতির ব্যষ্টি-মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভে অবশ্যই সক্ষম হবে এবং সমষ্টিগতভাবে তার নিজের জনগণের কারণের প্রতি মহান ভক্তির আদর্শ তার সম্মুখে থাকবে। এই ধারণা পছন্দ না হলেও তাকে জীবিকা-অর্জনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে—এমনকি হিন্দুকেও তা করতে হবে—শুধু প্রভেদ হবে যে তখন সে তার শিক্ষণ বা জীবিকায় তার উপযুক্ত উচ্চ কল্পনা বা প্রেরণার আবেগ যুক্ত করতে পারবে না। মানবাত্মার পক্ষে এমন হীনকর কিছু নেই, যেমন হচ্ছে জাগতিক পুরস্কারের জন্য জ্ঞান সঞ্চয়। জাতির পক্ষে এত অবনতকর কিছু নেই, যেমন মনের জীবনকে আহার সংগ্রহের উপায়রূপে দেখা। যদি না সত্যকে আমরা ভালবাসি বলেই পাবার চেষ্টা করি এবং যে কোন মূল্যেই তাকে লাভ করতে চাই, যদি না আমাদের নিজেদের আনন্দলাভের জন্য চিন্তার জীবন যাপন করি, তবে হৃদয় ও বুদ্ধির মহান বস্তুগুলি আমাদের কাছে তাদের দ্বার রুদ্ধ করে দেবে। জাগতিক প্রেরণায় উত্তেজনায় মানুষ কত দূর যেতে পারে তার খুবই নির্দিষ্ট এক সীমা আছে। কিন্তু যদি অন্য দিকে তার প্রিয়জনদের জন্য ওই ভালবাসা এমন উচ্চ ও সত্যের স্তরে ওঠে যে, সেটি যতদূর সম্ভব পৌঁছোবার ও হবার কারণস্বরূপ হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। যদি সে জানে যে যতই সে উপলব্ধি করতে পারবে, ততই ভাল হবে; যদি তার নিকট এটি আত্মীয়দের জন্য না হয়, তবুও ব্যাপক সম্পর্কের জন্য হবে,—যাকে সে দেশে বলে; তাহলে তার জনসেবার উৎসাহ এমন গুণসম্পন্ন হবে যেন তার ডানা গজিয়েছে। এটি মুক্তি দেয়, বন্ধন নয়। এ এক সাফল্য হয়ে ওঠে, সীমাবদ্ধতা নয়।

এই বিষয়ে ভারতের পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা করার আছে। সামাজিক প্রেরণাকে কেন আমরা একটি মানুষের নিজের পরিবারের মধ্যে বা তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত করব? এই লক্ষ্যটি বদলে দেওয়া যাক না কেন! আমরা প্রত্যেকে লক্ষ্য করব অন্য সকলের মঙ্গল এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সকলের মঙ্গলের জন্য বলিদান করতে ইচ্ছুক হব নিজেকে, নিজের পরিবারকে, এমন কি নিজের বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীকেও। বীরের চিরকালের পথ হচ্ছে আত্মত্যাগের প্রেরণা। জনগণের মঙ্গলের জন্য—আমার নিজের মঙ্গলের জন্য নয়—আমি যা কল্পনা করতে পারি, সেই উচ্চতম মহত্তমের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করব। এটা এমন কি আমার ব্যক্তি-সত্তার ধ্বংসের কাজ হতে পারে। এটি আমাকে দিয়ে এমনও করাতে পারে যে টেলিগ্রাফ-স্টেশনের কাজের জন্য বন্যার মধ্যে দিয়ে সাঁতার-কাটা কিংবা এক সহকর্মীকে উদ্ধারের জন্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়া। যে কোনটিই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমি কি আমার পরিবারবর্গকে অসহায় অবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে রেখে যাবো? এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি দূর করে দাও! আমরা—আমি ও অন্যেরা

—কি সাগ্রহে মৃত্যু বরণ করব না জগৎকে দেখাবার জন্য যে ভারতীয়দের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাটা কী হতে পারে? কোন পরিবার কি সানন্দে অনশন করবে না, যাতে জাতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে? বীরকে চকিতের মধ্যে পথ বেছে নিতে হয়। তার কাছে নিকটের ক্ষুদ্র দৃশ্যের চেয়ে বিরাট দৃশ্যটাই নিকটতর। মুহূর্তের মধ্যে তাকে শাশ্বতের দিকে পদক্ষেপ করতে হয়, সেও শাশ্বত হয়ে ওঠে। জার্মান-সমস্যার প্রতি জার্মান-মনকে একাগ্র করায় বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে ইউরোপ বীর সৃষ্টি করেছিল। এটিও এক ধরনের উপলব্ধি?

তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে ভারতীয় সমস্যার প্রতি ভারতীয় মনের একাগ্রতা। এটি করার জন্য মনের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের পরিত্যাগ করতে এবং তাকে বিশ্বজনীন ভাবনার সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠ হতে বলা হচ্ছে না, যে বৈশিষ্ট্যতার উপর ভারতীয় শক্তি ও সংস্কৃতি অতীতেনির্ভর করেছিল, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় নির্ভর করবে কিন্তু যেহেতু, বর্তমানে আমাদের জনমানসের বৃহৎ অংশই ব্যক্তিগত জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার পরিকল্পনায় নিমগ্ন, তাই আমরা এবার সঙ্কল্প করব ওই মনের সচেতন ঐক্য সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে, যাতে আমরা আরও ভাল ভাবে সমর্থ হতে পারি সাধারণের সুখসমৃদ্ধি, সর্বজনের মঙ্গল নির্ধারণে। ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গলের স্থানে সাধারণের মঙ্গল উপস্থাপনার ফল হচ্ছে আরও উচ্চস্তরে ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল করা সম্ভব! এই পদ্ধতির বাস্তবতা ইউরোপেই লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপথ বর্তমানে আর বিরল বৃত্তির অধিকারী বিশেষ ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে না, যতটা করে নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত ঐক্যবদ্ধ মুক্তিপ্রাপ্ত জনমানসের উপর। এমনিধারা মুক্তি ও মুক্তির প্রস্তুতি করা যায় গণশিক্ষার গুণ ও আঙ্গিক দ্বারা। তাই আমরা যারা ভারতীয়, তাদের পক্ষে দেখা দরকার শিক্ষার সারাংশ কী এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে ভারত ও ভারতীয় জনগণের উপকার সাধিত হয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ—২

পরিপূর্ণ শিক্ষায় আমরা সহজেই তিনটি পৃথক উপাদান লক্ষ্য করতে পারি। এই পার্থক্য সর্বদা ক্রমানুযায়ী নয়। প্রথমত যদি আমরা মানুষের মন থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর প্রতিদান লাভ করতে চাই, তাহলে শিক্ষার প্রস্তুতি, ধারণাগুলি গ্রহণ করার শিক্ষা, শিক্ষার দৃঢ় বিকাশ, জ্ঞানের যে বিশেষ বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেখানে যেন স্বাধীনভাবে অগ্রগমন—শিক্ষার এই স্তরের সঙ্গে আমরা অবশ্যই পরিচিত হব। শিক্ষা-পদ্ধতির এই স্তরগুলিই অনেকের কাছে অজানা।

দ্বিতীয়ত সকল ঐতিহাসিক যুগে— বিশেষ করে বর্তমান যুগে ধারণা ও কল্পনার কিছু নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যমূলক ভাণ্ডার আছে, যা সারা সমাজের কাছে হচ্ছে খুবই সাধারণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই তা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পরিণত জীবনে সে সুদক্ষ হয়ে ওঠে। এই উপাদানটিকে শিক্ষার সমগ্রতারূপে সর্বসাধারণ গ্রহণ করে বলে ধরে নেওয়া যায়। এটিই বৃহত্তম বলে বোধ হয়। এটিতেই সবচেয়ে পরিশ্রম লাগে। এই প্রক্রিয়াটিকে উঠিয়ে দেওয়া যে অসম্ভব তা অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ এটি প্রকৃতপক্ষে তিনটি উপাদানের মাত্র একটি। আর বলতে অবাক লাগে যে, যাকে আমরা প্রতিভা বলি তার বিকাশের জন্যে এটি সর্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়। জগতের ইতিহাসে কখনও এমন কোন যুগ ছিল না, যখন শিক্ষার বিষয়টি এত বড় ও আবশ্যিক ছিল, যেমন বর্তমানে হয়েছে। একজনে যেমন বলেছেন, 'ভূগোল, ইতিহাস, বীজগণিত ও পাটিগণিত, যা সব শৈশব-জীবনে ভয় ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে এক গৌরবময় শহরের চাবিকাঠি। বর্তমান চেতনায় এগুলি হচ্ছে বিশেষ অধিকার। এগুলি থাকলে একজন মানুষের শিক্ষিত মনের সমগ্র বিস্তৃত জগতের সঙ্গে সংযোগের ভিত্তি হয়।'

কিন্তু তৃতীয়ের বেলায় এই দুটি উপাদানের সর্বোচ্চ মাত্রা (আর এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে শুধু দ্বিতীয়টি খুব সামান্য মাত্রা নিলেই 'শিক্ষিত' বোঝায়!) একত্রিত করলে প্রকৃত শিক্ষার জন্য মনকে শুধু প্রস্তুত করবে। তারা প্রাথমিক শর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা কোনক্রমেই আর বস্তু নয়। সেগুলি থাকলে মন উপযুক্ত যন্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু কিসের জন্য ? কী তার বাণী হবে ? তার শিক্ষার বোঝা কিসের দ্বারা গঠিত হবে ? কিসের জন্য এত প্রস্তুতি তাকে প্রস্তুত করে তুলেছে ? এক পূর্ণ মানবিক বিকাশের মধ্যে এই তৃতীয় উপাদান অন্য দুটি উপাদানকে একেবারে সরিয়ে ফেলে দেয়। মনের উচ্চতর বা নিম্নতর উপযুক্ততায় এটি যেন অন্য দুটির কার্যকারিতাকে লক্ষ্য করে। মানুষ তার গুরুর সাক্ষাৎ পায় এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় নিমগ্ন করে। কিংবা সে যেন কোন সমাহিতকর ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করে, যেটি তার জীবনের সুতীব্র বাসনা হয়ে ওঠে। কিংবা সে এক অন্বেষণে বের হয়ে পড়ে এবং তারপর থেকে সেটির জন্যই সে বেঁচে থাকে, শুধু সেটির জন্যে। একজনের দশা রূপান্তরিত হয় বহুজনের দশায়। মন হিসাবে মনুষটি হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ মানবীয় সংগঠনের অঙ্গ। সমগ্র মানবতার সম্পদ-ভাণ্ডারে তাঁর কিছু অবদানের সুযোগ তখন আছে।

ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই তিনটি উপাদানের মধ্যে তৃতীয় ও উচ্চতমটি সে পর্যবেক্ষণ করেছে, বিশ্লেষণ করেছে এবং অন্য দুটিকে বরাতক্রমে ঘটতে দিয়েছে। ঠিক সেইভাবে পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে সে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছে এবং তৃতীয়টিকে ভাগ্যক্রমে ঘটতে দিয়েছে।

অথচ তিনটিরই তাদের বিজ্ঞান আছে এবং শেষেরটিও নিশ্চয় তা ছাড়া নয়। উদ্দীপকের প্রতি অহমিকার সঙ্গে সাড়া দেওয়া, অবিরাম মানসিক সক্রিয়তা, অধিক অশান্ততা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুধার পরিবর্তন, উচ্চগ্রামে স্বীয়-স্বীকৃতি, তার্কিকতা ও শক্তি প্রকাশের বাসনা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ। কিন্তু যখন গুরু আসেন বা যে ধারণা জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে সেটিকে যখন বোঝা যায়, তখন তীব্র প্রাথমিক সংগ্রাম থাকতে পারে, কিন্তু তারপর আসে গভীর আপাত নীরবতার কাল। প্রভুর মনে বস্তুগুলি কী ভাবে আবির্ভূত হয় তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। যেন তাঁর হস্তপদ রূপে তাঁর সেবা করা, যাতে নিজের হৃদয় ও মন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে উঠতে পারে; নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে, তাঁর চিন্তারাশি পরিপাকে নিরত সচেষ্ট হয়ে তাঁর সেবা করাই হচ্ছে পদ্ধতি। এই কালটুকুর মধ্যে বিদ্রোহের অবকাশ নেই। বস্তুত গুরু মুক্তিদান করেন, বদ্ধ করেন না তিনি। তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে যদি আমরা তাঁর নাম করে কোন ধারণার বিকাশকে বন্দী করতে বাধ্যতা বোধ করি। কার্যত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে কর্মের জন্য তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, সেটি তাঁর নিজের জন্য নয়, সেটি সত্যের জন্য এবং এটি যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু প্রথমত এটি প্রয়োজনীয় যে আমরা সেখানে শুরু করব, যেখানে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। প্রথমত স্বার্থবিহীন হয়ে সেই ধারণাকে ব্যক্ত করার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে, যা তাঁর মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। প্রথমত আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবনের সমস্ত তাৎপর্য নির্ভর করছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্কের উপর।

জগতের দৃষ্টির সামনে শিষ্য দাঁড়াতে পারে আর গুরু লুকিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু শিষ্যের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী সেই গোপন পবিত্র স্থানের পথের প্রতি নির্দেশ করবে, যেখান থেকে তার শক্তি আসছে। অন্যের গৌরবের জন্য কর্মসাধনের বোধই সবচেয়ে বেশী শক্তি প্রদান করে। কোন মানুষই তার জন্য তার স্ত্রী যেমন হতে পারে, তেমন মহৎ আকাঙ্খাপরায়ণ হতে পারে না। তার নিজের জন্য এটি করছে এই সত্যই মানুষের প্রেরণা ও মহত্ত্ববোধকে ছোট করে দেয়। কোন শিষ্যই আধ্যাত্মিক অহঙ্কার থেকে একই রকমের আনন্দ লাভ করতে পারে না, যেমন লাভ করে গুরুভক্তির উদ্দীপনা থেকে। কোন পুত্রই তার নিজের নাম বিখ্যাত করার জন্য তেমন আগ্রহ বোধ করতে পারে না, যেমন বোধ করবে তার নিজের পিতার নাম বড় করে তুলতে। এগুলি হচ্ছে মানব হৃদয়ের গভীরতম রহস্য এবং এইগুলিই সেই ভূমি গঠন করেছে, যা আবিষ্কার করার কাজ ভারতবর্ষ বেছে নিয়েছে। এই ভাবেই মহত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়।

যাহোক বর্তমানকালে এটি কষ্টকর—কম বেশি জাগতিক ভাবে বলা হচ্ছে—মহত্বকে চেনা কষ্টকর, যদি না শিক্ষণীয় দ্বিতীয় উপাদানের ভাষায় সে নিজেকে প্রকাশ করে। তথ্যের কিছু ভাণ্ডার আছে, যা আধুনিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য কম বেশি দরকার। এই অনুসন্ধানটি আগ্রহকর—এই তথ্য-ভাণ্ডারের কী সেই প্রয়োজনীয় বস্তু? কিন্তু আমরা এই বিষয়ে প্রবেশ করার আগে ব্যাপারটি আরও সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে নিঃস্বার্থপরতাই মার্জিত লোকের প্রকৃত লক্ষণ, যাঁদের রামকৃষ্ণ দেব হয়তো বলতেন 'বিদ্বানলোক'। এই অর্থে এক কৃষক-রমণী রাজ্যশাসনকারী রাণীর চেয়ে বড় হতে পারে। এমন কি বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও কৃষক-পত্নী শ্রেষ্ঠতর হতে পারে, কারণ তার হয়তো আছে তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধ, বিচারশক্তি, সহজবুদ্ধি ও আরও শত শক্তি, যেগুলিতে উচ্চপদমর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা কোনক্রমেই তার চেয়ে বড় হতে পারে না। জগৎ-পূজ্যদের যে কাহিনী সে কি মেষপালক ও গোয়ালিনী, ছুতার ও উটচালকদের নয়? কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে মনের কর্মক্ষেত্র কোন সুদূর ও অস্পষ্ট বস্তুর অন্বেষণে সীমাবদ্ধ, তার শক্তি অনুভব করার সুযোগ একই রকম নয়, যেমন সেই সুযোগ জগতের সমগ্রভাবে পরিচিত কোন বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত অন্যজনের আছে। কোন ভুটিয়া-বালক হয়তো খুব বড় গুপ্ত কবি, কিন্তু সে হয়তো অখ্যাত ও মূক ভাবেই জীবন যাপন করে যেতে পারে। ইতিহাসের হোমার ও সেক্সপীয়ররা হচ্ছেন তাদের কালের বিশ্ব-সংস্কৃতির অংশীদার।

নৈতিক উন্নতির পক্ষে বুদ্ধির ফর্মূলা খুবই সহায়ক হতে পারে। আমরা জানি যে আমাদের ব্যক্তিগত ক্রোধ ও অধৈর্যকে সংযত করা উচিত। কিন্তু এই কাজটি নিঃসন্দেহে সহজতর হয়ে ওঠে, যখন আমরা কিছুটা জানি স্থির-নক্ষত্রের আয়তন ও দূরত্ব সম্পর্কে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের চিন্তায় আশ্রয় নিতে পারি। বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি লাভ হতে পারে, এ ছাড়াও তাকে পরিণত অবস্থায় প্রয়োজন হতে পারে আত্ম-অভিব্যক্তির একটি উপায়রূপে। আমরা সংস্কৃতির ধারণার সঙ্গে একাত্ম করতে চাই না শিক্ষার ব্যায়াম লেখা ও পড়াকে এবং তার দ্বারা পরিবাহিত কিছু বিষয় মুখস্থ করাকে। আমরা ভাল ভাবেই অবগত আছি যে, কোন অশিক্ষিত ভারতীয় গ্রামবাসী সহজেই সাহিত্যগত সংস্কৃতি খুব উচ্চতর হতে পারে, পরীক্ষাগুলিতে খুবই কৃতিত্ববান পাশ করা ব্যক্তির চেয়ে কথকতা ও মঙ্গল-কাব্যের সঙ্গে সে বেশি পরিচিত। কিন্তু অন্যদিকে আমরা ভুলতে চাই না যে, আমাদের বুদ্ধি-শক্তির বিকাশ একটি কর্তব্য। কোন হিন্দু, যে তার জন-দেশ-ধর্মের প্রতি দায়িত্ব পূরণে ইচ্ছুক, সে নিজের জন্য সম্ভবপর যে কোন শিক্ষার সুযোগ অবহেলা করতে পারে না। এই হচ্ছে ঋষিদের কাছে প্রাত্যহিক যজ্ঞ এবং এটি পুরুষদের মতো স্ত্রীদের উপরও প্রযোজ্য।

শিক্ষার তৃতীয় উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় জগতে কবি ও পণ্ডিতের সৃষ্টি হয়। যে ধারণার কাছে আমরা নিষ্ক্রিয় যাতে সেটিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি,

যে ধারণা তারপর থেকে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে দেয়, যে ধারণার কাছে আমাদের সকল শিক্ষা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রস্তুতি, সেই ধারণা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ধারণা। এখানে আমাদের আত্ম-বশ্যতা হচ্ছে বৈরাগ্য। আমাদের উদ্দীপনা এখানে হচ্ছে প্রচারকর্তা। অভিব্যক্তির আদিকে কিছু যায় আসে না। আমাদের সমস্ত চরিত্র এই বুদ্ধিবৃত্তির নদীতে অবগাহন করে জ্যোতির্ময়, আত্ম-সংযত, আত্ম-পরিচালিত নবরূপে প্রকাশ পায়। একমাত্র পাপ হচ্ছে আমাদের সম্পদে, সম্মানে ও খ্যাতিতে প্রতিদানের প্রত্যাশা। কিন্তু যে মানুষ প্রকৃতই তত্ত্বের মহাজীবনে অনুপ্রবেশ করেছে এই ছেলেমানুষীতে বেশি দিন বাঁধা থাকে না কিংবা গুরুতরভাবে তিতবিরক্ত হয় না, কারণ তার অন্বেষণ-শক্তিই তার উপর আধিপত্য করে এবং তাকে এমন কি তার চিন্তা থেকেও বাদ দিয়ে দেয়। প্যালিসি কুম্ভকার ছিলেন এমন আদর্শবাদী। তেমন ছিলেন স্টিফেনসন, যিনি রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন। নিউটন, যিনি ডিমের বদলে তাঁর ঘড়ি সিদ্ধ করেন, তিনি ছিলেন তৃতীয়। সময়ের মাপকাঠিতে এক জাতির উত্থান-পতন নির্ভর করে সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে থেকে এমন ধরনের কত সংখ্যক মনীষী সে সৃষ্টি করতে সক্ষম তারই উপর। এই বিষয়ে বর্তমানে ভারত কেমন? তার দরিদ্র পণ্ডিত বাহিনী উত্তর দিকে! সর্বজনীন তত্ত্বের ক্ষেত্রে তার জনগণের সামর্থ্য জবাব দিক! বিবেকানন্দের কণ্ঠে অদ্বৈতবাদের ভেরীর আহ্বান উত্তর দিক! বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, কারুশিল্প, ব্যবসা, বহিঃ ও আন্তঃস্তরের মানুষের বিকাশ সবই সেই একের বিভিন্ন প্রকাশ। এর যে কোন একটির মাধ্যমে আলোকের বন্যা আসতে পারে, চরিত্রের নির্মাণ-গঠন হতে পারে, সেই অসীম আত্ম-বিস্মরণ, যার অর্থ সেই পরম লক্ষ্য। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য তত্ত্বটি বিবৃত করতে হবে। আদর্শকে সচেতন ভাবে অবশ্যই ধরতে হবে। সাধারণ শিক্ষাকে পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে হবে, এই পবিত্রতা ও মর্যাদার সুযোগটি করে দিতে হবে। আর যদি আমরা এই বিষয়টি একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে আমাদের সকলের শিক্ষা—জনগণের ও সকল শ্রেণীর পুরুষের ও স্ত্রীলোকের—ছাড়া অন্য পথ নেই; শিক্ষাদান তখন আর আমাদের কাছে এক বাসনাস্বরূপ নয়, বরং আদেশস্বরূপ। মানবতা হচ্ছে মন, দেহ আত্মা বা রক্তমাংস নয়। চিন্তা ও অনুভূতির জীবনেই এর উত্তরাধিকার। কারও কাছে এই উচ্চ জীবনের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে হত্যার চেয়ে অনেক বড় পাপ। কারণ তার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর, অন্তরের বন্ধনের জন্য দায়ী হওয়া এবং ফল হচ্ছে অবর্ণনীয় ধ্বংস। আজ আমাদের সামনে একটিমাত্র অবশ্য কর্তব্য রয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় আমাদের জীবন দিয়ে শিক্ষাদানে সাহায্য করা। শিক্ষা বৃহৎ অর্থে যেমন, ক্ষুদ্র অর্থেও তেমন এবং ক্ষুদ্রতেও যেমন বৃহত্তেও তেমন।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ—৩

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আত্মায় দরকার। এটি অবশ্যই ঐক্য গঠন করবে। এটি শিশুকে সমগ্রভাবে লক্ষ্য করবে, যেমন মনের প্রতি তেমন হৃদয়ের প্রতি, মন ও হৃদয়ের মতো ইচ্ছার প্রতিও। যতক্ষণ না আমরা তার অনুভূতি ও পছন্দকে শিক্ষিত করে তুলছি, আমাদের মানুষটি শিক্ষিত হচ্ছে না। সে শুধু কিছু বুদ্ধির কৌশলে দৃপ্ত হলো, যা দেখানোর জন্যই তাকে শেখানো হয়েছে। এই সব কৌশল দ্বারা সে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু সে অন্তরে আবেদন বা জীবন দিতে পারে না। সে মোটেই মানুষ নয়, সে এক চালাক বাঁদর। চালাক প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য লেখাপড়া কিংবা জীবিকার্জনের জন্য লেখাপড়া—মানুষ হওয়ার জন্য নয়, নিজের মনুষ্যত্ব ও পুরুষত্ব বিকাশের জন্য নয়—সেই লেখাপড়ার অর্থ হচ্ছে এই বিপদের মধ্যে যাওয়া। অতএব ছেলেদের যে সব তথ্য দেওয়া হয়, তার প্রতিটিতেই আমরা অন্তরে আবেদন অবশ্যই জানাব। জ্ঞানাহরণের সোপানের প্রতিটি ধাপে শিশুর নিজের ইচ্ছা অবশ্যই কার্যকর হবে। আমরা কথনই শিশুটিকে বহন করে উপরে ও সম্মুখে নিয়ে যাব না, সে নিজেই লড়াই করে উপরে উঠবে। আমাদের লক্ষ্য হবে ঠিক ততটুকু অসুবিধা তার পথে রেখে দিতে যেটুকু তার সঙ্কল্পকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে, ঠিক ততটুকু যা হতাশা দূর করতে পারবে। যখন লব্ধ জ্ঞানের পশ্চাতে ও মধ্যে একটি মানুষ দৃঢ় ভাবে দাঁড়াবে, একটি মন উঠে দাঁড়াবে তখন উপদেশ দানের কাজ বদলে আত্ম-শিক্ষণের কাজ করা যাবে। ছাত্র এখন নিরাপদ, সে নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান করবে। বিদেশে যে ছেলেদের প্রেরণ করা হবে, এই বোধ নিয়েই তারা প্রেরিত হবে যে এই ভাবেই তারা উন্নত হয়েছে। নীতির সাগরে প্রলোভন ও বাধা-বিঘ্নের তরঙ্গগুলির সঙ্গে নিজে নিজে সংগ্রাম করার জন্যেই সে নিক্ষিপ্ত হবে। আমরা ধরে নিই সে সন্তরণপটু। কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা কি করেছি ?

একটি পথ আছে এবং একটিমাত্র পথই। তা হচ্ছে শিক্ষাজীবনের প্রথম বর্ষগুলিতে স্মরণ রাখা যে, অনুভূতিগুলিকে শিক্ষাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। মহৎভাব অনুভব করা, সৎভাব ও উচ্চভাব বেছে নেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পক্ষে হাজারগুণ গুরুত্বপূর্ণ অন্য যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে। যে বালকের মধ্যে এই শক্তি প্রকৃতই আছে ও প্রকৃতই প্রধান, সে যে কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে সবদাই সম্ভবপর সবচেয়ে ভাল কাজটি করবে। যে বালকের মধ্যে এটি নেই, সে বুদ্ধির বিপাকে পড়তে পারে এবং এই বিপাকের অর্থ হতে পারে কেবলই ভুল কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ততা।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে খুব কমই পিতামাতা ও শিক্ষক হৃদয়ের এই শিক্ষার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করেছেন। এমন দৃষ্টি

বিভ্রান্তকর প্রথার মধ্যে আমাদের ছেলেদের জন্ত কোন্ বস্তুটির উপর আমরা তাহলে আস্থা স্থাপন করছি? আমরা কম বেশি অজ্ঞাতসারে বিশ্বাস করি গৃহের, পরিবারের, 'ধর্মের ও দেশের জ্ঞান ও অনুভূতির সাধারণ কর্মকে। সমগ্রভাবে ভারতীয় জনগণের বিরাট নৈতিক প্রতিভা বিগত দু-তিন পুরুষের ছাত্রগণের মধ্যে থেকে এতগুলি চমৎকার মানুষ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করেছে। আর পরিবেশের মধ্যে এই উপাদানের চরম গুরুত্বই বিদেশী শিক্ষাদাতাদের এত অকাম্য করে তোলে। আমার নিজের দেশবাসী শিক্ষাতত্বতে যতই অজ্ঞ হোক, আমাদের উচ্চ অনুভূতিময় জীবনের সঙ্গে তার সম্ভবপর সামঞ্জস্য আছে। তার না ভেবে বলা কথা আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বার খুলে দিতে পারে, যেখানে সদিচ্ছাকারী বিদেশী তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও বিফল হতে পারে। যে মানুষ সুচিন্তিভাবে বিরাট গঠনকারী প্রভাব আমাদের মধ্যে জাগাতে পারে না, সেও বরাতক্রমে তা করে ফেলতে পারে, যদি সে ও আমরা ঘনিষ্ঠভাবে একই জগতের হই। সুযোগ এত কম যে কোন বিদেশী এ কাজ করার প্রয়োজন স্বপ্নেও ভাবে না। এটি প্রায় সত্য যে বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জনের চেয়ে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জন আমাদের পক্ষে ভাল স্কুল মাস্টার।

যাহোক, আইনটি একবার জানা হলে আমরা আর অবস্থার কৃপাপাত্র হয়ে থাকব না। গৃহ লক্ষ্য রাখতে পারে বিদ্যালয় ছাত্রটিকে তৈরি করে তুলছে কিনা। এমন কি এক অজ্ঞ মাতাও তার সন্তানকে ভালবাসতে ও ভালবাসা অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন। এই কারণেই বর্তমানে আমাদের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁদের মায়েদের এত প্রশংসা করেন। শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তিরূপে বালিকাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্রত করা ছিল, যা হচ্ছে এই অন্তরের আবেদনে পূর্ণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা তার প্রথম প্রচলনে এই উপাদানটিকে একেবারে অবজ্ঞা করেছে এবং এইভাবে মানসিক বৃত্তিকে তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন করে তুলেছে। এরপর থেকে ভারতবাসীরা এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না। এরপর থেকে তারা বুঝবে—বাস্তবিক বিগত বহু বৎসর ধরে তারা বুঝে এসেছে—এমন কি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, বিদ্যালয়ে গমণকারীর চেতনার কাছে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে হবে ত্যাগের মহান নিয়মের দ্বারা এবং ত্যাগের এই নিয়ম এখানে হচ্ছে যে, মঙ্গলের জন্ত শিশুর বিকাশ, সেই মঙ্গল নিজের জন্ত নয়, তার জন-দেশ-ধর্মের জন্ত, অথবা পাশ্চাত্যবাসীরা যেমন বলে—পরিপার্শ্বিকতার উপকারের নিমিত্ত ব্যক্তির বিকাশ। 'তুমি কেন স্কুলে যাচ্ছ?' বিদায়কালে মাতা তাঁর শিশু সন্তানকে জিজ্ঞাসা করেন। আর শিশু কোনরকমভাবে উত্তর দেয়, জ্ঞান ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সেই উত্তর স্পষ্টতর ও আগ্রহকর হয়ে ওঠে। 'আমি মানুষ হওয়া ও সাহায্য করা যাতে শিখতে পারি।' এই কেন্দ্রবিন্দুটি ঘিরে যার শিক্ষা গড়ে উঠেছে, তার কোন দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার ভয় নেই।

এই সেবা করার ইচ্ছা, উন্নততর অবস্থার বাসনা, অন্তদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া,

সকলকে উন্নত করা, এই হচ্ছে বর্তমানকালের প্রকৃত ধর্ম। আর সবই হচ্ছে তত্ত্ব, নীতি, মতবাদ। এই হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মের অগ্নি। এর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সচেতন কর্মের দ্বারা যেন প্রতিদিনের শুরু হয়। ক্ষণিকের নীরবতা, স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনা, উপাসনা এ সবের যা কিছুই হচ্ছে আনুষ্ঠানিক যথেষ্টতা। উপাসিতের কাছে নয়, আমাদের কাছেই উপাসনার গুরুত্ব। যে কোন প্রতীকে বা বিনা প্রতীকেই কাজ হবে। এই জন্যেই আমাদের পূর্বপুরুষরা আদেশ করেছিলেন পবিত্র সপ্তনদীর জলকে বা পবিত্রভূমির মৃত্তিকাকে, গুরুর চরণদ্বয়কে বা মার নামে উপাসনা করতে। এ সবই হচ্ছে যার জন্য আমরা নিজেদের উৎসর্গ করি, যার সেবাই হচ্ছে আমাদের সব সংগ্রামের প্রেরণাশক্তি, সেই জন-দেশ-ধর্মের এক আভাস মনের প্রতি প্রদত্ত 'কোন মানুষ একা নিজের জন্য জীবনধারণ করে না।' যে অনুপাতে আমরা এটি উপলব্ধি করি, সেই অনুপাতে আমাদের জীবন মহান হয়ে ওঠে। যে অনুপাতে এটি আমাদের প্রেরণা হয়, সেই অনুপাতে আমাদের শিক্ষা প্রকৃত হয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ—৪

বর্তমানে ভারতে শিক্ষা শুধু জাতীয় নয়, জাতি গঠনমূলক হতে হবে। আমরা দেখেছি জাতীয় শিক্ষা কী হয়—এমন এক শিক্ষণ যার নিজস্ব উজ্জ্বল বর্ণ আছে এবং যা কিছু ঘনিষ্ঠ তার মাধ্যমে শিশু তার গৃহ ও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা যার শুরু এবং শেষ হয় যা কিছু সত্য, সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন তার থেকে তাকে মুক্ত করায়। সর্বদেশে, তার রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়নের স্তর যাই হোক না কেন, এই হচ্ছে সকল স্বাস্থ্যকর শিক্ষার প্রয়োজনীয় শর্ত। এই সাধারণ কথাগুলি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যেমন সত্য, তেমন ভারতের পক্ষেও, যেমন সত্য সুখে তেমন সত্য দুঃখে।

যাহোক, বর্তমান মুহূর্তের প্রশ্ন হচ্ছে জাতি-গঠনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দানের প্রয়োজন, দেশ এক বিশেষ সময়ে যে অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে এটি সেই সংক্রান্ত বিষয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাধারণ সম্মতি দ্বারা বা সুস্থ জনসাধারণের সম্প্রদায়গত গভীর সহজাত জ্ঞান দ্বারা সর্বদাই সহজে নির্বাচন করা ও জোর দেওয়া চলে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর, সাধারণ শিক্ষার যে কোন উপাদানের উপর, যেটিকে কাম্য বলে মনে করা যেতে পারে। আমাদের সকল সংস্থা এই রকমেই গড়ে উঠেছে। আমাদের আচার-ব্যবহারে বিশুদ্ধতার প্রয়োজন সামনে তুলে ধরা হয়েছে যখনই সভ্যতার সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে। যে কালে ওই রকম সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয় তখন জাতি-সংমিশ্রণকে প্রতিরোধ করার জন্য বিবাহ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম-কানুন এক সুচিন্তিত উপায় হয়ে ওঠে। সেইভাবে, যে মানুষদের জাতীয়তাবোধের উন্নয়ন সকল বিষয়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়, তারা তাদের শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তা ও চরিত্রের প্রয়োজনীয় উপাদানের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে।

জাতীয়তা বোধ হচ্ছে সবার উপরে অন্যের জন্য বোধ করা। এর মূল প্রোথিত আছে জনগণের চিন্তায়, সুদৃঢ় নাগরিক বোধে। এগুলি হচ্ছে যাকে সংগঠিত নিঃস্বার্থপরতা বলা হয় তারই বাগাড়ম্বরপূর্ণ নাম। জাতি-গঠনের সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি যা হচ্ছে শিশুর পক্ষে দেখা যে তার বয়োজ্যেষ্ঠরা নিজেদের মঙ্গল চিন্তার চেয়ে বরং সাধারণের মঙ্গল চিন্তায় সর্বদা আগ্রহী। এক পরিবার যে গ্রামের, শহরের বা সড়কের স্বার্থে নিজের স্বার্থত্যাগে ইচ্ছুক, এমন গৃহী যে নিজের সুখ বা নিরাপত্তার জন্য সরকারী কর্মচারীদের কোন অসাধু কর্ম ক্ষমা করে না। এমন এক পিতা, যিনি সাধারণের সম্মান ও ন্যায়ের কারণে যে কোন বাধার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন,—এগুলিই হচ্ছে জাতি-গঠনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও জোরদার শিক্ষা যা শিশু লাভ করতে পারে। বুনো শুয়োর ছোট হলেও ঘোড়া ও তার সওয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, উভয়কে ধ্বংস করার পক্ষে নিজের শক্তিতে কখনই সন্দেহ করে না। এই রকমই হচ্ছে সেই মানুষের সাহস, যে জনসাধারণের মন্দকে আক্রমণ করে। এই হচ্ছে বস্তুত শিক্ষা যার দ্বারা শিশুকে সবচেয়ে ভাল শিক্ষিত করা চলে। অন্যের মঙ্গলের

জন্ম ক্ষুধা, যার পরিতৃপ্তিতেই তার শেষ, মানুষের যন্ত্রণা দর্শনে অবতারের হৃদয়ে যে অসীম মমতা জাগে এই সবই হচ্ছে জাতি-গঠনের বীজ ও মূল। আমরা তখনই জাতি, যখন প্রতিটি মানুষই একই দেহের অঙ্গস্বরূপ, যখন সমগ্রের প্রতিটি অংশই আমাদের কাছে মূল্যবান, যখন জনগণের তুলনায় পরিবারের মূল্য কিছুই নয়।

এশিয়ায় চীন ও ইউরোপে ফ্রান্স হচ্ছে দুটি দেশ যারা ভালভাবেই জানে কী করে জনগণের চেতনাকে ধর্মে পরিণত করতে হয়। এই সত্যই জোয়ান অফ আর্ককে সম্ভব করে তুলেছিল। সুদূর গ্রামের এক কৃষক-কন্যা দেশের দুঃখ নিয়ে চিন্তা করতে পেরেছিল, যতক্ষণ না সে এই বোধে অভিভূত হয়েছিল, 'সুন্দর দেশ ফ্রান্সের জন্য স্বর্গের প্রভূত করুণা রয়েছে।' বুদ্ধের করুণার ধারণার মতোই এই ধারণা এবং ফ্রান্স ছাড়া আর কোথাও এটি দেশের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না।

আমাদের ছেলেদের আমরা অবশ্যই ঘিরে রাখব তাদের জাতির ও দেশের চিন্তা দ্বারা। তাদের জন্য পরিবারের বাইরে আকর্ষণ কেন্দ্র রাখতে হবে। তাদের কাছ থেকে আমরা দাবি করব ভারতের জন্য ত্যাগ, ভারতের জন্য ভক্তি, ভারতের জন্য বিদ্যা। আদর্শের জন্যই আদর্শ। ভারতের জন্যই ভারত। এটি তাদের কাছে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠবে। তাদের বিদ্যালয়ে ও গৃহে ভারত সম্পর্কে আমরা শিক্ষা দেব। কিছু পাঠ ওই ধারণাকে পরিপূর্ণ করবে, আর কিছু পাঠ তুলনামূলক বোধ জাগ্রত করবে। জ্বলন্ত ভালবাসা, সীমাহীন ভালবাসা। যে ভালবাসা শুধু প্রেমাস্পদের মঙ্গল খোঁজে, কোন স্বার্থ চিন্তা যাতে নেই, এই তীব্র বাসনাই তাদের কাছে আমরা দাবি করব।

আমরা তাদের বীরের মত চিন্তা করতে শেখাব। তাদের এমন ভাবে মানুষ করব যাতে নিজের দেশের লোকের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। সেই দুই ইংরাজ বালকের কাহিনীর মতো এমন চিত্ত আলোড়নকারী কাহিনী কমই আছে, যারা পাঞ্জাবে ক্রুদ্ধ জনতার দ্বারা নিহত হওয়ার সময় এই কথা উচ্চারণ করে মরেছিল, 'আমরাই শেষ ইরাংজ নই!' সেইভাবেই যেন আমরা গর্বভরা বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিটি নিঃশ্বাস নিতে শিখি, 'আমরাই শেষ ভারতীয় নই!' এই বিশ্বাস আমাদের সন্তানরা আমাদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে যেন পায়, সেই সঙ্গে সব ধরনের দৃঢ় ও বীরত্বপূর্ণ চিন্তা। বীররা ক্ষণজন্মা এ কথা ভাবা ভুল। মোটেই তা নয়। বীর সৃষ্টি হয়, জন্মায় না। বীরত্বপূর্ণ চিন্তার চাপেই বীর সৃষ্টি হয়। সব মানুষেরই অন্তরে আত্ম-ত্যাগের বাসনা আছে। অন্য কোন তৃষ্ণা এত গভীর নয়। আমরা কামনা করি ধ্বংস, সুখসমৃদ্ধি নয়, আর চাই অন্যের মঙ্গল।

এটি আমাদের চিনতে হবে। এর জন্য স্থান করে দিতে হবে। এটির উপর জোর দিতে হবে এবং একনিষ্ঠ ভক্তির দিকে নির্দেশ করতে হবে। দেশের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি, জনগণের প্রতি ও মৃত্তিকার প্রতি প্রেম যেন ছাঁচস্বরূপ হয়, যাতে আমাদের তপ্ত জীবন প্রবাহিত হয়ে ঢালাই হবে। যদি আমরা এখানে পৌছোতে পারি, আমাদের প্রতিটি চিন্তা, যা জ্ঞান লাভ করেছি তার প্রতিটি অক্ষর সেই বিরাট

চিত্রটিকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করায় সাহায্য করবে। জগন্মাতার উপর বিশ্বাস, ভারতের প্রতি ভক্তি, ঘটনার সত্য ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অযাচিতভাবে আসবে। আমরা দেশকে ঐক্যবদ্ধ দেখব, যেখানে আমাদের বলা হয়েছে সেটি খণ্ড-বিখণ্ড। সেটিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবলেই সেটি প্রকৃত তাই হবে। জগৎ মনের দ্বারাই সৃষ্ট, বস্তুর দ্বারা নয়। আর জগতে এমন কি কোন শক্তি আছে যা একটি চিন্তাকে বাধা দিতে পারে, যেটি সৃষ্টি হয়েছে ত্রিশ কোটি মানুষের তীব্র ভাবনা দ্বারা? এখানেই আমরা পাচ্ছি জাতি-গঠন শিক্ষার প্রকৃত কার্যক্রম।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ—৫

জাতির পুনর্গঠন শুরু করতে হয় তার আদর্শ দিয়ে। কারণ এই কাজে তিনটি প্রাথমিক উপাদানের কথা বিবেচনা করা দরকার। প্রথম হচ্ছে দেশ বা স্থান, দ্বিতীয় জনগণ ও তৃতীয় জাতীয় মন। তিনটির মধ্যে শেষেরটি প্রধান ও সবকিছুর পরিচালক। এটির দ্বারা কাজ করে আমরা অন্য দুটির একটি বা উভয়েরই উন্নতি অথবা পুনর্গঠন করতে পারি। এ দুটির প্রভাব তৃতীয়টির উপর তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও পরোক্ষ। মন জড় প্রকৃতির ও বিদ্রোহী সব কিছুর পুনর্গঠন করতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহী মন কী করতে পারে? এর থেকে আসে যে, জাতি পুনর্গঠনে শিক্ষার মতন এমন গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক অন্য কিছু নেই। এটিকে কী ভাবে জাতীয় ও জাতীয়করণ করা? জাতীয় শিক্ষা কী? আর বিপরীত ভাবে তার বিপরীত বিজাতীয় কী! আরও বলা যায়, জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা ভাল প্রস্তুতি কী ধরনের শিক্ষা প্রদান করে? কী ধরনের শিক্ষা শুধু জাতীয় হবে না, জাতি-গঠন-মূলকও হবে?

বিভিন্ন উৎপাদকের সঙ্গে শিক্ষার কাজ,—বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রদান, কিছু ধরনের ও পরিমাণের জ্ঞান গ্রহণ, মানুষের নিজস্ব বিকাশ। এগুলির মধ্যে শেষেরটি হচ্ছে অতুলনীয়ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের মধ্যে আবার এটি হচ্ছে তার আদর্শ, যা পরম উপাদানটি গঠন করে। কোন মানুষ যা শিখতে ইচ্ছা করে না, তা তাকে শেখাবার প্রচেষ্টা বৃথা হয়। যে সুযোগ একজন প্রত্যাখ্যান করে সেটি তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা অবাস্তব। শিক্ষা হচ্ছে খনন-কার্যের মতো। এর শুরু আদর্শ দিয়ে, প্রথমে উপরভাগে এর কাজ হয়।

পুরোনো আদর্শের মধ্যে দিয়েই নতুন আদর্শের কাছে যেতে হবে। পরিচিতের মাধ্যমেই অপরিচিতের কাছে পৌছোতে হবে। এই প্রশ্ন বাস্তবিক উঠতে পারে নতুন আদর্শ বলে কিছু আছে কিনা। একটি আদর্শ আছে এবং একটি রূপের মাধ্যমে সেটি ব্যক্ত হয়, কিন্তু যখন আমরা সেই আদর্শে পৌছোই, আমরা শাশ্বতে উপস্থিত হই। এখানে সব মানুষ এক হয়ে যায়। এখানে নতুন নেই, পুরোনোও নেই, নিজস্ব নেই, বিদেশী নেই। সীমাবদ্ধ রূপ কিছু নতুন কিছু পুরোনো, কিন্তু আদর্শ স্বয়ং সময়ের সীমা জানে না। তবুও 'নতুন আদর্শ' কথাটির কিছু অর্থ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপীয় কাব্য বাগদত্তা কুমারীকে মহিমান্বিত করে, ভারতীয় কাব্য সমভাবে সতী নারীকে আদর্শজ্ঞান করে। দুটিই শুধু সামাজিক প্রথা যার দ্বারা এক উচ্চ ধারণায় পৌছোনো যাচ্ছে, যা হচ্ছে নারীর পবিত্রতা। যাহোক, স্পষ্টতা এটি বৃথা হবে যদি ভারতীয় শিশুর কল্পনাকে ইউরোপীয় বিশিষ্ট ধারণা দ্বারা ওই আদর্শে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হয় এবং সমান মূর্খতা হবে ইউরোপীয় শিশুকে প্রচলিত ভারতীয় প্রথার দ্বারা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে।

তবুও মহান ও রমণীয় নারীত্বের প্রতি কল্পনার মুক্তিতে শিক্ষা যখন তার কাজ পূর্ণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয় যে নতুন রূপ সত্ত্বেও এই আদর্শ নিমেষে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শিক্ষণপ্রাপ্ত ও উন্নত হৃদয়ের দ্বারা টেনিসন ও বায়রনের কবিতার উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম ভাব নিমেষেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে, তবু ভারতীয় শিশুকে সেই ভাবধারায় মানুষ করার চেষ্টা অপরাধ হবে। সমান মূর্খতা হবে ইউরোপীয় শিশুকে বিয়াত্রিস ও জোয়ান অফ আর্কের বদলে সীতা ও সাবিত্রী সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা, যদিও সেই শিশুই বড় হয়ে নিজের সংস্কৃতির গভীরতা ভালভাবে পরীক্ষা করতে পারে প্রাচ্যের নায়িকাদের প্রতি তাৎক্ষণিক সহানুভূতি দ্বারা।

জাতীয় শিক্ষা প্রথমত, প্রধানত হচ্ছে জাতীয় আদর্শ শিক্ষা। যাহোক আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখব শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সহানুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির মুক্তি। বিদেশীয় পদ্ধতি দ্বারা এটি প্রায়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রূপে এটি ঘটতে দেখা যায় এবং জাতীয় পদ্ধতির দ্বারা বন্ধনের চেয়ে বিদেশী পদ্ধতির দ্বারা মুক্তি ভাল। সর্বজনীনতা লাভের এই বিষয়ের দ্বারা শিক্ষা পরিণামে প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়। সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরভাবে বেশিসংখ্যক মানুষকে মুক্ত করতে পরিচিত আদর্শ ও আঙ্গিক নির্বাচিত করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতিকে একেবারে বিরামবিহীন করা প্রয়োজন যাতে প্রাথমিক অভিজ্ঞতার উপাদান-গুলিতে কোন তীক্ষ্ণ অসঙ্গতি না ঘটে। এই ধরনের অসঙ্গতি চিন্তার বিভ্রান্তি উৎপন্ন করে। আর এই বিভ্রান্তি হচ্ছে শিক্ষার প্রলয়। তাই পরিচিত উপাদানগুলি দিয়েই জাতীয় শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে। উপস্থাপিত আদর্শ সর্বদাই আমাদের নিজস্ব ·অতীতের সৃষ্ট আঙ্গিকের পোশাকে প্রথমে ভূষিত হবে। আমাদের কল্পনার সর্বপ্রথম ভিত্তি হবে আমাদের নিজস্ব বীরত্বব্যঞ্জক সাহিত্য। আমাদের ইতিহাস দিয়েই আমাদের আশার জাল বোনা হবে। জানা থেকে অজানায়, সহজ থেকে কঠিনে— এই হবে প্রতিটি শিক্ষকের নীতি, প্রতিটি পাঠের নিয়ম। পরিচিতিই লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই লক্ষ্য, শিক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিই লক্ষ্য। পরিচিতের মধ্যে যে শিক্ষা শেষ হয়, তা মুক্তির পরিবর্তে বন্ধন হয়ে উঠবে, যথার্থ নয় তামাসা। পরিচিত শুধু মাত্র প্রথম ধাপ। কিন্তু প্রথম ধাপ হিসাবে একান্ত প্রয়োজন।

ভৌগোলিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে প্রথমে ভারতবর্ষের ধারণার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সেখানেই সেটি থেমে থাকবে না। ভৌগোলিক জ্ঞান একেবারে গেঁয়ো হয়ে যাবে। যদি না সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এক স্পষ্ট ধারণা তা গড়ে না তোলে। এমন কি সেটাও যথেষ্ট নয়। পূর্ণ শিক্ষায় ভৌগোলিক বিষয়ের মুক্তি, ভৌগোলিক অনুসন্ধানে দীক্ষা, ভৌগোলিক গবেষণায় প্রারম্ভিকতা অবশ্যই হবে।

ইতিহাসেরও একই ভাব। ঐতিহাসিক পারম্পর্য বোধ ভারতবর্ষের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। যা কিছু ঐতিহাসিক তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে; কিন্তু ভারতের ইতিহাস হবে নিয়ত বর্ধমান জ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্পণের প্রথম সোপান।

মঙ্গোলীয়, সেমিটিক, ইউরোপীয় ও আরবীয় জনগণের ইতিহাস, তাদের সভ্যতা ও তাদের আন্দোলন এ সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। পুরোনো ঘটনার নতুন করে ব্যাখ্যা, নতুন তাৎপর্যের ও অভাবিত ঘটনাবলীর ধারণা ও অতীতের কাহিনী থেকে ভবিষ্যতে গতিশীল শক্তির সন্ধান এই সব ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া যাবে এই শিক্ষার মুকুটমণি।

ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে এই পর্যন্ত। এটি কখনও ভোলা হবে না যে সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তা হচ্ছে পথস্বরূপ, লক্ষ্য নয়। সাফল্যের একটি স্তর আছে, যেখানে জগতের সকল শিক্ষিত লোক একত্রিত হতে পারে, পরস্পরের সম্পর্ক বুঝতে পারে ও উপভোগ করতে পারে। এই স্তর হচ্ছে স্বাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তির ভাষায় এই হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু এই স্তরে শুধু সেই পৌঁছোতে পারে, যার জ্ঞানের মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হচ্ছে মা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসায়, শৈশবের ও জ্ঞানার্জনের জন্য প্রথম সংগ্রামের মধুর স্মৃতিতে এবং অবিচলিত বিশ্বাসে যে তার জন্মস্থানের গ্রামে ঈশ্বরের মুখ উজ্জ্বলতম শোভায় মণ্ডিত ও তাঁর নাম মধুরতম ভাবে ধ্বনিত।

প্রকৃত শিক্ষায় বিদেশী সংস্কৃতির স্থান

একটি শিশু তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ও গ্রামের এক বড়লোকের সঙ্গে সম্পর্কের—যেখানে সে সহৃদয়তার সঙ্গে গৃহীত হতে পারে—মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ধরে নেওয়া যাক ছেলেটির নিজের পিতামাতা ও পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে এক ধনীর গৃহে অতিথিরূপে ঠাঁই লাভ ছাড়া তার আর কিছু নেই। তার অনুভূতির জীবন কত শূন্য হয়ে যায়! তার অনুভূতির কোন স্বাভাবিক শিকড় নেই। তার মধ্যে অনুভবের জগতের কোন কেন্দ্র নেই, যেখানে সে বিশ্রাম করতে ও অনুভব করতে পারে যে আত্মার গৃহ সে খুঁজে পেয়েছে। তার জীবনে বাহ্যবিষয় অন্তর্বিষয়ের পারম্পর্য নয়। আমাদের কারও পক্ষেই কোন কিছুই কোনকালে সমান হয়ে উঠতে পারে না সেই অনুভূতির সঙ্গে, যা জড়িত থাকে আমাদের শৈশবের বহু পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে, আমাদের ছেলেবেলার গৃহের সঙ্গে, যার কোলে আমরা শুয়ে থাকি. জগতের মাঝে আমাদের প্রথম জাগরণ কালের সঙ্গে।

প্রতিটি বাহ্যবিষয় কোন অন্তর বিষয়ের অপরোক্ষ শাখা হওয়া উচিত। যে মন গোড়া থেকেই বিদেশী জ্ঞান ও ধারণা দ্বারা পুষ্ট, পরিচিত অনুভবের উপর স্থাপিত নয়, সে যেন অপরিচিতের গৃহে মানুষ হওয়া অনাথের মতন। অনাথের আচার-ব্যবহার খুবই ভাল হতে পারে এবং তার উপকারীকে প্রতিদান দিতে পারে, কিন্তু তা হচ্ছে কর্তব্যের ধারণা সম্পর্কে বুদ্ধিজাত ফলের সমান, তাকে ভালবাসে বলে নয়, কারণ এটি সে এড়াতে পারে না বলেই করে।

তাহলে বিদেশী শিক্ষা কি কখনও মানুষের নিজস্ব বিকাশের কাণ্ডে কলম করে দেওয়া যায়, যাতে সেটি তার বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্বের প্রকৃত ও জীবনীশক্তিদায়ক অংশ হতে পারে? আমরা একথাও জিজ্ঞাসা করতে পারি, যে শিশুর নিজের বাবা-মা আছে তার মনে কি রাজা বা জমিদারের স্থান নেই?

আবার যখন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তখন যা বিদেশী তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক এই প্রশ্নও আছে। হৃদয়ের মুক্তি বলে একটি জিনিস আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে জাতিরই হোক না কেন কোন রুচিবান মানুষ যে তাজমহলের সৌন্দর্য অনুভব করে না এ আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমরা কোন রুচিসম্পন্ন হিন্দুরও কল্পনা করতে পারি না, যে ইংরাজি জানুক বা না জানুক ইউরোপের কোন সুন্দর প্রাচীন কাঠ-খোদাই করা ম্যাডোনা দেখে আনন্দলাভ করতে পারে না। মহান কাব্যের আবেদন সর্বজনীন। সংস্কৃতির সুন্দরতম প্রস্ফুটিত ফুলের অন্যতম হচ্ছে রুচি।

আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে লোক কাজের প্রশংসা করতে আসে সে শিক্ষার্থী নয়, ইতিমধ্যেই সাবালকত্ব অর্জন করেছে। ম্যাডোনার সম্মুখে দণ্ডায়মান ভারতীয় তাকে অনুকরণ করবে না। সে শুধু আনন্দ উপভোগের জন্যই সেখানে। এই

বৈশিষ্ট্য প্রাণবন্ত। প্রকৃত শিক্ষায় বিদেশী সংস্কৃতির স্থান কখনই প্রারম্ভে নয়। সকল যথার্থ বিকাশ জানা থেকে অজানায় এগিয়ে যাবে, অতি পরিচিত থেকে অপরিচিততে, কাছ থেকে দূরে।

সকল শিক্ষাতেই শুধু জিজ্ঞাসার জবাবেই আমরা জ্ঞানদানের চেষ্টা করব। এটাই হচ্ছে আদর্শ। যদি এই আদর্শে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৌছোতে সমর্থ হই, প্রতিটি শিশুই প্রতিভাবান হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের জগতের মধ্যে যে সত্য নেই, তার সম্পর্কে কৌতূহল কেমন করে জাগবে? যদি আমরা বুঝতে পারি একটি শিশুর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ প্রক্রিয়া কত জটিল, খেলার সময়, পথে, গৃহে পরিবারে কোন অভাবিত মুহূর্তে তার মধ্যে যে প্রশ্ন জাগরিত হয়, তার জবাব শিক্ষালয় কেমন ভাবে দেবে, তাহলে আমরা এটাও বুঝতে পারব যে চিন্তার প্রতিটি শাখা, যার মধ্যে মনের পূর্ণ ক্রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়, তা'কে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। মার্কিন শিশু জর্জ ওয়াশিংটনের কাছ থেকে সত্যবাদিতা শিখতে পারে, আর হিন্দু এটি আরও ভালভাবে শিখেছিল যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে। হিন্দু ব্যক্তিকে সেক্সপীয়ারের ব্রুটাস শিহরিত করতে পারে। কিন্তু সে শুধু সেই অনুপাতে তাঁকে প্রশংসা করতে পারে যেভাবে তার নিজের শৈশবে বীরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণায় পুষ্ট হয়েছিল আর এই ধারণাগুলি তার বোধগম্য হয়েছিল তার নিজের গৃহ ও মহাভারত হতে। শিক্ষায় বিশুদ্ধ ধারণারূপ কোন বস্তু নেই। বিশুদ্ধ ধারণা কেবল পরমহংসরাই লাভ করেন। শিশুর ধারণাগুলি খুবই জটিলভাবে আবদ্ধ থাকে যে বস্তুগুলি সে তার চারপাশে দেখে তার সঙ্গে, সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ও তার নিজের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে। অতএব শিক্ষার বিদেশী মাধ্যমে প্রথমে অনুবাদ করে নিতে হবে তার অজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর আদিতে এবং কেবলমাত্র তাই করার পরে যদি সেরকম সৌভাগ্য হয় তাহলে জ্ঞানরূপে সেটি প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান ও জ্ঞানের ফলের মধ্যে এখানে পার্থক্য হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেই জ্ঞান. বিশুদ্ধ জ্ঞানে, অতএব বিজ্ঞানে দেশী বা বিদেশী বলে কিছু হতে পারে না। অন্যদিকে, অনুভূতি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্থানীয় ব্যাপার। সব রূপই হচ্ছে বিশুদ্ধভাবে স্থানীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের এক নিজস্ব দেশ আছে। সেজন্যই শিল্প, যা হচ্ছে আবেগমণ্ডিতরূপ, সর্বদাই স্থানের, জনসাধারণের ও যে মানসিক ঐতিহ্য থেকে এটি বিকশিত হয়, তারই সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সৌন্দর্য হচ্ছে এক, আর শিল্প হচ্ছে সৌন্দর্যের আবরণ উন্মোচনকারী; সেই শিল্প সর্বদাই এক স্থানের বা অন্য স্থানের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণযুক্ত। জ্ঞান হচ্ছে কর্তব্য আর শিল্প হচ্ছে এক আনন্দ। এই কারণে প্রকৃত শিক্ষায় বিদেশী শিল্প যে স্থান দখল করতে পারে সেই প্রশ্নে আমাদের অন্তরে অসীম অনুসন্ধান করা উচিত। শিল্প বলতে আমরা যে সম্পর্কে বলছি সেটি এখানে ভাল করে বোঝা দরকার; সবার উপরে হচ্ছে কাব্য, তার অনুভূতির বহিঃস্থ রূপ নিয়ে; নাটক, ভাস্কর্য, সেটি যে নিয়মে পরিচালিত হয়, তা

আমাদের নয় ; সঙ্গীত, যা আমরা বুঝি না ; স্থাপত্য, যা আধুনিক এবং হাল্কা ও আড়ম্বরপূর্ণ। সমগ্র প্রশ্নের সার স্বরূপ গভীরভাবে ও ঘনিষ্ঠভাবে বোধগম্য হওয়া এটি নয়। আমরা তখনই কপট হই, যখন কোন বিষয়ে আমরা চেষ্টা করি, সেটিকে ইতিমধ্যেই ভালবেসেছি বলে নয়, কিন্তু সেটিকে প্রশংসা করা উচিত বলে বিশ্বাস করি। আর এই ধরনের কপটতা এসে পড়তে পারে যে কোন কাজে বা মতে, এমন কি খুব সাধারণ বিষয়েও যেমন কোন রঙ নির্বাচনে, নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে কদর্য ও বিশ্রী দেখাবার জন্য। রাস্কিন বলেন, 'অনুকরণ হচ্ছে প্রার্থনার মতন, ভালবেসে করা হলে তা সুন্দর, লোক দেখানোর জন্য হলে বীভৎস।'

কিন্তু আমাদের অনুভূতির ধারা ও অভিব্যক্তির রূপ ব্যাপক করার জন্য অনুসন্ধানের কোন অধিকার কি আমাদের নেই? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে স্থাপত্যের বিষয়ে একটু উল্লেখ করে। ফার্গুসন তার মহান সৃষ্টিতে নির্দেশ করেছেন যে, যখন কোন দেশবাসীর স্থাপত্য বিরাট ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তখন বিদেশে উদ্ভূত ছোটখাট উপাদান গ্রহণ ও পরিপাকের পক্ষে তারা আরও বেশী উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তিনি আমাদের বলেন, ইন্দোসেরাসিনীয় প্রথার রত্নখচিত মোজেকের উৎসস্থল ইতালীয় কি ইতালীয় নয় তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কারণ ভারত সেগুলি থেকে এমন অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কিছু সৃষ্টি করেছে। যাহোক, এটি পরিষ্কার যে ভারত এই কার্য করতে পারত না, যদি স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সে ভাসা-ভাসা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে থাকত। যেহেতু সে পরিষ্কারভাবে জানত তার নিজের প্রাসাদসমূহে সে কী পছন্দ করে, তাই সে বুঝেছিল সেগুলির উপর সুন্দর অলঙ্করণ কী হতে পারে। আজকের ধাঁধাগ্রস্ত স্থপতিরা, যে আঙ্গিকের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ নয় তাতে কাজ করতে গিয়ে কোন মতেই অমন সৌভাগ্যবান হতে পারে না, যখন সে সেইগুলিকে অলঙ্কৃত করে বাতুলসুলভ মৃৎকর্মে কিংবা নকল প্রস্তরখণ্ডের বীভৎস আকারে ও বিচিত্র বর্ণের লতাপাতায়!

আমাদের অনুভূতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বর্ধিত করার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যদি আমরা এতে অকপট হই, তাহলে সময়ে সময়ে অল্প করেই তা করা হবে এবং পরিশ্রম ও কষ্টের ফলরূপে। প্রেম সম্বন্ধে শুধু বক বক করে, এমন কি ছন্দবদ্ধ বাক্য ব্যবহার করেও আমরা প্রেমিক হতে পারি না! মহৎ ভাবের সূক্ষ্মতা, কৃচ্ছ্রতা ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তুলতে পারি, সহজ আনন্দ প্রাপ্তির স্থূল অনুকরণ দ্বারা নয়। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার নিজের হৃদয়ে তরবারির আঘাত খোঁজে।

আমরা চারদিকেই দেখছি যে যখন পরিচিতের মধ্যে মূল গভীরভাবে প্রোথিত, শুধু তখনই আমরা নিরাপদে অপরিচিতকে গ্রহণ করতে পারি। যে অনুপাতে আমরা পরিচিতকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করব, ব্যক্ত আদর্শ ও গৃহীত আঙ্গিকের মধ্যে এমন কি পরিচিতের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যকেও বিশ্লেষণ করব, সেই অনুপাতে সেটি আমাদের জন্য

সমগ্র জগতের গ্রন্থটি উন্মুক্ত করে দেবে। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই যে মানুষ নিজে বস্তুকে ভালবাসে না, তার নিজের যে কী সে সম্বন্ধে যার পরিষ্কার ধারণা নেই, তাকে কোন লোকই আধখানা মানুষের বেশি কিছু বলে কখনই গ্রহণ করবে না।

এটি একজনের কাছে কত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে দেখে ভারতীয় পিতামাতা তাদের ছেলেদের শিল্প-বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করার জন্য বিদেশে কত নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছে! যে অঙ্কুরের শিকড় নেই তার বৃদ্ধির জন্য অরণ্যে পুনরায় রোপন করা! এটা কত স্পষ্ট যে সবকিছুর চেয়ে একটি জিনিস যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তার নিজস্ব পরিবেশে শিকড় গাড়া ও বড় হওয়া! অন্যভাবে বলা যায়, ছেলেটির ভারত ত্যাগের আগে তার প্রথমে উচিত বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করা। তারপর সেই পদ্ধতিগুলির আলোকে ভারত তাকে যা কিছু শিক্ষা দিতে পারে তা তার শেখা উচিত, যে বিশেষ শিল্প-বিজ্ঞান সে আয়ত্ত করতে যাচ্ছে সেটির সহজ ও আদিম স্বদেশী-রূপ। তার আধুনিক শিক্ষার বিপরীতে আদিম শিল্পটিকে ওজন করে নেওয়ার পরে, দুটির মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পরে, যা কিছু পেয়েছে সে সব পড়ার পরে, এমনকি যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করার পরে যখন তার নিজের মন জিজ্ঞাসায় কম্পমান হয়ে উঠেছে, তখন ছেলেটিকে বিদেশে পাঠানো হোক। শুধু যখন ঔৎসুক্য ইতিপূর্বেই জাগরিত হয়েছে তখন জানা থেকে অজানায় অগ্রসর হওয়ার শক্তি আমাদের হয়।

আমি এক ছাত্র সম্পর্কে শুনেছি যে কোন কারখানা থেকে ছাপার কালি কীভাবে তৈরী করা হয় তাই শেখার আশায় বিদেশে গিয়েছিল। স্বভাবতই বহু কারখানার পর কারখানা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজের শক্তি ও পিতার অর্থ নষ্ট করার পর যে জ্ঞানের সন্ধানে সে গিয়েছিল তা ছাড়াই তাকে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে জাজ্বল্যমান, যেহেতু বহুকাল আগেই ভারতবর্ষ ও চীনের দ্বারাই স্থায়ী কালির তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং যেহেতু এই জ্ঞান এখনও পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়নি, বর্তমানকালেও কোন গলির মধ্যে শুরু করা যে কোন স্বদেশী কালির কারখানা সমপরিমাণ বিদেশী বাণিজ্যের লেখনীয় তরল পদার্থকে তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতা থেকে হটিয়ে দিতে পারে। এর থেকেই আসে যে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগে, যে ভারতীয় বালকটি মোটামুটি বুদ্ধি ও টেকনোলজিক্যাল তথ্য নিয়ে কোন ধরনের ছাপার কালি আবিষ্কারের সন্ধানে ছিল, সে যে লোকদের কাছ থেকে এখন ভিক্ষা বা চুরির ইচ্ছা করছে তাদের চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েই ছিল। এই ক্ষেত্রে সময় ক্ষতি ও অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞানের স্থান সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্য। বিদেশী শিক্ষায় শুধু শিরোভূষণ বা শীর্ষ-অলঙ্কার ছাড়া জাতীয় বিকাশের প্রকৃত সংবৃত্তি বা অভিজ্ঞতা হওয়ার কোন অধিকারই নেই।

অবশ্য যখন এটি বলা হচ্ছে এবং ব্যক্তির জন্য এমন সহজেই এক আদর্শ স্থাপিত হচ্ছে তখন বেদনার সঙ্গে মনে জাগে ভারতকে কি অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে! ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনার দশকগুলি থেকে ভারতে বিদেশী জ্ঞান ও বিদেশী

সমালোচনার অভূতপূর্ব বন্যা শুরু হয়—যে বন্যায় তার সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে এমন বহু চরিত্রসম্পন্ন ও মনসম্পন্ন মানুষকে ভারত হারিয়েছে—যে বন্যায় থাকা একমাত্র অসাধারণ জাতীয় সংহতি ও সঙ্কল্প তাকে এতকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারত। যখন আমরা এটি পূর্ণভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে স্মরণ রাখছি, তখন যা হোক আমাদের ওপর এটি শুধু আরও বাধ্যতামূলক হয়ে উঠছে যে ব্যক্তির বিকাশের বিষয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের পদক্ষেপ করতে হবে। কারণ একমাত্র ব্যক্তির শক্তির দ্বারাই সমগ্রভাবে যে ভুল করা হয়েছে তার সংশোধন আমরা করতে পারি।

যন্ত্রশিল্পের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এমন কি বিজ্ঞানেও সেই মানুষরাই যাবে, যারা বিশ্বাস করে প্রাচীন ভারতীয় মহান আদর্শের তারা উত্তরাধিকারী ও সেইজন্যই কর্মরত, যারা জাতীয় ভবিষ্যতের সৌধ নির্মাণের জন্য প্রস্তর স্থাপনে সক্ষম—যদি সেরকম কোন সৌধ আদৌ হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানের পথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নির্মাণ সেই মানুষের দ্বারা হবে না, যে মানুষ নিজের জীবিকার জন্য কাজ করছে এবং পুত্রকলত্রকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের মধ্যে রাখার জন্য উপার্জন বর্ধিত করতে ইচ্ছুক, সেই মানুষের দ্বারা হবে না যে দর দামের হিসাব করে, সে মানুষের দ্বারাও হবে না যে কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়, সে মানুষের দ্বারাও নয় যে আদর্শের সঙ্গে দোকানদারি করে। অশোক ছিলেন কলিঙ্গ বিজয়ী, অতএব তাঁর কিছু প্রজার শত্রু যে পর্যন্ত না বুদ্ধের বাণী এই ক্ষতিকর বাধার পাথর ঘুচিয়ে দিল এবং তিনি নিজেকে মানুষ—এক ভারতীয় মানুষরূপে অনুভব করলেন, যার অধিকার আছে মহত্ত্ব দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য শাসন করার। এমন ধারাই হবেন যিনি আধুনিক জ্ঞানের মশাল ভবিষ্যতের ভারতে বহন করবেন, যিনি নিজেকে অনুভব করবেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমগ্র মহত্ত্বের অধিকারীরূপে। তার ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে বৈরাগ্যের যে নদী প্রবাহিত হবে, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানেই সেই নদী তার সাগরকে খুঁজে পাবে। কিন্তু বিজ্ঞান সেই ভক্তের কাছে উচ্চতম সত্যের চেয়ে কিছু কম হবে না। তার মধ্যে দুটি সংগ্রামী বস্তু থাকবে—সত্যের আকাঙ্ক্ষা ও নিজের দেশবাসীর উপর তাদের অজ্ঞতার জন্য করুণা। সেই হৃদয়ে মুক্তির জন্য চিন্তার সময় থাকবে না। সৈনিক যখন তার দলপতিকে অনুসরণ করে শত্রুব্যূহে যায়, তখন কি মুক্তির চিন্তা করে? যে জীবন এই লক্ষ্য লাভ করে, সে এক অসীম ত্যাগের অগ্নিশিখা হয়ে উঠবে। রূপটি আধুনিক হতে পারে, বিজ্ঞানের নামটি বিদেশী হতে পারে, কিন্তু উৎসর্গের পবিত্রতা, শক্তি, জীবন ভারতীয় হবে এবং নিজেদের ভারতীয় রূপেই জানবে। তাই মুক্তির সন্ধানে বিরতিই হচ্ছে মুক্তি। এই আবেগের আলোকে দর্শন করলে আত্ম-চর্চার চেষ্টা কত ক্ষুদ্র ও দয়াজনক বলে বোধ হয়। বিদেশী জ্ঞানের সমস্ত কিছুই সে সহজে পরিপাক করতে পারে, যার নিজের দেশের সঙ্গে সম্পর্কের মূলটি গভীরভাবে প্রোথিত।

বিদেশী সংস্কৃতির প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে ধারণার দুশ্চিন্তা বেশীর ভাগ সময়েই বিদেশী বিলাসিতার বাসনাকে শুধু ঢেকে রাখে। এই বিষয়ের সমস্তটির সম্পর্ক হচ্ছে—

মানুষের আত্মসম্মানের মাত্রা খুব কঠোর হতে পারে না। একটা সময় ছিল যখন মানুষ জন্মাত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরূপে, নয় বড়জোর গোষ্ঠীর সহজাত প্রবৃত্তিসহ। বর্তমানে আমরা এমন কোন শিশুর ধারণা করতে পারি না, যার মধ্যে পরিবারের সম্মান আদিম প্রবৃত্তিরূপে নেই। হয়তো এমন যুগ আসতে পারে যখন জন্মভূমি ও দেশবাসীর চিন্তা অমনি গভীরভাবে মানুষের অন্তরে নিবিষ্ট থাকবে। সে যুগের মানুষদের কাছে মহান জীবনে বিদেশী বিলাসিতার স্থানের প্রশ্নটি কেমন দেখাবে? আমাদের যা নিজস্ব আছে কিংবা পরিশ্রম ও নৈতিক বিজয়ের অধিকারভুক্ত যা আমাদের হয়েছে, শুধু সেইগুলিই ব্যবহার করে আমরা ভাবীকালের ঘটনাকে বর্তমানকালেই আনি না কেন? এই সব বিষয়ে কিছু পরিমাণ আত্মসংযম ও আত্মবঞ্চনা প্রতি মানুষের কাছে দাবি করা হয় তার নিজের নৈতিক মর্যাদার প্রয়োজনে। যে বিধি শুধু এর সব সুযোগগুলি নয়, সকল সুবিধাগুলিও যতদূর সম্ভব ব্যবহার করে, সেই বিধি খুব সম্ভব ভারতীয় পুরুষকে ইউরোপীয় মহিলায় পরিণত করে দেবে। পৌরুষহীনতার অভিশাপ অনুসরণ করে বিদেশী বিলাসিতায় মগ্ন হওয়াকে, এমনকি সে মগ্নতা নির্দোষ হলেও। সঙ্কট মুহূর্তে লঘুভাব হচ্ছে পৌরুষহীনের রোগ। খ্রীষ্টীয় শপথের মহত্তমগুলির একটি এই কথাগুলির মধ্যে রয়েছে—'খ্রীষ্টের উত্তম সৈনিকরূপে আমাদের কঠোরতা সহ্য করতে দাও!' আর একটি মহান উক্তি, 'তোমরা মানুষের মত আচরণ করো! শক্তিশালী হও।' কঠোরতা সহ্য করার অক্ষমতা; আন্তরিক হওয়ার অক্ষমতা, কর্মে বা ভক্তিতে, জীবনে বা কল্পনায় মানুষের মত আচরণের অক্ষমতা ইত্যাদি, যদি আরও কিছু মন্দ থাকে, সে সব হচ্ছে বিলাসিতা বৃক্ষের ফল, যাতে আমাদের কোন অধিকার নেই।

সর্বশেষ ও চরম কথা হিসাবে বলা যেতে পারে—মানবতা হচ্ছে এক, স্বদেশী ও বিদেশীরূপে প্রভেদ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ কৃত্রিম। প্রভেদ হচ্ছে আপেক্ষিক। একটি মানুষের নিজের দেশেই বহু বস্তু আছে যা তার অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিদেশী। তার দোলনায় শায়িতাবস্থা থেকেই সে বহু বিদেশী বিলাসিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এই উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে নীতিগুলিও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে, জয় ও পরাজয়ের মধ্যে, চমৎকারিতা ও নিকৃষ্টতার মধ্যে সব প্রভেদই সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। আপেক্ষিকতার জগতের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভ্রমণ করলে মানবতার একত্বের চরম ও পরম ধারণাগুলি আমরা বুঝে উঠতে পারি। এই একত্ব আত্মার কাছে নিজেকে প্রতিভাত করে বিরাট মুক্তিরূপে। এটি এমন কি কখনও ক্ষীণতমভাবেও তার দ্বারা ধারণা করা যায় না, যে অর্ধকেই সম্পূর্ণের বদলে গ্রহণ করেছে। মানবিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে জাতিচ্যুত সে ব্যক্তি, বিদেশী পথ ও বিদেশী মতের অনুসন্ধানকারী, যার নিজের মাতা তার কাছে লজ্জাস্বরূপ হন—সেই মানুষ যার কোন স্বদেশ নেই।

ভারতীয় নারীর ভাবী শিক্ষা

ভারতে ভবিষ্যতের নারীরা আমাদের চিন্তাগ্রস্ত করে। তাদের সৌন্দর্য আমাদের নয়নপথে সর্বদাই জাগে। তার কণ্ঠস্বর আমাদের আহ্বান জানায়। যতক্ষণ না আমরা তার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করে তুলছি, যতক্ষণ না আমরা জীবনের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে বাইরে বেরিয়ে তার হাত ধরে ভিতরে টেনে আনছি, ততক্ষণ আমাদের মাতৃভূমি অবগুণ্ঠিতা ও নিষ্ক্রিয়া হয়ে নতনেত্রে বিষণ্ণ ধৈর্যের সঙ্গে পৃথিবীর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সেই মহীয়সী মাতার সানন্দ আত্মপ্রকাশের জন্য এটি একান্ত প্রয়োজনীয় যে, তাঁকে সর্বপ্রথমে পরিবেষ্টিত করা তাঁর কন্যাদের বৃত্ত দ্বারা, ভাবীকালের ভারতীয় নারীদের দ্বারা। তারা মাতার পদতলে তাদের গর্বিত মস্তক ঠেকিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করবে এবং তাঁর কাছে শপথ করবে নিজেদের জীবন, নিজেদের স্বামীদের জীবন ও নিজের সন্তানদের জীবন বলিদানের। তখন, একমাত্র তখনই, তিনি জগতের সামনে মুকুট মাথায় দাঁড়াতে পারবেন। তাঁর পবিত্রভূমি আজ শুধু ছায়ায় ভরা। কিন্তু যখন ভারতের নারীজাতি জাতীয়তার মহান আরতি করতে পারবে, তখন সেই মন্দির আলোয় ভরে উঠবে না, ঊষাকাল নিশ্চিত সন্নিকট হয়ে উঠবে। ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের সকলেই যাঁরা বোঝেন তাঁরা একমত যে এই সঙ্কটকালে আমাদের নারীদের শিক্ষার কিছু সংস্কারের অবশ্য প্রয়োজন। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা বিনা বর্তমানের কোন বড় কাজই শেষ পর্যন্ত করা যাবে না। দিনের সমস্যাগুলি পুরুষের যেমন নারীরও তেমন। এটা কত বৃথা গর্ব যে আমাদের হৃদয় যাকে অর্পণ করেছি, যদি না তাঁকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি।

যাহোক, নতুন ধরনের নারী-শিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় দ্বিধা চিরকালই হয়েছে প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্য এবং এই ব্যাপারে লোকেরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান ছিল! অতীতের হিন্দু রমণীরা আমাদের লজ্জার উৎস হয়ে থাকলে আমাদের কি উচিত তাদের পুরোনো লালিত্য ও মাধুর্য, তাদের নম্রতা ও পবিত্রতা, তাদের সহিষ্ণুতা ও শিশুসুলভ গভীর ভালবাসা ও দয়া দ্রুত পরিত্যাগ করা পাশ্চাত্যের সংবাদ ও সামাজিক উগ্রতার প্রথম স্থূল ফলগুলি লাভ করার নিমিত্ত? এই বিষয়ে ভারত কোন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথা বলে না। প্রভাবের ফলে সে বলে, 'মেনে নিলাম যে নারীদের আরও কঠিন মানসিক প্রকরণ এখন প্রয়োজন, কিন্তু চরিত্রের উপর পুরোনো প্রথায় শিক্ষণের আরও প্রয়োজনীয় দাবি পূরণে অসমর্থ হওয়ার চেয়ে ওইটি লাভে অসমর্থ হওয় অনেক ভাল। মস্তিষ্কের সেই শিক্ষা যা বিনয়ের মূলোচ্ছেদ করে ও কোমলতাকে দূর করে দেয় তা কোনক্রমেই প্রকৃত শিক্ষা হবে না। -এই গুণগুলি মধ্যযুগের ও আধুনিক সভ্যতায় অভিব্যক্তির বিভিন্ন রূপ পেয়েছিল, কিন্তু সেগুলি উভয়কালেই প্রয়োজনীয় সব শিক্ষাই যা লাভ করার উপযুক্ত, তা প্রথমে চরিত্রের বিকাশ ও সংগঠনে নিজে

অবশ্যই নিযুক্ত করবে এবং দ্বিতীয়ত কেবল বুদ্ধিগত সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করবে।'

অতএব, ভারতীয় নারীদের জন্যে যে প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তা হচ্ছে এমন ধরনের শিক্ষা যা মন ও আত্মার পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যকর বিকাশের এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে। একবার এমন ধরনের শিক্ষার রূপ সাফল্যের সঙ্গে চিন্তা করে বের করতে পারলে এবং তার উপযুক্ততা প্রদর্শন করতে পারলে যথেষ্ট হৈ-হৈ ছাড়াই আমরা নারীশিক্ষার যুগটিকে আমাদের মধ্যে পাব। প্রতিটি সার্থক পরীক্ষাই হয়ে উঠবে নতুন প্রচেষ্টা চক্রের সঙ্কেত। ইতিমধ্যেই নারীদের সেবাকার্যের বিষয়ে বিদেশে যথেষ্ট আগ্রহ জেগেছে। আমরা যা কিছু চাইছি তা হচ্ছে পথের নির্দেশ।

পদ্ধতির প্রশ্ন শিক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও উদ্দেশ্যের প্রশ্নের কাছে এটি তবুও ছোট। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের শিশুদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা। অতএব এটি আরও জরুরী প্রয়োজন যে মেয়েদের শিক্ষণে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণাকৃত আদর্শ থাকা উচিত, যার জন্য কাজ করতে হবে। আর এই বিশেষ বিষয়ে সম্ভবত পৃথিবীতে আর কোন দেশে এমন সৌভাগ্যজনক স্থান অধিকার করে নেই, যেমন ভারত আছে। সে সকলের উপরে, সে মহীয়সী নারীদের দেশ। যেদিকেই আমরা দেখি, ইতিহাসে বা সাহিত্যে, প্রতিপদেই আমরা সেই মূর্তিগুলির সাক্ষাৎ পাই, যাদের শক্তিকে দেশমাতা লালন করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের স্মৃতি চির পবিত্র করে সঞ্চিত রেখেছেন।

কীধরনের নারীকে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করি? সে কি শক্তিশালিনী, বুদ্ধিমতী, উদ্দীপিতা, সঙ্কট মুহূর্তের উপযুক্তা? আমাদের কি চিতোরের পদ্মিনী, চাঁদবিবি, ঝাঁন্সীর রাণী নেই? সে কি সন্ন্যাসিনী, কবি ও রহস্যময়ী? মীরাবাঈ কি নেই? সে কি রাণী, শাসনকার্যে সুদক্ষা? কোথায় রাণী ভবানী, কোথায় অহল্যাবাঈ, কোথায় মৈমনসিংয়ের জাহ্নবী? সে কি পত্নীত্ব, যেখানে আমরা মনে করি নারী উজ্জ্বলতমরূপে শোভা পায়? সতী কি হলো, সাবিত্রীর, চির মহিমাময়ী সীতার? সে কি কুমারীত্বের? উমা রয়েছে। জগতের সমস্ত নারীজাতির মধ্যে আর কোথাও কি গান্ধারীর মতো অমন আশ্চর্যকারিণী আর একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

এই আদর্শগুলি গঠনমূলকও। তার মানে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় শিশুকে চিন্তা করতে শেখানো হয় তাঁদের খ্যাতি ও গৌরবের কথা নয়। তাঁদের পবিত্রতা, সরলতা, অকপটতা, এক কথায় তাঁদের চরিত্র। বাস্তবিক, একজনের নিজস্ব ও বিজাতীয় আদর্শের মধ্যে সর্বদা এক পার্থক্য আছে। প্রথমটি দ্বারা অভিভূত হয়ে আমরা চেষ্টা করি তা অনুসরণ করার; দ্বিতীয়টিকে প্রশংসা করে তার ফললাভে আমরা যত্নবান হই। ভারতীয় নারীর কখনই কোন গভীর শিক্ষা হতে পারে না, যদি তার শুরু ও শেষ না হয় নারীত্বের জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরায়, যে আদর্শ তার নিজের ইতিহাসে ও বীরত্বপূর্ণ সাহিত্যে রূপ পেয়েছে।

কিন্তু নারীদের নিঃসন্দেহে সুদক্ষ করে তুলতে হবে। পত্নীরূপে সীতা ও সাবিত্রী বড় ছিলেন, তারা মহীয়সী নারী ছিলেন এই সত্যের ফলস্বরূপই তা ঘটেছিল। জীবনে এমন কোন স্থান ছিল না, যা তাঁরা কর্তব্যে ও করুণায় পূর্ণ করেননি। সামাজিক আদর্শের প্রতিটি দাবিই উভয়ে পূর্ণ করেছিলেন। একাধারে রাণী ও গৃহিণী, সন্ন্যাসিনী ও শহরবাসিনী, বিনীতা পত্নী ও নিঃসঙ্গিনী সাধ্বী, তাঁদের কালের নাটকে বীরাঙ্গনারূপে যে সব ভূমিকা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, তাতে দুজনেই সমান ছিলেন। পত্নীরূপে তাঁরা যেমন অতুলনীয়া ছিলেন, তাঁদের যদি কখনও বিবাহ না হতো তাহলে কন্যা, ভগ্নি ও শিষ্যারূপেও তাঁরা অমনি অতুলনীয়া থাকতেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই দক্ষতা, পত্নীত্বের পূর্বে এই নারীত্ব এবং নারীত্বের পূর্বে এই মনুষ্যত্ব,—সর্ব যুগে এইটিই হবে বালিকাদের শিক্ষার লক্ষ্য।

কিন্তু বর্তমানকালে ভারতের নৈতিক আদর্শ নতুন মাত্রা গ্রহণ করেছে—জাতীয় ও নাগরিক। এক্ষেত্রেও নারীকে নিজের ভূমিকা গ্রহণ করার শিক্ষা অবশ্য দিতে হবে। আবার এগুলির দিকে অগ্রসর হবার জন্য সংগ্রামের দ্বারা সে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। প্রত্যেক যুগের নিজস্ব বুদ্ধিগত সংশ্লেষণ আছে, যেটি সেই যুগের লক্ষ্যে পৌছোবার আগে বোঝা দরকার। নির্দিষ্ট মানসিক ধারণার যে অসংখ্য পথ ধরে হিন্দু নারী স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে যায়, তা পাশ্চাত্য মনের কাছে এক সত্যিকারের গোলকধাঁধা। তাই প্রকৃত অশিক্ষিত—সাধারণত যাকে শিক্ষিত নয় বলে ধরে নেওয়া হয়—হওয়া দূরে থাক, রক্ষণশীল হিন্দু নারী এমন এক শিক্ষালাভ করে, যেটি তার নিজের ধরন অনুযায়ী খুবই বিশেষত্বপূর্ণ, শুধু এই ধরনের শিক্ষার মূল্য আধুনিক মানুষেরা স্বীকার করে না।

সেইভাবে বিংশ শতাব্দীর জরুরী প্রয়োজনে দক্ষতার আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংশ্লেষণ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এটি আর শুধুমাত্র এক বক্তব্যের আধ্যাত্মিক বা আবেগময় বিষয়বস্তু নয়, যা শিক্ষার্থীর কাছে পৌছে দিতে হবে, যেমন অতীতের পৌরাণিক—সামাজিক সংস্কৃতিতে করা হতো। শিক্ষার্থীদের এখন বক্তব্যের সীমা বোঝার জন্য সন্ধান করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধারণার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এই বিশেষ সিদ্ধান্তে জাতি কীভাবে পৌছেছে সেই সোপানগুলি। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিক সংশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক এবং এই তিন প্রকার জ্ঞানের ধারাই—যেহেতু সত্যের কোন লিঙ্গ নেই- পুরুষের মতোই নারীদেরও গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল এইভাবে হচ্ছে যেন তিনটি ক্ষেত্র যাতে বর্তমান যুগের মন ঘুরে বেড়ায় এবং যার মধ্যে সে সকল ধারণা প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুসন্ধান করে। এইভাবে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে জাতীয়তার ধারণা—যার মধ্যে আজকালকার ভারতীয় প্রচেষ্টাগুলি মিলিত হচ্ছে—প্রথমত হচ্ছে সামাজিক-প্রথা, জাতি, ভাষা ও বাকি সব কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদানসহ আমাদের নিজেদের জাতির

ইতিহাস অধ্যয়নের ফলস্বরূপ। একই রকম ভাবে নাগরিকতাবোধ জাগ্রত হবে আমাদের নগরগুলির, তাদের অবস্থানের এবং যুগ হতে যুগান্তরে তাদের পরিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন দ্বারা।

পুনরায় জাতিকে দেখতে হবে শুধু তার নিজস্ব অতীত ও নিজস্ব স্থানের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নয়, অন্য জাতের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়েও। এইখানে আমরা ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় আসি। আবার ভৌগোলিকভাবে ইতিহাসকে দেখা দরকার এবং ঐতিহাসিকভাবে ভূগোলকে। আদর্শনীয় অধুনিক নারীর মহিমা ও মর্যাদার অধিকাংশই থাকে তার জ্ঞানের মধ্যে যে তার গৃহটি নক্ষত্রখচিত জগৎ-ভূমিতে শুধু এক রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ছাড়া কিছু নয়, প্রতি ঘণ্টা যা অতিবাহিত হচ্ছে, তা তার অঞ্জলিতে আবদ্ধ এক অসীম নদীর এক বিন্দু জল, যা তার ইচ্ছা মত ব্যবহৃত হবে তর্পণের জন্য বা পানের জন্য এবং তারপর আবার বাধাহীন ভাবে প্রবাহিত হবে। মনের এমন ভাবের পিছনে রয়েছে এক সুদৃঢ় বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা।

বর্তমান যুগ এটি দাবি করে যে আমরা শিক্ষা করি সত্যের বা বিজ্ঞানের ঘটনা-গুলির অর্থ কী। তথাপি এই চিহ্নিত সত্য, তৃষ্ণার্ত হয়ে যাকে চাওয়া হচ্ছে, সে তো শুধু সেই অনন্ত বিস্তৃত ধারণার এক খণ্ডমাত্র, যাতে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও শ্রেণীকরণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইতিহাসের ও ভূগোলের।

এইভাবে প্রকৃতি, পৃথিবী ও কাল হচ্ছে তিনটি প্রতীক যার সাহায্যে আধুনিক মন নিজের উপর অধিকার লাভ করে। শিক্ষণীয়ভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করার পূর্ণ উপায় মানুষ কখনও আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেনি। প্রতি ব্যক্তির মনেই সেগুলিকে ভালভাবে উপলব্ধির জন্য সংগ্রামের দৃশ্য চলছে। প্রতি বিদ্যালয়কক্ষ একই প্রচেষ্টাকে সমষ্টীকরণ করায় রূপদান করে। যাঁরা ভারতীয় নারীর কাছে আধুনিক ধারণাগুলি পরিবহণ করবেন তাঁদের সেইখানে শুরু করা দরকার যেখানে নিজেদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তারা শিখতে পারে কত ভাল হয় এগুলি লাভ করলে। অবশেষে ধারণাটি একবার গ্রহণ করলে ভারতীয় নারী স্বয়ং অন্য ভারতীয় নারীদের শিক্ষিত করে তুলবে—ইতিমধ্যে প্রতিটি উপায় যা পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা উচিত। ভ্রাম্যমান ভাগবত বা কথকতা ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা ভূগোলকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে বিভিন্ন তীর্থস্থানের চিত্রগুলি স্লাইডে দেখিয়ে। মহাভারত ও রামায়ণের বাইরের ইতিহাস এই একই ভাবে পরিচিত করে তোলা যেতে পারে। স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সম্বন্ধে সহজ বক্তৃতা সমবেত গোষ্ঠীর কাছে ও পর্দার আড়ালে তাদের স্ত্রীলোকদের কাছে ভ্রাম্যমান শিক্ষকদের দ্বারা কেন দেওয়া যাবে না তার কোন যুক্তি নেই। ছবি, ছবি, শুধু ছবি ও মাতৃভাষা—এইগুলি হচ্ছে তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার প্রথম উপকরণ। যদি আমাদের দেশের প্রতি ভালবাসা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়, তবে ভালবাসার জন্য একটি দেশ নিশ্চই আমরা দেব। যে বস্তু সম্বন্ধে তারা কল্পনা করতে পারে না, সে সম্পর্কে নারীরা কী করে উৎসাহী হবে?

বড় ও ছোট স্কুলগুলি, বাড়ির স্কুল ও বাড়ির বাইরের স্কুল, প্রাথমিক ও উচ্চ স্কুলগুলি সবই হচ্ছে 'বড় সমস্যা সমাধানের এক প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু এই স্কুলগুলি ভারতীয় জীবনধারার মধ্যে হবে, তার বিরোধীভাবাপন্ন নয়। স্কুল ও গৃহের দুই বিপরীত জগতের মধ্যে মনকে স্থাপন করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তা ধ্বংস হবে। স্কুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত আদর্শের নৈতিক সমর্থন দিতে হবে এবং স্কুলে প্রাপ্ত আদর্শকে গৃহের শিক্ষা সমর্থন করবে,—এই দিকের বিচ্যুতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেয়ে গভীরতম অজ্ঞতা আমাদের নারীদের পক্ষে ভাল।

ছেলেদের জীবনে যেমন সর্বদা ছিল, তেমনি মেয়েদের জীবনেরও এক প্রয়োজনীয় বস্তু বিদ্যালয়কে করে তুলে আমরা এমন বস্তু স্থাপন করছি যা কখনই নষ্ট করা যাবে না। আগত প্রতি প্রজন্মকে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার মহান কর্তব্য পালন করতে হবে। মানব সমাজের এটি হচ্ছে এক স্বাভাবিক চিরন্তন কর্ম। কিন্তু নারী-শিক্ষার যেসব সমস্যা আজ আমরা দেখছি, এ শুধু কালোপযোগী বাধা। এক কঠিন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশকে নিয়ে যেতে হবে। একবার আধুনিক চেতনার প্রধান বিষয়বস্তু ভারতীয় ভাষার মধ্যে পথ খুঁজে পেলে সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে, কারণ আমরা যাবতীয় স্কুল ও স্কুল মাস্টারদের কাছ থেকে যা শিখি তার চেয়ে বেশি শিখি মাতৃভাষার কাছ থেকে। সেই মহান দিনটিকে নিয়ে আসার জন্যে মাতা স্বয়ং আহ্বান করছেন বিরাট আধ্যাত্মিক বীরবৃন্দকে শপথ ও সেবার জন্য। শত শত যুবকের প্রয়োজন নিজেদের সংগঠিত করে নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল পদ্ধতিতে গভীর শিক্ষাদানের নিমিত্ত। বেশির ভাগ ছাত্রই বোধহয় গৃহে বা গ্রামে ছুটির মধ্যে বছরে বারোটি পাঠ দানের শপথ নিতে সক্ষম—এটি মোটেই ক্লান্তিকর কাজ বলে প্রমাণ হবে না—অথচ এটির দ্বারা কতখানি কাজ করা যেতে পারে!

অন্যেরা ইচ্ছুক হতে পারে মাতৃভাষার সাহিত্যকে গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে। শিক্ষক যেখানে কখনও পদক্ষেপ করেন না সেই অবকাশটুকুতে পুস্তক ও পত্রিকা প্রবেশ করে। গ্রন্থাগার বা বইয়ের তাক হচ্ছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। মেয়েরা কী ভাবে ভারতীয় ইতিহাস বুঝবে, যদি বুদ্ধ বা অশোক সম্পর্কে, চন্দ্রগুপ্ত বা আকবর সম্বন্ধে জানার জন্য তাদের প্রথমে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে হয়? তাদের গৌরব মহান হয়ে উঠবে, যারা এরপর থেকে নিজেদের বর্তমানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চেপে রাখবে নারীদের ও সাধারণ মানুষদের ভাষায় আধুনিক জ্ঞান বিতরণের মহান কর্তব্য দিয়ে।

নারীদের জন্য প্রথম প্রজন্মের পথ সৃষ্টিকর্ম প্রধানত পুরুষদের করার প্রয়োজন দেখে কারও হয়তো এই উদারতা ও একাগ্রতাকে পরিহাস করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় জনসাধারণকে গভীরভাবে জানেন, তাঁরা এই ব্যঙ্গকে সমর্থন করতে পারেন না। ভারতীয় জীবন সামাজিকভাবে সুসংবদ্ধ। সভ্যতা হচ্ছে অঙ্গীভূত, আধ্যাত্মিক ও অন্য নির্ভরশীল। যখন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হয়, তখন ভারতীয় এক ব্যক্তির,—রামমোহন রায়,—উৎসাহেই করা হয়েছিল। যখন বহু-বিবাহের পরিবর্তে এক-বিবাহকে আদর্শ বিবাহ-ব্যবস্থা বলে জোর দেওয়া হয়, তখন

সেই প্রেরণা এসেছিল একজন মানুষের কাছ থেকে—বাংলায় বিদ্যাসাগর। কোন দলের মধ্যে থেকে স্বার্থপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা প্রাচ্যে বড় সংস্কার ও অধিকারের বিস্তৃতি লাভ ঘটেনি। সেটি হয়েছে অন্য পক্ষ থেকে ন্যায়ের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা দ্বারা। অথবা যদি বাস্তবিকই নারী কোন জরুরী প্রয়োজনের তীব্রতা অনুভব করে, কোন মন্দ বিষয়কে ভাল করতে চায়, তাহলে সে কি স্ত্রীলোকের যেমন মাতা তেমন পুরুষের নয়? সে কি শৈশবে তার পুত্রের কানে যে কর্তব্যে তাকে নিয়োগ করতে চায় তা বলতে পারে না? আর এইভাবে সে তার দুর্বল হস্ত যে অস্ত্র ধারণ করতে পারে তার চেয়ে এক শক্তিশালী অস্ত্র নির্মাণ করতে পারে না? এমন নারীই তো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা ছিলেন এবং এই ভাবের অনুপ্রেরণাই তো তাঁকে নারীদের সমর্থক করে তুলেছিল।

কিন্তু আর একটি কথা বলার আছে। আমরা যে সমস্যার কথা ভাবছি, সেটি এই প্রজন্ম যাদের উপর ন্যস্ত করছে, শিক্ষার সেই তরুণ পুরোহিতদের কাছে সাবধানতা ও নির্দেশের বাণী। শিক্ষা কখনই সমালোচনা ও হতোদ্যম করার মধ্যে দিয়ে প্রচার করা যায় না। শুধু তিনিই কাজের শিক্ষক হতে পারেন, যিনি ছাত্রের মধ্যে মহান বস্তু দেখেন। শুধু ভারতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা আমরা ভারতের বাইরের জগতের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রদান করতে পারি। শুধু নিজেদের লোকদের ভালবাসা দ্বারাই আমরা মানবজাতিকে ভালবাসা শিক্ষা দিতে পারি—ভারতীয় নারীদের ভবিষ্যতে গভীর বিশ্বাস দ্বারাই কেবলমাত্র কোন মানুষ সেই ভবিষ্যৎকে এগিয়ে আনার সাহায্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। নবশিক্ষার প্রচারক প্রাচীন ভারতের গৌরবময় দৃশ্যের সম্মুখে নিজেকে উৎসর্গ করুক। সে আশা করুক এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুক যে, আমাদের এই কালে আমাদের সকল গ্রামে আমরা যেন গান্ধারীর মতো মহীয়সী, সাবিত্রীর মতো বিশ্বাসী ও সাহসী, সীতার মতো পবিত্র ও কোমলতাপূর্ণ নারী দেখতে পাই। ভবিষ্যতের পদদ্বয়ে অতীত যেন অক্ষস্বরূপ হয়! অতীতের সব কিছু যা হয়েছে তা যেন ভবিষ্যতে যা হবে সেই পর্বতে আরোহণের সোপানস্বরূপ হয়। আমাদের কাছে প্রতি ভারতীয় নারী হয়ে উঠুক দেহধারী মাতৃভাব, জন্মভূমির সংস্কৃতিস্বরূপা ও রক্ষয়িত্রী,—ভূমিদেবী! গৃহদেবী! বন্দেমাতরম্!

রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রকল্প

যে পরিবর্তনগুলি হিন্দু শিক্ষাকে পাশ্চাত্যের সমস্যা করে তুলেছে, তা সেইদিন পূর্ণরূপ লাভ করল, যেদিন ভারতকে আধুনিক জগতের একটি দেশ হিসাবে ইংরাজ সাম্রাজ্য ঘোষণা করল।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে সেই সময় পর্যন্ত উপদ্বীপটির ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ ছিল এক বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ধরনের সামাজিক ক্রমবিকাশের। আর গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যে ব্যষ্টির শিক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থাটিও সহজবোধ্য ছিল।

সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল, স্বাচ্ছন্দ্যের এক যুক্তিসঙ্গত মান লভ্য ছিল এবং তার সংজ্ঞা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল, এবং যে শিক্ষণ প্রতি নর ও নারীকে সক্ষম করে তুলত জীবনের কর্মাবলীকে যথাযোগ্য অনুপাতে সমাজ ও নিজের মধ্যে বিতরিত করতে, সেই শিক্ষা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বর্তমানে এ সবই বদলে গেছে। ১৮৩৩ সাল থেকে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ্ এই শর্তে নবীকরণ হয়েছিল যে তাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পকে তারা উন্নয়ন বা পালন করবে না, ভারত তখনই বিশ্ব-বাণিজ্যের পূর্ণ স্রোতের বাইরে গিয়ে পড়ল। কোন প্রাচীন বস্ত্র যেমন বাইরের বাতাস সহ্য করতে পারে না, তেমনি ভারতের শিল্প ও সম্পদ ধূলিসাৎ হয়ে স্রোতে ভেসে গেল। তার রহস্যময় সুন্দর সুতীবস্ত্র আজও ভেনিস ও জেনোয়ায় কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে সেগুলি হচ্ছে 'প্রাচীন, অতি প্রাচীন'। এক বিদেশী—শাহজাহান—যাঁর প্রতিভা ছিল দূরদৃষ্টির যে মোজেয়িক ও পাথর-কাটার স্থানীয় নগণ্য শিল্প দ্বারা কী হতে পারে এবং তা করার প্রাচুর্যও তাঁর ছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। অ্যানিলিন ডাই প্রাচ্যের উজ্জ্বল সুন্দর রঙকে স্থানচ্যুত করছে তেমনি ঘটনা দ্বারা যা হিন্দুস্থানীকে করছে ইংরাজি দ্বারা এবং সংস্কৃত, হিন্দি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষার জাতীয় সম্পদকে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য দ্বারা স্থানচ্যুতির চেষ্টা করছে।

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এমন কি কাম্যও; কিন্তু পরিবর্তনের অর্থ ক্ষয় নয়। এটি খুব সহজেই বোঝা যায় যে ভারত এখনও আধুনিক ধ্বংসের প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠেনি, এখনও নতুন সমস্যার উপাদানগুলিকে পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি, সমাধানের উপায়গুলি বের করার সময় তার থাকা তো দূরের কথা। এটিও পরিষ্কার যে, যদি জাতীয় জীবনে বর্তমানের এই বিরতিকাল হয় পুনঃস্থাপন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রস্তাবনা, বিলয়ের পরিবর্তে, তাহলে এটি একমাত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে শিক্ষার কোন পরিকল্পনা দ্বারা যা জনসাধারণকে সক্ষম করতে ইতিপূর্বে অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংরক্ষিত করতে এবং সেই সঙ্গে নতুন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে।

তন্তুজীবীর মস্তিষ্ক অলস থাকে না যখন তাঁতের উপর তার মাকু এদিক-ওদিক যায়। এই কাজে তাকে নিযুক্ত করা চলে না সমাজের প্রতি অংশের সহযোগিতা ছাড়া। অতএব শিল্পের বৈশিষ্ট্য যাই হোক, দর্শন ও জগৎ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি জাতীয় মহাচক্রগুলি, মহান বিষয়গুলির জল্পনা-কল্পনা ও উচ্চতর ব্যক্তিত্বের অন্যান্য সঞ্চয়গুলিও অবশ্য থাকবে। এটিই হচ্ছে প্রধানত ভারতের বিদ্যা যেখানে গণিতশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিদ্যায় ও অন্যান্য বিজ্ঞানে অবদানগুলি অতীতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল এবং আবার তাই হবে মনে হয়। অতএব, যে কোন শিক্ষা যা কার্যকরভাবে ভারতের নিজের জন্য গ্রহণ করার প্রয়োজন মেটাবে, তা অন্তত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, অন্যান্য ফলের সঙ্গে বর্ধিত জাতীয় আত্মসচেতনতা উৎপন্ন করবে। তরুণ জনগণের শক্তি ও দায়িত্ববোধের ভাব এবং জগতের অন্যান্য লোকদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সাহায্যের ভাব। এমন এক প্রাচ্যবাসী সৃষ্টি করা হবে যার মধ্যে প্রাচ্যের ভাবধারা গভীর করা হয়েছে, তাতে যুক্ত করা হয়েছে মানবজাতির, দেশের সমগ্র জনগণের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা, পাশ্চাত্যের উৎসাহ ও সংগঠন শক্তি, পাশ্চাত্যের বাস্তববোধ ও বল—এমন ধারা আদর্শ প্রাচ্যের, আমাদের সংস্কৃতির শক্তিকে উদ্দীপিত করবে।

(এটি লক্ষ্য করতে হবে যে 'জাতীয় সাফল্যের এই সংরক্ষণ' কোন অর্থেই প্রধান বা পণ্ডিতের সূক্ষ্ম নিঃস্বার্থপরতার সঙ্গে বস্তুগুলি যেমন ছিল তেমনি ছবির মত তাদের রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টা নয়।)

এইদিকে ইতিমধ্যে সরকার ও অন্যান্যরা হস্তক্ষেপ করেছেন, যেখানে তা পথভ্রান্ত হয়নি, সেখানে শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সবকিছুকেই দেশের অধিবাসীদের দ্বারা সাগ্রহে আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়েছে। শিক্ষা-প্রচারকদের কাছে তাদের ঋণ এমন কিছু, যা ভারতবাসীরা কখনও ভুলতে পারে না এবং হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই জীবিকা মহান সদস্যদের নামগুলি, প্রোটেস্ট্যান্ট বা রোমান ক্যাথলিক যাই হোক, কৃতজ্ঞভাবে ও ভালবাসার সঙ্গে স্মৃতিতে সঞ্চিত আছে। আজও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হিন্দু ছাত্রের, তাদের নিজেদের লোকের ঐতিহ্য অনুসারে প্রয়োজন হয় স্কচম্যান ডেভিড হেয়ারের সমাধিতে তীর্থযাত্রা করার, যিনি শতবর্ষ পূর্বে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত হয়েছে। তিনি কলেরা রোগগ্রস্ত এক ছাত্রের সেবা করতে গিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান, তাঁর যুক্তি বিচারপূর্ণ চিন্তাধারার জন্যে খ্রীষ্টান কবরভূমিতে তাঁর কবরদান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং শেষে তাঁর ছাত্রদের মস্তকে বাহিত হয়ে ভালবাসার সঙ্গে সমাহিত হয়েছিলেন একটি স্থানে, যেটি আজও রয়েছে কলেজ বেষ্টনীর মধ্যে। এই শেষ অনুষ্ঠানের প্রতিটি কর্মই তার কাছে মুখর, যে গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার হিন্দু অভিব্যক্তি বুঝতে পারে। ভারতীয় শিষ্টাচার

হচ্ছে অতিথিকে তার প্রথা অনুযায়ী অভ্যর্থনা করা, সেজন্য যত অসুবিধা বা অর্থব্যয় হোক না কেন এবং এই সূক্ষ্ম সম্মান উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে কবর দান হিন্দুদের কাছে বিদ্রূপপণের বিষয় হলেও ডেভিড হেয়ারের ভাগ্যে তাই হয়েছিল, সৎকার নয়। তারপর আবার শবদেহ বহন করেছিলেন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু যুবকেরা যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে, কোন ভাড়াটে শববাহককে মৃতের সংস্পর্শে আসতে দেন'নি, যারা সমাজের নিম্নতম শ্রেণী থেকে আসে। ভালবাসার কোন কাজকে বিশ্লেষণ করা অমানবিক ব্যাপার, কিন্তু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আমাদের জানা দরকার ভালবাসা প্রদর্শনের সঠিক মূল্যায়নের নিমিত্ত। আর তাছাড়া, সমাধিস্তূপ ও স্মৃতিচিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বেশির ভাগ মুসলমানীয় প্রথা, হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রে গমনের এই বর্তমান অভ্যাসের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাদানের এই মহাপুরুষ নাগরিক কল্পনার উপর কি গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন।

তবু ডেভিড হেয়ার ও বহু মহান স্কুল শিক্ষকদের দিন অনেক কাল আগেই শেষ হয়ে গেছে এই প্রাথমিক বিরোধের পূর্বেই—নতুন শিক্ষা বিধি প্রাচ্য না পাশ্চাত্য ক্লাসিকের প্রভাবাধীন থাকবে ? শিক্ষার জাতীয় রূপের খাতিরে রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা মীমাংসা করা যেতে পারত। অবশেষে এটি স্থির লর্ড ড্যালহৌসি দ্বারা ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যাতে বর্তমান দেশীয় বিদ্যালয়-গুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো, পরিদর্শন করা হলো এবং সাহায্য দেওয়া হলো, আর শিক্ষার মহান উদ্দেশ্যে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থানে ও ইংরাজিকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে পরিচয় করানো হবে। সেই সময় এটিকে প্রশ্নটির বিস্ময়কর সমাধান বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৪ সালের পরের বছরগুলি থেকে এটি আমাদের সকলের কাছেই উদয় হয়েছিল যে, শিক্ষা সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যাপার নয়, এমন কি তথ্যেরও নয় এবং এ পরিণামের প্রকৃত অভিজ্ঞতা অধিকাংশ ইংরাজ কর্মচারীকে যে ভাবে ব্যাপারটা করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট করে তুলেছে।

তবু কোন্ দিকে যে পরিবর্তন করা হবে সেটিও স্পষ্ট নয়। বাঙলাদেশে শিক্ষার ব্যয় কঠোরভাবে কমিয়ে রাখা হয়েছে বছরে মাথা পিছু উনত্রিশ সেণ্টের মতো (অথবা এক শিলিং দুই পেন্স দুই পেনি)। স্পষ্টত এখানে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি বা হাতের কাজ শিক্ষালয়ের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ করা নেই।

অন্যদিকে, ত্রিশ কোটির এক বিরাট জনসংখ্যায় একবার কোন পথে প্রবেশ করলে কখনও পিছু হটে আসা যায় না, যদিও গতিপথের দিক সংশোধন করা যেতে পারে এবং ফল আকারে যতই অপ্রত্যাশিত হোক, তবু গণনীয়। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার যেমন দেখিয়েছেন যে, আধ পেনির ডাকটিকিটে, সস্তা রেল-ভ্রমণে ও ইংরাজি শিক্ষার জনপ্রিয়তায় ভারতের অখণ্ডত্ব সাধিত হচ্ছে, যা খুব কমই আগে দেখা গিয়েছিল। এটা সহজেই বোঝা যাবে এই অখণ্ডতা, যা লাভ করা যাচ্ছে সস্তা ও অসার ইউরোপীয়

পড়াশোনায়, তা শাসক ও শাসিতের কাছে সমান ভাবে কী ভয়ঙ্কর, দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পথে।

এই পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা ছেলে ও মেয়েদের কাছে সমানভাবে প্রযোজ্য। যাহোক, আমরা যখন শেষোক্তদের চিন্তায় আসি পৃথক সমস্যারূপে, আমরা নতুন চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাই।

প্রাচ্যের রমণীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি আঁকড়ে ধরে থাকে প্রথাকে ও শিক্ষার পুরাতন ধারাকে। অন্যান্য দেশের প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকদের মতো তাদের সকলকেই বিয়ে করতে হতো অল্প বয়সেই। অর্থনৈতিক কারণগুলি আজকাল বাগ্দানের বয়সকে বাড়িয়ে বারো বছরে দাঁড় করিয়েছে। অনুষ্ঠান ও শ্বশুরালয়ে প্রবেশের মধ্যবর্তীকাল—প্রায় চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত—ছোট বধূটির নতুন গৃহ ও পুরাতন গৃহের মধ্যে পালা করে আসা-যাওয়ার দ্বারা বিভক্ত বলে ধরে নেওয়া হতো।

এই বছরগুলির মধ্যে যদি স্বামী মারা যেত, তাহলে বালিকাটি যেন ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে বাস করেছে ধরে নিয়ে বিধবা বলে গণ্য হতো এবং সামাজিক সম্মান তার পুনর্বিবাহ অসম্ভব করে তুলত। এই ধরনের ঘটনাগুলি 'বাল-বিধবা' বলে পরিচিত শ্রেণী সৃষ্টি করত। এরপর থেকে তাদের জীবন সন্ন্যাসিনীদের মতো হয়ে উঠত। তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হতো বিশেষ উচ্চ ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনা ও ভক্তির আদর্শের মূর্তিমতীরূপ। আর এর প্রতিদানে তারা চারপাশের সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করত,—ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য নয়, যা প্রায়ই ভুল করে ভাবা হয়।

যাহোক, যদি সব ঠিক মত চলে, তাহলে বারো বছরের বধূ চোদ্দ বছরের পত্নী হচ্ছে এবং শ্বশুরবাড়িতে কর্তব্য ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। এই সময় পর্যন্ত সে হচ্ছে আদরে ও আবদারে শিশু। (হিন্দু পরিবারে কন্যার প্রতি অতি-কোমলতা,—যেহেতু সে অতি অল্পবয়সেই তাদের ছেড়ে চলে যাবে,—বিদ্যালয়ে এক অসুবিধার উৎস।) এই সময় এক রকম বলা যেতে পারে তার শিক্ষার শুরু হয় এবং হিন্দু নারীর মর্যাদা-বোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার শ্বশ্রূমাতার সযত্ন শিক্ষার নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ।

বর্তমানের হিন্দুগৃহে নারীর আবাসস্থল হচ্ছে মধ্যযুগীয় দুর্গের বাওয়ারের (Bower) মতো, শুধু গভীর সরলতা ও দরিদ্রতার ভাষায় যেন তার অনূদিত রূপ আমরা পাচ্ছি। শুধু সেলাই ও বোনার কাজে আমাদের কুমারীরা নিযুক্ত থাকে না, বস্তুত তাকে করতে হয় গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ,—ঘর-দোর পরিষ্কার করা ও রান্না-বান্না, পরিবারের গো-সেবা এবং শিশু সন্তানদের মানুষ করা। গৃহে সমবয়সী বহু বালিকা থাকে ভাইদের ও স্বজনদের স্ত্রীরূপে এবং পরিবারের বয়স্কা নারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে 'মা'কে শ্রদ্ধা করা, যিনি হচ্ছেন পরিবারের কর্তার মাতা বা পত্নী।

মধ্যযুগীয় বীরত্বের দিনে কোন পুরোনো কাব্য বা গাথা সুন্দরী নারীরা যতটা আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন, ভারতীয় নারীরা তাদের অন্তঃপুরে মহাকাব্য ও পুরাণ তার চেয়ে কিছু কম আগ্রহের সঙ্গে শোনেন নিশ্চয়ই। এমন কি মধ্যযুগীয় প্রাসাদের হলঘরে

যে ভ্রাম্যমান চারণ কবিদল গান ও অভিনয় করতেন, তাদেরও জুড়িদার এখানে আছে, কারণ প্রায়ই বসন্ত সন্ধ্যায় রামায়ণ গান শোনার ব্যবস্থা করা হয় এবং মেয়েরা উঠানের দাওয়ায় পর্দার পিছনে বসে—যেখানে তারা দেখতে পায়, কিন্তু তাদের দেখতে পাওয়া যায় না—চির-পুরাতন অথচ চির-নতুন কাহিনী রাম সীতার বনে বনে পরিভ্রমণের কথা শোনে।

যাহোক, এমন নির্দোষ আনন্দ ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছে, কারণ এগুলি পাওয়ার জন্য যে স্বল্প আয়ের প্রয়োজন হয় তা প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে। ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ইংরাজের সস্তা কেরানীর জাতে পরিণত হচ্ছে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের উপর অসংখ্য নির্ভরশীলদের ভার বহন করতে সক্ষম হয়ে পড়ছে। যদি এই রকম অবস্থা ঘোচাতে হয়, তাহলে নতুন কাজকর্ম, নতুন কিছু করার প্রেরণা ও সংযোগের শক্তি তাদের সৃষ্টি করে নিতে হবে। আর পুনর্গঠনের এমন এক যুগে সামাজিক শক্তিরূপে নারীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হবে।

এটা স্পষ্ট যে তাদের বর্তমান শিক্ষা হচ্ছে প্রধানত উন্নয়নের চেয়ে শৃঙ্খলার। তবুও এর দ্বারা বিরাট ব্যক্তিদের আবির্ভাব একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে'নি। বহুর মধ্যে একটি প্রমাণ হচ্ছে ঝাঁসীর বিধবা রাণী, যিনি বিদ্রোহের সময় নিজের অন্তঃপুরের বাইরে এলেন যুদ্ধ ঘোষণা করতে, নতুন মুদ্রা চালু করতে, কামান তৈরী করতে এবং শেষে নিজের সৈন্যদলের শিরোভাগে থেকে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করতে।

অবশ্য এই ধরনের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত শিক্ষাব্যবস্থার উপযুক্ততা প্রমাণের চেয়ে জাতির জীবনীশক্তি প্রদর্শন করে। এটি অস্বীকার করা চলে না যে যদি আমরা ভারতীয় নারীর বর্তমান জীবনে যুক্ত করতে পারি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বৃহত্তর সুযোগ, বৃহত্তর সামাজিক শক্তি ও অর্থনৈতিক চাপ অপসারণের শক্তি এবং বর্তমান সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরূপ সমালোচনা বর্জন, তাহলে যে বস্তুর অত্যন্ত প্রয়োজন সেটি আমরা অর্জন করব।

এখন খ্রীষ্টান মিশনারী ও অন্যান্যদের ধন্যবাদ, তাঁদের প্রচেষ্টায় দু ধরনের শিক্ষা কিছু লোকের আয়ত্তের মধ্যে প্রাইমারী স্কুলে 'থ্রি, আর' শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। যেহেতু গোঁড়া লোকেরা সাধারণত বিয়ের পরে তাদের কন্যাদের সরিয়ে নেয়, তাই তাদের স্কুলের শিক্ষা দশ-বারো বছরেই শেষ হয়। খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম-সমাজী ও পার্সীদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ডিগ্রি লাভ খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এগুলিও এই ধরনের সব দৃষ্টান্ত ধরেও বাংলায় যারা প্রচলিত শিক্ষালাভ করে সেই মেয়েদের মোট সংখ্যা হচ্ছে জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা মাত্র সাড়ে ছয় ভাগ। আর বলা হয় যে বাঙ্গলা এই বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রসর প্রদেশ।

অতএব প্রয়োজন অত্যন্ত আছে। উত্তরটির চরিত্র কী ধরনের হবে সে সম্বন্ধেও আমরা সকলে কিছুটা একমত। এখন যে প্রশ্নটি থাকে, সেটি হচ্ছে,—কোথায় ও কী ভাবে আমরা ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদান শুরু করতে পারি, যেটি তাদের প্রকৃত জীবনের যথার্থ প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন বোঝাবে?

এই সব সত্য সম্বন্ধে গবেষণা ও চিন্তার পরে এই রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে।

যদি আমরা অর্থ সংগ্রহে সফল হই, তাহলে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে একখণ্ড জমি ও একটি বাড়ি কিনতে আমরা ইচ্ছা করেছি এবং সেখানে বিশটি বিধবা ও বিশটি অনাথ বালিকাকে গ্রহণ করা হবে,—এই সমস্ত সম্প্রদায় থাকবে সারদা দেবীর কর্তৃত্বে ও পরিচালনায়, যাঁর নাম সম্প্রতি জগতের কাছে পরিচিত করেছেন অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার তাঁর 'লাইফ অ্যাণ্ড সেইংস অফ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে।

আরও প্রস্তাব করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক শিক্ষালয়কে সংযুক্ত করার, যেখানে সবচেয়ে ভাল হাতের কাজ শেখানো হবে।

স্কুলের পাঠক্রম কিণ্ডার গার্টেনের উপর ভিত্তি করে হবে এবং ইংরাজি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকবে, প্রাথমিক গণিত ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, প্রাথমিক বিজ্ঞানও ভালভাবে শেখানো হবে এবং ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। শেষ বিষয়টির তাৎক্ষণিক উপযুক্ততা হচ্ছে প্রতিটি ছাত্র যাতে নিজের জীবিকার্জনে সক্ষম হয় গৃহত্যাগ না করেই এমন এক কর্মের দ্বারা, যা সম্পূর্ণ মর্যাদাকর।

কিন্তু স্কুলটিতে এক দ্বিতীয় কার্যক্রমও থাকবে। যে বিধবাদের বয়স আমরা দেখব আঠারো থেকে কুড়ি বছর, তারা শুধু যথার্থ হিন্দু পটভূমি ও গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানদানের বিষয়ে কার্যকরী হবে না, তাদের দ্বারা আমরা দু-তিনটি শিল্প সংগঠিত করতে পারব, যার সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার খোলা চলবে ইংল্যাণ্ডে, ভারতে ও আমেরিকায়। এই শিল্পগুলির মধ্যে থাকবে দেশীয় জ্যাম, আচার ও চাটনি প্রস্তুত করা।

ধরা যাক, আমাদের প্রচেষ্টা সর্ব বিষয়ে সফল হবে, সবার উপরে এটি হিন্দু সমাজের সমর্থন লাভ করল এবং কোনক্রমেই বিজাতীয়করণ নয়,—এটা হয়তো সম্ভব হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে যখন আমরা প্রতিটি শিশুকে বলতে পারব সে নিজেই নির্বাচন করে নিক তার জন্য বিবাহিত-জীবন, না জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত-জীবন। যারা প্রথমটি বেছে নেবে, আমরা আশা করছি তাদের সম্পূর্ণ সম্মানকর সাহায্য করতে পারব। যে তার জীবন নিজের দেশের জন্য ও তার নারীদের জন্য অক্লান্ত কর্মে নিযুক্ত করতে চাইবে, তার বিস্তৃত শিক্ষার পরে ও বয়স্কা নারীদের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকরূপে ব্যবহার করে অন্যান্য কেন্দ্রে নতুন রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় শুরু করার আশা আমরা করব।

পরিশেষে আমি বলি যে আমার বিশ্বাস আশু কর্তব্য থেকে দূরের কিছুতে আমি কোন শক্তি বা দানকে পরিচালিত করতে চাইছি না। বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে আমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছি যে জগৎ-সেবা হচ্ছে দেশ-সেবা। ইতিমধ্যেই আমরা বোধহয় ওয়াল্ট হুইটম্যানের সূক্ষ্ম প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে শুরু করেছি—

'সকল জাতি কি পরস্পরের সংযোগ করেছে? পৃথিবীতে কি একটি হৃদয় হতে চাচ্ছে?'

ভারতীয় বিবেকানন্দ সোসাইটির জন্য প্রস্তাব

ভারতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে এবং বিশেষ করে বোধহয় দক্ষিণ প্রেসিডেন্সীতে শহরে ও গ্রামে বিবেকানন্দ সোসাইটিগুলি দেখা যায়। ছাত্রের দল সেই গৌরবময় নামে উদ্দীপ্ত হয়ে একত্রে সম্মিলিত হয় এই নামটির যোগ্য কিছু করার এক অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এবং তারপর ফিরে দাড়ায় জিজ্ঞাসা করার জন্য—কী করা যায়?

বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রধান কর্তব্য কী হবে?

পাশ্চাত্য দেশে উত্তর হবে, কাজ।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট দেশে সম্ভবত চেষ্টা করা হবে শহরের বস্তীতে বাস করে ও কাজ করে স্থানীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সাহায্য করা, হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা করা, যেমন কাঠ-খোদাই, ধাতু বা কাঁচের কাজ, কিংবা শরীর-শিক্ষণ, এমন কি শুধু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা; বিবেকানন্দ সমিতির বালকদের চেয়ে যারা সমাজে নিম্নতর ও কম সৌভাগ্যবান তাদের মধ্যে কাজ করা।

ক্যাথলিক দেশে সাতটি দৈহিক দয়ার কাজ (ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে সেবা, কারাবন্দীদের পরিদর্শন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান ও মৃতকে কবর দান) হবে ওই সমিতিগুলির শক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, আর সেগুলি হবে বড় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র শাখাগুলির কাজ, তারা নিজেদের 'অর্ডার অফ রামকৃষ্ণ' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করবে, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছে ফ্রান্সিস্কানস ও ডোমিনিকানস ক্যাথলিকদের থার্ড অর্ডার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবা মেয়েদের মধ্যে 'ফিল্স দ্য ম্যারী' সোসাইটি অফ যীশাস-এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ভারত এই কোনটিরই দলে পড়ে না। বরং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের চেয়ে ক্যাথলিক দেশের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এটাই— যে গুণগুলি চার্চ প্রচলিত করার চেষ্টা করছে, ভারত বহুকাল পূর্বেই সেগুলি পরিপাক করেছে এবং তার সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক গতির মধ্যে প্রকাশ করছে। তাদের নিজের পরিবারের বাইরে ক্ষুধার্ত লোককে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান প্রাচ্যের গৃহস্থদের দৈনন্দিন কার্য তালিকার অংশ। যাদের প্রয়োজন তাদের অর্থদান বা বস্ত্রদান একটি নিয়মিত কর্তব্য হিসাবে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পথিপার্শ্বে দয়া প্রদর্শনের জন্য আমরা লক্ষ্য করি প্রতিটি গ্রামের বাইরে ধর্মশালা, নদীর তীরে স্নানের ঘাট এবং দাক্ষিণাত্যের প্রতিটি বড় রাস্তার ধারে ভারবাহীদের বোঝা ঠিক মতো মাথায় পুনর্ন্যস্ত করার জন্য পাথরের স্তম্ভ ও 'লিণ্টেল'। আর সৎকার কর্মের বিষয়ে ভারতীয় সন্তানরা নিজেরাই জানে দরিদ্রদের সম্মানজনক সাহায্যরূপে মৃতদেহ শ্মশান ঘাটে বহন করে নিয়ে যাওয়া কত সাধারণ ব্যাপার। এশিয়া হচ্ছে ধর্মগুলির মাতা, যেহেতু মূলত ও প্রধানত সামাজিক কর্মরূপে সেই গুণগুলি সে স্পষ্টত নিয়মিত পালন করে,

যেগুলি দক্ষিণ ইউরোপ একমাত্র চার্চের চাপ ছাড়া সানন্দে অবজ্ঞা করবে এবং যেগুলি উত্তর ইউরোপ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর শীতের জন্য রাষ্ট্র ও নগরের কর্তব্য-কর্মরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

তাই এটি হবে নিউ ক্যাসেলে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো, যে কথাটা আমরা ইংল্যাণ্ডে বলি, যদি আমরা আমাদের মহান গুরুর নামে শুধু এই রকম এক প্রচেষ্টা করি —ইতিপূর্বেই যারা ধার্মিক তাদের ধর্মভাবাপন্ন করে তোলা। তাহলে কাজের প্রথম পদ্ধতি কী হবে? সেটি আমাদেরই কেন হবে না? ভারতে আমাদের কি প্রয়োজন নেই অবস্থাকে আরও বেশি সমানকরণ, যতটা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় আছে? শিল্প ও হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও বিস্তৃতি? খেলাধুলার সর্বজনীনকরণ, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় ধরনের কুস্তি, মুগুর-ভাঁজা ও লাঠিখেলা, যদিও আধুনিক ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ও ড্রিল বাদ দিয়ে নয়? যন্ত্রশিল্পের প্রসার? শ্রেণীগুলির মধ্যে তাদের অবসরকালে আরও সহযোগিতা ও সহানুভূতি?

হায়, এ সবেরই আমাদের প্রয়োজন আছে। বাস্তবিক এটি জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, স্বামীজীর নাম সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রকাশ করে যেন এক যুগ থেকে অন্য যুগে উত্তরণ, যে উত্তরণ ইতিমধ্যেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, আর সেটি নিরাপদ ও অক্ষতিকর করেছে এই সত্য যে তিনি তাঁর একক ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সম্মিলিত করেছিলেন সমাজের উভয় কালের শক্তিকে। কারণ তাঁর ছিল সেই দিব্যজ্ঞান, যা ধর্মীয় সভ্যতায় মহান ধর্মগুরুর উদ্দেশ্য একমাত্র পরিপূরণ করে এবং সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন নির্ভীকতা ও আশায় পরিপূর্ণ, জনগণের নিকট জাতীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি-স্বরূপ, যেটি ভারতকে যাঁরা পুনর্গঠন করবেন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই হওয়া দরকার। অন্যদিকে আমরা অবশ্যই ভুলব না যে, যে ধরনের কাজের কথা আমরা চিন্তা করছি, তা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ও শ্রমের আধুনিক অবস্থা থেকে স্বাধীনভাবে উৎপন্ন। শহরে বালকদের ও গ্রামবাসীদের প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্লাব গঠন, কিছু উন্নতমানের ছাত্রদের পরিচালনায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার বস্তু অনুসন্ধান, ভারতে তেমন বাঞ্ছনীয় ও আনন্দময় হবে যেমন ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু স্পষ্টত এটি একমাত্র করা যেতে পারে ভারতীয়দের দ্বারা, ভারতীয়দের নিয়ে, আর ভারতীয়দের জন্য। 'লাইফ অফ চার্লস কিংসলে' পড়, কিংবা এমন কি পড় মিসেস হামফ্রে ওয়ার্ডের সুখপাঠ্য উপন্যাস 'রবার্ট এলস্‌মেয়ার' এবং উপলব্ধি কর জনগণ ও মাটির সঙ্গে একাত্মবোধের বন্যা, শক্তির ও আনন্দের বন্যা যা বর্ণনা করে, যাকে বলা যেতে পারে, ইংল্যাণ্ডের সুন্দর 'ধর্মযাজক-জীবন', ঠিক যেন অনেকটা 'ইউনিভার্সিটি সেটেলমেণ্ট'-এর আদর্শ। এই আশঙ্কা করা হয় যে ওই ধরনের ঘটনা ছাড়া, তাদের শৃঙ্খলহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত করলে, আমাদের বিবেকানন্দ সোসাইটির এই রকম প্রচেষ্টা এই মুহূর্তে হয়ে উঠবে শুধু পরাশ্রিত ও অনুকরণজাত। আমরা যা চাই, তা হচ্ছে ছেলেরা তাদের হৃদয় মন নিযুক্ত করবে জনসাধারণের জন্য মহান প্রেম সৃষ্টি করার কাজে। কিন্তু সেই প্রেম

যদি নিজেকে অকালে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় এমন রূপে যা বিদেশীর কাছে স্বাভাবিক, তাহলে তা অবশ্যই হবে নীচ ও ভুল পথে চালিত।

কিন্তু বিবেকানন্দ সোসাইটি দ্বারা এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার আরও পরিষ্কার বাধা হচ্ছে সেগুলিকে সফল করে তুলতে বাস্তব অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া। সদস্যরা বেশির ভাগ হচ্ছে স্কুল ও কলেজের ছাত্র। তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পররীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপর এবং জীবনের এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য ছেলেটিকে নিশ্চয়ই তার সমস্ত সময় ও মনোযোগ এই বিষয়ে দিতে হবে। এগারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে হবে, দেশ ও পরিবারের প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুভার কাজ হতে। আবার ভারতীয় মানুষদের এমন লোক খুব কম আছে যে নিজের জন্যই জীবন ধারণ করতে পারে। প্রায় আমাদের সকল যুবকই তাদের বই নিয়ে সংগ্রাম করছে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পরিবার প্রতিপালনের জন্য, বৃদ্ধ পিতামাতার বোঝা লাঘব করার জন্য, কিংবা বিধবা ভগ্নীদের জন্য এবং যতদূর সম্ভব কম বয়সেই তাকে এটি করতে হয়। অতএব তাদের পক্ষে খুব কমই সম্ভবপর হবে, এমন কি ব্যয় করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ থাকলেও, এটিকে কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের কাজরূপে গ্রহণ করা, যেমন লণ্ডন টয়েনবী হল বা চিকাগো হাল হাউসের ছাত্র-বর্ষের মধ্যে ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হয়।

নিজেদের ও নিজেদের গৃহের নারীদের জ্ঞান বিস্তৃত করার কোন ধরনের প্রচেষ্টা,—পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের গুণাগুণ বিচার, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে বাস্তবিক ভাল কাজ করা যেতে পারে। অন্য ধরনের কাজও হতে পারে—প্রাচীন প্রথায় দৈহিক ব্যায়ামের প্রসার—যাতে বিশেষ দক্ষতা ও পৌরুষ উৎপন্ন হয়—এবং নতুন পদ্ধতিতেও, যাতে সহযোগিতা ও সংগঠন শক্তি দান করে। নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলকার্যে এই প্রচেষ্টাগুলির যে এক প্রত্যক্ষ ফল আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই রকম মনোভাবের সঙ্গেই আমাদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহগুলি জড়িত রয়েছে।

কিন্তু অনেক বিবেকানন্দ সোসাইটি বোধ করতে পারে যে. এই লক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট কার্য তাদের বর্তমান সুযোগের বাইরে, ছাত্রদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে অধ্যয়ন। অতএব নিজেদের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ যা তারা প্রস্তাব করতে পারে, তা হচ্ছে অবিরাম স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি অধ্যয়ন, তাঁর ভাবধারা পরিপাক করার বাসনা নিয়ে এবং পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের জীবনে সেটিকে ব্যক্ত করা। যারা এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করবে, তারা দুটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রথমত তারা বৃক্ষের জন্য অরণ্যকে অবহেলা করার ভুলটি করবে। বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করে তাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব যে, তাঁর সমস্ত গ্রন্থের পিছনে, সকল বাণীর পিছনে স্বয়ং মানুষটি রয়েছেন, প্রতিটির থেকে স্বতন্ত্র সমগ্রের মধ্যে দিয়ে শুধু আংশিক প্রকাশিত। কিন্তু এই মানুষটিকে তাদের বোঝার ও পরিমাপ করার

প্রকৃত দরকার, তাঁর বিক্রমকে উপলব্ধি করা তাদের দরকার, তাঁর আশা ও বেপরোয়া ভাবের আনন্দধ্বনি তাদের নিজস্ব করে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

ছাত্রদের কাছে দ্বিতীয় অসুবিধা আরও গুরুতর। বিপদের আশঙ্কা রয়েছে যে স্বামীজীর গ্রন্থগুলিকে এক নতুন বন্ধনে পরিণত করার, তাঁর রচনার প্রতিটি অক্ষরকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং অবিরাম বারবার পাঠ দ্বারা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ও কর্ণদ্বয়কে বধির করে তোলা এবং এইভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করার সকল সুযোগ আমরা হারিয়ে ফেলি, যেমন খ্রীষ্টান বালক হারিয়ে ফেলে ইংরাজি বাইবেলের সৌন্দর্য অথবা মন্দিরের পূজারী ভুলে যায় প্রণাম-মন্ত্রের শিহরণ। স্বামীজী স্বয়ং ছিলেন স্বাধীনতার মহান অবতার। তাঁর সান্নিধ্যে উপবেশনটাই ছিল মুক্তির অভিজ্ঞতা। তিনি আর কিছু না হলেও বন্ধন-বিনাশকারী ছিলেন। তাহলে কী করে বিবেকানন্দ সোসাইটি, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও, মনের উপর হাতকড়া পরানোর ভার নিতে পারে? এটা কি পরিষ্কার নয় যে, একমাত্র যখন আমাদের নিজেদের চিন্তা প্রথমে সজীব হয়, তখন আমরা তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মূল্য বুঝতে পারি? যে লোকেরা জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নের দ্বারা ইতিমধ্যেই বিশেষ বিচলিত, তারা এই বিষয়ে ছয়টি 'মাদ্রাজ-বক্তৃতা'য় তাঁর উক্তিগুলি প্রশংসা করতে প্রস্তুত। যে ছেলেরা তাদের নিজের দেশকে ভালবাসে এবং তাকে ঐক্যবদ্ধরূপে ধারণা করার ইচ্ছা করে, তারা আনন্দিত হবে 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর'-এর মধ্যে অবস্থিত উজ্জ্বল দৃশ্য পরম্পরা ও বিশদ জ্ঞান দর্শন করে। যারা হিন্দুধর্ম কী জানার জন্য অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং এই অনুসন্ধানের বিশালত্বের সমস্যায় বিচলিত, শুধু তাদেরই চিকাগোর মহান বক্তৃতার অর্থ বোঝার অবস্থা হবে।

কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে, তাহলে স্বামীজীর সমগ্র উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা কেমন করে বুঝব? স্পষ্টত আমরা প্রথমে সেই প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করব, যেগুলি তিনি মোকাবিলা করেছিলেন। এইভাবে আমাদের অসুবিধাগুলিই তাঁর কথার অর্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এ কথাটি খুবই খাঁটি যে, সেই প্রকৃত শিষ্য, যার হৃদয়-মন সেই তত্ত্বে বিধৃত, যে তত্ত্ব তার গুরুর ছিল এবং সেটিকে কার্যকর করতে সে অগ্রসর হয় এমনভাবে যা তার গুরু কখনও চিন্তা করেননি, এমন কি অনুমোদন না করতেও পারতেন। কী তত্ত্বে বিবেকানন্দ বিধৃত ছিলেন? যে পড়তে যাচ্ছে তার কাছে কী এটি যথেষ্ট সহজ নয়? তিনি তাঁর সম্মুখে দেখেছিলেন এক বিরাট ভারতীয়জাতি, তরুণ, প্রাণবন্ত, পৃথিবীর যে কোন জাতির সম্পূর্ণ সমকক্ষ। তাঁর কাছে এই সাধারণ জাতি ছিল 'জাতীয় ন্যায়ের (ধর্ম) দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা'—নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন, অন্যদের কাছে তাদের স্বীকৃতি আদায়কারী, স্বাধীনভাবে সকল জগতে—চিন্তার জগতে, বাস্তব জগতে, সামাজিক জগতে, কর্মের জগতে—নিজস্ব লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান, যার জন্য তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, একথা যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে।

কিন্তু একথা বলা হবে যে, স্বামীজীর পক্ষে ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ ছিল। তিনি বড় ভ্রমণকারী ছিলেন। একদিকে তিনি ভারতকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জানতেন। অন্যদিকে তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশই দেখেছিলেন। তুলনার মতো শিক্ষা আর কিছুই দিতে পারে না। এই যুক্তি ঠিক এবং এই সত্যের দিকে নির্দেশ করে যে, বিবেকানন্দ সোসাইটির অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত তীর্থ ভ্রমণের জন্য উৎসাহের পুনরভ্যুত্থান। কেদারনাথ গিয়ে আমরা শুধু কেদারনাথকেই দেখি না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা কত কিছুই না শিখি। তাদের সুন্দর হিমালয়ের প্রতি জাতির যে ভালবাসা, তার কত গভীরে না আমরা প্রবেশ করি। বারাণসীতে একবার ভ্রমণ করে আমাদের চিন্তা ও অনুভবের শক্তিতে আমরা কতখানি না যোগ করতে পারি? যিনি বিখ্যাত চারটি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন, তাঁর নির্দিষ্ট ও জীবন্ত জ্ঞান কি গ্রহণযোগ্য নয়?

অবশ্য আমাদের নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির বোধ জাগাবার জন্য বহুসংখ্যক যুবকের বিদেশযাত্রা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা আরও বলতে পারি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা খুব কম কাজের হবে। খুব কম পর্যবেক্ষকই বিদেশ ভ্রমণের বিস্তৃত সুযোগ গ্রহণের অনুপযুক্ত, কারণ এই ক্ষেত্রে সবার উপরে এটি সত্য যে মানুষ শুধু সেটুকুই দেখে, যেটুকু দেখার শক্তি তার মনের আছে। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য বোঝার জন্য আমরা নিজেদের কীভাবে শিক্ষিত করব?

একটি প্রধান উপায় হচ্ছে ঐতিহাসিক জ্ঞানের চর্চা। এমার্সন বলেছেন, 'প্রতি মানুষ হচ্ছে তার সব পূর্বপুরুষদের উদ্ধৃতি।' সেইরকম ভাবে প্রতিটি মুহূর্ত হচ্ছে সমগ্র অতীতের সংক্ষিপ্তসার। আমাদের শুধু—এমন কি প্রধানত—ভারতের ইতিহাস নিয়ে নিমগ্ন থাকার দরকার নেই। অন্যান্য দেশে জাতীয় বিকাশের পদ্ধতি যতই আমাদের ধারণায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ততই সেই অনুপাতে নিজের দেশের ইতিহাস জানার ক্ষুধা আমাদের মধ্যে অদম্য হয়ে উঠবে।

পাঠ্যপুস্তকের 'স্টোরিস অফ দি নেশানস' সিরিজের বইগুলি নিয়ে প্রাচীন অ্যাসিরিয়া ইজিপ্ট প্রভৃতির কাহিনী অধ্যয়ন কর না কেন? ইসলামের উৎপত্তি ও বিকাশ খুঁজে বের কর না কেন, সিরিয়া, স্পেনে ও কনস্ট্যান্টিনোপলের চারধারে এর গভীর সংগ্রাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে? আমরা আগ্রহী হই না কেন পারস্যে, ভেনিসে, ক্রুজেডের ইতিহাসে, প্রাচীন গ্রীসে, যদি সুযোগ পাই তো চীন ও জাপানকে বাদ দেব না?

কিন্তু এই বিষয়গুলির চেয়ে আরও গভীরে আমরা যেতে পারি এবং মানব সমাজের প্রকৃতি ও কমনওয়েলথগুলি নিয়ে গবেষণা করতে পারি। ইণ্টার-ন্যাশানাল সায়েন্স সিরিজে স্পেনসারের 'স্ট্যাডি অফ্ সোসিওল্যজি' শুরু করার পক্ষে সুন্দর গ্রন্থ। এতে আছে আত্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা একাগ্র ছাত্রের কাছে বেদ-বাক্যের মতো হওয়া উচিত। সমাজতত্ত্ব, আদিম মানব ও ওই ধরনের বিষয়ের উপর স্পেন্সার, লুবোক, টাইলার, ফিস্ক, ক্লড ও অন্যান্য বহু আধুনিক লেখকের প্রচুর

গ্রন্থ আছে, কিন্তু প্রথমোক্ত লেখকের বেশির ভাগ গ্রন্থই আমরা যে উদ্দেশ্যে চিন্তা করছি তার পক্ষে খুবই বিশিষ্ট। নিজের ধারণার উপর গর্ব ও বিশ্বাস উদ্রেকের কারণে হিন্দু পাঠকের কাছে ড্রেপারের 'কনফ্লিক্ট অফ দি রিলিজিয়াস অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক স্পিরিটস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ—শুধু ইউরোপীয় বিষয়ের উপর হচ্ছে এই গ্রন্থটি। ফ্রেডরিক হ্যারিসনের 'মিনিং অফ হিস্ট্রি' এবং কনগ্রেভের 'ইণ্টারন্যাশানাল পলিসি' হচ্ছে বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য, যদিও প্রাচ্য সম্পর্কে যে অসাধারণ অজ্ঞতা তাঁরা প্রকাশ করেছেন তা ভারতীয় বালকদের কাছে প্রামাণ্য হওয়ার চেয়ে উত্তেজনার কারণ হবে। বিশুদ্ধ ধর্ম-জিজ্ঞাসার ব্যাপারে বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি যেমন এই বিষয়ের বক্তব্যকে তুলে ধরেছে, ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্বের ব্যাপারে মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে ভীষ্মের বক্তব্য ভারতে সর্বদাই গবেষণার যোগ্য। এখানে আমরা দেখতে পাই জাতীয় কল্যাণের প্রশ্নে চরম রাজকীয় অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ় জ্ঞান এবং প্রতিটি ছাত্র পাঠ শুরু করার আগে নিজেকে যেন মুকুটধারী নৃপতি বলে মনে করে, রাজার রাজারূপে দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে, যাতে সে প্রাচীনকালের ভারতীয় সম্রাটের সকল কথাগুলি প্রকৃতি অর্থ বুঝতে পারে।

যাহোক, এটা জানা আছে যে সকল মহান যুগের সূচনা হয় বীরোপাসনার বিরাট তরঙ্গ দ্বারা। যে উদ্দীপনা বিবেকানন্দ সোসাইটি গঠন করছে সেটাই এর এক দৃষ্টান্ত। ইতিহাস সম্পূর্ণ দার্শনিক হতে পারে না। মহান চরিত্রগুলির উপাসনায় আমাদের উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপ দেওয়া যাক। বিবেকানন্দের নিজস্ব চিন্তার কাছাকাছি এর চেয়ে আর কিছু নেই। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন বুদ্ধ বা সীতা বা সেণ্ট ফ্রান্সিসের কথায়, এমন কি হয়তো সেই সময় বিদেশে বসবাসকারী কোন বিরাট ব্যক্তির সম্পর্কেও। আর নিজেকে তিনি সেই বীরের আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন, চরিত্র ও কাহিনীর উপর কোন নতুন ও বিস্ময়কর ব্যাখ্যার আলোকপাত করতে কখনও ব্যর্থ হতেন না।

তাহলে উদাহরণস্বরূপ আকবর, রাণী অহল্যাবাঈ, চিতোরের প্রতাপ সিংহ, শিখদের গুরুবৃন্দ বা পেরিক্লিস, স্যালাদীন, জোয়ান অফ আর্ক, জর্জ ওয়াশিংটন সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব তা আবিষ্কার করার জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটি কেন কিছু সদস্য পাবে না এবং তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ পড়বে না? কিংবা আবার জনসাধারণের কাহিনীর কিছু বিশেষ সঙ্কটকালের উপরও কাজ করা যেতে পারে। ১৮২০ থেকে ১৮৬০ সালের ইটালি, ১৮৬৭ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জাপান, ফরাসী বিপ্লব, পারসীকদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের প্রাচীন সংগ্রাম। এইগুলি হচ্ছে, যাকে ঠিক মতই বলা হয়ে থাকে ইতিহাসের গ্রন্থি। এগুলি নিজেরাই হচ্ছে এক জাতীয় শিক্ষা।

কাজের এক ব্যবহার যোগ্য পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে সাধারণ আলোচনার মধ্যে। প্রস্তাবিত বিষয় ও প্রশ্নগুলি নিয়ে ছেলেদের পড়াশোনা, বিতর্ক ও চিন্তার মধ্যে দিয়েই শুধু আমরা মুক্ত ও প্রাণবন্ত জ্ঞানে উপনীত হতে পারি। সাধারণ আলোচনা বা প্রথামত বিতর্কের শেষে, ক্ষেত্র অনুযায়ী স্বামীজীর অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা যেতে পারে, কোন প্রামাণিক রায় স্থির করার জন্য। এই

ধরনের কিছু উপায়ের দ্বারা আমরা বুদ্ধিকে ভোঁতা করা এবং নতুন বন্ধনরূপে এটিকে সৃষ্টি করে গুরুর মতকে অবনত করার বিপদ হতে নিরাপত্তা আমরা আশা করতে পারি।

কারণ তিনিই সবচেয়ে বড় শিক্ষক নন, যিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি বলতে পারেন; কিন্তু তিনিই বড় শিক্ষক, যিনি আমাদের গভীর জিজ্ঞাসার মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তাই আমরা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য এবং মাসখানেক বা ছ সপ্তাহ অন্তর এই ধরনের চিন্তা-পরিভ্রমণের পরে আমরা যখন স্বামীজীর নিজস্ব রচনাবলীতে ফিরে আসব, আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে আমরা সেগুলিকে আরও আরও বেশি উজ্জ্বল দেখব এবং তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। কারণ আমরা শিখেছি তিনি যেভাবে ভালবাসতেন সেই ভাবে ভালবাসতে, তিনি যেমন আশা করতেন, তেমন আশা করতে এবং তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা বিশ্বাস করতে।

ঐতিহাসিক গবেষণার উপর বক্তব্য

১। সব কিছু যা তুমি কর, নৈতিক আদর্শের প্রভাবাধীন থেকে কর। মনে রেখো সত্য তার সব কিছু পূর্ণতা নিয়ে প্রকাশিত হয় শুধু বুদ্ধির মাধ্যমে নয়, হৃদয়ের মাধ্যমেও এবং ইচ্ছারও। অতএব বিশুদ্ধ মানসিক উপলব্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। আর কখনও ভুল না যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি কার্য জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় বলি, যে মানুষ সচেতনভাবে হীন বা অসৎ নির্বাচন করে, সে তার সহযাত্রীদের অগ্রগতির পথে বেশি দিন পথিকৃৎ হয়ে থাকতে পারে না। যে উচ্চতমকে লাভ করা যায়, তার জন্য যদি আমরা সর্বদা সব রকমে চেষ্টা করি, তাহলে যে কোন পথেই সবকিছু আমরা প্রকৃতপক্ষে লাভ করতে পারি।

এ কথা বলা হয় যে, 'বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি হচ্ছে বড় সামাজিক ঘটনা।' শিক্ষার সব অগ্রগমনের পক্ষে এটি সত্য। এমন কি সত্য লাভের জন্য আমরা যে শ্রম করি তা নিজের জন্য নয়, তা অন্য মানুষের জন্যই এবং আমাদের শ্রমলব্ধ ফল অন্যদেরই প্রদেয়, স্বার্থপরের মতো নিজের উপভোগের জন্য নয়। এক মহান দৃশ্য নিজে একা দেখার চেয়ে ক্ষুদ্র লাভ উদারভাবে ভাগ করে নেওয়া ভাল। ভাল কারণ জ্ঞানের অগ্রগমনের পক্ষে তা শেষ পর্যন্ত বেশি কার্যকর। আমাদের প্রজন্মে ব্যক্তি বিশেষের সংগ্রামের ফল জাতির পরবর্তী পুরুষের যাত্রারম্ভের স্থান হওয়া উচিত।

২। গবেষণায় যে তত্ত্ব ও জ্ঞান সংগ্রহ করা যায় তা নিয়ে কখনও সন্তুষ্ট থেকো না। আমরা যেমন দেহ, তেমন মনও। আমাদের অন্যান্য অনুভূতি ও বৃত্তি আছে, ভাষার এইগুলি ছাড়াও। আমাদের মস্তিষ্ক যেমন আছে, তেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আছে। দেহকে কাজে লাগাও। সব ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার কর, এমন কি প্রত্যঙ্গগুলিকেও, সত্যকে অনুসন্ধান করার কাজে। শুধু মন দিয়ে নয়, পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের দ্বারা নয়, দর্শন ও স্পর্শন দিয়ে, ভ্রমণ ও কর্মের মধ্যে দিয়ে যা কিছু শেখা যায়, তাই হচ্ছে যথার্থ জানা। অতএব, যদি তুমি ভারতকে বুঝতে চাও, তাহলে প্রতি যুগের প্রধান ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ কর। মাটি সরিয়ে খোদিত প্রস্তরগুলি নিজের হাতে স্পর্শ কর, যা দেখতে চাও, সম্ভব হলে সেখানে যানবাহনের বদলে পদব্রজে চলে যাও। মোটরে করে যাওয়ার চেয়ে বরং বাহন ব্যবহার কর। যেখানে কোন ঘটনা ঘটেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াও, এমন কি সেই ঘটনার কোন চিহ্ন এখন যদি না থাকে। যদি কোন ধর্মীয় তত্ত্ব তুমি বোঝার বাসনা কর, তাহলে যে মানুষের জীবনে সেটি এসেছে বা যে জাতির কাছে সেটি ঘনিষ্ঠ ছিল, তা যতটা খুঁটিনাটির সঙ্গে পার নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বুঝতে হলে পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে ভিক্ষা কর। আওরঙ্গজেবকে বুঝতে হলে দিল্লীর মসজিদে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ পড়ে প্রার্থনা কর। কিংবা যদি সামাজিক গঠন তোমার গবেষণার বিষয় হয়, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কর্মের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণে স্থির নিশ্চিত

হয়ো। যা তোমার কাছে আসবে, সেই প্রত্যেকটি সত্যকে পরীক্ষা করে নিও, প্রতিটি তত্ত্বকে যাচাই করে নিও। যা তুমি খুঁজছ, তার সার্থকতার জন্য প্রতিটি বৃত্তিকে তার অভিমুখী করো। যা তুমি বিশ্বাস করো তার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে নিও রুটি প্রস্তুতকারীদের ময়দা মাখার মতো, কুমোরের কাদার তাল নিয়ে কাজ করার মতো, নদীর জলধারায় পূর্ণ খালটির মতো, বিষয়টি নিয়ে মন্থন করো। কখনও সন্তুষ্ট হয়ে বসে থেকো না। চিন্তাকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করো, অনুভূতিকে অভিজ্ঞতায়, অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানে। জ্ঞান চরিত্র হয়ে উঠুক। নির্যাতনে গৌরব বোধ করো। তোমার কর্ম তোমার কাছে যে মূল্য চায় তার দ্বারাই তুমি জানতে পারবে জগতের কাছে এর সম্ভাব্য মূল্য কতখানি।

৩। ভবিষ্যৎকে কখনও ভুলো না। 'অতীতেরর দ্বারা বর্তমানকে বোঝ ভবিষ্যৎকে জয় করার জন্য।' এইটি তোমার নীতি হয়ে উঠুক। উদ্দেশ্যহীন জ্ঞান শুধুই পাণ্ডিত্য। সেই সঙ্গে জ্ঞানানুসরণে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুপ্রবেশকে জ্বলন্ত তরবারির মতো একধারে সরিয়ে রাখবে। উদ্দেশ্য, নৈতিক উদ্দেশ্য, অন্যান্য বিষয়ক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থের একেবারে বিপরীত। ব্যক্তিগত, সামাজিক, নীতিগত বিরোধের মধ্যে আকর্ষণ প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করো। এই জগতের যে শক্তিগুলি আছে সেগুলিকে মুক্ত করে উচ্চ কর্ম খুঁজে নিতে দাও—তোমার নির্বাচিত লক্ষ্যে সাহায্য দান করুক।

৪। আর এবার আসে তোমার কাজের সুযোগের প্রশ্নটি, তোমার প্রকৃত কী করা দরকার সেই প্রশ্নটি। আমি জানি দুটি বিষয়ে তুমি খুব স্পষ্ট হবে—প্রথমত, যাই করো না কেন তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতির সেবা করার জন্য; দ্বিতীয়ত, তুমি জান এ কাজ করার জন্য তুমি নিজেকে তৈরি করে নেবে এই বিশেষ বিষয়ের কাজে জগতের এক বিশেষজ্ঞরূপে। অতএব এই দুটি বিষয়ের উপর আমার আর বলার দরকার নেই।

প্রকৃত কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে, আমি ভাবি বহুকাল ধরে আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে যে, ভারতের পরিপাক করা আধুনিক চিন্তাধারাকে তিনটি উপাদানে বিভক্ত করা যেতে পারে, যা সে শুধু গ্রাসই করবে না, গণতন্ত্রীকরণও করবে। এগুলি হচ্ছে—আধুনিক বিজ্ঞান, ভারতীয় ইতিহাস ও জগৎ-বোধ বা ভূগোল—সংশ্লেষিত ভূগোল।

৫। এখন এগুলির যে কোনটিকে তুমি তোমার নিজের কর্মরূপে নির্বাচন করো, তোমার বুদ্ধিগত আনন্দের বেশির ভাগই আসবে অন্যান্যগুলি থেকে। যদি তুমি বিজ্ঞানের কর্মী হও, তুমি আগ্রহকর ভাবে ইতিহাসের অনেক কিছুই পড়তে পার আনন্দ লাভের জন্য। আর এইভাবেই চলতে পারে। উচ্চ গবেষণার একটি সূত্রের এই ধরনের কিছু দ্বারা গণতন্ত্রীকরণ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিদ্বানদের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত ইতিহাসের কোন যুগ সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকারদের দ্বারা রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে কাজে লাগতে পারে। স্কটের উপন্যাসগুলি আধুনিক চিন্তা

সৃষ্টির একটি প্রধান উপাদান হয়ে আছে। আর তোমাকে বলার প্রয়োজন করে না যে, ইংরাজভাষী লোকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের গবেষণা জনপ্রিয় করার জন্য কবিতা কী করেছে।

৬। কিন্তু যা কিছু করো না কেন,তাতে মন-প্রাণ ঢেলে দাও। বিশ্বাস করো যে, জ্ঞানের এই আধুনিক রূপ, নবীন হলেও সত্য। এর মধ্যে কোন পূর্বলব্ধ ধারণা নিয়ে যেও না। এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করো না যে তোমার পূর্বপুরুষরা সব বুঝতেন, কিন্তু মানুষের মতো সঙ্কল্প করো তোমার পূর্বপুরুষদের, বংশধরদের বুদ্ধির রাজ্যে এর প্রধানত্ব যোগ করার। এই দোষ আমি সবদিকে দেখছি। যখন নতুন কিছু বলা হয়, যা একেবারে সাড়া জাগানো, তখন লোকে ভাবে আমার 'জাতীয়তাবাদী'র লক্ষণ হচ্ছে জবাব দেওয়া, 'ও, হ্যাঁ, আমার এটি ভাল করে জানা আছে, সংস্কৃত ভাষা থেকে বা মহাভারত থেকে কিংবা অমুক সাধুর বাণী থেকে।' আর সেখানেই তাদের চিন্তা শেষ হয়। এ হচ্ছে বিশুদ্ধ অলসতা ও অশ্রদ্ধা। এমন ধরনের পরিচিতি চিন্তাকে হত্যা করে, কবরস্থ করে, তাকে বাস করার জন্য কোন আশ্রয় দেয় না, বিকশিত হওয়ার জন্য কোন উদ্যান নয়। যে মানুষ বুদ্ধি দ্বারা নতুন রাজ্য জয় করবে, সে কখনও পিছন ফিরে তাকাবে না, একমাত্র হাতিয়ার খুঁজে নেওয়ার জন্যে ছাড়া। যে মানুষ সত্যকে মুখোমুখি দেখবে, সে প্রথমে তার চোখ দুটি শিশির দিয়ে ধুয়ে নেবে, যে শিশির মানব জাতির অব্যবহৃত। তারপর যখন তোমার কর্ম সাঙ্গ হবে, যখন তুমি তোমার বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, তখন তুমি শ্রদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ অনুষ্ঠান করতে পার। তোমার নিজের আবিষ্কারের মধ্যে থেকে এটা-ওটা নিয়ে তোমার পূর্বপুরুষদের উক্তির মধ্যে এটা-সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পার এবং এই সন্ধির আনন্দের মধ্যে টের পাবে যে তাঁরা যে পথে গিয়েছিলেন তুমিও সেই একই পথে গেছ, শুধু পথ-নির্দেশক প্রস্তর ফলকগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করেছ। কিন্তু বর্তমানে তোমার দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ রাখ শুধু পার্থক্যের তালিকাগুলির প্রতি, নতুনের প্রতি, অজানা অকল্পিত অপ্রমাণিতের প্রতি, তাহলে তুমি তোমার পিতার প্রকৃত সন্তান বলে নিজেকে প্রমাণ করবে, তাদের প্রথানুযায়ী পোষাক পরিধান করে নয়, তাদের অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাদের মত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে। একাগ্রতা ও বৈরাগ্য হচ্ছে হিন্দু মানসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন বা সংস্কৃত ভাষায় ব্যস্ত থাকা নয়।

৭। এবার বিষয়টি নিয়ে বলা যাক। ইতিমধ্যেই তুমি ইতিহাস ও ভারতীয় অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয়েছ। অতএব ধরে নেওয়া যায় তোমার কাজ এই ক্ষেত্রের কোথাও হবে। কিন্তু তোমার নিজস্ব বিশেষজ্ঞতার পাশাপাশি—যা তোমার শিক্ষিত অভ্যাসের দ্বারা তুমি বিশ্বস্তভাবে পালন করবে, যাকে প্রফেসার যদুনাথ সরকার বলেন 'ভূমি কর্ষণ'—ভুলে যেও না সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে নিজেকে আগ্রহী করে তুলতে। যদি তুমি ভূগোল গ্রহণ করো, আনন্দের জন্য ইতিহাস পাঠ করো, কিন্তু

রিক্লাসের মতো বড় ভূগোলবিদ্ হয়ো। যদি ইতিহাস গ্রহণ করো, তাহলে রিক্লাসের 'ইউনিভার্সাল জিওগ্রাফি' পাঠ করতে ভুল না এবং আর যা কিছু সংশ্লেষিত রচনা এই সম্পর্কে দেখতে পাবে। সংশ্লেষণ বা একত্বের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণের দ্বারা মন শক্তির সন্ধান করে এবং এইভাবে লব্ধ শক্তি ব্যবহার করে বিশ্লেষণে বা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে। আবার যদি ভারতীয় ইতিহাস তোমার গবেষণার কাজ হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের ইতিহাসের উপর সুন্দরতম ইউরোপীয় আলোচনাগুলি পাঠ করো। সেগুলি তাদের ঘটনার জন্য সব সময় মূল্যবান নাও হতে পারে, কিন্তু তাদের পদ্ধতির জন্য সেগুলি অমূল্য। বাকলে, লেকি ও গিবন পড়। যদি পার তো বিখ্যাত ফরাসীদের লেখা পড়। বলা হয় যে ফ্রান্সের এক স্কুর্ফির জন্ম লিখিত বোসেঁর ইতিহাসের গতির উপর ক্ষুদ্র রচনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো নেপোলিয়াঁর আত্মায় অগ্নি প্রজ্বলিত করে তুলেছিল। আমি এখনও পর্যন্ত সেটি পড়িনি, কিন্তু পড়ার আশা করছি। আরও আশা করছি কঁদর্সে ও ল্যামার্টিনের লেখাগুলি পড়ার এবং মিচেলের এখনও পর্যন্ত যা পড়েছি তার চেয়ে আর বেশি পড়ার। কোঁতে সম্পর্কে আমি তোমাকে উপদেশ দিতে অক্ষম মনে করি। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ইতিহাসে নিযুক্ত মানুষদের মধ্যে আজ পর্যন্ত তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তাঁর আলোচনার মতোই তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মূল্যবান কিনা তা আমি তোমায় বলতে অক্ষম। আমি নিজে এ পর্যন্ত শুধু মাঝে মাঝে তাঁর অল্পই গ্রহণ করতে পেরেছি, এবং আমার মনে যে সহস্র প্রশ্ন আছে সে সম্পর্কে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছেন কিনা আমি এমন কি তাও বলতে পারি না। তা সত্বেও আমি যে দুটি বই তোমায় পড়তে দিয়েছি—ইংরাজ পজিটিভিস্টের লেখা 'দি মিনিং অফ হিস্ট্রি' ও 'দি নিউ ক্যালেণ্ডার অফ গ্রেট মেন'—যদিও যথেষ্ট জনপ্রিয় তা সত্বেও অত্যন্ত গভীর বলে আমার কাছে বোধ হয়। ইতিমধ্যে যা আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, শেষের বইটির প্রতিটি বিভাগের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি দিয়ে এবং প্রতিটি জীবনীর সঙ্গে অন্য জীবনীর সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে আমার মনে হয় সেগুলির ওজন সোনা দিয়ে করার উপযুক্ত।

ভারতীয় ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব চোখে পড়ে। কিছু লেখক বৌদ্ধ ভারতে (যদি বাস্তবিক এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের অধিকার আমাদের থাকে) আগ্রহী, আর কিছু লেখক আগ্রহী মারাঠা বা শিখ বা ইন্দো-ইস্লামিক ইতিহাস বা ওই রকম কিছুর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী। কিন্তু এর সবগুলির মধ্যে দিয়ে যে ভারতীয় হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে, তা কে ধরতে পেরেছে? ভারতীয় স্থানগুলির সমগ্র আনন্দ ভারতই সৃষ্টি করেছে। আমি যখন রাজগিরে ছিলাম তখন এটি অনুভব করেছিলাম এবং স্পষ্ট দেখেছিলাম বৌদ্ধযুগের মধ্যে দিয়ে আরও প্রাচীন ভারতের রূপরেখা দীপ্তিমান—সেই ভারত মহাভারতের ভারতবর্ষ। আর এই সেদিন সাঁচীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ইজিপ্ট থেকে প্রত্যাগত এক মহিলা আমায় বললেন, 'দু হাজার-বছরের ব্যাপার নিয়ে আপনি যদি এত চিন্তা করেন, তাহলে চার হাজার বছরের

বেলায় কী ভাববেন ?' আমি বলেছিলাম, 'দু হাজার বছর আমার কাছে তুচ্ছ। এমন কি সাঁচীও প্রস্তরস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ভারতীয় মানুষের এই শক্তি এখনও আছে!'

তুমি কি সেই মানুষ যে এই সত্যকে ধরতে পারবে এবং সমগ্র জগতের সামনে সুদৃঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কাব্যের উষ্ণতা মিশিয়ে একে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? তার চেয়ে বড় কথা তুমি কি সেই মানুষ, যে স্বয়ং ভারতবর্ষকে এই অনুভবটি করাতে পারবে? জাতীয় ইতিহাসের এক উপনিষদ ভারতীয় জাতীয়তার এক শাশ্বত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবে ভারতীয় হৃদয়ে, যেটি জাতীয়তাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র জগৎ। কিংবা তোমার গবেষণার অর্থনীতির দিকেই তোমার বেশি ঝোঁক? তাই যদি হয়, তাহলে নিজেকে কেবল সংখ্যাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হতে দিও না, আরও এক বিষয়ে নিজেকে সযত্নে সতর্ক করো যাতে তুমিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি না হয়ে ওঠ, যে ভারতের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যা কিছু জানার সবই জানে এবং তাছাড়া আর অন্য কিছু জানে না। পৃথিবীর প্রতি দেশের ও প্রতি সম্প্রদায়েরই অভিযোগ আছে এবং অভিযোগগুলি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলগুলিকে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলে চিন্তা করলে, সেগুলিকে সংশোধন করার দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হবে। সক্রিয় সংগ্রামশীল মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতীতকে গ্রহণ করে—আর যদি পূর্বপুরুষদের কোন কার্যের জন্য গর্বিত হতে ইচ্ছা করো, তাহলে অন্যদের জন্য শান্তভাবে দুঃখভোগ করার জন্য প্রস্তুত হবে। বিপরীত ধর্ম-বিধি অন্যত্র যেমন খাটে এখানেও তেমনি! প্রশ্ন হচ্ছে তারপরে কী করা হবে? এমন কি অর্থনীতির বিজ্ঞানকেও নৈতিক করা যেতে পারে, গঠনমূলক করা যেতে পারে। যে নীতি পালন করে মানুষ সর্বদা কিছু আয় করে, তা নীচ ও বাজে ব্যাপার। বস্তুত উচ্চতম মানুষ বরং বিপরীত সীমার দিকেই আকর্ষিত হয়, যা তাকে সর্বদা কিছু প্রদান করে না।

রাস্কিন, উইকস্টিড ও ফ্যাবিয়ানরা ইংরাজ লেখকদের মধ্যে অর্থনীতির যথার্থ দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সাহায্য করতে পারেন, কারণ তাঁদের লেখা বিশেষ ধরনের মধ্যে দিয়েও সমগ্র মানবসমাজের লাভের দিকটি অনুভব করতে পেরেছে। বিষয়টির আঙ্গিকের জন্য তোমার বহু গ্রন্থ পাঠ করার দরকার। কিন্তু তার মধ্যে নীতি ও মানবপ্রেমের সমগ্রতা খুব কম ব্যক্তির সঙ্গেই তুমি ভাগ করে নেবে, যারা প্রায় সর্বদাই কোন না কোন মতবাদের প্রতিভূ, যা মানুষকে শোষণ ও ধ্বংসের পরিবর্তে প্রেম ও সেবা শিক্ষা দেয়, যা হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা স্থায়ী আনন্দ। যাহোক, আর একটি তৃতীয় বিষয় আছে, যা তুমি গ্রহণ করতে পার এবং যেটিকে পরিপুষ্ট করতে পার ভারতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় অর্থনীতি দুটি বিষয়েই তোমার গবেষণার থেকে। 'সোসিওলজি' বা সমাজের গবেষণা সম্পর্কে আমি ইঙ্গিত করছি। এই শব্দটি কোঁতের সৃষ্টি, কিন্তু জনপ্রিয় করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হার্বার্ট স্পেনসার। স্পেনসার ও অন্য লেখকের দল এই বিষয়টির মধ্যে গেছেন সামাজিক প্রথা নিয়ে

গবেষণা করার মাধ্যমে, আর প্রথা দ্বারাই যে সমাজের ইতিহাস প্রধানত লেখা হয় সে সম্পর্কে খুব কমই সন্দেহ আছে। কোঁতে এটিকে এক জৈবক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন, যার অর্থ দায়িত্ব ও লক্ষ্যস্থল আছে। তিনি প্রতি মানবজাতির মধ্যে প্রতি মানব সত্তার আধ্যাত্মিক সমগ্রতা লক্ষ্য করেছিলেন। আর বহু লেখক সমাজ-তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন, মানুষের সমাজকে পিঁপড়ের ও মৌমাছির ওই ধরনের সমাজের সঙ্গে তুলনা করে।

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের রাজা হচ্ছেন বোধহয় ক্রোপ্‌টকিন। হেইনম্যান দ্বারা প্রকাশিত তাঁর 'মিউচ্যুয়াল এড' পুস্তকে তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও আত্ম-সংগঠন হচ্ছে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চেয়ে অনেক শক্তিশালী উপাদান, জীবনের উচ্চতর ধরনের ক্রমবিকাশে এবং সম্প্রদায়ের সাফল্য নির্ধারণে।

এখন এটি নিশ্চয় এক চিন্তার ও গবেষণার বিষয়, যেটি জাতীয়তার প্রশ্নে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার নিজের মতে আমরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে নীতি হবে 'পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা, আত্ম-সংগঠন' এবং আমরা শুধু দৃঢ়চেতা কর্মীই চাই না, চাই সম্ভবপর সর্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতাদের, যার ফলে তাঁরা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। এটা কি সত্য যে শিল্পব্যবস্থার সমাজ সর্বোচ্চ ধরনের সমাজের রূপ? যদি তাই হয়, তাহলে এটিও কি সমান সত্য যে সেটি পূর্বে সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়? সেদিন কে যেন আমায় বলেছিল, 'সামরিকতা থেকে সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিল্পব্যবস্থায়' বড় প্রশ্নগুলির ধারে এসে এখন আমরা দাঁড়িয়েছি। তাহলে একটি বিষয় পরিষ্কার বোধ হচ্ছে—শিল্পব্যবস্থায় সক্ষম লোকেরাই শুধু সব কিছুতে সক্ষম। যদি সূচনা শেষটি নির্ধারণ করে, তাহলে শেষও পরিষ্কারভাবে সূচনাকে নির্ধারণ করবে, সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত হবার সংগ্রাম হচ্ছে উচ্চতম যে সংগ্রাম আছে তারই মতো উচ্চ।

এমন কি ভারতের ইতিহাস লিখতে হলে, এমন কি ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হলে, আমার বহু দিনের অনুভূতি হচ্ছে যে আমাদের সর্বপ্রথমে দরকার সমাজতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞদের—যাঁরা এক দৃষ্টিতেই বলে দিতে পারবেন প্রাগৈতিহাসিক সময়পঞ্জীতে কোন্ সামাজিক গোষ্ঠীর সম্ভাব্য যুগ। তারপরেও তার সঙ্গে যুক্তভাবে আমরা চাই এমন মানুষদের, যাঁদের কাছে—চ্যালদিয়ান, অ্যাসারিয়ান, তাতার, পেলাসজিন, ইজিপ্শীয়ান, ফোনিসিয়ান—প্রাচীন এশীয় সাম্রাজ্যগুলির ইতিহাস উন্মুক্ত পুস্তকের মতোই। সর্বশেষে আমরা এমন মানুষ চাই, যাঁরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন কোন লক্ষ্যের দিকে, নিশানাহীন সমুদ্রের কোনপথে, জাতীয় কল্যাণের বিরাট অর্ণবপোত পরিচালিত করা হবে।

তুমি কি এক নিঃসঙ্গ ছাত্র হবে? কিংবা সেই সর্বাপেক্ষা সুখী ও সফল কর্মীদের অন্যতম, যারা তাদের সহনেতা ও সহকর্মীদের আহ্বান করতে পারে একই পথে পরিশ্রম করার জন্য এবং চিন্তালব্ধ ফলগুলির বিনিময় করার জন্য।

সহযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য

তুমি কী পড়তে পার সেই বিষয়ে। প্রথমত জাতীয় কার্যের কোন্ অংশের জন্য তুমি নিজেকে প্রস্তুত করতে চাও? আমার বিশ্বাস, যদি ঠিক পরিচালনা করা যায়, ভারত বর্তমানে এমন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে তার নীতি হবে—'পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা, আত্ম-সংগঠন।'

যদি তুমি বিষয়টির দিকে তাকাও, তাহলে দেখবে শোষণ ও দুর্নীতির বেশির ভাগ ঘটনাই—যেখানে সংখ্যার সুবিধা একইরকম ভাবে এক পক্ষে, যেমন এখানে,—সংগঠন দ্বারা মোকাবিলা করতে পারা যায়। একজন বিচ্ছিন্ন ও অশিক্ষিত লোকের চেয়ে দশ হাজার দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অনিষ্ট করা অনেক বেশি মুশকিল। অফিসের করনিকদের, সরকারী কর্মচারীদের, রেলের চাকুরিয়াদের, করদাতাদের, কৃষকদের দৃষ্টান্তই ধরা যাক। এইসব শ্রেণীর মধ্যে অনেক কিছুই করা যায় শুধু সংঘবদ্ধতা ও সম্মিলিত-কর্মের দ্বারা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নির্ভর করে সংগঠকের উপর, যে সাধারণত সম্পাদক। এই ধরনের কাজ করতে কি তুমি আগ্রহী? শুধুমাত্র স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সংগঠনকে ব্যবহার করা চলে না, ঋণ, যন্ত্রপাতি, জ্ঞান, সহযোগিতা ও বহু রকমের পারস্পরিক সাহায্যও লাভ করা যায়।

যদি এই বিভাগটিকে তুমি গ্রহণ করতে চাও, দেখবে যে এই বিষয়ের নিজস্ব ইতিহাস ও সাহিত্য আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'কো-অপারেশন' পড়ে নাও। চিঠি লেখ আইরিশ এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন সোসাইটিকে, ২২ লিঙ্কন প্লেস, ডাবলিন, আয়ারল্যাণ্ড, তাদের কাগজপত্রের জন্য এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর ও উপদেশের জন্য। হাইনম্যান প্রকাশিত ক্রোপ্‌টকিন লিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'মিউচুয়াল এড' পড়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির ইতিহাস অধ্যয়ন করো। ডেনমার্কে সহযোগিতার ইতিহাস পড়। আর বিশেষভাবে পড় ছোট দেশগুলির ইতিহাস, নরওয়ে, সুইডেন, হ্যানসিয়েটিক লীগ, মটলির 'রাইজ অফ দি ডাচ রিপাবলিক' ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য ছোট সমিতি গঠন করো। বাস্তবিক, যে কোন উপায়ে এটি করো। নিজের জ্ঞানকে ভাগ করে দাও এবং তা বিস্তৃত ও গভীর করার জন্য সহযোগিতা করো। সবার উপরে, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো, তোমার চিন্তাকে কার্যে পরিণত করো, নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। একদল লোককে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের জন্য সংগঠিত করো এবং লক্ষ্য করো তুমি কেমন অগ্রসর হচ্ছ। একটি শ্রেণীকে সংগঠিত করো, ধর কোন আইনের সাহায্যের জন্য। এটি খুব অসুবিধার হবে না। আমার মনে হয় কোন দান-কার্যের চেয়ে এটি ভাল পরীক্ষা হবে, ওই দান-কার্যের প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেখাতে ও ব্যর্থ হতে আমরা সবাই অভ্যস্ত। নির্দিষ্ট কোন কিছুর বিরুদ্ধে কোন ধরনের সম্মিলিত সংগ্রাম সংগঠিত করো।

কিংবা তুমি রাজনীতিতে বিশিষ্ট হতে চাও? সেক্ষেত্রে তোমায় অবশ্যই পড়তে হবে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—আর কংগ্রেসের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির সঙ্গে

দত্ত, ডিগবি, নৌরজি, পি সি রায় ও অন্যান্যদের গ্রন্থ, সেইসঙ্গে রানাডে, গোখলে ও অন্যান্যদের বক্তৃতাবলী—এই হচ্ছে তোমার শ্রেষ্ঠ উপায়।

অথবা সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষ? সেক্ষেত্রে ইতিহাস নিয়ে কাজ কর এবং নিজের দেশের ছাড়াও অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও ভূগোলকে অবহেলা করো না। কারণ মনে রেখ জগৎ-বোধের মধ্যে দিয়েই আমাদের জাতীয়তা-বোধ অর্জন করতে হবে। মানব সমাজের গঠন,—স্পেনসার, টাইলর, ক্লোড, লুবোক ও অন্যান্যরা; প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির ইতিহাস—অ্যাসিরিয়া, চ্যালদিয়া, চীন, পারস্য, গ্রীস ইত্যাদি এবং ভারতের জন্য—টিলকের দুটি গ্রন্থ, ফার্গুসনের স্থাপত্য, ক্যানিংহামের প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ। ম্যাক্রিণ্ডেলের সংগ্রহাবলী, পুরাতত্ত্বের সার্ভে রিপোর্ট ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ধরনের পড়াশোনায়—আর যা পড়েছ সেই সব স্থানে তীর্থ-ভ্রমণের দ্বারা জ্ঞানকে অবিরাম সুদৃঢ় করলে—তুমি এক অলিখিত ইতিহাস লেখার উপাদান খুঁজে পাবে।

কিংবা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়ে মহান উদ্দেশ্যের জন্য তুমি কাজ করতে চাও? সেক্ষেত্রে সহযোগিতাকে যা কিছু সাহায্য করো তা তোমায় সাহায্য করবে এবং এক ভিন্ন ধরনের কাজ চাই।

অথবা মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞানগুলি লেখার কাজের ভার গ্রহণ করতে তুমি আগ্রহী? মালাবারী ভাষায় তোমাদের কী কী বই আছে, যাতে মেয়েরা ইতিহাস পড়তে পারে? যদি তুমি তোমাদের নিজের ভাষায় এই কাজ করো, তাহলে তোমার সাহায্যকারী প্রয়োজন, একেবারে একদল সাহায্যকারী। তাহলে আবার তোমার সাহসের প্রয়োজন হবে, যা জন্মগ্রহণ করে এই অনুভূতি থেকে যে অন্যেরাও অন্য ভাষায় এই একই ধারণার বশে কাজ করে চলেছে।

এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে সহস্র সহস্র জনের—সারা দেশ জোড়া আমাদের বাছা বাছা স্নাতকদের বীরত্বপূর্ণ ভক্তি, প্রতিজন নিজের বিষয়টি নির্বাচন করে নেবে এবং তোমাদের বিরাট ভূমিকায় এক একটি স্থান পূর্ণ করবে। এতখানি করার প্রয়োজন আর অন্য কিছুর নেই। অন্য কিছুই আর এত আলো নিয়ে আসতে পারবে না। এই হচ্ছে এক সহযোগিতার ঘটনা। প্রতি মানুষ প্রতিদিন শুধু কয়েক ঘণ্টার অবসর প্রদান করবে। বাকি সময়টুকু সে তার জীবিকা অর্জন করবে। তুমি দেখতে পাচ্ছ?

কিন্তু অন্য সব বিষয়ও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শারীর-শিক্ষণ। এটির অত্যন্ত প্রয়োজন। এই রকম, আরো এই রকম।

যে কোন ক্ষেত্রেই ফ্রেডরিক হ্যারিসনের যত লেখা হাতের কাছে পাও পড়ে ফেল। তার বইগুলিতে খরচ আছে, কিন্তু সেগুলির ওজনের সমান স্বর্ণ হচ্ছে তাদের মূল্য। সেগুলি প্রকাশ করেছে ম্যাকমিলান।

ভারতীয় বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেনের স্থান

১

সুন্দর শব্দ 'কিণ্ডারগার্টেন'—শিশুদের উদ্যান—আজকাল সারা পৃথিবীতেই পরিচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সত্য একে সৃষ্টি করেছে তা সমানভাবে পরিচিত বা সমানভাবে বোধগম্য নয়। আদর্শ শিশু-উদ্যান বোধহয় হবে গৃহ, যে উদ্যানের ধাত্রী হচ্ছেন মা। আর সব মা যদি বুঝতেন মানুষের বিকাশের বিষয় এবং জানতেন কত ভালভাবে এই ফুলের জগৎকে গড়ে তোলা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে সত্য ও সবচেয়ে মহৎ শৈশবের বিদ্যালয় হয়ে উঠত। না, সহজাত জ্ঞান যত দূর যায় এবং বিদ্যার চেয়ে অনুভূতি এত বড় যে শিশুকে তিক্ত-বিরক্ত শিক্ষকের রুক্ষ জ্ঞানের কাছে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে সরল মাতার সস্নেহ যত্নের কাছে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে মার প্রয়োজন শিক্ষকের লক্ষ্যের জ্ঞান, আর নিঃসন্দেহে শিক্ষকের প্রয়োজন মায়ের ভালবাসা ও যত্ন।

মনীষীরা জ্ঞানচর্চা করেন এবং সম্প্রদায়কে তা দান করেন। এইভাবে প্রতি সভ্যতা তার সংস্থাগুলির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। অন্য কিছুই এর চেয়ে বেশি নিখুঁত শিক্ষণীয় হতে পারে না যেমন ব্রতগুলি, যা হিন্দুসমাজ সংরক্ষণ করে এসেছে এবং পুরুষানুক্রমে তার সন্তানদের হস্তান্তর করেছে। সেগুলি যেমন উপাসনার প্রথম পাঠ, তেমন সামাজিক সম্পর্কের বা আচার-ব্যবহারের। এর মধ্যে কতকগুলি ব্রত—যেটি গো-সেবা শিক্ষাদান করে কিংবা বীজ বপনের কিংবা কয়েকটি যা ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার উপাদানবিশিষ্ট বলে বোধ হয়—সেই বস্তুটি দেবার বাসনা করে, যাকে আমরা আজকাল ধর্ম-নিরপেক্ষ জ্ঞান বলে প্রভেদ করি। বস্তুত সেগুলিকে বোধ হয় যেন প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার টিকে থাকা খণ্ডবিশেষ। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম-তত্ত্ব ও ধর্মীয় অনুভূতি শিক্ষার জন্যই সেগুলি সংগঠিত। সেই ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণতা বিস্ময়কর। তারা আচরণ, কাহিনী, ক্রীড়া ও উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করে এমন সূক্ষ্মতার সঙ্গে যে, বহু ভারতীয় তা প্রশংসা বা উপভোগ করতে পারে না, যেমন আধুনিক শিক্ষার কল্পনাগুলির সঙ্গে ইউরোপীয়রা ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। এগুলির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে ভারতবর্ষ যা করেছে, কিণ্ডারগার্টেনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ তা করার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানের স্তরে। যখন আমরা ব্রতগুলিকে বুঝতে পারি, তখন প্রাচ্য রমণীর সূক্ষ্ম লাবণ্য ও অনাসক্ততা দেখে আর বিস্মিত হই না। যেখানে শিশু শিখেছে বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে তার ফুল পাড়ার আগে মনে মনে অনুমতি চাইতে, সেখানে নারীদের কাজ কী করে রুক্ষ বা মন্দভাবাপন্ন হবে? পূজার জন্য সুগন্ধি পত্র চয়নের সময় ছোট কুমারী বলে, 'ও তুলসী, বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর চরণে তোমায় নিয়ে যাবার জন্য আমায় আশীর্বাদ কর!' তারপর একটু থেমে তবেই সে পাতা তোলা শুরু করে।

তাহলে ইউরোপের কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষাগুলি যেন একটি ব্রতের পালা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা রূপায়িত করা হয়েছে শিশুর মনকে বিজ্ঞানের জ্ঞানে নিবেশ করার জন্ত। ভারতের ধর্মীয় ব্রতের মতো প্রথমত এগুলি বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে সম্পর্কিত। এই বিষয়গুলির পরিচিতি গল্পের দ্বারা করা হয়। পাঠক্রম বা খেলা —বা ব্রতও বলা যেতে পারে—মধ্যে দিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ বার বার করা হয়। আর সব শেষে, উচ্চতর পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমের মধ্যে ফলশ্রুতি হচ্ছে ক্রীড়া, যা সংগঠিত হয়েছে শিশুদের দ্বারা গীত সুরারোপিত গান দ্বারা, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা। অতএব এই চারটি অংশ—কাহিনী, বিষয়, কর্ম ও ফলস্বরূপ ক্রীড়া—সৃষ্টি করে শিশু-উদ্যানের বিশিষ্ট ব্যায়াম। এইগুলির সাহায্যে শিক্ষাথার মনকে নিয়ে যাওয়া হয় এক সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে, যার উপর পরবর্তীকালে আরও উচ্চতর পরম্পরা গঠন করা যেতে পারে। এই চারটি উপাদান শিশু-জগৎকে সমগ্রভাবে ও আংশিকভাবে সৃষ্টি করে। আর শিশু-শিক্ষার সমস্যা হচ্ছে এই বিশিষ্ট ব্রতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা যায় স্থান, কাল, গুণ, রূপ, কারণ ও অন্যান্য সব কিছু সম্পর্কে সুনির্দেশিত চেতনা।

এই ধরনের শিক্ষার ভিত্তি করা হয়েছে শিশুর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উপর, যেমন শিশুদের খেলায় দেখানো হয়েছে।

আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা ধর্মের ব্যাপারে কখনও ভুল করতেন না, খেলার মধ্যে দিয়ে এর প্রকাশটাকে বুঝতেন, আত্মা ও অনুভূতির ভিত্তি হিসাবে তার যথেষ্ট ব্যবহার করতেন। ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্ ও পর্যবেক্ষক—পেস্তালোজি, ফ্রোবেল ও কুক—অনুমান করেছিলেন যে জগতের সাধারণ জ্ঞানই মানুষকে গঠন করে এবং একই ক্ষেত্রে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন—শিশুদের ক্রীড়ায়—তার থেকে খুঁজে বের করার জন্ত কীভাবে শিশুকে দিয়ে এই জ্ঞান সংগ্রহ করানো যায় এবং জগতের কর্তৃত্বলাভ করানো যায়। যখন আমরা দু ধরনেরই শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করব এবং এ সম্পর্কে যা জানার তা সবই জানতে পারব, তখন হয়তো এই সত্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে—প্রাচ্য সর্বদা চেষ্টা করছে শিশুর অন্তর্জগতের উন্নয়ন আর পাশ্চাত্য তার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চাইছে, যার দ্বারা সে বহির্জগৎকে বশে আনতে পারে। এটি সেই মহান সত্যের আর একটি দৃষ্টান্ত যে, এই সভ্যতা দুটি শেষ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী হওয়ার পরিবর্তে বরং পরস্পরের পরিপূরক। লোকে আশা করতে পারে যে, ভারতের জন্ত সাধারণ শিক্ষার সমস্যা যখন সমাধান করা হয়ে যাবে, কেউ হয়তো আবির্ভাব হবেন জগতের জন্ত চিরস্থায়ী করতে ভারতের ব্রতগুলির বিজ্ঞান।

সকল জন্তর শিশুরা খেলা করে এবং সেটা আমাদের কাছে প্রায়ই বোধ হতে পারে উদ্দেশ্যহীন অসংলগ্ন, কিন্তু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে আমরা সাধারণত দেখব যে শৈশবের লাফালাফি ও দাপাদাপি একাধারে অতীতের নাট্যকরণ ও ভবিষ্যতের আভাস। বিড়ালছানাদের খেলা হচ্ছে শিকারের নাটক। ছানারা তাদের পূর্বপুরুষ যে পাথুরে পাহাড়ে ঘুরত তার স্মৃতির জাগরণ করে। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিহীন এই শক্তি ব্যয় হচ্ছে স্বাস্থ্য ও বলের প্রাচুর্য। উপবাসীর খেলার শক্তি থাকে না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে

লাভজনক না হলেও খেলা সর্বদা শিক্ষণীয়। বাঘেরছানা বা কুকুরছানা তার ভবিষ্যতের কর্ম শিক্ষা করছে ওই অযৌক্তিক অঙ্গ-সঞ্চালন বার বার পুনরাবৃত্তি করে সেই সময় যখন সে খাদ্যের জন্য পিতামাতার উপর নির্ভরশীল। পক্ষীশাবকরা খেলার দ্বারাই নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে ভবিষ্যতে ওড়া বা সাঁতার কাটা বা মাটি আঁচড়ানোর জন্য। সেই রকম মানবশিশুও তার জীবনের শুরু থেকে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গ-সঞ্চালন দ্বারা। মাতা জানেন কতগুলি আংশিক প্রচেষ্টা দ্বারা শিশু শেখে বিছানায় উপুড় হতে, হামা দিতে, হাঁটতে, কথা বলতে। আর এইসব স্বেচ্ছাকৃত শক্তির সঙ্গে বারংবার প্রচেষ্টাকেই আমরা বলি খেলা। কিন্তু এগুলিই ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে নিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্বের পরম্পর সন্নিবদ্ধ কর্মের দিকে।

যখন শিশু হাঁটতে ও কথা বলতে পারে তার মাতা তাকে কম নিবিষ্টতার সঙ্গে লক্ষ্য করেন। তবু আগের মতো প্রাণশক্তির সঙ্গে পুরোনো প্রক্রিয়াই চলে, কিন্তু মানসিকতার উচ্চমার্গী স্তরে, সৃজনরত, ধ্বংসরত, একাকী সানন্দে ক্রীড়ারত, দলবদ্ধভাবে ক্রীড়াশীল; খননরত, গ্রহণরত, মাটির পুতুল নির্মাণরত, কাদা-বালি-জল ঘাটছে, পোকামাকড়-মাছ-পাখি ধরছে, বল ছুঁড়ছে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, লাঠি ঘোরাচ্ছে, গুলি খেলছে, পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে, পায়রা পুষছে, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে—এইসব বিভিন্ন কর্মের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, বরং রয়েছে বয়স অনুযায়ী মানসিক উন্নতির সঙ্গে মিল রেখে এক সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের কার্য পরম্পরা। সারা জগৎকে শিশুর বিদ্যাগৃহে পরিণত করার এই হচ্ছে প্রকৃতির পথ, সে এইভাবে ভাবী রাজার হাতে রাজদণ্ড তুলে দেয়। প্রকৃতি ভুল করে না। এই সহৃদয় নিয়মে সকল কারণই সৃষ্টি করে সকল কার্যকে। বালকের আগ্রহ কখনও কমে না। স্বাস্থ্যজনক পরিপাকের পূর্বে যেমন ক্ষুধা, তেমনি এই সকল শিক্ষার সঙ্গে থাকে আনন্দ। মনোযোগ ঘনীভূত হয়, সমগ্র সত্তা অভিনিবিষ্ট হয়।

যাহোক, এর সমস্ত সমগ্রভাবে প্রস্তর যুগের একটি মানুষের বেশি কিছু তৈরি করতে পারে না—এক বড় গোষ্ঠীর নেতা, নেতারূপে সকলে ভালবাসে, শিকারে শক্তিমান, প্রত্যুৎপন্নমতি, সাহসী, সৌন্দর্যপ্রেমিক ও সঙ্গীতানুরাগী—এই সমস্ত প্রকৃতির শিক্ষা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এর বেশি কিছু আর দেখতে পাওয়া শক্ত। বাকিটুকু হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের কাজ, আর সেই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার মধ্যে দিয়ে যাকে আমরা বলি শিক্ষা। এমন কি প্রস্তর-যুগেও এই উচ্চতর উপাদান কর্মরত ছিল, নইলে আমরা কেউই সেই যুগের বাইরে আসতে পারতাম না। এমনকী প্রস্তর-যুগেও মানুষের স্বপ্ন ছিল আর মেয়ে মানুষের ছিল বীর-গাথা। আগুনের চুল্লীর ধারে বুড়োরা ছেলেদের মধ্যে বসে থাকত যেন জ্ঞানের এক রহস্যময়-রূপ। মানুষের জন্য সব সময় কল্পনার প্রতীকের, ভালবাসার ও আশার এক অতি-জগৎ ছিল। সভ্যতা যতই জটিল হয়ে উঠেছে, এই অতি-জগৎ ততই হয়ে উঠছে নির্দিষ্টভাবে এক বাসনার বস্তু এবং প্রতি পৃথক মানব-সত্তায় জিজ্ঞাসা ক্রমবর্ধমানরূপে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করছে। শুধু এই জিজ্ঞাসার পূর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে মানুষের যথার্থ আশা জড়িত থাকতে পারে, কারণ কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তার পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে মানুষকে জন্ম

ও উত্তরাধিকার থেকে মুক্ত করা যেতে পারে এবং সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার কিছু সুযোগ পেতে পারে। প্রতিটি ধর্মই তার নিজস্ব দীক্ষার পরিকল্পনা বহন করে এবং মানব-সমাজের জন্য নিজস্ব আশা ও কল্পনা কোন না কোনরকমভাবে প্রকাশ করে। আর বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করে—যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ-জ্ঞান সত্য সৃষ্টি করে এবং পুরাকালের শাস্ত্রগুলি যেমন তাকে পবিত্র জ্ঞান করত, তেমনি পবিত্র জ্ঞান করে—আমাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ মাত্রানুযায়ী আমাদের বাধ্য করে শিক্ষার সেই তত্ত্ব নির্দিষ্ট করতে যার দ্বারা মানবগোষ্ঠীকে মানব-সমাজের সম্পূর্ণ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ বা শক্তিমান করতে।

'প্রকৃতিকে মান্য করার দ্বারাই তাকে জয় করা যায়,'—বলেছেন বেকন ও পেস্তালোজি, মহান শিক্ষক যিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন ফরাসী-বিপ্লব দ্বারা তার মানসিক অধিকারের চিন্তাগুলির সঙ্গে—এটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছিল যে শিক্ষার বিজ্ঞান মনের নিয়মগুলি অবিরাম ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণের দ্বারাই শুধু সৃষ্টি করা যায়। পেস্তালোজি বার বার আধুনিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন এই বলে যে 'Psychologizing of education.' এই সাইকোলাইজিংয়ে তিনি দুটি বড় আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথমে এল সেই নিয়মটি যে বিমূর্ত চিন্তা মূর্ত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দ্বিতীয়টি ছিল সামান্যীকরণ, যে শিশু তার উন্নয়নকালে জাতিকে অনুসরণ করে। দুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা কেউ জানে না। প্রথমত সমস্ত জ্ঞান শুরু হয় মূর্ত থেকে, যাকে বলা যায় ইন্দ্রিয় থেকে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে মনে। ইন্দ্রিয়কে অবজ্ঞা করে বা দমিত করে আমরা কখনও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি না। নিয়ন্ত্রণ করে,—নিশ্চয়ই। নিয়ন্ত্রণের পূর্বে উন্নয়নকে ধরে নিতে হয় আর শিক্ষণ হচ্ছে এরই একটা বড় গোছের শুধু নাম। কিন্তু সর্বদাই মূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বিমূর্ত চিন্তার শক্তিতে—এই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার মহান বেদবাক্য। এটি আরও হচ্ছে সেই সত্য, যা উপাসনায় মূর্তি ও সামাজিক সংস্কৃতিতে ব্রত ব্যবহারের পিছনে রয়েছে।

এইভাবে পেস্তালোজি নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে তাঁর শিষ্য ফ্রোবেল কিণ্ডারগার্টেন উদ্ভাবন করেছিলেন। বহু বৎসর ধরে তিনি শিশুদের ক্রীড়া লক্ষ্য করেন এবং তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেন; একটির সঙ্গে অপরটিকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি তাঁর 'দান' নামে খেলনা-সংগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন, কিছু সংখ্যক বস্তুকে চিহ্নিত করলেন, যেমন সুতো, লাঠি, বালি, খড়ি, কাগজ ও অন্যান্য এবং নথিভুক্ত করে গেলেন বিস্ময়কর একরাশ খেলা ও পর্যবেক্ষণ। এইসব বস্তুগুলি নিয়েই সংগঠিত হয়েছে যা কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থা বলে পরিচিত। এ হচ্ছে এক ব্যবস্থা যাতে সকল জ্ঞানকে অনুমান করা হয়েছে মূর্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবস্থিত এবং সকল কর্মই শিশুর কাছে যেন 'খেলা' বলে বোধ হয়। 'দান' সংগঠিত হয়েছে বল, গৃহনির্মাণের বস্তু ও টালি নিয়ে নক্সা রচনার জন্য। কর্ম—যেমন লাঠি রাখা, মাদুর বোনা, কাগজ মোড়া, রঙ দিয়ে আঁকা ও এই ধরনের সব—হচ্ছে চিরন্তন আগ্রহের বস্তু, প্রকৃতপক্ষে মানব-সমাজের আদিম কাজের উপর ভিত্তি করা। আর যে

খেলাগুলি পাঠের সহজ অংশরূপে অনুষ্ঠিত হয় না, তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে যন্ত্রপাতি বা প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণকে কর্ম-সঙ্গীত (action songs) রূপে পরিবর্তন করা হয়েছে। পায়রার ওড়া, মাছ ধরা, নৌকা চালানো, কৃষকের কাজ—এই সকল বিষয় খেলার মধ্যে দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা প্রায়ই খুব উদ্দীপনাময়।

প্রতিটি ক্ষেত্রে এইসবের শিক্ষণীয় মূল্য বেশির ভাগ নির্ভর করে যে শিক্ষক এগুলি প্রয়োগ করছেন তাঁর বিশেষ গুণগুলির উপর। ফ্রোবেলের ব্যবস্থাপিত কিণ্ডারগার্টেন বোধহয় খুব জটিল চিন্তাধারা, একটু বেশি সূক্ষ্ম, যাকে লোকে বলতে পারে একবারে খুব বেশি 'জার্মান'। এটি সহজেই যান্ত্রিক হয়ে পড়তে পারে, এক ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা হয়ে পড়তে পারে লক্ষ্যের দিকে এক উপায়ের বদলে। মূল সত্য ও লক্ষ্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাতে পৌঁছোতে কিছু নির্দিষ্ট স্বাধীনতা ও উদারতা হচ্ছে শিশু-উত্থানরক্ষকের কাছে ফ্রোবেলের ব্যবস্থার জ্ঞান ও দ্রব্যাদির পূর্ণ সরবরাহের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রোবেলের কোন দুটি স্কুল একবারে একরকম নয়। তাদের মধ্যে প্রভেদ হবে পদ্ধতির খুঁটিনাটি নিয়ে শুধু নয়, শিক্ষার কাজের প্রধান ধারণা নিয়েও। তাদের মধ্যে পার্থক্য আরও হবে কী পরিমাণ তারা উপাদানগুলি ব্যবহার করবে তাই নিয়ে,—১৮৬৫ সালের পর থেকে ফ্রোবেল যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং যে কাঠামো নিজে নির্মাণ করেছিলেন, তাতে কুক ও অন্যান্যরা যা সংযোগ করেছেন। যদি একই দেশের মধ্যে একটি গ্রামে একই নীতির বিভিন্ন প্রয়োগের পার্থক্য এত প্রকট হয়ে ওঠে, তাতেই বোঝা যায় যে ইউরোপে কিণ্ডার-গার্টেন ও ভারতে কিণ্ডারগার্টেন দুটি পৃথক বস্তু হয়ে উঠবেই। আর ভারতীয় শিক্ষাদাতারা ছাড়া অন্য কেউ ভারতীয় কিণ্ডারগার্টেন সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ ব্যবস্থাটি অবশ্যই ভারতীয় জীবনের এক স্ফুরণ হবে, শিক্ষার যে নীতিগুলি মানুষের পক্ষে সর্বজনীন সত্য তাকে রূপ দেবে। মিস্টার চিচগার নামে বোম্বের একজন শিক্ষাদাতা গত পঞ্চাশ বছর ধরে কিণ্ডারগার্টেনকে ভারতীয়করণের চেষ্টা করেছেন এবং কয়েকটি দিকে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর নিজের মুখমণ্ডল ও দেহের আকার একেবারে শিক্ষাদাতার জীবন্তরূপ, শিক্ষাদর্শনের স্রষ্টাস্বরূপ তিনি। তাঁর চেহারায় ফ্রোবেলের ছবিগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, একাধারে পুরুষ ও মাতার সংমিশ্রণ, উভয়েই শ্রদ্ধেয়। ছেলেদের কোলে টেনে নেবার আকর্ষণী শক্তি তাঁর ডাইনীর মতো আর আদর্শের জন্যই তাঁর জীবন ধারণ। নিঃসন্দেহে মিস্টার চিচগার ভবিষ্যতের ভারতীয় কিণ্ডারগার্টেনে মহামূল্যবান প্রচুর উপাদান দান করেছেন। তিনি সংখ্যা ও পরিমাণের শিক্ষা সাফল্যের সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই হয়তো প্রথম ব্যক্তি হবেন, যিনি নির্দেশ করবেন কিণ্ডারগার্টেনকে সামান্যীকরণ করার কাজে আরও উন্নতির দরকার এবং শিক্ষাকে নিখুঁত করার আগে ভারতের প্রতি জাতির সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমরা জানি যে ফ্রোবেলের স্কুল খুবই ব্যয়বহুল। ব্যবসায়ী-লোকদের হাতে তাঁর আদর্শ শোষণের পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং শেষপর্যন্ত বোধ হবে নানা ধরনের বিরাট

ব্যয় ব্যতীত কেউই কয়েকটি শিশুকে শিক্ষা দিতে পারবে না। অথচ এটাই হচ্ছে ফ্রোবেলের আদর্শের একেবারে বিপরীত। তিনি নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষার উপাদানগুলি হবে মূল্যহীন ফেলে দেওয়া বস্তু, যেমন ভাঙা পাত্র ও লাঠি, যেসব নিয়ে ছেলেরা সাধারণত নিজে নিজেরাই খেলা করে। এক নির্দিষ্ট খেলনা বা কর্মের ভারতীয়করণের খুব ভাল পরীক্ষা হবে ওই ধরনের কোন বস্তু খুঁজে বের করার উপর, যা হবে ব্যয়বিহীন শিক্ষা-সামগ্রী। উদাহরণস্বরূপ ফ্রোবেল শিশুকে প্রথম যে 'দান'টি প্রদান করেন তা হচ্ছে উজ্জ্বল বর্ণের এক নরম বল। স্পষ্টত এর জায়গায় আমরা নিতে পারি ভারতীয় সাধারণ ন্যাকড়ার বল এবং সেটিকে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কমলা ও বেগুনী রঙের তুলোয় আবৃত করতে পারি। এরই বদল হিসাবে আমরা দিতে পারি প্রয়োজনীয় রঙের ফল বা ফুল, বৃন্তের উপর নৃত্যশীল। শিশু ও তার মাতা কিংবা শিশুরা ও তাদের শিক্ষক এগু'ল নিয়ে শুধু খেলা করুক। এটা সত্যি যে এ ধরনের বল মাটিতে পড়ে লাফাবে না, কিন্তু এই পার্থক্যটুকু ছাড়া, সেটি খেলার সব উদ্দেশ্যই পূরণ করবে এবং তাদের সাহায্যে শিশু ভাষা শিক্ষা করবে ও সঙ্গীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শিখবে। সামরিক সুনির্দিষ্টতা ও একত্বের প্রাথমিক বিষয়গুলি 'বল-ড্রিল' বা বল খেলা দ্বারা শিশুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। আধুনিক স্কুলের ক্লাসের শিক্ষা হচ্ছে তার বিশিষ্ট অঙ্গ, মধ্যযুগীয় উন্মুক্ত স্কুলের একত্রে স্বর করে পড়া ও ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়নের বিপরীত হচ্ছে সেটি। আর ক্লাসের শিক্ষার সূচনা হয় এক সঙ্কেতে কয়েকজনের সমবেতভাবে সাড়া দেওয়ায়, যেমন ফ্রোবেলের বলের ব্যাপারে হয়।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় হচ্ছে যে শিশুর প্রতিটি ধারণাকে অনুসরণ করে উপযুক্ত শব্দ। প্রথমে বস্তু বা কর্ম, পরে নাম বা শব্দ। আমরা হাত দিয়ে ন্যাকড়ার বলটি অনুভব করি এবং উচ্চারণ করি এটি নরম। আর প্রতিটি শব্দের বিপরীত শব্দ আছে। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন, 'নরম নয় এমন কোন বস্তু আমায় দেখাও', আর শিশুরা পাথর বা কাঠ বা অন্য কিছুতে আঘাত করে উচ্চারণ করে এটা শক্ত। অন্য বিপরীত বস্তু খুঁজে বের করা হয় এবং 'নরম, শক্ত' উপলব্ধি ও আবৃত্তি বার বার করা হয়। জানার পরে আসে ভাবা এবং প্রতিটি ধারণার বিপরীতটিকেও তার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। বল ছুড়ে দেওয়া হয় 'উপরে', তারপর 'নিচে'। বাঁ হাত ও ডান হাত একটি পাঠের মধ্যে শেখা হয়। এইভাবে শিশুর পক্ষে সহজ হয় উপযুক্ত শব্দ শেখা। আমরা নিয়মে পৌঁছেছি—বস্তুকে অনুসরণ করে তার নাম, কর্মকে শব্দ।

ফ্রোবেল নির্মাণ-কর্মের জন্য নানা ধরনের ইট বোঝাই একগাদা বাক্স দেন। এই বাক্সগুলি আকারে ঘনক। প্রথমটি আটটি ছোট ঘনকে বিভক্ত। দ্বিতীয়টি বিভক্ত আটটি সমান মাপের ও আকারের ইটের মতো খণ্ডে; তৃতীয়টি গঠিত হয়েছে সাতাশটি ঘনকে, তার কয়েকটি বিভক্ত হয়েছে কর্ণ অনুযায়ী অর্ধ ও এক-চতুর্থাংশ ত্রিভুজে এবং চতুর্থটি গঠিত হয়েছে ইটের মতো আকারের ঘনক দ্বারা, একইভাবে বিভক্ত। এই চারটি দান, বিশেষ করে এদের মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে কিণ্ডারগার্টেনের

মেরুদণ্ড। এগুলির থেকে শিশু শেখে সংখ্যা, জ্যামিতি ও বিভাজনের পরিমাপ। সে ইতিহাসের গল্প শোনে এবং তাই দিয়ে গল্পের চরিত্র সৃষ্টি করে। সেগুলি হচ্ছে শিকারের ঘোড়া, যুদ্ধের সৈন্য, ভূগোলের প্রাসাদ ও পর্বত : নৌকা, কুয়া, বৃক্ষ, শহর, পৃথিবী—সব কিছুই পালাক্রমে ও স্বল্পকালের জন্য। তাদের আকার যেমন স্থির ও দৃঢ়, শিশুর কল্পনায় তারা তেমনি চরম নমনীয়, একাধারে তার সম্পদ ও সঙ্গী। কিন্তু সেগুলি কাঠের তৈরি এবং ব্যয়বহুল। অতএব ভারতীয় কিণ্ডারগার্টেনের জন্য সেগুলি চিন্তার বাইরে, যদি না গ্রামের কুম্ভকার মাটি দিয়ে সেগুলি তৈরি করে দেয় এবং এখনও পর্যন্ত প্রায়ই চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি একবারও এগুলি করাতে সক্ষম হইনি। এই নির্মাণ-কর্মের 'দানগুলির' স্থান গ্রহণকারী বস্তু আমার মনে হয় ভারতীয় কিণ্ডারগার্টেনের চরম প্রয়োজনগুলির অন্যতম। যা হোক, মনের এই বিচলিতভাব নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে আমি দেখেছিলাম যে, তত্ত্ববিদ্‌রা কিণ্ডারগার্টেনে নির্মাণ-দানগুলি একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করেন না। এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রফেসার জন ডিউয়ী বাস্তবিক ওইগুলি একেবারে পরিত্যাগ করেছেন এবং তার জায়গায় বড় বড় কাঠের খণ্ড তৈরি করে নিয়েছেন, মেঝেতে ছেলেদের ওইগুলি নিয়ে স্বাধীনভাবে খেলতে দেন ট্রেন ও ইঞ্জিন ও অন্যান্য সব মনে করে নিয়ে যেমন স্কুলের বাইরের ছেলেরা সাধারণভাবে খেলা করে। যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই পরিবর্তনের পিছনে তাঁর যুক্তির কথা, তখন তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, 'এই দানগুলি থেকে শিশু সেটা পায় না, যেটা আমরা কল্পনা করে নিই যে সে পাচ্ছে।' আর একজন বড় ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বিশেষ নির্মাণ-দানগুলি একমাত্র উপায় নয়, যার দ্বারা শিশুকে শেখানো যায় সঠিক চিন্তা করতে, গণনা করতে, ভাগ করতে ও সাজিয়ে রাখতে। তাই আমি ভেবেছি আমরা কি পারি না শুকনো বাদাম ও বীজের ছোট মালা তৈরি করতে—প্রথম নির্মাণ-দানের জন্য আটটি এবং তৃতীয়টির জন্য সাতাশটি—আর সেগুলিকে ইট দিয়ে যেমন সংখ্যার ধারণা তৈরি করা হয় তেমন ভাবে ব্যবহার করতে। এই ধরনের পরিবর্তনে আমরা অবশ্য আকারের সংজ্ঞা পাই না এবং সেগুলি এদিক-ওদিক করার স্বাধীনতা পাই না, যেমন ফ্রোবেলের পরিকল্পিত খেলনায় পাওয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা পোড়ামাটি দিয়ে তার নকল করতে পারছি, ততক্ষণ শেষের এই দানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে পাওয়া যাবে বলে ভাবা চলে না।

২

ফ্রোবেলের স্কুলে শিশুর সমস্ত সময়টুকু বল ও ঘনক নিয়ে খেলায় কাটে না। সেখানে সবসময়ই তাকে সেই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার সমস্যা আছে, যা তার জানা উচিত ভবিষ্যতের প্রয়োজনে, অথচ তার আনন্দের ভাব বা মূর্ত-বস্তু ব্যবহারের অভ্যাস বিনষ্ট না করে। শারীরিক ব্যায়াম তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নটিও আছে। তাছাড়াও শিশুর ও আদিম মানবের নির্মাণ করা ও সৃষ্টি করার প্রয়োজনটিও আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম প্রয়োজনটি দাবি করে যে, পড়া-লেখা ও ওই ধরনের যাবতীয় কর্ম হওয়া উচিত ফ্রোবেলীয় এবং স্কুলের রুটিনে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিশেষভাবে খেলাধুলায় ও গানে। তৃতীয়টি হচ্ছে নিযুক্তকরণের স্তরে—যাতে মাটি, সুতো, কাগজ বা ওই ধরনের কিছু বস্তু শিশুকে দেওয়া হয় এবং তাই দিয়ে তাকে কিছু করতে শেখানো হয়। শুধু যারা এ নিয়ে চেষ্টা করেছে, তারাই জানে শিশুদের প্রদর্শিত বিস্ময়কর সৃজনক্ষমতা মডেলিংয়ের কাজে, সহজ ধরনের বোনার কাজে, রঙীন খড়ি দিয়ে নক্সা তৈরির কাজে ও ওই ধরনের সব বিষয়ে। আর অন্যদিকে আমাদের মধ্যে খুব অল্পেরই কোন ধারণা আছে, যে বস্তুগুলি তারা করেছে তার দ্বারা বুদ্ধির যে যুগান্তর তাদের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে সেই সম্পর্কে। আমি জানি খুব বিশিষ্ট ব্যক্তি সেদিন বললেন এক বিরাট সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কে, যা তিনি বাড়ির পিছনের ছোট বাগানে ন বছর বয়সে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং নির্মাণও করেছিলেন। পথের তলা দিয়ে নালা কেটে জল নিয়ে যাবার জন্য তিনি যে কালভার্টগুলি সাজিয়েছিলেন তার আনন্দ এই মধ্য বয়সেও তাঁকে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

ফ্রোবেল চেয়েছিলেন এই নিযুক্তিকরণকে জাতির আদিম-বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতে। পেস্তালোজির শিষ্য ভুলতে পারেননি যে, মানব-সভ্যতার ঐতিহাসিক কালগুলি দ্রুত পার হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতি মানুষ সাবালক হয়ে উঠবে। আর এই সত্যই নিশ্চয় শিশুদের এত উৎসাহিত করে এই নিযুক্ত থাকার কাজে। বুনন কার্য যখন এমন সহজ করে দেওয়া হয় যাতে ছোট শিশুরা তা অভ্যাস করতে পারে, তখন শিশুরা একবারে আনন্দে চেঁচামেচি করে সেই কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। ফ্রোবেল: তাদের দিতেন রঙীন কাগজের ফালি, নানা প্যাটার্নের কাগজের ফ্রেম বা মাদুররূপে বোনা। সরু বাঁশের সহজ ফ্রেমে রঙীন সুতোয় বোনার কাজও চলতে পারে, বাজারে যেমন খেলনার চারপাই বিক্রয় হয় তেমন ধরনের। কিংবা সুতো বা কাগজের বদলে রঙীন ন্যাকড়ার ফালিও ব্যবহার করা চলতে পারে। কিংবা বাঁশের কঞ্চিতে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে ওই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিশুদের আনন্দ ও এই প্যাটার্ন-রচনায় তাদের একাগ্রতা এর শিক্ষণীয় মূল্য যে যথেষ্ট তা দেখিয়ে দেবে, কারণ হারবার্ট স্পেনসারের ভাষায় একথা তো প্রায় বলা যায় না যে যেমন দৈহিক শক্তির তেমন মানসিক শক্তিরও ভালভাবে যাচাই হয় ক্ষুধা দিয়ে।

মাটি-কাদা-বালি এই বস্তুগুলির দ্বারা ছেলেরা নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে। আদিকালের মানুষ এইগুলি দিয়েই নির্মাণ-কার্য শিখেছিল। শিশুদের, সবার উপরে ভারতীয় শিশুদের মডেলিং করার এক অদ্ভুত প্রতিভা আছে এবং সেটিকে প্রতিপালিত ও উৎসাহিত করা উচিত। দুটি ছেলেকে মাটির কলা তৈরি করতে দেওয়া হোক এবং তাদের করা কাজের তুলনা করে আমরা তখুনি দেখতে পাব কে বেশি জানে, কে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে, কে চিন্তায় বেশি দূর অগ্রসর হয়েছে। এর থেকে আমরা তাড়াতাড়ি দেখতে শিখব মডেলিংয়ের শিক্ষাগত মূল্য এবং বুদ্ধির শক্তি, যা সকল শিল্পের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করে।

ফ্রোবেলের প্রতিভাকে আর কোথাও এমন বেশি বিকশিত দেখা যায়নি, যেমন দেখা গেছে যখন তিনি কতকগুলি রঙীন কাগজ নিয়ে ছেলেদের তা ভাঁজ করতে শেখান—এই পদ্ধতির দ্বারা তিনি তাদের শুধু রেখা ও তল সম্পর্কে জ্যামিতির অসংখ্য বিষয় শেখান না, তাছাড়াও তাদের একরাশ কাগজের খেলনা তৈরি করতে উৎসাহিত করেন। সৌন্দর্যের এক নির্দিষ্ট-মাত্রার দিকে ছোটদের সকলের একত্রে কাজ করার আনন্দ তাদের সামনে যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে তাকে সাগ্রহে অনুসরণ করার। আর একমাত্র চেষ্টা দ্বারাই একজন বুঝতে সক্ষম হয় এই সহজ উপায়গুলি দ্বারা কতখানি শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা লাভ করা যায়। একজনের কোন কিছু গ্রহণ করার সমগ্র মানসিক ক্ষমতা ও উন্নয়ন নির্ধারণ করে তার সাফল্য এক চৌকোনা কাগজকে নিখুঁতভাবে আধা-আধি ভাঁজ করায় এবং টেবিলে তার উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করায়।

কল্পনাকে যে সুযোগ এগুলি প্রদান করে, তাই কাজের এই কাঁচামালগুলির প্রতি এমন গভীর ভালবাসা ছেলেদের মধ্যে সৃষ্টি করে। মেসিনে প্রস্তুত করা ও দোকানে বিক্রি করা কোন দামী পুতুল বা খেলনা ছেলেদের মধ্যে এমন আগ্রহ জাগাতে পারে না এবং তাদের মনোযোগ এমনভাবে নিবিষ্ট করে রাখতে পারে না। বস্তুগুলির স্থূলতাই হচ্ছে শিশুদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ তাতে মন অনেকখানি কল্পনা করার অবকাশ পায়। বস্তুগুলি আভাস দেয়, সম্পূর্ণতা আনে না। প্রার্থনাকারী উপাসকের মতো ক্রীড়ারত শিশুরাও আদর্শের শুধু আভাস চায়, তার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নয়। কল্পনার ক্রিয়া হচ্ছে এমন কিছু, যাতে আমাদের শিশুদের সর্বদাই আমন্ত্রণ জানাতে হবে, যদি না সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন সে প্রথম বলটি পায়, তখন এটাই তাকে দিয়ে ঘোষণা করায় যে বলটি হচ্ছে পাখির মতো, মাছের মতো, বিড়ালছানার মতো এবং কল্পনার এই প্রথম কার্যগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে, তা কখনও দমন করা নয়।

রেলপথ থেকে বহুদূরে অবস্থিত কোন গ্রাম তার কুমোর, তাঁতি, কাঁসারী, স্যাকরা প্রভৃতি নিয়ে, তার চরকা-কাটায় নিযুক্ত মেয়েদের নিয়ে, পশু-পরিচর্যারত গোয়ালাদের নিয়ে আদিম সমাজ ব্যবস্থার এক সম্পূর্ণ চিত্র। মানুষের সকল প্রাচীন জীবিকা ও প্রাচীন যন্ত্রপাতি সেখানে রয়েছে। কুমোরের চাক, তাঁতির তাঁত, চরকা, লাঙল, সেইসব জাতির চিরন্তন খেলনা। খেলার জন্য রাস্তায় শিশুকে ছেড়ে দিলে সে তার চারপাশের জীবনকে অনুকরণ করে নিজের জন্য এক আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন সহজেই সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামটিই হচ্ছে সত্যিকারের শিশু-উদ্যান। এই উক্তির মধ্যে বহু পরিমাণ সত্য আছে। ভারতের পক্ষে সেইজন্যই এটা সর্বদা সত্য হয়ে উঠেছে যে এই কারণেই মনীষীরা শহরের চেয়ে বরং গ্রামেই বেশি জন্মেছেন; আর আধুনিক শহরের চেয়ে মধ্যযুগীয় শহরেই বেশি। সেইসঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম হচ্ছে জীবিকার এক অসংলগ্ন স্তূপ, স্কুলের মতো সুসংগঠিত ও প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণ নয়। যন্ত্রপাতিগুলির নাটাকরণ করে এবং নিরস্বভাবে তার পুনরাবৃত্তি করে শিশু নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে, তাদের শ্রমে সত্যিকারের অংশগ্রহণ দ্বারা নয়। এই দুটির মধ্যে যদি দ্বিতীয়টি সত্য অভিজ্ঞতার ধারা হতো, তাহলে কোন ভৃত্য বা কর্মীর দাস-শিশু শিক্ষার ভাল সুযোগ পেত উচ্চশ্রেণীর ক্ষুদ্র মুক্ত মানুষটির চেয়ে, যে ইচ্ছা মত এদিক-ওদিক করে এবং শ্রমকে আত্ম-উন্নয়নের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, বেঁচে থাকার অধিকারের ছাড়পত্ররূপে নয়।

গ্রাম্য যন্ত্রপাতি খেলায় যে উদ্দীপনা দান করে বেশির ভাগ তারই জন্য সেগুলির উপস্থিতিতে শিশুদের আনন্দের কারণ ঘটে। আদর্শ কিণ্ডারগার্টেনের খেলা হওয়া উচিত কোন কাহিনী বা বর্ণনা থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক নাটক সৃষ্টিতে। সেটি হচ্ছে এক আদিম ধরনের নাটক যেমন কথক, জাতে একজন বা দুজন প্রধান অনুষ্ঠানকারীকে কোরাসের দ্বারা সমর্থন করা হয়। গানের সঙ্গে থাকে নাচের অঙ্গভঙ্গী হাতে-হাতে রচা এক বেষ্টনীর মধ্যে, হাতে-হাতে তালি ও লাফ-ঝাঁপ থাকে। বিষয়বস্তু নেওয়া যেতে পারে প্রকৃতি থেকে, যন্ত্রপাতির নড়াচড়া থেকে কিংবা পারিবারিক জীবন থেকে। কৃষকের বীজ বপন, অঙ্কুর রোপন বা শস্য কর্তনের কার্য, মাঠে জল-সেচনের কাজ, তাঁতে তাঁতীর কাজ, চরকায় মেয়েদের কাজ, কুমোর কাঁসারী স্যাকরার কাজ। পাখির দলের ওড়া, গোচারণ, নদীতীরে বসতকারীদের জীবন, শিশুর সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক—এই সমস্তই বেশ ভাল বিষয়বস্তু। মাদ্রাজে মিসেস ব্রাণ্ডার তামিল ভাষায় ছেলেদের ছড়া সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলি দিয়ে শিশু-উদ্যানের সহজ খেলা তৈরি করেছেন, যেগুলি আনন্দ-দান ও সুসংবদ্ধ ক্রিয়ার পক্ষে খুবই মূল্যবান। শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়ায় ও ছড়াগুলি সুর করে গায় এবং যা উপযুক্ত হতে পারে তেমন অঙ্গভঙ্গী করে থাকে। তারপর বোধহয় তারা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচে ও বার বার আবৃত্তি করে। এই ধরনের বিশুদ্ধ অঙ্গ-সঞ্চালনের খেলা কিণ্ডারগার্টেনের

তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। অতি পরিচিত বাংলা ছড়া 'তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই' এই একই ধরনের আভাস পেয়ে।

কিণ্ডারগার্টেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য বিষয়টি যাহোক আবিষ্কৃত হয় যেই আমরা এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানে দীক্ষিত করার সমস্যা নিয়ে চিন্তা শুরু করি। মূর্ত অভিজ্ঞতার ক্রমিকধারাকে বিনষ্ট না করে শিশুকে শিক্ষা করতে হবে লিখিত ভাষার ব্যবহার, গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ও নানা ধরনের বিজ্ঞান ও নক্সা। তার মনকে এইসব বিভিন্নশ্রেণীর বাস্তব সত্যের মধ্যে সংগ্রামের জন্য পরিচালিত করতে আমরা যে কোন বস্তু বা উপাদান স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারি, যা আমাদের খুশি করে বা যে কর্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে তাকে পরিষ্কার করে তুলতে সহায় করে। কিন্তু কিছু নীতি আমাদের অবশ্য পরিচালিত করবে। আমরা শিশুদের উপযুক্ত উপাদান অবশ্য প্রদান করব, অর্থাৎ তারা যেগুলি ব্যবহার করতে পারে এমন উপাদান। আর তার কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা তাকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব। আমি প্রায়ই ভাবি যে এক বাক্সভর্তি ছোট কার্ডবোর্ডের টুকরো, যাতে বর্ণমালার অক্ষরগুলি মুদ্রিত আছে। শিশুদের পড়তে শেখার পক্ষে বই পড়ানোর চেয়ে ভাল শিশুসুলভ পদ্ধতি হবে। শিক্ষা দ্রুততর ও বেশি আনন্দময় হয়ে উঠবে যদি ধাঁধার মতো অক্ষরগুলিকে খুঁজে বের করে সাজাতে শেখানো হয়। পড়ার আগে লেখা নিশ্চয়ই আসে, যেমন বিদেশী ভাষা বলার আগে তা সহজে বুঝতে পারার ব্যাপারটা আসে। শব্দ-গঠন—বিক্ষিপ্ত শব্দের বানান-বাক্য পাঠ করার আগে আসে। আর এইভাবেই চলে। সর্বদাই অনুভূতির কাছে আবেদন। সর্বদাই অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা। আর সর্বদাই আনন্দ, আরও বেশির জন্য ক্ষুধা।

অনেক লোক আশঙ্কা করেন যে যদি কাজকে সর্বদা আনন্দজনক করে তোলা হয়, তাহলে শিশুরা দুর্বল হয়ে যাবে, কঠিন ও অপ্রীতিকর কোন কিছু করতে অক্ষম হবে। সেইসব লোকের মন শিশু-উদ্যানের সমস্ত অর্থটাই ধরতে পারেনি। যে আনন্দ শিশুরা উপভোগ করে, তা হচ্ছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আনন্দ, শক্তির ও একাগ্রতার আনন্দ, কর্মের আনন্দ। এটি উচ্চস্তরের আনন্দ, উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দ নয়। কিণ্ডার-গার্টেনে ঠিক মতো শিক্ষিত শিশু অন্যদের চেয়ে ভালভাবে জানে কোন নতুন সমস্যায় কীভাবে নিজেকে নিযুক্ত করতে হয়, ভারী বোঝা কীভাবে বহন করতে হয়, সংবদ্ধ ঘটনা থেকে কীভাবে এক নিয়ম অনুমান করতে হয়। আর এই শক্তি উপার্জিত হয়েছে তার নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শিক্ষা দেওয়ার ফলে, তার উন্নতির নিয়মগুলির উপর লক্ষ্য রেখে, সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করার পরিবর্তে সেগুলিকে পরিবর্ধিত করার চেষ্টা করে, কতকগুলি বৃত্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কতকগুলিকে শাসিত করার পরিবর্তে সমগ্র শিশুর কার্যাবলী ও প্রচেষ্টাকে বিধিবদ্ধ করার দ্বারা।

অন্যভাবে বলা চলে যে, যদি কিণ্ডারগার্টেনের লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতিকে মেনে নিয়েই তাকে জয় করা হয়েছে।

ভারতে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে হাতের কাজ প্রশিক্ষণ

যদি হাতের কাজ প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত বিষয়টি ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য এক সম্পূর্ণ রূপরেখা আমাদের তৈরি করতে হয়, তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে শিক্ষার বিশিষ্ট ক্রমকে যে চারভাগে বিভক্ত করা হয় তার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ।

প্রাথমিক বা মাতৃভাষামূলক বা গ্রাম-শিক্ষাকে আমরা বিবেচনা করব চূড়ান্ত শিক্ষার এক প্রয়োজনীয় অংশরূপে এবং উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় বালকের পক্ষে আট বৎসর বা বড় জোর দশ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত স্থায়ী। এই সময়ের মধ্যে একমাত্র যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তা হচ্ছে মাতৃভাষা ; শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে তথ্য প্রদানের চেয়ে অশেষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিশু চিন্তা করতে ও আবিষ্কার করতে শিখবে এবং নিজের জন্য সৃষ্টি করতেও শিখবে, মনের ও দেহের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মূল্য শৃঙ্খলার চেয়ে অনেক বেশি এবং যদি কোন এক নির্দিষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হয় বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীয়ভাবে, তবে সেটি নিশ্চয়ই হবে কিণ্ডারগার্টেন। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি বালকের জীবনের আট থেকে বারো বছর বা দশ থেকে চোদ্দ বছর কিংবা তার কাছাকাছি কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা চলতে পরে। এই বছরগুলির মধ্যে বালকটি সম্ভবত ইংরাজি শিক্ষা শুরু করে এবং ইতিপূর্বে সে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছে, প্রথাগতভাবে যে উপদেশ নিজের ভাষায় পেয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি ইংরাজি ভাষায় করে। যাহোক, এটি আশা করা চলে যে বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও সংহতির জন্য তার শিক্ষার বেশির ভাগ পরিমাণ মাতৃভাষাতেই চলতে থাকে, এই বয়সের বালকের পক্ষে একমাত্র সেটিই সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

বারো বা চোদ্দ বছরে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, বালকটি তাতে প্রবেশ করবে, আমরা যাকে বলতে পারি তার 'হাইস্কুল কোর্স'। বর্তমানকালে ভারতবর্ষে এটি সম্ভবত সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষাতেই প্রচলিত এবং এই ঘটনাকে আমরা নিন্দা করলেও এর প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ কোন ভারতীয় ভাষাই সারা দেশের সঙ্গে এক ব্যক্তির সংযোগ স্থাপনের স্বাধীনতা দেয় না, আর এই পরীক্ষায় হিন্দুস্থানী বা উর্দু কিছুটা সন্তোষজনক হলেও ইংরাজি তবুও অনেক সুবিধাজনক, এটি শুধু ভারতেই ভাষাগত অধিকার অর্পণ করে না, সারা পৃথিবী জুড়েই সেই সুবিধাটুকু দেয়, আর তাছাড়া এটি একটি আধুনিক ভাষা, যার দ্বারা সঠিক চিন্তাটি প্রকাশ করা যায়, যা হচ্ছে বহু ভাষারই চাবিকাঠি, বর্তমানকালের প্রায় সকল সংস্কৃতিরই। হাইস্কুল স্তরের শিক্ষায় কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়, যা পরে আসবে। আর জীবনের কর্তব্য হয়তো এই বছরগুলির মধ্যেই নির্বাচন করা হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের বালকটি কিন্তু এখনও মানুষ হয়ে ওঠেনি। সে এখনও শিক্ষা গ্রহণ করছে। তার ভুলগুলি এখনও অপরাধ হয়ে ওঠেনি। ক্রমবর্ধমান দেহের জন্য সুষম খাদ্য ও শক্তিপ্রদ ব্যায়াম, আলো ও

বাতাস, প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ জল প্রভৃতির দাবিগুলি অন্যান্য সব প্রয়োজনের পূর্বে মেটানো উচিত, যদিও এগুলিকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় ক্রমশ বেড়ে ওঠা আত্ম-কর্তৃত্ব ও বুদ্ধির বিষয়জাত সূক্ষ্মতর ও পুরুষোচিত আনন্দ থেকে।

সর্বশেষে আসে কলেজ-জীবন, যা শুরু হয় ষোলো বা আঠারো থেকে এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী শেষ হয় বিশ বা বাইশ বছর বয়সে। একথা এখানে বললে বোধহয় ভাল হয় যে শিক্ষার ব্যাপারে সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নেই। এটা ভাবলে ভুল হবে যে বাইশ বছরে যে শিক্ষা শেষ হয় সেটি বিশ বছরে শেষ করতে পারলে সুবিধা লাভের আনন্দ উপভোগ করা যায়। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটে। দেহ ও মনের উভয়েরই বৃদ্ধির, উন্নতির প্রশ্নের পিছনে রয়েছে সংস্কৃতি এবং ঠিক যেমন আমরা কোন ব্যক্তিকে মানসিক পরিবর্তনের এক নির্দিষ্ট চক্রের মধ্যে দিয়ে নিজেদের খুশিমতো নির্ধারিত সময় অনুসারে 'দৌড়' করাতে পারি না, ঠিক তেমনি একই ধরনের প্রথা বুদ্ধির ক্ষেত্রেও আমরা করতে পারি না। ভালভাবে শিক্ষিত একজন ভারতীয়কে আমি দেখেছি নয় বছর বয়সে গ্রামের বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় কলেজ জীবন শেষ করতে। সময় সম্পর্কে আমরা যত উদার হতে পারব, ততই শিক্ষার ভাল ফল আমরা দেখাতে পারব এবং শিক্ষা-পদ্ধতির প্রশ্নটিও ভালভাবে বিবেচনার যোগ্য হয়ে উঠবে।

যাহোক, সাধারণ শিক্ষার অংশস্বরূপ হাতের কাজ প্রশিক্ষণ সমগ্রভাবে পরিকল্পনাটিকে সস্তা বা ছাঁটাইয়ের দিকে নিয়ে যায় না। যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এটিকে কীভাবে রূপ দেওয়া হচ্ছে এবং কতখানি সম্পূর্ণতার সঙ্গে এটি অভ্যাস করা হচ্ছে, সেই অনুযায়ীই এটি সর্বদা কম-বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। আর শিক্ষার জন্য যে সময় দরকার হয় তাতে এটি সর্বদা যুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এক ম্যানুয়েল ট্রেনিং হাই-স্কুলে মোট স্কুলের সময়ের অর্ধেক, অর্থাৎ যাকে বলা যায়, সপ্তাহে বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা ড্রইং ও ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের অন্যান্য কাজে দেওয়া হয়। এই বারো থেকে পনেরো ঘণ্টার মধ্যে আবার কম করে পাঁচ ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা আছে বিভিন্ন ধরনের অঙ্কনের জন্য, কোন কোন ক্ষেত্রে এর মধ্যে ক্লে-মডেলিং ও কাঠ-খোদাই—সমান পরিমাণে সময় দেওয়া হয় ছুতোর যেমন কাঠের কাজ করে তেমনি কাজে—এবং আরও একই পরিমাণে সময় দেওয়া হয় ধাতুর কাজে, অর্থাৎ কামারের কাজ, টিন মিস্ত্রির কাজ, ভাইসের কাজ ও যন্ত্র-নির্মাণ। সেণ্ট লুইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত যে ম্যানুয়েল ট্রেনিং হাইস্কুল আছে, সেখানে কাঠ ও ধাতুর একত্রিত কোর্সে সপ্তাহে আট ঘণ্টার বেশি সময় কখনও দেওয়া হয় না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফ্রি-হ্যাণ্ড, মেকানিক্যাল ও আর্কি-টেকচারাল ড্রইংকে একেবারে আলাদা বিষয় হিসাবে গণ্য করে আরও চার বা পাঁচ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

এখন এটা যেন বোঝা না হয় যে এই কোর্সগুলি আর্টসের সাধারণ ক্যারিকুলামের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে এই ভেবে যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কারখানার বা ব্যবসায় কাজ জোটে। নিঃসন্দেহে, যদি কোন বালক বিদ্যালয় ত্যাগের পরে কোন ধরনের

ব্যবসায়িক কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করতে চায়, তাহলে এই ঘটনায় তার সে ক্ষেত্রে প্রবেশ সহজ হয়ে যায়, কারণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে সে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে আছে এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধানের সাহায্য-কার্যে সে তার বুদ্ধির সমস্ত শক্তিকে আহ্বান করতে পারে। নিঃসন্দেহে এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু এই ধরনের লক্ষণের উপর হাতের কাজ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি নির্ভর করে না। সেইটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের স্নায়ু-ব্যবস্থার ওপর এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে দৈহিক ধ্যান-ধারণা পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্তজনিত সত্যগুলির ওপর। সম্পূর্ণ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটিকে স্কুল-কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ওকালতী করার অধিকার আমাদের আছে। যদি কারখানা ও গুদামঘরগুলির সুদক্ষ সংগঠক ও পরিচালক সরবরাহ করার হিসেবটাই একমাত্র করা হত, তাহলে এমন ধরনের শিক্ষার সীমিত সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব ব্যবসায়ীশ্রেণীর উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য সম্প্রদায় হয়তো জোর দিত। কিন্তু যাদের অভিজ্ঞতা তাদের বলার অধিকার দেয়, তারা সর্বক্ষেত্রেই বলবেন যে, অন্যান্য সব বিষয়ে সমান হলেও যে ছেলেটি হাতের কাজের প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সে, যে ছেলেটি এই প্রশিক্ষণ লাভ করেনি তার চেয়ে বুদ্ধির দিক দিয়ে সব ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। তার চিন্তার এক সজীবতা ও শক্তি আছে এই সত্যটির জন্য যে, সে জানে কী করে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং নিজে নিজে চিন্তা করতে অভ্যস্ত বলে। তার সাহস ও মৌলিকত্ব আছে। সবার ওপরে তার চরিত্রের ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নের সঙ্গে কর্ম, চিন্তার সঙ্গে কার্য, অনুমানের সঙ্গে প্রমাণ যোগ করার মূলগত অভ্যাসটির ওপর।

ইউনিভার্সিটি রেজিস্টারে বা সিলেবাসে আমেরিকান শিক্ষাদাতারা বার বার জোর দিয়েছেন এটির ওপর—হাতের কাজ প্রশিক্ষণের বিশুদ্ধ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য। সেণ্ট লুইয়ের বিশেষজ্ঞরা বলেন—'যদি শিক্ষার বিষয় হয় দক্ষ শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই,...ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলে সবকিছুই বালকের উপকারের জন্য, কর্মশালায় সে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, একমাত্র বস্তুটি যা বাজারে ছাড়া হবে, তা হচ্ছে সে। এমনকী হাতের কাজ শিক্ষাতেও প্রধান বস্তু হচ্ছে মানসিক উন্নতি ও সংস্কৃতি। হাতের কাজে দক্ষতা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক শক্তির প্রমাণ এবং এই মানসিক শক্তি, উপাদানগুলির জ্ঞান ও হস্ত-ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিঃসন্দেহে হয়ে দাঁড়ায় দৃঢ় বাস্তব বিচারবুদ্ধির একমাত্র ভিত্তি এবং বাস্তব শক্তিগুলির ও সমস্যাগুলির কর্তৃত্বকারী ও সক্রিয়জীবনের কর্তব্যগুলির জন্য একজনকে সর্বদা যথোপযুক্ত করে তোলে। অতএব প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক স্পষ্টতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লাভ করা।' এমন কি এক উকিলও ভাল উকিল হতে পারে, যদি তার হাতের কাজের প্রশিক্ষণ থাকে।

সেণ্ট লুইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় আরও নির্দেশ করে যে, আদর্শগতভাবে ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের এক নির্দিষ্ট চরিত্রের চেয়ে বরং সাধারণ চরিত্রের হওয়া উচিত, যদি এর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রয়োগের জন্য ব্যাপকতম ক্ষেত্র লাগে। 'সেইজন্য আমরা সমস্ত

যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ও হস্তশিল্পকলার ও মানুষের জীবিকা ও বৃত্তির বিশিষ্ট যন্ত্রপাতিগুলির বিমূর্তকরণ করে নিই এবং সেই ভাবে শিক্ষার এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করি। এইভাবে কোন বৃত্তিশিক্ষা না দিয়ে আমরা শিক্ষা দিই যন্ত্রবিস্তার মূল নীতিগুলি, যা হচ্ছে সব যন্ত্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত।' স্কুলে করানো কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে খুব অর্থপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। বৃত্তি হিসাবে অভ্যাস আর শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার এই দুটির মধ্যে খুব লক্ষ্যণীয় পার্থক্য আছে। দুটি যদি একই হতো, তাহলে হাতের কাজ শিক্ষণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো বালকটিকে কোন শ্রমজীবীর কর্মশালায় সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত করলে। কিন্তু এ দুটি এক নয়। কোন আসবাব তৈরি করতে শেখা কোনক্রমেই এক বস্তু নয়, যেমন কাঠ কাটা ও জোড়া-দেওয়া কাজের দ্বারা লাভ করা যায় সঠিকতা, উপযুক্ততা, কর্ম পরিচালন দক্ষতা। ছোট ঘড়ি বা বড় ঘড়ি তৈরি করতে শেখা কখনই এক বস্তু নয়, যেমন হচ্ছে চাকা, স্প্রিং ও পেণ্ডুলাম ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ও শৃঙ্খলা অর্জন এবং তত্ত্বগতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা—যাতে মন জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারে এক বস্তুর প্রতি অন্য বস্তুর দৈহিক প্রতিরোধে। আধুনিক শিল্পের শিক্ষণীয় মূল্য একমাত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে সেই শিল্পের সামান্যীকরণ থেকে, শিক্ষার উপাদানে তার পুনর্বিশ্লেষণ করে। এই ধরনের সামান্যীকরণ আমেরিকায় করা হয়েছে, ফলে ম্যানুয়েল ট্রেনিং হাইস্কুল তার কাজের ধারাকে সাজিয়ে নেয় বইয়ের শেষে সংযুক্তিতে দেওয়া তালিকাটির পরিকল্পনা অনুযায়ী।

তালিকাটি প্রধানত তৈরি করা হয়েছে আমেরিকা ও জাপানে টেকনিক্যাল এডুকেশান সম্পর্কে ডাঃ হ্যানফোর্ড হেণ্ডারসনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার থেকে, যেটি ১৯০৪ সালের এপ্রিলে মাদ্রাজের 'হিন্দু'তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্পেশ্যাল বুলেটিন (হোল নম্বর ২৮৬) যা ব্যুরো অফ এডুকেশান, ওয়াশিংটন ডি. সি. প্রকাশ করেছে, যাতে আঠারোটি ম্যানুয়েল ট্রেনিং হাইস্কুলের শিক্ষা-কোর্সের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে, তা প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ডাঃ হ্যানফোর্ড হেণ্ডারসনকে সমর্থন করে সঠিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সেই বিষয়ের, যা বালকের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় সকল ম্যানুয়েল ট্রেনিং-কোর্সের প্রয়োজনীয় সময়-তালিকা।

আমেরিকা রাষ্ট্রের এই কাগজটি থেকে সেই ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের আদর্শ কোর্সটির খুঁটিনাটিও সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা বারো থেকে একুশ বছরের বালিকাদের জন্য তিন বা চার বছর ধরে বিস্তৃত করা হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে কাজের ধরনের ভিত্তি হচ্ছে শিল্প ও পরিবার-জীবন। প্রথম বছরের ক্যারিকুলাম হচ্ছে সাধারণ অঙ্কন ও জল-রঙের কিছু কাজ, রন্ধন ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান (গৃহকাজ), সীবন, ক্লে-মডেলিং ও কাঠ-খোদাই। দ্বিতীয় বছরে আমরা আবার পাই অঙ্কন, পোশাক-প্রস্তুত, ক্লে-মডেলিং, কাঠের কাজ এবং অর্নামেণ্টাল-কাট আয়রনের কাজ। শিল্প হিসাবে শেষোক্ত বিষয়টি হচ্ছে এক ভেজালের ব্যাপার, এটি হচ্ছে ফিতের মতো বাঁকা লোহার টুকরো সাঁড়াশী দিয়ে সুন্দরভাবে জুড়ে টুকিটাকি

তৈরি করা। কিন্তু নানা রকম নক্সা-শিক্ষা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার শিক্ষার সুযোগ হিসাবে এটি বিবেচনার যোগ্য।। এই দ্বিতীয় বছরটিতে হাতে-নাতে রন্ধন-শিক্ষার বদলে খাদ্যের রাসায়নিক গুণ ও তার প্রস্তুতির উপর তত্ত্বমূলক পাঠ দেওয়া হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর এই বিষয়গুলি ও এই ধরনের কোর্সকে আরও উন্নত অবস্থায় নিয়ে যায় এবং শিশু ও রোগীর পরিচর্যা, আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা ও কাপড় কাচার কাজ সেই বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পায়, যেগুলি থিওরিটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শিক্ষার আরও দুটি ভাগ আছে। যাঁরা বালক বা বালিকাদের জন্য ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের কোর্স তৈরি করেন, তাঁরা সে দুটিকে অবজ্ঞা করতে পারেন না। সেগুলি হচ্ছে বিজ্ঞান ও জিমন্যাস্টিক। বল-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা ও রাসায়ন-বিদ্যার কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান—তা সে যতই প্রাথমিক হোক—ম্যানুয়েল ট্রেনিং দানের প্রচেষ্টা এবং গাছপালা, জীবজন্তু ও সাধারণভাবে বহির্জগৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ শক্তির সুপরিকল্পিত চর্চা ছাড়া এ যেন হাতকে চোখ থেকে বিচ্ছিন্ন বা উভয়কেই মন থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো প্রচেষ্টা। আর এই একই ভাবে সুদক্ষ স্কুল শিক্ষক বুঝতে ব্যর্থ হন না যে তার ছাত্রদের দেহ আছে, যাকে দেহ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে ও উন্নত করতে হবে। স্কুল গৃহের বাইরে ফুটবল ও ক্রিকেট সুন্দর কাজ করে চলেছে কিন্তু সেগুলির যারা সফল হয়েছে, তাদেরই সবচেয়ে ভাল সেবা করার ঝোঁক। আমরা এমন কিছু চাই, যা একই সময়ে উচ্চতম-কৃতী ও নিম্নতম কৃতীর আনুপাতিক আত্ম-উন্নয়ন ঘটিয়ে সার্থক শিক্ষার যে পরীক্ষা তাতে টিকে থাকবে। আমরা যা বিবেচনা করছি, সেই ধরনের বহু ইংরাজি স্কুলে এই অভাব পূর্ণ করা হয় সপ্তাহে একটি বা দুটি ঘণ্টা মিলিটারী ড্রিল করিয়ে। আর এটি করানো হয় ছেলেদের যেমন, মেয়েদেরও তেমনি। আমি চাই এই প্রথা ভারতীয় স্কুলগুলিতেও প্রবর্তিত হোক। শিক্ষক হন সাধারণত কোন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, যিনি 'ড্রিল-সার্জেণ্ট রূপে খুশিই হন নিজের সামান্য পুঁজিতে কিছু যোগ দিতে এবং প্রায়ই তাঁর ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হন। একদিকে আমরা যখন বিবেচনা করি ভারতীয়দের সহযোগিতার অভ্যাসে ও সম্মিলিত কার্যের মানসিকতায় ও অনুভূতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার কতখানি প্রয়োজন এবং অন্যদিকে যখন আমরা উপলব্ধি করি সুসংবদ্ধভাবে মার্চ করা, চার্জ করা, বেষ্টনী রচা, চতুষ্কোণ সৃষ্টি করা, কভারিং, ডবলিং, কাল্পনিক অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে আদেশের কথাগুলি মান্য করা ও অন্যান্য সব কিছুর অবচেতন মনে প্রচুর প্রভাবের কথা, তখন আমরা বিশ্বাস না করে পারি না যে ভারতীয় সমস্যার এক বড় অংশ শিক্ষণীয়রূপে সমাধান করা যায় স্কুলের মাঠে এই অত্যন্ত সহজ উপায়গুলির দ্বারা।

পরবর্তী প্রশ্ন যা এক বাস্তববাদী ভারতীয়র মনে উদয় হবে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে হাতের কাজ প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলি সম্পর্কে, তা হচ্ছে ব্যয়বহুল। আমি স্বীকার করব যে যখন আমি কয়েকটি আমেরিকান হাইস্কুলে ম্যানুয়েল ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট

দেখেছিলাম, তখন আমি একই সঙ্গে প্রশংসায় ও হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমেরিকাবাসীরা তাঁদের নিজেদের শিক্ষার প্রয়োজনে যে বদান্যতা দেখিয়েছেন তার প্রশংসায় আরও হতাশ হচ্ছি যখন আমি চিন্তা করলাম ভারতীয় প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রুকলিনে প্রাট ইনস্টিটিউটের হাইস্কুলে আছে ছুতারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ভাইস, ফার্নেস, ইঞ্জিন, নেহাই, ধাতু ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি। আর এ সমস্তই হচ্ছে ইনস্টিটিউট যার জন্য বিখ্যাত, সেই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে স্কুল-সপ্তাহের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সময় প্রত্যেককেই পালা অনুযায়ী দেখা যাবে এক সবল বুদ্ধিমান শ্রমিকের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করছে এমন সব যন্ত্রপাতির, যা ভারতবর্ষে শুধু কয়েকটি শিপ ইয়ার্ডে, খনিতে ও কারখানায় দেখতে পাওয়া যায়। এমন সুযোগ থেকে যে সুবিধা লাভ করা যায় বা এই ধরনের নির্মাণ-কার্যের এখানে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে ?

সেই সঙ্গে এটাও যেন আমরা স্মরণ রাখি যে হাতের কাজ প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পজগতের চেয়ে বরং শিক্ষাগত ; আমরা দেখব যে ইউরোপে যেমন আমরা বলি, আধখানা রুটি হচ্ছে রুটি না পাওয়ার চেয়ে ভাল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যেখানে আমরা পারি সেখানে শুরু করাই ভাল। এই দেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দুই বা তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর যৌথ প্রচেষ্টা কলেজ গ্রেডের ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট। আর ভারতীয় রাজারাও প্রত্যেকে তাঁর নিজের রাজ্যে ওই একই রকম কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের স্কুলগুলিকে রাজকীয় সম্পূর্ণতার সঙ্গে সজ্জিত করা অসম্ভব বলে সাধারণ প্রধান শিক্ষকরা যেন তাঁদের বালকদের হাতের কাজ প্রশিক্ষণ দানের সহজ উপায়গুলি বিবেচনা করা থেকে বিরত না থাকেন।

ডাঃ হেণ্ডারসন প্রদত্ত অঙ্ক অনুসারে কাঠের ও ধাতুর কাজের ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের মেসিন নির্মাণ ছাড়া ভাল সাজ-সরঞ্জামের জন্য মাথা পিছু প্রতি বালকের জন্য প্রায় ১৬৫্ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে—অর্থাৎ কাঠের কাজ ৭৫্ টাকা, ভাইসের কাজ (ধাতুর) ৩০্ টাকা, কামারের কাজ ৬০্ টাকা। অতএব তিন হাজার টাকার একটু বেশি দিয়ে বিশটি ছাত্রের জন্য মেসিন ছাড়া আর সব কিছুসহ একটি স্কুলকে সজ্জিত করা যায় এবং এই বিশটির একটি কোর্সে খুব বেশি হলেও মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্রয়োজন, তাই সরঞ্জামগুলি একশো কুড়িটি ছাত্রের এক স্কুলের জন্য প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট - এমন কি আরও বেশি হতে পারে যদি শনিবার, রবিবার ও সন্ধ্যাগুলি ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা যায়। এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে কর্মতালিকায় এক গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক হচ্ছে যন্ত্র-নির্মাণ, কিন্তু এই অভাব সত্ত্বেও প্রতি শহরে এই ধরনের শিক্ষণালয় থাকার সুবিধা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার উপর যে ব্যয়-বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা শুধু বিবেচনা করেছি যন্ত্রপাতির খরচ, স্কুল পরিচালনায় নয়, যা নির্ভর করবে শিক্ষকদের দেয় বেতন, ভাড়া ও স্থান বিশেষে অন্যান্য বিষয়ের ওপর।

ইতিমধ্যে নিশ্চয় অনুমান করা হয়েছে যে শিক্ষায় হাইস্কুলের স্তর হচ্ছে ম্যানুয়েল ট্রেনিং ধারণার হৃদয়স্বরূপ, সাধারণ সংস্কৃতির যেন এক উপাদান বলে বিবেচ্য। যে শিক্ষা এটি দেয়, তা যদি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ কার্যের প্রস্তুতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যরূপে অনুসৃত হওয়া উচিত। তা যদি হয় তাহলে এগুলি হয়ে উঠবে সাধারণ পাঠক্রম,—অর্থাৎ, শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি বিভাগ কিংবা সিভিল বা মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের পাঠক্রমেও স্থান গ্রহণ করতে পারে, যা কোন বিশেষ বিদ্যালয় স্থির করতে পারে।

যা'হোক, বাস্তবিক যে বালক এই বছরগুলির মধ্যে নিজেকে তৈরি করতে পারবে এক বিশেষ শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে জীবিকার জন্য, সে খুব সম্ভব নির্বাচন করবে এক টেকনিক্যাল স্কুলের পাঠক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, যে মানুষ শিল্পের জগতে এক উচ্চ স্থান গ্রহণ করবে, তার ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত এবং তার সাধারণ শিক্ষা সেখানে শেষ করার পরে বিশেষ টেকনিক্যাল প্রস্তুতির জন্য দু বছর ব্যয় করবে। এই ধরনের উপদেশ আমাদের সক্ষম করে আমেরিকান অর্থে টেকনিক্যাল স্কুলগুলির সাংস্কৃতিক স্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করায়। এগুলি নিছক কর্মজীবীদের বিদ্যালয় নয়। এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাদের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে সেগুলি হচ্ছে শিল্পের নায়ক ও কর্তাদের কলেজ। বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় যা, শ্রমের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তাই।

আমেরিকান টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে ও ইউরোপের দেশগুলির পলিটেকনিকসে যে ধারণাটি রূপ পেয়েছে, তার ইতিহাস সম্পর্কে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত রয়েল কমিশনের রিপোর্ট থেকে আমরা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি।

আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার সূত্রপাত প্রধানত হয় গ্রেট ব্রিটেন থেকে। ওয়াট, আর্করাইট ও ক্রম্পটনের আবিষ্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি বহু বছর ধরে ইংরাজদের একচেটিয়া ছিল এবং ১৮৪০ সালের কাছাকাছি যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি রেলপথ ও আধুনিক কারখানা নির্মাণ শুরু করল, তখন তারা টের পেল যে গ্রেট ব্রিটেনে সম্পূর্ণ উন্নত এক শিল্প-সংগঠনের মুখোমুখি তারা দাঁড়িয়েছে, যেটি তাদের কাছে এক সীল করা বইয়ের মতো, যারা তার ওই কারখানাগুলিতে প্রবেশ করতে পারেনি।

'বিদেশের এই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করল, যেমন প্যারিসের ইকোল সেঁত্রালে, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের পলিটেকনিক স্কুলগুলি এবং ওই স্কুলগুলিতে টেকনলজির শিক্ষক হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানের লোকদের ইংল্যাণ্ডে পাঠালো।

'এখন ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রেই টেকনিক্যাল হাইস্কুল রয়েছে এবং যারা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল ডিরেক্ট'র হতে ইচ্ছা করে, তাদের জন্য ওই স্কুলগুলি শিক্ষার স্বীকৃত শাখা। যাহোক, টেকনিক্যাল কেমিস্টদের মধ্যে অনেকেই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে। আপনার কমিশনাররা বিশ্বাস করেন যে ইউরোপে বিস্তৃত শিল্প-নির্মাণ সংস্থাগুলি, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির ভিত্তি স্থাপনে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা বহু বিঘ্নকর প্রবাহের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এত ব্যাপক হতে পারত না, এই স্কুলগুলির উচ্চ টেকনিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত, মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ-সুবিধা ছাড়া এবং ওই শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার মূল্যের—যা ওইসব দেশ অনুভব করে—সাধারণ প্রশংসা ছাড়া।

'...বাড়িগুলি প্রাসাদোপম, ল্যাবরেটরি ও মিউজিয়ামগুলি দামি ও ব্যাপক, অধ্যাপকের দল...এত বেশি সংখ্যক যে শিক্ষার বিষয়টিকে যতদূর সম্ভব ভাগ করে নেওয়া চলে। জার্মানীর কিছু পলিটেকনিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে, যেহেতু প্রধানত বর্তমান চাহিদার চেয়ে 'টেকনিক্যালি-ট্রেণ্ড' ব্যক্তিদের সরবরাহ অনেক বেশি; স্কুলের শিক্ষা বর্জন করা চলতে পারে এই কারণের জন্য নিশ্চয়ই নয়।'

ইংরাজ কমিশনাররা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন সাধারণ সংস্কৃত ও উচ্চতর শিক্ষার কথা, যা ইউরোপের দেশগুলিতে বড় কারখানা ও অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তা ও ম্যানেজারদের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যক্তিরা তাঁদের বিশেষ শিল্প যে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল, তার জ্ঞানের কতটা অধিকারী, নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের নিজের দেশে বা পৃথিবীর আর কোথাও যেসব উন্নতি সাধিত হয়েছে সেগুলি গ্রহণ করার দ্রুততা, বিদেশী ভাষা সম্বন্ধে এবং দেশের বাইরে নির্মাণ-কার্যের বিদ্যমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে কমিশনাররা বলেন। এই সবের মধ্যে আমরা দেখি যে বিদেশী প্রশিক্ষণের শক্তিকে এইভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বৈশিষ্ট্য আবার নির্ভর করছে তার বড় কলকারখানাগুলির ওপর, যাদের সম্পর্কে ওই কমিশনাররা ঘোষণা করেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা টেকনিক্যাল স্কুল।' ইংরাজি রিপোর্টের ওপর ১৮৮৫ সালে কৃত আমেরিকান টীকা এই মন্তব্য যোগ করে যে, রাশিয়াতে বাকি ইউরোপের টেকনিক্যাল শিক্ষার ধারণাগুলি 'বিস্তৃত করা হয়েছে স্কুলগুলিতে, যারা সরঞ্জামাদির সম্পূর্ণতায় ও আর্থিক প্রাচুর্যে ইউরোপের অন্যান্য যে কোন দেশকে হারিয়ে দেয়, সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে প্যারিসের ইকোল পলিটেকনিক।' এর সঙ্গে এটাও যোগ করা যেতে পারে যে টেকনিক্যাল শিক্ষার যান্ত্রিক দিকে সম্ভবত অন্য কোন দেশই বর্তমানে সারা যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত টেকনিক্যাল স্কুলের বিরাট জালের কাছাকাছি পৌছাতে পারে না।

এই স্কুলে চার বৎসরের এক কোর্স এইভাবে প্রদত্ত হয়:

(ক) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি-নির্মাণ;

(খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি-নির্মাণ;

(গ) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং;

(ঘ) আর্কিটেকচার বা স্থাপত্য;

(ঙ) দি ফিজিক্যাল অ্যাণ্ড কেমিক্যাল প্রসেস, বিভিন্ন শিল্প ও নির্মাণ-কার্য নিয়ে গঠিত।

এইভাবে এটি স্পষ্ট যে টেকনিক্যাল স্কুল হচ্ছে সরলভাবে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং আমরা আশা করি প্রবেশকালে ছাত্রদের গণিত ও সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষায় পাস করতে হয়।

আমেরিকায় এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ বলা হয় বোস্টনের ম্যাস'চুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিকে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার লেল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির সম্পদের প্রাচুর্য তার ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগকে সম্ভবত শীঘ্রই পরিণত করবে অন্তত ওটির সমান ধরনের এক টেকনিক্যাল কলেজে।

বিষয়টির এই অংশ আলোচনা পরিত্যাগ করার পূর্বে এবং আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে সেই ধরনের ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ে নিবিষ্ট করার আগে, যা বর্তমান মুহূর্তে ভারতীয় শিক্ষার প্রয়োজনে প্রয়োগ করা চলতে পারে, আর একটি কথা আলোচনা করার আছে, যেটি হচ্ছে ম্যানুয়েল ট্রেনিং হাইস্কুলের জন্য শিক্ষক সৃষ্টির যে ব্যবস্থা আমরিকায় করা হয়েছে এবং ভারতে এই সুবিধা সংগঠনের জন্য ওই ব্যবস্থা কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই প্রশ্নটি।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ডাঃ হ্যানফোর্ড হেণ্ডারসন বিনা দ্বিধায় বর্ণনা করেছেন, যেন আদর্শ পাঠক্রম, বোস্টনের স্লোয়েড ট্রেনিং স্কুলে এক বৎসর অতিবাহন, তারপর দ্বিতীয় বৎসরটি নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। এর পরে স্কুলগুলি পরিদর্শন—যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলি বলা হয় চিকাগো ও ফিলাডেলফিয়ায় আছে—একান্তভাবে প্রয়োজন। আর তারপরে যদি ধরা যায় এই প্রশিক্ষণ যারা পেয়েছে, সেই মানুষগুলি 'কঠোর কর্মে ভীত নয়, সুস্থ সবল দেহী, মনে নিরলসতা ও উদারতা, হৃদয়ে অনুকম্পা ও আন্তরিকতা, তাহলে ভারতে ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য সক্ষম হবেই অন্তত।'

এমন কী আমেরিকাতেও শিক্ষাদাতাদের প্রচুর দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়েছে ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের প্রস্তুতির কোর্স কী ধরনের হওয়া উচিত তাই নিয়ে, যেটিকে আমরা এখানে সম্পূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি, অর্থাৎ যাকে বলা যায়, আট থেকে বারো বয়সের মাঝের বৎসরগুলি।

এই প্রয়োজন মেটাতে সরল কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন 'কার্ড-বোর্ড মডেলিং' ও 'স্লোয়েড' ইত্যাদি ধরনের নামে, যাতে বালক-বালিকারা কার্ড-বোর্ড বা কাঠ দিয়ে সহজ বস্তু নির্মাণ করা শিখতে পারে কয়েকটি সরল যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

প্রথমে কার্ড-বোর্ড মডেলিং ধরা যাক: বালকদের দেওয়া হয় এক খণ্ড স্ট্রবোর্ড বা সাদা কার্ড-বোর্ড ½ ইঞ্চি চৌখুপী মুদ্রিত, এক শক্ত পেন্সিলকাটা ছুরি, পেন্সিল, মাপের জন্য রুলার, কম্পাস ও রবার। তারপর শিক্ষক ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেন এবং বোর্ডে বড় যন্ত্র দিয়ে ও চক দিয়ে এঁকে দেন প্রয়োজনীয় রেখাগুলি ও মাপগুলি, যার দ্বারা, ধরা যাক, এক চার চৌকা ভাজকরা খাম তৈরি হবে। এটি

করার পরে তিনি বুঝিয়ে দেবেন কোন রেখা ধরে কাটার জন্য ছুরিটিকে তীক্ষ্ণভাবে ও তার সঙ্গে ধীরভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে, যাতে কার্ডটিকে পরে ভাঁজ করা চলে। এটা করা হলেই কার্ড-বোর্ডে এক চৌকো থামের মডেল করা হয়ে গেল।

পরের পাঠটি সম্ভবত একইভাবে একটি বাক্স ও বাক্সের ঢাকনা-নির্মাণ, এক ফটোগ্রাফের ফ্রেম, এক ব্যাগ, এক বুক-কভার বা ফোল্ড করা পোর্টফোলিও বা আর কিছু। বহুভূজ সমন্বিত রূপরেখার ঘনবস্তু তারপরে গ্রহণ করা হয়, শীঘ্রই এমন একটি সময় আসে যখন শিশুরা শিক্ষকের চেয়েও এগিয়ে যেতে ব্যস্ত হয় নতুন সমস্যা নিয়ে এবং সেগুলি সমাধান করার নতুন পদ্ধতির আভাস দিতে। আর এটা যখন ঘটে, তখন আমরা জানি যে শিক্ষা যথার্থ সার্থক হয়েছে, কারণ এটা নতুন ধাপে ওঠার প্রতিটি পাঠের সঙ্গে উত্তরণ ইচ্ছার একত্র সংযোজন ব্যতীত আর কী?

স্লোয়েড বা স্কুলের কাঠের কাজটি খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। এতে উপযুক্ত বেঞ্চ ও যন্ত্রপাতিসহ এক বিশেষ কক্ষের প্রয়োজন হয়। এই উপদেশ দেওয়া হয় যে, যদি স্বতন্ত্র স্লোয়েড বেঞ্চ খুব ব্যয়সাপেক্ষ বলে বোধ হয়, তাহলে ভাইস লাগানো এক শক্ত টেবিল ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে চারটি ছাত্র কাজ করতে পারে। উপযুক্ত কাঠ ও প্রয়োজনীয় অঙ্কনের যন্ত্রপাতি তারপর সরবরাহ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে পেন্সিল, রুলার ও কম্পাসকে ধরতে হবে। এই সহজ কাঠের কাজের যন্ত্রপাতিরূপে যেগুলিকে গণ্য করা হয়, তাতে আমি দেখতে পাই র‍্যাঁদা, চেরাইয়ের করাত, বিট-ব্রেস, ড্রিল-বিট, ব্যাক-স, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, সেণ্টার-বিট, আধখানা গোল ফাইল, টার্নিং-স, স্পোক-শেভ, ক্রস-কাট-স, ছুরি, কম্পাস-স, শিরীস কাগজ ইত্যাদি। টেবিল সমেত চারজন ছাত্রের কাজের উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সেটের আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করেছে স্লোয়েড ট্রেনিং স্কুল, বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস, যা হচ্ছে একশো টাকার কিছু বেশি।

এই ব্যয় করার পরে শিক্ষক এর সদ্ব্যবহারের জন্য অগ্রসর হন কিছু দ্রব্য উৎপাদন করে, যেমন ফটোগ্রাফের তাক, বড় বই রাখার সেলফ, সেলাইয়ের জন্য বসার জায়গা, রুমালের বাক্স, গ্লাভসের বাক্স, ছোট মডেল-গাড়ি, ও এই ধরনের কিছু। অনুমান করা হয় এই কাজ থেকে পাওয়া যায় সবল পেশী-ক্রিয়া ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনীশক্তির প্রেরণা।

যাহোক, আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাববে এই ধরনের বিবৃতি স্বয়ংই নিন্দার্হ। এতে বোধ হয়, যেন যান্ত্রিক দক্ষতার প্রশংসা আমেরিকান শিক্ষাদাতা কুক্ষিগত করে সরে পড়েছেন। এইসব কিছু কষ্ট ও ব্যয় শুধুমাত্র ম্যানুয়েল স্কুলের বেঞ্চ-ওয়ার্ক কয়েক বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। এটাও বোধ হবে যে, আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষার জন্য হাতের কাজের দক্ষতাকে খাটো করার প্রয়োজন হচ্ছে এবং কিছু ধনী ব্যক্তি দ্বারা ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের কোর্সকে মূর্খসুলভ অপব্যয়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার পরিণাম হতে পারে যেজন্য এটি স্থাপিত হয়েছিল সেই আসল উদ্দেশ্যকেই ধ্বংস করে দেওয়া। যদি ভারত তার স্কুলগুলিতে ম্যানুয়েল ট্রেনিং চায় তবে স্পষ্টতই এই ব্যবস্থাগুলির মতো এত বিস্তারিতভাবে নয় এবং সবল পেশী-ক্রিয়া এই

ক্ষেত্রে যেমন 'এলিমেণ্টারী স্লোয়েড' দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, তেমনভাবে না হয়ে অন্য কোনরকম উপায়ের দ্বারা।

যাহোক বিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন কীভাবে ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হয়, এমন কি যখন তিনি সম্পূর্ণ নির্দেশটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং সহজ শিক্ষা-পদ্ধতি হয়তো উদ্ভাবন করা হবে, যাতে সঠিক পরিমাপ ও গঠন-কর্মের দক্ষতা ক্রমে প্রকাশিত হবে কাঠের ওপর একাধারে তত্ত্বগত জ্ঞান ও বাস্তব প্রয়োগের প্রকৃত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

আট থেকে বারো বছর বয়সের ছেলেদের এক ছোট ক্লাসে হাতুড়ি, ছুরি, করাত ও স্ক্রু-ড্রাইভার বা যন্ত্রপাতির এক ছোট বাক্স দিলে গৃহস্থালীর বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্র নিজেদের পক্ষে প্রচুর সুবিধাজনকভাবে তারা তৈরি করে নিতে পারে।

সকল ভাল শিক্ষকই জানেন তাঁদের নিজেদের শিক্ষার মূল্য কীভাবে পরীক্ষা করা যায়, তার ছাত্রদের মধ্যে সেই শিক্ষা কতটা আগ্রহ জাগিয়েছে তার দ্বারা। হার্বার্ট স্পেনসারের শিক্ষার ছোট বইটি 'এডুকেশান' আমাদের পড়া না থাকলেও তাঁর প্রধান যুক্তি আমরা বোধহয় বিবেচনা করতে ও প্রশংসা করতে পারব, যথা সুস্থ শারীরিক ক্ষুধা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূল্যবান খাদ্য-উপাদান সন্ধান করে এবং যা ক্ষতিকর তা পরিত্যাগ করে, তেমনি ভালভাবে শিক্ষিত শিশুও যে পাঠগুলি তার প্রয়োজন সেগুলি ভালবাসে এবং ঘৃণা করে শুধু সেগুলিকে, যেগুলি খারাপ বা তার কাছে খারাপভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। অন্য কথায়, যে শিক্ষক ছেলেদের আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই ভাল শিক্ষক। যে পাঠ ক্লাসকে আনন্দ দান করে সেটাই ভাল পাঠ। তাই সহজ ছুতারের কাজ শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক হতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম একই থেকে যায়—যদি কাজটি এমনভাবে শেখানো হয় যাতে ছাত্রেরা কাজটি ভালবাসে, তাহলে সেটি ভাল শিক্ষাদান।

এইভাবে আমরা বিবেচনা করলাম সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের আমেরিকান ব্যবস্থা। হার্ভার্ডের প্রফেসার উইলিয়াম জেমস বলেন,—তাঁর উক্তি সমগ্র দাবিটিকে মোটামুটি তুলে ধরে :

'সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় যে বিরাট উন্নতি করা হয়েছে, তা নিহিত রয়েছে ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলগুলি স্থাপন করায়, এর কারণ এই নয় যে সেগুলি আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের জন্য বাস্তববাদী ও কাজের এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে দক্ষতর লোক দেবে বলে, বরং এর কারণ হচ্ছে সেগুলি আমাদের দেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার নাগরিক। ল্যাবরেটরির কাজ ও কারখানার কাজ উৎপন্ন করে পর্যবেক্ষণের অভ্যাস, নির্ভুল ও অসম্পূর্ণ ধারণার মধ্যে প্রভেদের জ্ঞান এবং প্রকৃতির জটিলতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সকল শব্দ-বিবরণীর অপ্রাচুর্য যা, একবাই মনের মধ্যে গঠিত হলে যাবজ্জীবনের সম্পদরূপে থেকে যায়। এগুলি দান করে নির্ভুলতা···দান করে সততা···জন্ম দেয় আত্ম-বিশ্বাসের অভ্যাস। ছাত্রকে তারা নিযুক্ত করে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তার বয়সের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঙ্গে।

তারা তাকে নিমগ্ন রাখে এবং মনে স্থায়ী ও গভীর দাগ রেখে যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত যুবকের তুলনায় শুধুমাত্র বই পড়ে মানুষ-হওয়া জন সারা জীবন ধরেই বাস্তবের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে; সে যেন ম্লানভাবে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেই-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এটি বোধও করে এবং প্রায়ই এক ধরনের বিষণ্ণতায় ভোগে, যার থেকে হয়তো সে উদ্ধার পেত আরও যথার্থ শিক্ষা দ্বারা।'

'সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানসিকতার নাগরিক'—এই সৃষ্টি করাই প্রকৃত সকল ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের নিঃসন্দেহে প্রধান উদ্দেশ্য। এটিই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য, এই কাজেই উপায়গুলি ভালভাবে গ্রহণীয়।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন আমরা প্রকৃত পরিকল্পনাটি দেখি, যা আমেরিকান চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষকরা গ্রহণ করেছেন, আমাদের স্বীকার করতে হয় যে আরও একটি পরিপূরক উদ্দেশ্য আছে, যে সম্পর্কে শিক্ষা-সংগঠকরা কম সচেতন, সম্ভবত যার অস্তিত্ব এমন কি তিনি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সেটি আছে। আর সেটি হচ্ছে এ কথা স্বীকার করার ইচ্ছা এবং ছাত্রজীবনে স্কুলের চার-দেয়ালের মধ্যে কার্যকরভাবে পুনরাবৃত্তি করা বাইরের জগতের বিরাট যান্ত্রিক ও শিল্প-সভ্যতার প্রধান অঙ্গগুলির।

শিক্ষার হাইস্কুল স্তরে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের এক সহজ রূপের শিক্ষণীয় কোর্স তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিসহ কেন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং যন্ত্র-নির্মাণে এক বৎসরের কাজে তা শেষ হবে, যাতে আমাদের বলা হয়, 'অন্যান্য সব শাখার একত্রীকরণ আমাদের হয়েছে?' এর অর্থ কী, যদি না তা হয় হাতিয়ার যেসিনে উত্তরণ—যা কম-বেশি অরাজকতার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের সমাজগুলি করেছে,—ভবিষ্যতের ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সজ্জিত করার জন্য যার সঙ্গে বুদ্ধির ও নীতির সেতুবন্ধন প্রয়োজন।

কোন ধরনের হাতের কাজ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আমেরিকা ঠিক মতো অনুভব করেছিল মানুষের মনস্তত্ত্বে সাধারণভাবে নিহিত আছে বলে এবং বিশেষ করে শিক্ষার মনস্তত্ত্বে। কিন্তু ম্যানুয়েল ট্রেনিং সেই দেশে যে রূপ নিয়েছে তা বর্তমানকালের বিশিষ্ট সভ্যতার সম্পূর্ণ ফলশ্রুতি অনুযায়ী। এক সুশিক্ষিত মানুষ তার হাত দুটি কীভাবে ব্যবহার করবে, সে শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। আর আধুনিক জগতের এক সুশিক্ষিত মানুষ এই প্রশিক্ষণ কালে সত্যই শিক্ষা লাভ করে যন্ত্রপাতির মূল নীতিগুলি ও তার ব্যবহার। সে অবশ্যই জানবে স্কুল-পাম্প চালাবার জন্য স্টিম-ইঞ্জিনের নির্মাণ ব্যাপারটি, ডায়নামো, ইলেকট্রিক মোটর এবং যে কোন সুসজ্জিত ব্যবসায়িক কারখানায় যেসব ছোট যন্ত্রপাতি নির্মিত হতে পারে। হাতিয়ার থেকে শুধু যন্ত্রে উত্তরণ নয়, বাষ্প থেকে বিদ্যুতেও, তারপর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা—বালকটি অভিভাবকদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে যাতে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজস্বস্থান অনুসন্ধান করে নিতে বা জয় করে নিতে। এই নীতির বিজ্ঞতা বা অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিতর্ক করা যায় না এবং

ভারতীয় শিক্ষায় এর প্রয়োগ আরও বেশি স্পষ্ট। যদি আমেরিকা তার কারখানা ও ডক-ইয়ার্ড, তার যন্ত্র নির্মাণশালা ও বিজ্ঞানের গবেষণাগার সত্বেও তার বিদ্যালয়-গৃহে যন্ত্রযুগকে অবজ্ঞা করতে পারে না, তাহলে ভারত আরও কত কম পারবে, কারণ তার সাম্প্রতিক (যদিও শেষ নয়) সমস্যা হচ্ছে সেই যুগে তার নিজের প্রবেশ ? বাস্তবিক আমরা কল্পনা করতে পারি যে, ভারতীয় রক্তের এক বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ নিজেকে হয়তো বলতে পারেন, আমি শুধু স্কুল-বৎসরগুলির মধ্যে যথেষ্ট মানুষ সৃষ্টি করি, যারা আধুনিক যন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করতে ও নির্মাণ করতে পারবে, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নিজেই নিজেকে গড়ে নিতে পারবে। কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি ভারতীয়রা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে যন্ত্রযুগের আবির্ভাব দীর্ঘকাল পিছিয়ে রাখা চলবে না।

যাহোক, যখন আমরা শিল্পের প্রাক-আধুনিক কালের গবেষণায় আসি, আমরা বুঝতে শুরু করি আমেরিকার উন্নতির দুর্বল স্থানটি কী। এটি খুবই পরিষ্কার যে ঐতিহাসিকভাবে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যবদ্ধতা'র পূর্ববর্তী যে যন্ত্রশিল্প ও উপাদান-গুলি, সেগুলির শিক্ষাগতভাবেও তার পূর্ববর্তী হওয়া উচিত। তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে, ভারতের প্রতিটি গ্রাম হাতের কাজ প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠতর উপাদান প্রদানে সক্ষম হবে আমেরিকার যে কোন শহর যা সংগ্রহ করবে তার তুলনায়। প্রাচীন জগতের এই ধরনের বস্তু যেমন ইটের পাঁজা ও কুমোরের চাক, চরকা ও সাধারণ তাঁত, পশম তৈরির টাকু, রঙ করার ভাটি ও ভেষজ রঙের প্রাচীন বিধি, কাঁসারীর চুল্লি ও যন্ত্রপাতি, কাঁচ-শিল্পীর হাপর, এমন কি ঝুড়ি-নির্মাণকারীর শুকনো ও চেরা তালপাতা, এই সবগুলিতে শিক্ষণীয়ভাবে ব্যবহার করা চলে তার দ্বারা, যে একত্রিত করবে বিস্তৃত বুদ্ধিগত প্রশিক্ষণে এগুলির ব্যবহারের জ্ঞান এবং শিক্ষার নীতিগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা।

ইতিহাসের ছাত্র জানে কীভাবে প্রাচীন গ্রীসে এশীয় গৃহস্থালীর সাধারণ মৃৎপাত্র নির্মাণ ও অলঙ্করণ বিশ্ব-শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যতম স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। সে আরও জানে যে, চীন ভিন্ন পথে এই ধরনের উন্নতি করেছিল ফুলদানির এবং চীনামাটির আবিষ্কার সবার আগে করে, এক সম্পূর্ণ পৃথক ও 'হেলেনিক'-এর মতো মহান বৈশিষ্ট্যজনক সিরামিক ক্রমবিকাশকে উপভোগ করেছে। সে তার পোড়ামাটির গবেষণায় দিল্লী, লাহোর ও পারস্যের বিস্ময়কর রঙের কাজ ও নক্সা ভুলতে পারে না।

শিক্ষকের পক্ষে এই ধরনের জ্ঞান সম্ভব করে তোলে মাটি, চক্র ও চুল্লিকে স্কুল গৃহে নিয়ে আসা উদার শিক্ষার প্রধান অংশরূপে, নিছক কারিগরি শিক্ষারূপে নয়।

সুতীবস্ত্র ছাপার মহান ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস প্রতি গ্রামেই দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় এবং যে কোন শিশুকে উদ্দীপনা ও উৎসাহ দান করবে এই শিক্ষায় যে হাতের ব্যবহারই এই শিল্পকে গড়ে তুলেছে। কিংবা শুকনো ঘাস, তালপাতা, চাঁচাড়ি বোনার

কাজকে একধারে করে তুলতে পারা যায় সহজ বুনন-কার্যের একটি ঘটনা এবং বস্তুগুলির, ব্যবহার্য পদার্থগুলির এমন কী বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে এক ধারণা।

প্রথমে এবং বোধহয় সর্বদাই, এই ধরনের শিল্প শিক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কারিগরটিকে এনে ক্লাসের মধ্যেই তার জীবিকায় নিযুক্ত করা এক ভাল শিক্ষকের উপস্থিতিতে, যিনি জানেন কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, পরিচালিত করতে হয় এবং কাজটির উপর মতামত প্রকাশ করতে হয়। দীন কর্মী ও শিক্ষিত বালকদের মধ্যে, যারা নিজেদের প্রস্তুত করছে কোন একদিন তাদের জাতির নেতা হবার জন্য, এই ধরনের সংযোগ সাধন দুই জগতের সম্মিলন ঘটায়, যেটি চেষ্টা করার উপযুক্ত। বৃদ্ধ ছুতার বা তাঁতি বা কুমোর বা অন্য কেউ, একধারে এক ধরনের গুরু ও এক ধরনের পুরোহিত এবং তার মাধ্যমে তার শিষ্যেরা এক জগতের সঙ্গে স্নেহের সংস্পর্শে আসতে পারে, যে জগৎ অন্যথায় মিলিয়ে যেতে পারে চিহ্নবিহীন হয়ে ভুল বুঝে আর অত্যন্ত দেরীতে শোকজ্ঞাপনের পাত্র হয়ে।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে শিক্ষার এই মাধ্যমিক স্তরের ম্যানুয়েল ট্রেনিং দেওয়া হবে যন্ত্র-শিল্পের দিকে ঝোঁক দিয়ে। একে সমানভাবে শিল্পসম্মতও করে তোলা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মডেলিং ও ডিজাইন হবে শিক্ষার প্রধান বিষয়। চালের গুঁড়ি, সিঁদুর, সাদা ও হলদে মাটি—এই দ্রব্যগুলি প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু আল্পনা-নক্সা ও শাড়ির পাড় থেকে শুরু করে সূতীবস্ত্র ছাপা, টালি ও কালো মাটির থালা খোদাই এবং দরজা ও বাড়ির সামনে আশ্চর্য মডেলিং, যা বারাণসী ও অন্যান্য প্রাচীন শহরে প্রচলিত, এই ধরনের নানা বস্তু পর্যন্ত হতে পারে। অলঙ্করণ দক্ষতা ভারতে খুবই সাধারণ যেমন মাটি ও জল। প্রতিটি দীন রাজমিস্ত্রীর স্থাপত্য সৌন্দর্য সম্পর্কে নানা ধারণা ও অনুভূতি আছে। প্রতিটি নারী সুন্দর প্যাটার্ন সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটি শিশুর কোমল সূক্ষ্ম বর্ণের প্রতি সহজাত ভালবাসা আছে। আর মডেলিং-এর সহজাত শক্তি—সৌন্দর্যের ধারণাকে দৃঢ়, নমনীয় রূপ প্রদান হচ্ছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা এমন কাউকে পাইনি, যিনি এই সবগুলির মূল্য ও সম্পর্ক বোঝেন, যাতে সক্ষম হবেন তাদের আহ্বান করতে সচেতন ও স্ব-পরিচালিত হবার জন্য। এই ধরনের কাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু করা যেতে পারে।

এই দেশে হাতের কাজ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে না হস্তশিল্পে দক্ষতা অর্জন, সেটি পূর্ব হতেই আছে, নিঃসন্দেহে এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য হাতের আঙুল দিয়ে আহার অভ্যাসের। ভারতে এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বিদ্যমান বৃত্তির বুদ্ধিগত উৎকর্ষ সাধনে, সঠিক অনুমান শক্তি প্রদানে এবং যে দক্ষতা আমাদের আছে তা বিজ্ঞভাবে পরিচালনে, সেই সুযোগ দানে, যা একমাত্র আসে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে এবং প্রাচীন ও নতুন সভ্যতার যথার্থ তুলনা ও হৃদয়ঙ্গম করার অভিজ্ঞতায়। যদি কোন বালক এই প্রশিক্ষণের কোর্স সম্পূর্ণ অতিক্রম করে, শিক্ষার প্রথম মুহূর্ত থেকে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তার পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে স্নাতক হয় এবং শেষপর্যন্ত বিশদভাবে সজ্জিত

ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, আমি বলতে দ্বিধা করি না যে, সে ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে এবং রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজের নেতা হবার অবস্থায় পৌছোবে, আমরা যাদের দেখেছি তাদের থেকে জ্ঞানের ভারসাম্য ও সাবালকত্ব পৃথক ধরনের।

অবচেতন বুদ্ধির সেই শিক্ষা, যার সম্বন্ধে দাবি করা হয় যে একমাত্র ম্যানুয়েল ট্রেনিংই কার্যকর করতে পারে, এই ধরনের পরীক্ষায় হয় টিঁকে থাকবে, নয় মুছে যাবে। আর আনন্দ ও উপভোগের যে জগৎগুলি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক সাহিত্যের ছাত্রের কাছে সর্ব অবস্থাতে, যদিও যে উপকার এটি সাধন করে তার পক্ষে প্রধান যুক্তি না হলেও প্রতিপদেই সাক্ষী এগিয়ে আসে আমাদের বলার সঙ্গে যে আমরা যথার্থ পথেই চলেছি।

শিক্ষার প্রাথমিক বা কিণ্ডারগার্টেন স্তরে শুধু স্পর্শ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন নেই। পেস্তালোজি, মহান শিক্ষাদাতা—মানবতার অনুভূতির সাধক—আবিষ্কার করেছেন যে শুধু আধুনিক 'Anschau-ung' পর্যবেক্ষণ দ্বারা কিংবা যেমন তিনি এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, 'অনুভূতির ছাপ, চিন্তার অঙ্কুরোদ্গম অভিব্যক্তি'—দ্বারা জ্ঞান গড়ে ওঠে, বাক্য দ্বারা নয়। ফ্রোবেল, কিণ্ডারগার্টেনের জনক, ছিলেন পেস্তালোজির শিষ্য, ছেলেদের উন্নতির প্রথম অবস্থাগুলিতে গুরুর মহান নীতিগুলি প্রয়োগ করেন। অতএব কিণ্ডারগার্টেন হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক ধরনের শিক্ষা শুরু করার প্রচেষ্টার চেয়ে কিছু বেশি বা কম নয় এবং কাঠ, মাটি, পশম, ন্যাকড়া, কাগজ, প্রবাহমান জল, পেন্সিল, রং ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে সুসংবদ্ধ ও উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে নাড়াচাড়া করা, এর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষার উপাদান গঠন করে। যন্ত্রপাতি ছাড়া এই সমস্ত—জাতির প্রাচীন সরল যন্ত্রপাতি—চাকা, তাঁত, ভাটি—ব্যবহারে নিয়ে যায় মাধ্যমিক স্তরে, যেমন আমরা সেটিকে বিবেচনা করছি। আবার এইতে যান্ত্রিক ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের আমেরিকান উন্নতিকে স্থাপিত করা উচিত। আর যদি শিক্ষার সংগঠন এই প্রথায় আমাদের তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির ভারতীয় কয়েকজনকে আকর্ষণে সফল হয়, আমি বিনা দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে আজ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য ভারতে সন্ধান করবে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে ম্যানুয়েল ট্রেনিং দেবার উপায়গুলি, যেমন ভারত বর্তমানে পাশ্চাত্যে অনুসন্ধান করছে হাইস্কুল ও কলেজে কীভাবে এটি দেওয়া যায় সেই জ্ঞান।

শিক্ষায় হাতের কাজ প্রশিক্ষণ সম্পূরক বক্তব্য

হাতের কাজ প্রশিক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বিশেষজ্ঞ ডাঃ হ্যানফোর্ড হেণ্ডারসনের ভ্রমণ সারাদেশ জুড়ে তাঁদের ওপর এমন এক ছাপ ফেলেছে—যাঁরা শিক্ষার পদ্ধতি-গুলির উন্নতির জন্যে বিজ্ঞভাবে আগ্রহী—যে তিনি এখানে থাকাকালীন যে তথ্যগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে সময়ে সময়ে কিছু যোগ করার প্রয়োজন হয়েছে।

ডাঃ হ্যানফোর্ড হেণ্ডারসন ভালভাবে মনে রাখার মতো জোর দিয়ে প্রভেদ করেছেন এইগুলির মধ্যে (ক) শিল্পগত বা ব্যবসা-স্কুল, (খ) সাধারণ শিক্ষার উপাদানরূপে হাতের কাজ প্রশিক্ষণ এবং (গ) কারিগরী শিক্ষা; তিনটি একই ধরনের, যা দেখিয়ে দেবার কমই প্রয়োজন করে, বিশেষরূপে বৈজ্ঞানিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত। এগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যাপকভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না; সেটি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার এক উপাদান হিসাবে হাতের কাজ প্রশিক্ষণ। এই সম্পর্কে ডাঃ হেণ্ডারসন বলেছেন:

'এটি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়েছে যে, বুদ্ধির উন্নয়ন পরিকল্পনারূপে এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এমন কী সেই বালকদেরও শিক্ষার থেকে বাদ দেওয়া যায় না, যারা লেখাপড়ার জীবিকায় যেতে ইচ্ছুক। শুধু শিল্প-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ম্যানুয়েল ট্রেনিং হয়ে উঠেছে শিক্ষার এক বহু বিস্তৃত উদ্দেশ্য। বর্তমানে সারা আমেরিকা জুড়ে মাধ্যমিক শিক্ষার কোর্সে এটি প্রদান করা হয়, শুধু হাইস্কুলেই নয়, লোয়ার স্কুলগুলিতেও ক্রম-বর্ধমানভাবে সংস্কৃতির উপায়রূপে, ঠিক যতটা কম-বেশিভাবে জীবিকা অর্জনের উপায়টিকে দেওয়া হয়। আমরা প্রায়ই দেখি যে ম্যানুয়েল ট্রেনিং পাওয়া ছাত্র গণিতে ও অন্যান্য বিষয়ে, যাতে চিন্তার প্রয়োজন হয়, তাতে ম্যানুয়েল ট্রেনিং না পাওয়া ছাত্রের চেয়ে ভাল ফল করতে পারে।'

কিন্তু যখন স্কুলে ম্যানুয়েল ট্রেনিং হচ্ছে এইভাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা টেকনিক্যাল স্কুল সংক্রান্ত প্রশ্নের চেয়ে, সেই সঙ্গে এটি বাধাও পায় এই সত্য থেকে যে, এটি ওগুলির মতো প্রত্যক্ষ অর্থোপার্জনের উপায় নয়। আমাদের পাশ্চাত্যের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা ট্রেড স্কুলে বালক বা বালিকা রান্না, সেলাই, ছুতোরের কাজ, জুতো তৈরি আরও অনেক কিছু শিখতে পারে এক সহজ ধারণা নিয়ে যে, বাইরের জগতে বেরিয়ে সেই বিশেষ বৃত্তিতে একটি স্থান অনুসন্ধান করে নেওয়া। ভারতে বর্তমান-কাল পর্যন্ত শ্রেণী-ব্যবস্থা এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নাকোচ করেছে মানুষের বৃত্তিকে তার বংশগত করে দিয়ে এবং কারিগরের গৃহটিকেই এক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল করে দিয়ে। স্বর্ণকার বা রঞ্জকের পুত্র তার জীবনের কর্তব্য কাজটি শিশুকাল থেকেই শিক্ষা করে, যা আমরা জানি; আর যদি কোন নতুন প্রয়োজন, যা এইভাবে সম্পূর্ণ সরবরাহ করা যেতে পারে না, বর্তমান কালে নিজেকে অনুভব করায়, তবু ইংরাজের কলকারখানা বেশ কিছুটা শিক্ষাদান কার্য করে চলেছে এই বিশেষ

কাজটিতে তাদের, যাদের তারা নিযুক্ত করে। আর ভারত এখনও পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করেনি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সেই সম্পর্ক রেখে শিল্পজ্ঞানকে সংগঠিত করার প্রয়োজন, যাকে আমরা প্রকৃত শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা বলে গণ্য করব। সে সম্ভবত এই প্রয়োজন উপলব্ধি করবে প্রথমে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কিছু কর্মের দিকে, যেমন রেশম-চাষ, ফলের বাগান এবং ওই ধরনের সব।

যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা হচ্ছে এমন কিছু, যার প্রয়োজন ভারতের উচ্চশ্রেণী সহজেই বোঝার মতো অবস্থায় আছে এবং যার জন্য তারা অনেক রকম প্রচেষ্টাও করেছে—নিজেদের সুবিধার জন্য যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যন্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা সুন্দর জীবিকা প্রদান করতে পারে তাকে, যে এই বিদ্যা আয়ত্ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বাস্তবিক এটা খুবই আশ্চর্যকর যে বহু দেশীয় রাজ্য বহুকাল পূর্বেই এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা দেখতে পাইনি যে শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক তাদের নিজেদের আধুনিকভাবে সংগঠিত ও উন্নতি করতে হবে এবং বহুসংখ্যক তরুণকে আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে প্রেরণ করতে হবে যাতে যখন সেই সময়টি আসবে, তখন তারা ইউরোপীয়দের বদলে নিজের প্রজাদের কাজকর্ম দিতে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষে এত কাজ করার পড়ে আছে, সেই কাজগুলি দেশীয় রাজ্যসমূহ নিজেদের প্রেরণায় স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারত। সেই কর্তব্যগুলি হচ্ছে স্যানিটেশানের কাজ, বৃক্ষস্থাপনের কাজ, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, সেচের খাল কাটা ও পরিষ্কার করা, রেলপথ তৈরি, আরও কত কী এবং এই ব্যাপারে সংস্কারের এখনও প্রচুর অবকাশ আছে, ভারতীয় যুবরাজ ও ধনী ব্যক্তিদের এখনও প্রচুর সময় রয়েছে নিজেদের রাজনীতিজ্ঞ বলে প্রমাণিত করার বিজ্ঞজনোচিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্মধারা গ্রহণ দ্বারা।

তবুও টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল শিক্ষা যে কোন সময়ে এক পুরুষের মধ্যেই—জাতীয় কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, কিন্তু এই কাজের প্রধান শর্ত হচ্ছে যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাসহ পরিচালনা করার মতো একটি মনের অস্তিত্ব। সাহিত্য-কলা শিক্ষায় উপাদানরূপে ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের স্থান কিন্তু অন্যরকম। শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকের ক্ষেত্রে এটি সোজাসুজি অর্থোপার্জনের দিকে পরিচালিত করে না। এক ব্রাহ্মণ কখনও ছুতোর হবে না যেহেতু কেবলমাত্র স্কুলের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে সে কাঠের কাজের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। যা হোক, সে নিশ্চয় নিজেকে আরও মৌলিক ও পুরুষসুলভ বলে প্রমাণ করবে চিন্তায় ও চরিত্রে তার গৃহীত সকল কাজগুলির মধ্যে। ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের পরোক্ষ প্রভাব, যাকে বলা যায় তার শিক্ষার মূল্য, তা হচ্ছে পুরস্কারের অতীত। কিন্তু এর প্রত্যক্ষ কাজগুলি খুব স্পষ্ট নয়। আর এর উচ্চতর মূল্যের অনুপাতে একটি সম্পূর্ণ রাজ্যের সাধারণ শিক্ষার পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার অসুবিধাও উচ্চতর। এটি শুধু অর্থ ও 'যন্ত্রাদি'র প্রশ্ন নয়। এটি বেশি করে হচ্ছে মাত্রার ব্যাপার যাতে শিক্ষার ধারণাটি স্বয়ং পরিপুষ্ট হয়েছে এবং কাজের এক বিশেষরূপ এর অভিব্যক্তির উপায় সৃষ্টি করে। আর এটা পালাক্রমে হচ্ছে যেমন সময়ের তেমন

ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন। অতএব ম্যানুয়েল ট্রেনিং প্রথম সূত্রপাতের সময় যেন হবে প্রধান দপ্তরের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার এবং সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশে এর প্রয়োজন বেশ কিছুটা সময় সুসংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। ম্যানুয়েল ট্রেনিং আবার সস্তার ব্যাপার নয়। অন্যদিকে ডাঃ হেণ্ডারসন আবার দেখিয়ে দিয়েছেন, 'সামাজিক-ভাবে ও অর্থনৈতিক উভয়ভাবেই এর প্রতিদান এত মূল্যবান যে খরচের উপযুক্ততা একশো গুণ হয়ে দাঁড়ায়। এক সুন্দর ক্ল্যাসিক্যাল স্কুলের চেয়ে এক সেই ধরনের সম্পূর্ণ সজ্জিত ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলে খরচ বেশি পড়ে তার যন্ত্রপাতির জন্য, কিন্তু সেটিকে পরিচালিত করে যাওয়ার জন্য খুব বেশি খরচের প্রয়োজন হয় না। যেমন অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তেমনি এই ক্ষেত্রেও প্রথম পদক্ষেপেই খরচ পড়ে।'

অভাব যখন এত বিরাট, তখন এটি খুব আনন্দকর বিস্ময় যে ডাঃ হেণ্ডারসন যে বিষয়টির ওপর ভারতীয়দের কৌতূহল ও আগ্রহ জাগাতে পেরেছেন তা হচ্ছে এই ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলগুলি। আর যে প্রশ্নটি স্বভাবত প্রথমে আসে তা হচ্ছে, 'ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের প্রথম পরিচয় স্কুলগুলিতে কেমনভাবে করানো যেতে পারে?'

এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যে ম্যানুয়েল ট্রেনিং সেখানকার জীবন ও সংস্থাগুলির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যকর। তার মানে বলা যায়, প্রথা স্বয়ং ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা প্রস্তুতি সৃষ্টি করে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সাধারণ জীবনে বিরাট বিলাসিতা প্রতি ব্যক্তির কাছে দাবি করে ব্যবহারিক বস্তুগুলির উপর কর্তৃত্ব করার কম-বেশি শক্তি। আর এই দাবিকে সাহায্য করে জনজীবনের মাত্রার কঠোরতা।

তারপর আবার আদর্শ শিক্ষায় কিণ্ডারগার্টেন হচ্ছে সর্বাগ্রগামী এবং ম্যানুয়েল ট্রেনিং শিক্ষার স্তরের সঙ্গী হয় খেলার মাঠ। হাতের দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ক্রিকেট ও টেনিস কম সাহায্যকারী নয় এবং অন্তত ইংল্যাণ্ডে যে বালক বা বালিকা ব্যায়ামের চেষ্টা না করে শুধু বই নিয়ে রোগা হয়ে যায়, তাহলে সে তার সহপাঠীদের কাছে অলস বা খারাপ বলে নিন্দিত হয়। আনন্দের মধ্যে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম পাশ্চাত্যের সম্ভবত হচ্ছে তাপস, প্রাচ্যের প্রার্থনা ও উপবাসের সমতুল্য। আর আমি কখনও ভুলতে পারব না স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে শেষ চড়ক পূজার দিনটিতে, তিনি বেলুড়ের কয়েকটি ক্রীড়া দেখে আমার কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে হিন্দুদের চড়ক পূজা ব্যায়ামাগারে করা উচিত।

আমাদের কল্পনা করে নেওয়া যাক কিণ্ডারগার্টেন, খেলার মাঠ ও চমৎকার শিক্ষক সমেত সর্ববিষয়ে সুসজ্জিত এক পাশ্চাত্য স্কুল, এই স্কুল থেকে বের হওয়া বালকের ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের ইতিহাস কী হবে? এটি এক বাস্তব প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার চরিত্র সম্ভবত ভালভাবে প্রকাশ করবে।

কিণ্ডারগার্টেনে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই শিশু শিক্ষা করতে থাকে যে হাত, চোখ ও মনের সমন্বয় সাধন বৃত্তিকে পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়ে আরও বেশি দূর অগ্রসর করিয়ে দেওয়া হবে। যে দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা হয় তা খুবই সরল এবং এমন সব পদার্থ দ্বারা গঠিত, যা শিশু তার নিজের খেলার মধ্যেই গ্রহণ করে নিতে পারে—কাদা,

বালি, কাগজ, পশম ও কঠিন আর কোমল ছোট ছোট বস্তু। যেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন, সেগুলিই শিশু মনের কাছে সাধনার বস্তু। আঙুলগুলি যখন এক মাটির পাত্র গড়ে বা এক কাগজে ফুল কাটে তখন সমস্ত বৃত্তিগুলি একাগ্র হয়ে থাকে আর যদি কেউ এই মনোনিবেশের উপযুক্ততায় সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া হোক যে কোন শিশুকে খুব সহজ একটি জিনিস শেখাতে, যেমন 'গোলাপ ফুল লাল' শুধু বাক্য দ্বারা এবং আর একটি শিশুকে ওই একই জিনিস গোলাপটি সত্যি করে তার কাছে এনে এবং তারপর সরিয়ে নিয়ে তারপর সে পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করুক, ধরা যাক রঙীন খড়ি দিয়ে এবং দেখুক কোন পদ্ধতি গভীরতরভাবে মনে প্রবেশ করে আর চিরস্থায়ী প্রভাব উৎপন্ন করে।

যা হোক, সাত বা আট বছর বয়সে এমন কি সবচেয়ে পশ্চাদ্‌পদ বালকও কিণ্ডারগার্টেন পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই অল্প বয়সে কিছুতেই সে প্রস্তুত হতে পারে না কাঠ, ধাতু ও কাদা নিয়ে চার বছরের সমান্তরাল কোর্সের জন্য, যে সম্পর্কে ডাঃ হেণ্ডারসন অমন বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সময় থেকে বালক বা বালিকার দশ বা বারো বছর বয়স পর্যন্ত ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের সঙ্গে কোন প্রকার সংযোগের প্রয়োজন, যাতে বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হয়, যা তখন প্রয়োজন, অথচ এমন কোন দৈহিক চাপ সৃষ্টি করবে না, যা মোকাবিলা করার শক্তি তার নেই। এটিকে বলা হয় শিক্ষার প্রস্তুতি বা উত্তরণের কাল। এটি অবশ্য অনুমান করে নেওয়া হয় যে শিশুর সারাদিনের শিক্ষার সমস্ত কোর্সটি যতদূর সম্ভব বাস্তব করা হয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয় বালি ও কাদা দ্বারা রিলিফ-ম্যাপের মডেল করার মধ্য দিয়ে; উদ্ভিদবিদ্যা ও জাতীয় ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় এমনভাবে যাতে পেন্সিল ও রঙের তুলির ব্যবহার জড়িত থাকে, তাছাড়াও এমন বস্তুর প্রয়োজন হয়, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে হাতের দ্রুত ও সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ ক্ষমতার উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান পেশীগত বাধাগুলির অপসারণ এবং বস্তুগত অসুবিধার ব্যাপারে মস্তিষ্কের দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা। আমেরিকার স্কুলে কার্ড-বোর্ড মডেলিং ও স্লোয়েডের মতন বিষয় দ্বারা এই সংযোগ সরবরাহ করা হয়।

কার্ড-বোর্ড মডেলিংয়ে যন্ত্র হিসাবে শিশু ব্যবহার করে পেন্সিল, মাপকাঠি, কম্পাস ও ভাল শক্ত ছুরি। প্রথমে কার্ড বোর্ডটি ঘর কাটা হতে পারে, তার মানে, চৌকোণা ঘর তাতে মুদ্রিত থাকে। তার উপরে শিশু নির্দেশ মতো মাপজোপ করতে শেখে ছোট বাক্সের ও বাক্সের ঢাকনার এবং তারপর প্রয়োজনীয় অল্প গভীরতার সঙ্গে কাটতে শেখে ধারগুলি মোড়ার জন্য এবং প্রতিটি খণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে কাটতেও শেখে। সাধারণ চার কোণা বাক্সের পরে ঢাকা সমেত পাঁচকোণা বাক্স করা হয় এবং তারপর একটার পর আরেকটা, এইভাবে আটকোণা আকারের পর্যন্ত শেখানো ও আয়ত্ত করানো হয়। তারপরে শিশু দৈনন্দিন ব্যবহারের ছোটখাট বস্তুগুলি নেয়, যেমন খাম, স্টেশনারী স্ট্যাণ্ড, পুতুল, ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্য এবং সেগুলি তৈরি করে মুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের ব্যায়াম হিসাবে।

কার্ড-বোর্ড মডেলিং থেকে সে যায় স্লোয়েডে, ছুতোরের কাজের এক সহজ কিন্তু

গুরুতর বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষণীয় রূপ, যেটি তার প্রাথমিক স্তরে প্রায় এক সাধারণ স্কুল-ঘরেই শিক্ষা দেওয়া যায় এবং কিছু পরবর্তী কালে প্রয়োজন হয় কার্পেন্টার্স বেঞ্চ ও কিছু দামী যন্ত্রপাতি। সুইডেনের নাস নামক স্থানে দশ বা পনেরো বছর আগে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে স্লোয়েডকে সুসংবদ্ধ ও পরিশীলিত করা হয়েছে। আর আজকাল শিক্ষকদের ট্রেনিং ও ডিপ্লোমার জন্য সেখানে যেতে হয়। কিছু ভারতীয় শিক্ষককে স্লোয়েড শেখার জন্য সেখানে পাঠানো যেতে পারে, যাতে ফিরে এসে তারা সেটিকে এখানে জনপ্রিয় করে তোলে বিশেষ সুবিধার জন্য। স্লোয়েড কোর্সে 'মডেল' নামে কিছু সংখ্যক কাঠের বস্তু স্কুল-ঘরেই ক্ষুদ্রাকারে প্রস্তুত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাদের মধ্যে থাকতে পারে পয়েন্টার (খুব যত্ন সহকারে নির্মিত এক ছুঁচালো লাঠি), কাগজ কাটা ছুরি, পেন্সিল (অবশ্য লেখার বস্তুটি তার মধ্যে ঢোকানো থাকে না), কাঠের টালি বা মাদুর, ফ্রেম, বইয়ের অনুকরণে ব্লক এবং এই ধরনের সব। আর একটি কোর্সে এর থেকে আরও জটিল আকারের সব দেওয়া হতে পারে, যেমন ভাঁজ করা ব্লটিং-বুকের মডেল, টি-স্কোয়ার, বাতিদান, ছোট চৌকি, তোয়ালের রেল, জানলার ফ্রেম ও এইসব। এই সমস্ত মডেল যখন শিরীষ কাগজে ঘসে ও সমান করে সম্পূর্ণ করা হয় তখন এক ইঞ্চির একের চৌষট্টি ভাগ সূক্ষ্মতা নির্ভুলভাবে প্রত্যাশা করা হয়, যার থেকে এই কোর্সের শিক্ষার মূল্য সহজেই বোঝা যেতে পারে।

কিন্তু যদিও নাস হচ্ছে স্লোয়েড কোর্সের ও ডিপ্লোমার প্রধান ও কেন্দ্রস্থান, তবুও সারা পৃথিবীতে এর কোন যুক্তি নেই কেন ভারতীয় বিদ্যালয়-গৃহগুলি নাসের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করবে এই বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোর্স তৈরি করার জন্য। স্লোয়েড বর্তমানে যেমন হয়েছে, তেমন সুসংবদ্ধ বিষয় হওয়ার আগে নিশ্চয় এক দীর্ঘ পরীক্ষার স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে ছিল (১) শিক্ষকরা নিজেরাই ছুতোরের কাজের রহস্যগুলি শিক্ষা করছিলেন, (২) যা তাঁরা শিক্ষা করেছেন তাকে স্কুল-গৃহের প্রয়োজনের উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা, (৩) তাঁদের সিদ্ধান্তগুলিকে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক ও সংখ্যার বিশ্লেষণে নামিয়ে আনা, যা স্লোয়েডকে আজ যা হয়েছে তাই করে তুলেছে। ভারতীয় শিক্ষকরা এই পরীক্ষার অবস্থাকে কেন ফিরিয়ে আনবেন না? ম্যানুয়েল ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে, কেন তাঁরা সুচিন্তিতভাবে লক্ষ্য করবেন না এক ভারতীয় স্লোয়েড সৃষ্টির, একটি শিক্ষার কোর্স হিসাবে? আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, কিছু দেশীয় রাজ্যের দ্বারা প্রদত্ত কিছু পুরস্কার ও বৃত্তি—রাজ্যের নিজের প্রজাদের একটু সুযোগ দানের সঙ্গে সারা দেশের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত,—বহুসংখ্যক বাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টার জন্মদানের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এই ব্যাপারে পাশ্চাত্যে জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তি খুবই উন্নত এবং গভর্নমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি শিক্ষার নতুন অঙ্গগুলি গ্রহণ করে সেগুলি শুধু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত হওয়ার পরেই। আমেরিকায় মিসেস কুনেরী শ নামে পরিচিত এক ধনী মহিলা নিজের ব্যক্তিগত ব্যয়ে দু বছর ধরে স্লোয়েডের প্রশিক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং তারপরে তার পরীক্ষার ফলগুলি ম্যাসাচুসেটস রাষ্ট্রের হাতে প্রদান

করেন, যখন তিনি এই কার্যের উপকারী চরিত্রটি প্রমাণিত করার সাফল্য লাভ করেন। ভারতেও এই ধরনের কাজ কখনও কখনও ধনী ব্যবসায়ী বা রাজারা করে থাকেন। কিন্তু এই কর্মের অসীম ব্যাপ্তির প্রয়োজন। আর আমরা এখানে এটি যথেষ্ট বুঝতে পারিনি যে আমাদের মধ্যে কোন একজন এই কার্য করার পক্ষে যথেষ্ট ধনী নয়, পাঁচ বা ছজনে যুক্ত হয়ে পারি। একদল শহরে লোক তাদের সন্তানদের গভীরতর শিক্ষার প্রয়োজন বুঝতে পেরে হয়তো এই ধরনের লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা হয়তো এক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ শিক্ষকের সাধারণভাবে ব্যয় বহন করতে পারেন যখন প্রয়োজনীয় কোর্সটি স্থির করার কাজ চলছে, কিংবা তারা একাজও করতে পারেন—যদিও আমি মনে করি না এসব ক্ষেত্রে তার কোন রকম প্রয়োজন আছে—পাশ্চাত্যে কোন ব্যক্তিকে এই কাজের ভার দিয়ে পাঠালেন, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার ফলগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য।

এটা স্পষ্ট যে এই কাজের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মানুষ, যাঁরা মোটামুটিভাবে শিক্ষা কী তা বোঝেন। তাই কিছু পরিমাণ বুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অকাজের হয়ে পড়বে, যদি না প্রকৃত কাজ করার কিছু শক্তি সেই সঙ্গে থাকে, কর্মীসুলভ কিছু দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং গণিতের দিকে অল্প একটু ঝোঁক।

এই ধরনের প্রচেষ্টার প্রথম প্রজন্মে কিছু প্রতিভার কিংবা সেই উৎসাহ যা প্রতিভার কাছাকাছি পৌছোয়, তার একান্ত প্রয়োজন। আর আমি ভাবি, যদি আমি ভারতীয় কোন মহারাজা হতাম, যে পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করার মানুষ খুঁজছে, তাহলে আমি তাদের সন্ধান করতাম আর্ট-স্কুলে, স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের অফিসে, এমন কী মেডিক্যাল কলেজে ও বিজ্ঞানের গবেষণাগারে। মানসিক সংস্কৃতি সেখানে নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু হাতের প্রমাণিত দক্ষতা তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন।

ধর্মাচরণ ও ধর্ম
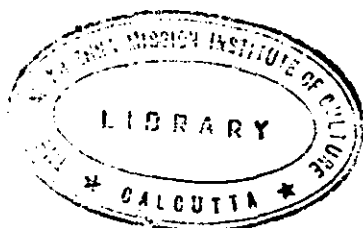
প্রতিটি ধর্ম কোন না কোন বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে বর্ধিত হয় যেমন মিশরে মৃত্যু, পারস্যে সৎ ও অসতের রহস্য, খ্রীষ্টধর্মে ঐশ্বরিক মহাপুরুষের পরিত্রাণকারী প্রেম ইত্যাদি ভাব সমূহ। একমাত্র হিন্দুধর্মের লক্ষ্য বৈরাগ্য ও মুক্তি এবং কোন কিছুই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। বাস্তবে এটি হিন্দুধর্মের দুর্বল দিক। স্বামী বিবেকানন্দ যে অভাব অন্তরে তীব্রভাবে অনুভব করতেন, সে প্রসঙ্গে আধা-আনন্দের সুরে বলতেন, "এই দোকানে শুধু ত্যাগ আর মুক্তি! সংসারীর জন্য কিছুই নয়!" হিন্দুধর্মের মহত্বের এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে গুণ, তা হোল যে ধর্মের সংস্পর্শে হিন্দুধর্ম আসুক না কেন, প্রতিটি ধর্মীয় ভাবকে সমন্বয়-সাধনের মধ্যে নিয়ে আসার শক্তি। ধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্মের আত্মসাৎ করার ও সভ্যতা হিসাবে প্রতিরোধ করার শক্তি, উভয়ের যোগফল মানব-ইতিহাসের একটি চমকপ্রদ ব্যাপার, যা আত্ম-বিরোধী অথচ সত্য-বিরোধী নয়। মূলত ধর্মের প্রকৃত জাল থেকে আহরণ করা সেই সংযোগ রক্ষাকারী উপাদান ছিল দর্শন, যা বেদান্ত নামে পরিচিত; মুসলমান ও খ্রীষ্টানযুগে সংস্কারবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল নতুন আদর্শের ক্ষীণ আলোকপ্রাপ্তিজনিত মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।

এখন হিন্দুরা দেখছে, দেশের ধর্মীয় প্রেরণার ওপর মহত্তম আহ্বান জীবনের সমগ্র নতুন বিস্তৃতিকে অঙ্গীভূত করার প্রয়োজনের মধ্যে নিহিত। জীবন সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিগুলিকে আমাদের সম্ভব করে তুলতেই হবে। মুক্তি নয়, স্বর্গই যাদের একমাত্র কামনা, তাদের জন্য অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা থাকবে। থাকবে ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার স্বীকৃতি। কৃতকর্মের মধ্যে থাকে ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতার পক্ষে প্রয়োজন ত্যাগ। একজন মহৎ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎপটে প্রয়োজন হাজার সৎ নাগরিকের। তবেই নাগরিকত্ব ও সন্ন্যাস উভয়ক্ষেত্রে দার্শনিক ধ্যান-ধারণা থাকতে বাধ্য।

বাস্তবে উচ্চমার্গের কোন বিষয় তার সহযোগী বিষয়ের নিন্দা বা ত্রুটি ঘোষণা করে না। আদর্শ চিরকাল অসীম ও চিরকালই স্বর্গীয়। একটি উচ্চ আদর্শসম্পন্ন সমাজ মহত্তম সাধুদের জন্ম দান করে। পিতা-মাতাদের পবিত্রতার ফলেই অবতারদের আবির্ভাব সম্ভব। যে সমাজে বিবাহিত জীবনের বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয়, সেখানে সন্ন্যাসের আন্তরিকতাও সম্ভব হয়, অসচ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খলদের মধ্য থেকে হয় না। অনুরূপভাবে, উচ্চ ধর্মীয় আদর্শকে রক্ষা করার জন্য সম্মানযোগ্য নাগরিকদের প্রয়োজন এবং তাদের আচার-আচরণের প্রকাশ মঠবাসীদের মত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু তা হলেও, আমাদের নতুন লক্ষ্য নিয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্র ও শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। আমরা খুঁজে দেখব, আধুনিক জগতের উপযুক্ত কাজ পৌরুষের সঙ্গে সম্পাদনের দায়িত্ব পালনের পক্ষে সবটুকু সমর্থন ও সাহস। আত্মত্যাগ কর্মের মধ্যে অর্জিত হতে পারে, আবার কর্মত্যাগের দ্বারাও হতে পারে। এ বিষয়ে হাজার হাজার পাঠ আছে আমাদের, কিন্তু সন্ন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত পূর্ব ধারণা আমাদের ধর্মের অনুকূলে সবকিছুকে অবজ্ঞা করার পথে নিয়ে গিয়েছে। সাত্ত্বিক

আদর্শের অভাব ইউরোপীয় সমাজের দুর্বল দিক সত্য। কিন্তু হিন্দুধর্মেরও দুর্বল দিক গৃহস্থ ও নাগরিক আদর্শের গুরুত্ব না থাকা। তার সবচেয়ে বড় কারণ, যখন শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল, তখন ধর্ম ও বৈষয়িক সঙ্গতির দিক থেকে সমাজ খুবই উন্নত ছিল। এগুলির মধ্যে শেষেরটি যখন অন্তর্হিত হয়, তখন আগেরটির কদরবোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আজ যেটা প্রয়োজন, বিশেষ বিচার বিবেচনা করে দুটি বিষয়কেই পুনরায় আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা।

এজন্য আমাদের কর্মের শীর্ষে উঠতে হবে। এই জগৎকে দেখতে হবে একটি বিদ্যালয়ের মতো, শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়নের জন্য যেমন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ঠিক তেমনই। শেষ লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য চাকায় কাঁধ লাগিয়ে সংগ্রাম করে যেতে হবে অবিরাম। আমাদের দর্শন অনুসারে এই জীবনের পরিসরে সম্পূর্ণ প্রগতি অসম্ভব। কিন্তু আংশিক বা আপেক্ষিক প্রগতি সম্পূর্ণ সম্ভব। যেহেতু আমরা এই আপেক্ষিকতার ভূমিতে বিচরণ করি, আমাদের অবশ্যই এমন কাজ করতে হবে যেন ঠিক পরবর্তী পদক্ষেপ পূর্ণতায় ধন্য হয়।

এমনকি, তুলনামূলক ব্যাপারে আমাদের সামনে আদর্শস্থানীয় নীতি উপস্থাপিত করা যাক। অত্যন্ত আকস্মিক এক প্রশ্নের উত্তরে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে একজন মিস্ত্রী দুবার জবাব দিয়েছিল, "আমি শুধু ভাল স্ক্রু তৈরী করি না, যা সবচেয়ে ভাল হতে পারে, তাই প্রস্তুত করি।" এই আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত। সর্বোত্তম সম্ভব স্ক্রুই আমাদের তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাপারেই এমনটি হওয়া চাই। আমাদের পেতে হবে খুব ভাল নয়, সবচেয়ে ভাল; খুব কঠিন নয়, সর্বোচ্চ। চরম অপেক্ষা একটুও কম নয়। কোন কিছুই সরল সোজা নয়। কোন কিছুই সস্তা নয়। যে শক্তির দ্বারা একজন কঠোর তপস্বীর সঙ্কল্প হতে পারে, তার দ্বারা একজন শ্রমিকও হতে পারে, যদি তার ফলে মায়ের উদ্দেশ্য ভালভাবে সাধন করা যায়।

আমাদের বন্ধুদের জন্যও আমাদের আদর্শ উচ্চতর হোক। কোন লোকই না যেন অসৎ সংসর্গ করে। সন্ন্যাসী অথবা নাগরিক যে কোন মানুষই মহৎ হোক। ব্রাহ্মণ অথবা পারিয়া, যে কেউ হোক না কেন আত্মসম্মান অভ্যাস করুক এবং একে অন্যের নিকট সমান দাবি করুক। আমরা নিষ্ক্রিয় থেকে একজনকে পশুতে পরিণত হতে দিয়ে কাউকেই সাহায্য করি না।

বিদ্যালয়ে ধাপে ধাপে শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সব শিক্ষা একই ধরনের। সবই সমানভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের সভ্যতার অবস্থাও একইরকম। একজন সন্ন্যাসীর ত্যাগের মতো একজন ব্যবসায়ীর সততা পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই, কারণ জগতে সৎ লোকেরা না থাকলে ধর্মীয় শৃঙ্খলারও অবসান হতে পারে।

এইভাবে হিন্দুধর্মকে বাস্তব ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রয়োজন সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে নিজের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার নিজেরই অভ্যন্তর থেকে টেনে আনতে হবে ও বাহ্যত বিপরীত আদর্শগুলির সঙ্গে সমন্বয়-সাধন করতে হবে। অতি-সামাজিক জীবনের পরিচয় সমাজের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে। ধর্মোপদেশের লক্ষ্য শুধু অরণ্যের সাধুই নয়, শহরের কসাই ও গৃহবধূরও আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

মুক্তি

একটি জাগ্রত এবং তরুণ বোধশক্তি সব প্রশ্ন থেকে একটি প্রশ্ন বার বার জানতে চাইবে, যেটির চেয়ে আর কোন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির নিশ্চয়তা অনেক কম, তা হোল, "মুক্তি কি ?" আমাদের মধ্যে অনেকেই সত্যিকারের মুক্তির জন্ম জন্মেছে, আমাদের নিজেদের মুক্তি। কিন্তু আমরা সকলেই কোন না কোন কিছুর সংগ্রামের জন্ম জন্মেছি। মানুষকে এমন কোন ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে কল্পনা করা যায় না, যে কৃত্রিম পরিবেশে তার সংগ্রামের সব ইচ্ছা মুছে যেতে পারে এবং কোন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার মানবিক অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে। এরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থা উপলব্ধি করে যাবজ্জীবন বন্দী এমন একজন মানুষের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি, যদি তাই হয়, যেহেতু তার সমগ্র কর্ম-কল্পনা সামাজিক অথবা দৈহিক, তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। অথবা ধনী বা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা, অথবা উদাহরণস্বরূপ, রাজপুরুষেরা যে খাঁচার মধ্যে বাস করে, তার ফলে একটি স্বভাবের ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, তা হোল, সে ইন্দ্রিয়গত আনন্দের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দেবে বেশ ভালভাবে এবং নিতান্ত মূর্খের মত আত্মোন্নতির পথ খুঁজবে। কিন্তু তা হলেও, যে কখনও সংগ্রাম করেনি তার বিকাশ নির্বোধের মতই হবে। ন্যূনপক্ষে এটি সত্য। আমাদের সব প্রাণবন্ত সত্তা ও বুদ্ধিমত্তা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। এর অভাবের ফল আকৃতিহীন অক্ষমতা।

একথা বলা হয়েছে, স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির জন্ম প্রচেষ্টা করে কি করে না, এর দ্বারা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়ে থাকে। এটা সত্য হতে পারে। কারণ, কোন সন্দেহ নাই যে, বুদ্ধি দিয়ে যে জিনিস আমরা নির্ধারণ করতে পারি না, আমরা তার জন্ম প্রচেষ্টা করতে পারি, এমনকি উপলব্ধিও করতে পারি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এ বিষয়ে বা অন্ত বিষয়ে মুক্তি অর্জন করতে পারি এবং ক্রমে ক্রমে কম বেশী পূর্ণ মুক্তি গড়ে তুলতে পারি। অনেকে অধিকারের নামে মুক্তির জন্ম চেষ্টা করে থাকে। "ঈশ্বর এবং আমার অধিকার" একটি বিধি যা আত্মার এরূপ কতকগুলি প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত। একমাত্র হিন্দুধর্মই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম শক্তিতে স্বীকার করে, বস্তুর ওপারে যা আমাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য, তা মুক্তির জন্ম আত্মার যথার্থ তৃষ্ণা। এবং এই মুক্তি আত্মোন্নতির একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। ধর্ম বলে, যে মানুষ মুক্ত, সে নিজেই নিজের মধ্যে পূর্ণ। যে মানুষ প্রকৃত এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খুঁজে পায়, সে সবদিকেই মুক্ত এবং সব বন্ধন থেকে মুক্ত।

মুক্তির একটি অনিবার্য চরিত্র-লক্ষণ এই, সব সময় কোন কিছুর বৈপরীত্যে একে উপলব্ধি করতে হবে। সরল অথবা যৌগিক প্রচেষ্টা যে রকম হোক না কেন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র সত্তার প্রচেষ্টা এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আত্ম-পরিচালনার ও জৈবিক-নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা। পৌরুষসম্পন্ন পুরুষদের পক্ষে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার

চাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ প্রয়োজন। একজন প্রকৃত পুরুষ সমাজের ইচ্ছানুসারে কোন নির্ভুল কাজ পছন্দ করতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, সামাজিক বাধ্যবাধকতায় নয়, এ কাজ তার নিজেরই পছন্দ। এ ব্যাপারে যে কোন বড় রকমের আশঙ্কা যথেষ্ট স্থূলত্বের পরিচয়, যেহেতু যারা পুরুষালি পুরুষ তারা নিজেদের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজেদের শক্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং এই স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বা হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় সব সময়ই অভ্যস্ত। একমাত্র যে শিশুটি নিজেকে এতটুকুও বড় মনে করতে পারেনি, নিজের প্রত্যাখ্যানের স্বাধীনতা আঁকড়ে থাকতে চায় বলে, তাকে যাই চাওয়া হোক, সে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন মনে করে। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি, অসার দম্ভ, স্বার্থপরতা, আত্ম-আচ্ছন্নতা এবং অপরের প্রয়োজনের প্রতি ঔদাসীন্য—যা বয়সের এই অবস্থায় উচ্চ ও কষ্টসাধ্য সহযোগিতার পক্ষে অনুপযোগী স্বভাব গড়ে তোলে। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিরা তাঁদের নিজেদের স্বাধীনতাকে প্রতিরোধ করার শক্তি নিয়েই জন্মান, যেন তাঁরা দেওয়ার আগ্রহশীলতাতেই পূর্ণ, এবং সেবার যে কোন সুযোগ পেলেই বিশেষ অধিকার হিসাবে গ্রহণ করতে উন্মুখ। এরূপ চরিত্র আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাই। মনুষ্যজাতির মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা দুর্লভ নয়। পরন্তু, এইটি আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণে ইটের সঙ্গে যুক্ত মশলা।

তাহলে, সমাজ একটি অন্যতম শক্তি যার বিরুদ্ধে মানুষকে তার নিজের স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে হবে, সমাজ এমন একটি ক্ষমতা, যা থেকে তাকে পরিশ্রম করে পেতে হবে। কিন্তু প্রশ্নটি আবার ফিরে আসে, কি সে মুক্তি যার জন্য মানুষের এই সংগ্রাম? এবং এখানেই চূড়ান্ত প্রতারণার অন্যতম প্রশ্নটির উৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করে নিজ নিজ আবেগপ্রবণতা অনুযায়ী মুক্তি দাসত্বের সঙ্গে অভিন্ন। এ সেই মুক্তি, যা মানুষকে মাতাল, লোভী, লম্পট করে তোলে।

প্রথমেই আমাদের সব কাজ, আমাদের গুণের সব বিকাশ ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। পরে ইচ্ছা ব্যাধির আকারে দেখা দেয়, যা থেকে আমাদের রোগমুক্ত হতেই হবে। এ কি সত্য? ইচ্ছার গতিবেগ, যা অনিবার্যভাবে আমাদের নিজস্ব খেয়ালের কাছে নতিস্বীকার করে, তা মুক্তি নয়। এটা সর্বশেষ এবং সূক্ষ্মতম আকারের বন্ধন, এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ভুল করতে বাধ্য, তাই এটি মারাত্মক ও মৃত্যুতুল্য। নিজ ইচ্ছার স্বরূপ উপলব্ধি করার স্বাধীনতা মুক্তির একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত হতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ আর সব সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মতো, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ইচ্ছা ও দেহ এবং মনের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে পারি, আমরা জানি না প্রকৃত মুক্তি কাকে বলে। জীবনের উত্তরাধিকার, যেখানে মুক্তি অর্জিত হয়েছে, আত্মার সেই দিব্যধামে কী বিপুলতা, কী শান্তি, কী তীব্র আনন্দ ও চির-উজ্জ্বল করুণা মানুষের জন্য অপেক্ষা করে আছে! যে কোন পথে, যে কোন উপায়ে এর প্রকাশ ঘটতে পারে। কেবল মুক্ত পুরুষই জানে মুক্তি কাকে বলে এবং তিনিই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিভাবে সেই স্বাধীনতার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যিনি নিজের দুর্বলতা বা অন্যের বাধায় বাধাপ্রাপ্ত নন, কেবল সেই মুক্ত পুরুষের কর্মই

শক্তিশালী। মুক্ত! মুক্ত! মুক্তিই আত্মার শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ। প্রত্যেক হিন্দুর জানা আছে, "যে রাত্রে সব গরুকেই কালো দেখায়" তা অপেক্ষা খুব বেশীও নয়, দিনের সেই আলোর উষালগ্ন বিশ্বের প্রতিটি কোণে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু, তা হলেও আমরা যখন এর সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করি, এক চিরন্তন অসম্ভবের মুখোমুখি হই, তখনই কেবল আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "নেতি! নেতি! এ নয়! এ নয়!"

একজন সেনানীকে শিখতে হয়, আনুগত্য তার প্রার্থনার অঙ্গ। যখন বিশ্রামের সময়, তখন যদি কেউ জপ করে, এবং পরে কাজের সময় নিদ্রালু হয়, তবে সেটা কোন উৎকৃষ্ট গুণের পরিচয় নয়। এ পথে পুণ্য হয় না। হাসিখুশি বালকের হৃদয়বত্তা, অপরদিকে মা যদি বলেন "দৌড়ে গিয়ে খেলা করো", তখন মায়ের সব কথা ভুলে যাওয়া,—এই প্রকৃত ভক্তি এবং অসংখ্য প্রণামের চেয়ে ভাল।

স্বামী বিবেকানন্দের কী অপূর্ব আবিষ্কার যে, মনুষ্যচিত কর্ম প্রায়ই সমগ্র ধার্মিকতার প্রমাণ হতে পারে! কোন কোন জাত কেবল প্রবৃত্তি থেকেই এই পুণ্যের চর্চা করেছে, কিন্তু ধর্মীয় সত্যের নির্ভরযোগ্য চরম-ঘোষিত সম্পদের সঙ্গে এর আগে কখনো জীবনের এত নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এতখানি দূরপ্রসারী বক্তব্য যুক্ত হয়নি। এই পৌরুষ, যা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে যুক্ত, লক্ষ্য করা যেতে পারে, এক ধরনের মুক্তি, কারণ কোন পুরুষালি পুরুষের পক্ষে নিজের পৌরুষ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মতো সময় নাই। বীরত্ব জীবনের সুদুর্লভ মুহূর্তে একটি স্বাভাবিক প্রস্ফুটন যা ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলিতে সুন্দর এবং নির্ভয়।

"আগের কাজটি আগে করো, যদিও তা কখনো কখনো নীরস মনে হতে পারে। সিঁড়ি বা দরজার উপর খোঁড়া কুকুর দেখলে তুমি তাদের সাহায্য করো।"

সরল এবং সাহসীদের ক্ষেত্রে এটা জীবনের কোন মন্দ নিয়ম নয়।

উচ্চতর আচার অনুষ্ঠান

একটি জীবিত ধর্মকে সব সময় ক্রমোন্নতির দিকে এগুতে হবে, অপরিবর্তনীয় অবস্থা থেকেও। অনমনীয় আকারের মধ্যে একমাত্র মৃতই অশিষ্ট হতে পারে। জীবন্তকে অবিরাম নতুন নতুন গতি, নতুন নতুন উপাদানগুলিকে অঙ্গীভূত করে যেতে হবে, নতুন নতুন পথে অভূতপূর্ব কর্মশক্তিতে সারা দিতে হবে, যে পরিবেশ নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে চলেছে, তার পুনর্গঠনের জন্ম কিছু পরিমাণ ঝুঁকতে হবে।

সনাতন ধর্মের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। ক্রমাগত বৃদ্ধি, বিস্তার ও অভিজ্ঞতার নতুন এলাকাগুলি থেকে গ্রহণ করতে না পারলে, হিন্দুধর্মও চিরস্থায়ী হতে পারতো না। কারণ জগৎ যা কখনও দেখেনি, অন্ত যে কোন ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের অধিক পরিমাণে আত্ম-সংযোজন ও নতুন করে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। আমরা বিশ্বাস করি, এ এক অক্ষয় প্রতিশ্রুতি বিরাট বৃক্ষকাণ্ডের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জগতের দ্রুত বিলীয়মান ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে ধারণ করে আছে।

যাই হোক, এটা জানা প্রয়োজন যে, পরিবর্তনের জন্ম আমরা কোন্ দিকে তাকাব, যদি আমরা বুদ্ধিমানের মতো আগত পরিবর্তনগুলিকে স্বীকার করে নেই। রোমান ক্যাথালিক ধর্মের মতো হিন্দুধর্মও গত বারো শ বছর ধরে উত্তরোত্তর ধর্মের নিঃসঙ্গ সাধনার পথে এগিয়েছে, যা ভক্ত এবং গুরুর মধ্যে আত্মা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আত্মার চর্চা। সন্দেহ নাই, এই বিষয়ে সব ধর্মের শেষ বাণীতে একথা সত্য। আত্মার মুক্তি—আত্মিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সংগঠিত ধর্মমতের এটাই প্রধান উদ্দেশ্য। সামান্ত কিছু সমাজ-কল্যাণ গৌণ ব্যাপার।

কিন্তু ধর্মের একটি জনগণতান্ত্রিক দিকও আছে। ধর্ম যেমন আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করে, তেমনই মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনও সৃষ্টি করে। আমরা যদি সকলে মায়েরই সন্তান হই, তাহলে ঠিক এই কারণেই পরস্পরের ভাই হতে পারব। একটি বিশেষ বিষয়ের উন্নত বৈশিষ্ট্য অন্ত বিষয়ের পরিপূরক উন্নয়নের দ্বারা সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। পূজা-পদ্ধতির গণতান্ত্রিক অথবা সাম্যবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে, আরও অধিক আত্মার মুক্তি হতে পারবে।

এজন্ম সাধারণ প্রার্থনা হতে হবে। এবং সাধারণ প্রার্থনা সভাকে সংগঠিত হয়ে উঠতে হবে। তার অর্থ, এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে কয়েকজন পূজারীর প্রতিবেদন অবিলম্বে পাওয়া যেতে পারে এবং এই সব প্রতিবেদন মাতৃভাষাতেই হবে। যখন প্রচুরসংখ্যক লোক একত্রে শ্লোকগুলির আবৃত্তি করবে, তখন এগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করে দ্বৈতসঙ্গীতের মত পুনরাবৃত্তি করা বাঞ্ছনীয় হবে।

ধর্মীয় ব্যবহারে মিছিলের প্রচলন ফিরিয়ে আনতে হবে আবার। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমরা যখন পড়াশুনা করি, যা প্রাচীনতর হিন্দুধর্মেরই ভাষান্তর মাত্র, তখন

আমরা সন্দেহ করতে পারি না, প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা, শাঁখ, বাদ্য, ধুপ ইত্যাদি সহ মিছিল প্রাচীন ভারতীয় পূজা অনুষ্ঠানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তার কিছু কিছু ক্ষুদ্রতম প্রচলন আজও অব্যাহত, যখন বিবাহের সময় বরের চারপাশে সাতজন নারী আলোর মশাল নিয়ে প্রদক্ষিণ করে, অথবা মৃত পিতাকে দাহ করার সময় পুত্র জলন্ত আগুন নিয়ে চারিদিক প্রদক্ষিণ করে।

এই সব প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ও সাধারণভাবে সমগ্র বিষয়টির গভীর সমীক্ষা এখন করা উচিত। এখনও আমাদের নিজস্ব অনেক প্রিয় আচার ইউরোপে চালু আছে, অথচ আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে। হিন্দু উৎসবের উচ্চতর অর্থগুলিকে আমাদের পুনরায় প্রচলন করতে হবে। ভবিষ্যতে পূজায় অংশগ্রহণে জনসাধারণের সঙ্গে স্থান থাকবে পুরোহিতদেরও। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনেও থাকবে সহযোগিতা ও আত্ম-সংগঠন।

হিন্দুধর্মের মহিমা

ইদানীংকালে আমরা প্রচুর শুনেছি, অল্প বিস্তর অকৃত্রিম হিন্দুধর্মের মহিমা সম্পর্কে। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের বাস্তব মহিমা কি, এ ধারণা কতজন হিন্দুর নিজেদের আছে? এ সম্পর্কে যত ভাল ভাল কথা বলা হয়ে থাকে, সত্যই যদি হিন্দুধর্মের সেই গুণগুলি থাকে, তাহলে কোন বিদেশী ধর্মের আক্রমণে হিন্দুধর্মের মৃত্যু ঘটবে না। মৃদু হাস্যের সঙ্গে এই পরিণাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, আমাদের নিকট শূন্য প্রশংসার কতদূর অর্থ হতে পারে, তার একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে। ব্যাপার এই, বিদেশীরা তাদের সব স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়েও আমাদের ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে না, কারণ সামাজিক প্রথাগুলি আধা-ধর্মীয় অধিকারের জাল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু আমাদের কল্পনায় সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যসূচক ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নীতিগুলির ওপর এতটুকু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করেও উধাও হয়ে যেতে পারে। এই ভাবাদর্শগুলি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমেও প্রযোজ্য হতে পারে, পূর্বেও হতে পারে। বোধ হয়, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা এই যে, একমাত্র এই ধর্মেই বিধিবদ্ধ বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি শ্রেণী আছে, যা পূর্ণ এবং বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি অনুরক্ত। এবং এই উভয় বিষয়গুলির মধ্যে আকস্মিক অভিব্যক্তিজনিত পার্থক্যকে ভয় করার কিছু নাই, কারণ নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে এগুলি ওপর ওপর তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে।

আপাতঃদৃষ্টিতে বিপুল পুরাণ-শাস্ত্র সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের প্রকৃত সারমর্ম খ্রীষ্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধারণার উপর আশাতিরিক্ত কম নির্ভরশীল। যে পাশ্চাত্য বিশ্বাসের ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, অতঃপর তার দাঁড়ানোর দুর্বল ভিত্তি ছাড়া কিছু নাই। হিন্দু তা নয়। সত্যানুসন্ধানের

কোন ছায়া নাই, যা এখানে ধর্মীয় শৌর্য হিসাবে বিবেচিত হয় না। আমরা এখানে বিপদের মধ্যে নাই যে, দৃষ্টির প্রসারতা ও গভীরতার জন্য কোন মানুষকে কঠোর নির্যাতন ভোগ করতে হবে। যদি ভারতের জন্মগ্রহণ ও ভারতেই বসবাস থাকতো তাহলে গিওর্দানো বার্নোকে কখনো পুরে মরতে হোত না, গ্যালিলিওকে এমন অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হোত না। জ্ঞানের জন্য প্রতিটি সৎ প্রচেষ্টাকে সনাতন ধর্ম অনুমোদন করে। এটা কোন রকম সত্যের ঈর্ষা এবং সন্দেহ নয়। বোধ করি এর মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত গৌরব নিহিত।

আমাদের ধর্ম যে জনসাধারণের, তারা কখনও বর্বর অবস্থার মধ্যে ফিরে আসেনি এবং কখনও শিক্ষার সঙ্গে বিবাদ করেনি। সত্যের বিভিন্ন রূপের প্রবিত্রতার মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না। সত্য সত্যই। যারা আমাদের পৌত্তলিক বলে তাদের মতো আমাদের পুরাণ প্রকৃতই ভীষণ রকম ঝামেলার মধ্যে ফেলেনি। আমরা যা বিশ্বাস করি তার প্রতি খাঁটি থাকতে চাই। সব জ্ঞানই প্রবিত্র। বিশ্বাসের মধ্যে অতলান্তিক গভীরতা থেকে যা ছিনিয়ে আনা হয়েছে, আমাদের বলা উচিত নয় কোন্‌টা বেশী অথবা কোন্‌টা কম বাধ্যবাধকতার অধীন। অঙ্ক দেবতারই দান। বিজ্ঞানীরা ঋষিই।

আমাদের বিদেশী বন্ধুদের উদ্দেশে আমরা এমন কায়দায় হাসি দিতে সমর্থ যে, তা তাদের ধর্মের দিগন্ত পেরিয়ে চলে যাবে। ঈশ্বর সত্যিই আছেন, খ্রীষ্টানদের এ বিশ্বাসপ্রণবতা আছে, কারণ স্যার অলিভার লজ এরূপ কথা বলেছেন। এ কেবল বালসুলভ লঘুতা। তারা কি আশা করে অপরে তাদের ধর্ম গ্রহণ করুক, যে ধর্মের নিজ সন্তানেরা এরূপ ক্ষুদ্র বিচার করে? হিন্দুদের নিকট ধর্ম একটি অভিজ্ঞতা অথবা কিছুই নয়। যদি বিজ্ঞানও অভিজ্ঞতা হয়, সে একথা মনে করে না যে, দুটির যে কোন একটিকে অস্বীকার করতে হবে এমন দায় তার আছে, কারণ সে জানে এর দুটিই সত্য। ভগবান কি তার তত্ত্বাবধানে? বিশ্ব-চরাচর কি তার হঠাৎ বুঝতে পারার ওপর নির্ভর করছে? সে যদি ফৌজদারী বিচারক হোত তাকে হয়তো এর চেয়ে আরও নম্রতা, আরও ধৈর্যের ব্যবহার করতে হোত।

মানুষকে সন্তুষ্ট করে পড়াতে অথবা বিশ্বাস করাতে হিন্দুধর্ম কখনও তত্ত্বাবধান করে না। একজন মানুষ প্রথমেই কথা বলার অধিকার উপলব্ধি করবে। এ ব্যাপারে কোন নকল মুদ্রা চলবে না। আমরা নকল ও আসল শব্দের পার্থক্য জানি। আমরা বলতে পারি, কে অধিকার নিয়ে বলছেন, কে ধর্মগুরুর মত বলছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস অভিজ্ঞতার ভিত্তি, উপলব্ধি, ব্যক্তিগত যথোচিত অধিকারের উপর ন্যস্ত। এ ছাড়া, আমাদের দৃষ্টিতে মৌখিক আনুগত্যের কোন ফলাফল নাই। এগুলো আসুক, চলে যাক। এর কোন দাম নাই। যদি আগামী কাল আমাদের মঞ্চ নির্মাণের সব প্রথা দ্রুত অপসৃত হয়ে যায় আমরা আবার সবটাই পুনর্নির্মাণ করে নিতে পারব না, আমরা মানব-হৃদয়ের অত্যন্ত অভাব থেকেই তা করতে বাধ্য হব।

আমাদের বিলুপ্তির আশঙ্কায় নদীতীরে বসে যারা আর্ত-বিলাপের সঙ্গে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে চায়, তারা লক্ষ্য করুক, তাদের গোঁড়ামির জন্য তারা নিজেরাই মৃত্যুর দরজায়, আমরা নই। হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে না, যেহেতু তার সন্তানেরা সকলে এক কাপ চা খেতে শিখেছে, সত্যি! জাতি, বৃত্তি, জীবন ধারা, সংস্কৃতির রূপ সবই যদি অন্তর্হিত হয়, তবু চিরকালের মতো হিন্দুধর্ম অটুট থাকবে। বাস্তবে এমন কিছু কি আশা করা যায় না, হিন্দু সভ্যতার নীতিগুলি খ্রীষ্টান দেশগুলোতে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করুক। আমাদের ধর্ম যে কোন উচ্চতর সভ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সমকক্ষ। আমরা কি জানি না যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজনিত বিশ্বাসগুলি চলে গেলে জাতিগুলির মৃত্যু ঘটে? আমরা কি নির্বোধ যে, প্রাচীন মিশর ও বেবিলনে সমকালীন সভ্যতার অলীক কাহিনী, ক্ষমতার বাইরে মৃতের পুনরুজ্জীবন, যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তার বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, এসব জানি না? ভারত এসব করবে না। বরং দুনিয়ার দিকে দিকে চলে গিয়ে বালসুলভ বিশ্বাসের অপূর্ণতা দেখে তার নিজের উপচে-পড়া ভাণ্ডার থেকে দিয়ে আসবে। বরং সে অন্য সকলের গুরু এবং উপদেষ্টা হবে ও যারা বিরোধিতা করে, তাদের ক্ষুদ্রতা ও অগভীরতা থেকে নিজ দেশের চিন্তা-নায়কদের বিরাটত্বের হিসাব করবে। এর ফলে বরং তার নিজ সম্পদের প্রতি গর্ব ও বিশ্বাস দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। নির্মল হাসির সঙ্গে ভারত তার স্তাবক ও ভণ্ড-দরদীদের অতিক্রম করে চলে যাবে, কিন্তু তার নিজের শুভ উদ্দেশ্য সত্বেও নির্বোধ সন্তানেরা অর্থহীন বক্তব্যে উল্লসিত হয়ে তার দ্যুতিকে শান্ত পরিতৃপ্তির বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে এমন এক অদূর ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেবে, যখন সব অবস্থাই আশ্চর্যজনকভাবে উল্টে যাবে।

এরূপ সময় শুধু আসছে নয়, হাতের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আশ্চর্য যে আমাদের মাতৃ-মন্দিরের প্রতি হবে আনুগত্যের অভাব, আমরা অতীত সাফল্যের অযোগ্য পাঠকে পরিণত হব এখনও যদি আমরা দেখতে না পাই। জগতের শুধু গীর্জাগুলিই নয়, ইউরোপের সব বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সেই সব চিন্তা-নায়কদের এখনও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাবে, যাঁরা অরণ্যের আশ্রয়ে বাস করে গাছের ছাল অথবা কটিবস্ত্র পরিধান করে আরও অন্তর্নিহিত, আরও গভীরভাবে উপলব্ধ সত্যের নির্দিষ্ট রূপদান করে গিয়েছেন যা বস্তু জগতের আরামের দিকে ঝুঁকে-পড়া ইউরোপ কখনও কল্পনা করেনি।

হিন্দুধর্ম ও সংগঠন

হিন্দুধর্ম জগতে একটি অন্যতম সূক্ষ্ম ও সুসঙ্গত ক্রমবৃদ্ধি। এর অসুবিধা এই যে এটি একটি ক্রমোন্নতি, সংগঠন নয়। এটি একটি বৃক্ষ, যন্ত্র নয়। যে যুগে জগৎ জুড়ে সঠিকতা, হিসাবের নির্ভুলতা ও পরিচালন ক্ষমতার জন্য যন্ত্রের পূজা চলেছে, আর এর অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্বও আছে, তবুও কিছু পরিমাণ অভাববোধও থেকে যায়। হিন্দুধর্মরূপ বৃক্ষের ফল অপূর্বরূপে তুলনাহীন ; কিন্তু সহজ লভ্য নয়, কারণ এর স্বতঃস্ফূর্ত ফল লাভ হয় না, শেষলক্ষ্যে দূরদর্শিতা, সুস্থির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পৌঁছতে হয়। উদাহরণ হিসাবে, জগতের ধর্মবিশ্বাসগুলির মধ্যে বোধ হয় আমাদেরই সঙ্গে কেবল সত্যের কোন বিরোধ নাই। এর অধীনে বৈজ্ঞানিক মন অসীম অজানার অনুসন্ধানে চূড়ান্ত গবেষণা করতে পারেন, দার্শনিক তাঁর সিদ্ধান্তের আলোকপাতে উৎসাহিত হতে পারেন এবং সাধারণ ধর্ম এরূপ উচ্চ কোন বিষয়ের ওপর রায় দিতে পারে না। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এ সবই সত্য। এই সঙ্গে ভাবতে হবে, হিন্দুরা তাঁদের সন্তানদের পক্ষে সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আঁকড়ে ধরার জন্য কি করেছেন ? অথবা তাঁরা দেশবাসীকে সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে বিশারদ অথবা সহায়ক রূপে কি গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছেন ?

আমাদের দিক থেকে এই সকল বিষয় প্রদক্ষিণ করার পথে হিন্দুধর্মে কোন বাধা নাই, এবং যা কেবল আমাদের এই প্রচেষ্টায় চালিত করতে পারে, প্রধাণত তা হোল একটি সতর্ক এবং কর্মোদ্দীপক চেতনা। একটি লোকহিতকর চেতনা সমগ্র বিষয়টি বিচারের বিষয়ীভূত করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের সেই নিঃসন্দেহ ইঙ্গিত, যে অর্থে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঐ সকল বিষয় আক্রমণাত্মক (বিস্তারশীল) হিন্দুধর্মের অংশ। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে আগ্রাসী হতে হবে কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে নয়, সামাজিকতার ক্ষেত্রে আত্মোন্নতির দ্বারাও ; শুধু মতবাদের দ্বারা ধর্মান্তরিতদের গ্রহণ করে নয়, এর কর্মকাণ্ডের মধ্যে গভীর আবেগ সঞ্চার করে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা। আমাদের প্রয়োজন লোকহিতকর চেতনার সাহায্যে ধর্মকে সাহায্য করা—এমন একটি উজ্জ্বল আত্ম-বোধ যার মধ্যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অংশ আছে। শিক্ষার ব্যাপারে শ্রেণীগত উৎকর্ষ একটি প্রাচীন ব্যাপার। যার প্রতিভা আছে, বুদ্ধিজীবির জীবন এখন তার জন্য নির্দিষ্ট। সাহস এবং উৎসাহের সঙ্গে আমাদের নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় যেমন সকলের জন্য খোলা, তেমন সকল প্রকার সামাজিক কার্য-নির্বাহক গড়ে তুলতে হবে। কলেজ, হাসপাতাল, অনাথালয়, মহিলাদের আশ্রয় ইত্যাদি তাঁরাই চালাবেন, একাজে যাঁদের অনুরাগ ও কর্মশক্তি আছে এবং মানবতার এই সেবকদের জন্ম সম্পর্কে কিছুই বলা চলবে না। পবিত্র জীবনের জন্য এর দ্বারা সাধুতে তাঁরা পরিণত হন, যেমন জ্ঞানের দ্বারা দার্শনিকরা পরিণত হন ঋষিতে।

যদি সমাজের স্বার্থে করা হয়, তবে কাজ সরল ও উন্নত হয়, তার অর্থ কোন ব্যক্তি বিশেষের না হয়ে কাজটা যদি একটি সাধারণ দৃঢ় বিশ্বাসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সমষ্টির দ্বারা সাধিত হয়। কর্মের মধ্যে এই সাধারণ বিশ্বাসের দৃঢ়তাই ছোট ছোট ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রায়ই মানবিক উন্নতিলাভের জন্য বিরাট আন্দোলনগুলির কারণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রাহ্ম সমাজ যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে আঘাত করতে পেরেছিল। ছোট উপাসনালয় কর্মীদের জন্য পটভূমি ও আশ্রয় তৈরী করে। এটি তাদের কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে পাঠায়, সাফল্যে উল্লসিত হয়, সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায়। এরূপ কোন হৃদয়ের স্থান না থাকলে কর্মীদের কর্মশক্তি ও সাহস রক্ষা করা কঠিন। আমাদের প্রিয়জনদের নিয়ে গঠিত ছোট গোষ্ঠী আমাদের নিকট খুবই মধুর এবং বেশ ভালভাবেই বহু বাধা অতিক্রম করার প্রেরণা যোগাতে পারে, যে প্রচেষ্টা আমাদের অন্যভাবে করা উচিত নয়। "এ নয়!" "এ নয়!" বলে আত্মার বিকাশ যতদূর সম্ভব হোক, কিন্তু একে এই পার্থক্য বিচারের অভ্যাসের জন্য সুযোগও পেতে হবে।

তাহলে আমরা সমাজের গোষ্ঠী হিসাবেই আমাদের সমস্যাগুলি গ্রহণ করব। জগৎকে নাড়া দেবার জন্য কোন একজন মাত্র লোক ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য না থাকুক। প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আবিষ্কার, প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি স্বপ্ন—যা দেখা হয়েছে, সবই সামাজিক সিদ্ধি। এগুলিতে সমাজের অবদান আছে, এবং সমাজই এর ফললাভ করবে। তাহলে ধর্ম অথবা মহৎ কাজের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা, যাঁদের ওপর এই প্রচেষ্টা বর্তায়, তাঁরা যেন প্রধান নায়ক হিসাবে নিজেদের মূল্য বিচার না করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য দুটি অথবা তিনটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মুচলেকা বা চুক্তি থাকবে। হতে পারে তারা একই স্কুল অথবা কলেজে সহপাঠী ছিল, অথবা তারা একই গুরুর শিষ্য হতে পারে। হতে পারে তারা একই গ্রামের অধিবাসী, বা একই কর্মে নিযুক্ত সহকর্মী। পরিচালন শক্তি যাই হোক না কেন, সফল হতে হলে লক্ষ্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং কেন্দ্রীয় মধ্যমণি হিসাবে যাঁরা থাকবেন, সেই অকৃত্রিম অনুরাগীদের মধ্যে থাকবে তীব্র ভালোবাসার বন্ধন।

স্বেচ্ছামূলক সম্বন্ধ, বিধিবদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দায়িত্ব গ্রহণে একটি দলের ইচ্ছা নাগরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, সমাজের চারপাশে যে সাধারণ আন্দোলন, তার নিকট প্রতিটি কাজ কী পরিমাণ ঋণী! কিছু লোককে কাজ করতে হবে সেবক হিসাবে, বহু মানুষের শত্রু হিসাবে নয়। প্রত্যেকটি আন্দোলনের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে প্রতি-আন্দোলনের প্রয়োজন, যদি সেই আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে অটুট রাখতে হয়। ভারতে কারিগরী শিক্ষার অভাব অর্থাভাবের জন্য নয়, যা প্রচুর পরিমাণে ঢালা হয়েছে, বরং সমাজে সাধারণভাবে শিল্প-বিকাশের অভাব। শিক্ষা এবং উন্নয়নের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে, যা অতিক্রম করা যাবে না, তাই উভয়ের নির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক উন্নতির দ্বারা অগ্রগতি আসতে পারে। আবার

এই সকলের সমষ্টি ও সমাজের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনের মধ্যে একটি যথাযথ সম্বন্ধ আছে, যা লঙ্ঘন করা যাবে না। এবং এই সবকিছুই একটি ব্যাপক সমাজ-শক্তির মধ্যে একইভাবে সংলগ্ন থাকবে, যা নিজের প্রয়োজন, নিজের সমস্যা ও কার্য-সাধনের উপায়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করবে। আমাদের সব সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা সাধারণ সমাজ-চেতনার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। আমাদের একে সজীব রাখার জন্য জাগাতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। এই সমাজ-চেতনাকে শিক্ষার অভাব সম্পর্কে প্রথমেই গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে হবে, মনের প্রকৃত কর্ষণের প্রয়োজন সম্পর্কে বুঝতে হবে। এই ব্যাপারে সকলের স্বার্থ প্রত্যেকের স্বার্থ ও প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের স্বার্থ হিসাবে পরিগণিত হতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিতে শক্তি যোগাতে হবে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের সব জিনিস চিন্তা করা শিখতে হবে ও দেখতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। জ্ঞানের একটি কোণে পড়ে থেকে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, মানুষের জ্ঞাত সব কিছুই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আমরা কি মানসিকভাবে বিজ্ঞান, মতিস্থিরতা ও ব্যাপক বোধগম্যতার যোগ্য? যদি তাই হয়, তবে এখন আমাদের কুশলতা প্রমাণের সময় এসেছে।

আমাদের অজ্ঞতার দুর্গ নতুন করে আক্রমণ করার সূচনা আমরা কোথায় পাব? সাহস করে আমাদের ধর্মীয় শক্তিগুলির মধ্যে একে খুঁজে পেতে হবে। বৌদ্ধ দেশগুলিতে সন্ন্যাসীদের মঠকেন্দ্রিক শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যালয়, পাঠাগার, যাদুঘর ও কারিগরী শিক্ষা বিষয়ে প্রচেষ্টা। আমরা কেন আশা করতে পারি না, আমাদের দক্ষিণ ভারতীয় শহরগুলোর মন্দিরগুলি নতুন এবং উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করুক? ব্রাহ্মণদের বাধা ও প্রতিক্রিয়ার মনোভাব থেকে আমরা কেন আতঙ্কগ্রস্ত হব। যদি এটা প্রকৃতই সত্য হয় যে, আমরা প্রকৃতিস্থ, তাহলে ব্রাহ্মণরা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমরা আমাদের নিজেদের দেশ ও জনসাধারণের কাছে সর্বোচ্চ, মহত্তম ও চূড়ান্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী আশা করতে পারি, যা জগতের যে কোন জাতি গ্রহণ করতে পারে। এবং এই প্রথম এই কাজের মধ্যেই প্রকৃত অর্থে আমরা হিন্দু হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারব। আমাদের দেশের নাম ও আমাদেব নৈতিক বিশ্বাস কি আমাদের নিকট প্রশংসনীয় সম্মান, প্রেমের পুরস্কার ও শ্রমের স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে না?

সহযোগিতা

গত শতাব্দী জুড়ে খ্রীষ্টানরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে সব কাজ করেছে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই নিজেদের মাধ্যমে অনুরূপ পথে কাজ করার বিরাট প্রয়োজন আছে। স্কুল, হস্টেল, পারস্পরিক সাহায্যমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলার ব্যাপারে খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রকৃত প্রভাব তাদের সহযোগিতার শক্তির জন্যই সম্ভব হয়েছে। তরুণদের খ্রীষ্টান সমিতির আকর্ষণের কথা বিবেচনা করা যাক, এদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতার কার্যসূচী, লেখাপড়ার ঘরগুলি, ছুটির আগে ও পরে ছাত্রদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ইত্যাদি, বিশ্ববিদ্যালয়-শহরগুলির ভারতীয় তরুণদের অসীম আস্থায় যতখানি সম্ভব অবহেলিত। অবশ্য আমাদের অধিকার আছে কোন ভাব বা নীতিকে প্রত্যাখ্যান করার, সেই সঙ্গে ঐ নীতি থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্তির আশাকেও বর্জন করতে পারি।

কেউ একথা বলবে না যে, প্রাচ্যদেশীয়রা নিজেদের মধ্যে ঐ ধরনের খ্রীষ্টান সমিতিকে ধীরস্থির বুদ্ধিতে অনুকরণ করুক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপস্থাপিত নীতি বা অন্য আকারে তার অভিব্যক্তি সম্পর্কে বোধগম্যতা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমাদের আত্ম-গঠনের অনেক মূল্যবান পদ্ধতি পাশ্চাত্য জীবন-ধারা ও চিন্তার প্রভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার সুসঙ্গতি, নৈতিক শাসন, উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা এবং সর্বোচ্চ চিন্তা ও ত্যাগের জন্য এর খোলাখুলি ভাব সবই গিয়েছে এবং তার বদলে আমরা পেয়েছি শহরের নামে আধুনিক যুগের স্তূপীকৃত অসংলগ্ন ভগ্নাংশ।

এমন কি শহর, যার মধ্যযুগ থেকে শুরু, তারও অধুনিক স্বেচ্ছামূলক সমিতিগুলির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কাশী অথবা এলাহাবাদে একজন নবাগত অচিরাৎ নিজেকে নিজের পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পায়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধের সূত্রে আবদ্ধ দেশের নিজ অঞ্চলের লোকেদের দ্বারা যখন সে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তাদের ঘরের বাইরের পরিবেশে তারা বন্ধু পায়, সহযোগিতা এবং উপদেশও পায় এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। নিজের দেশের লোকেদের নিয়ে তার এই এক চতুর্থাংশ শহরে তার সব ইচ্ছা, সব উদ্দেশ্যের ক্লাব, ঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছু। সম্ভবত শহরের যে কোন আধুনিক সমাজের অপেক্ষা এগুলির মধ্যে তার উদ্দেশ্য অনেক ভাল সিদ্ধ হয়। এবং এইভাবেই সংগঠিত সম্প্রদায়গত মত গড়ে উঠেছিল, যার ফলে শীঘ্র অথবা দেরিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশের সুযোগের বিস্তৃতি ঘটতে পেরেছিল। সব প্রদেশেই সম্প্রদায়গত দলগুলি সহৃদয়, স্বাধীন, ভদ্র, বন্ধুত্বপূর্ণ ও ধনী সদস্যদের মধ্যে রাজকীয় উদারতায় পূর্ণ। তদপেক্ষা আমাদের সামাজিক পরিবেশই আমাদের চরিত্র ও আচরণকে সর্বোচ্চ স্তরে বজায় রাখতে সমর্থ। এক চতুর্থাংশ শহরগুলিতে এই সামাজিক প্রবহমান ধারা প্রশংসার

সঙ্গে রক্ষিত হয়ে এসেছে। এখনকার মত আগেকার দিনগুলিতে দক্ষিণ দেশ থেকে আগত একজন তরুণের পক্ষে শহরের অপচয়গুলি থেকে উদ্ভূত প্রলোভনের হাতছানির মধ্যে আসা সহজ ছিল না। এর একমাত্র সঙ্গত কারণ এই যে, তার নিজের জেলার বয়স্ক লোকেরা তার চারপাশে থাকতো। তার চারিত্রিক শোভনতার কোন অভাব হলে, তাকে তার বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হোত এবং তার জন্য গ্রামে তার পরিবারকে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হোত। এই ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা নৈতিক বিধিনিষেধের নিরূপণ করা সহজ নয়।

যাই হোক, আমরা যখন এই সব বিষয়ে চিন্তা করি, তখন আধুনিক উন্নতির বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে না মনে করে পারি না। উদাহরণ হিসাবে আমরা ভেবে দেখতে পারি সেই দরিদ্র মুসলমানদের কথা, যারা প্রধানত পাটনা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতা শহরে আসে কোচয়ান হতে। সব দেশেই এই বিশেষ ধরনের জীবনের প্রলোভন সাজ্ঘাতিক। মদের দোকানগুলি সর্বনাশা বৃদ্ধির পথে। কারও নিজের ঘরে কিছু লোকের একত্র মিলিত হওয়ার প্রথা হ্রাস পেয়ে চলেছে। অসংখ্য গ্রাম্য গৃহের সুখের কাছে শহরের জীবন বিশ্রী রকমের ধ্বংসাত্মক, এতে বিস্ময়ের কি আছে?

এবং যদিও এসব কথা খুবই সত্যি, আমরা মোটেই বলতে পারি না, আমাদের দেশীয় লোকেদের সঙ্গে এখানে জগতের যে কোন দেশের লোক তুলনীয় হতে পারে। প্রায়ই গরীব লোকেদের জীবনধারণ পরিবেশের সম্বন্ধহীনতার জন্য এত করুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা সত্ত্বেও সারা দিনে এক বেলা খেয়ে আর স্বল্প বেতনের অর্ধেকটাই তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়। আজকালকার দিনে ভারতীয় ভৃত্যদের আত্মত্যাগের সমগ্র ইতিহাস কেউ কোনদিনই জানবে না। আমাদের দেশের নিম্নতম স্তরের লোকেরা ক্ষুধা দমন করতে এমনই অভ্যস্ত যে, অন্য দেশ হলে শহীদের আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হোত।

আমরা, বিশেষ করে আমাদের ছাত্র সমাজ, -যারা শহরে বাস করে, আমাদের চারপাশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখবে। আমরা জনসাধারণের জন্য কি করতে পারি? কি করে তাদের পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা তাদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারি? পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার শক্তি আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে এগুলি আমাদের প্রচুর পরিমাণেই আছে। আধুনিক কালের প্রয়োজনে আমাদের উদ্দেশ্যে এগুলি রক্ষা করার,ব্যবহার করার, উন্নয়ন করার, পুনঃসংযোজন করার আহ্বান এসেছে। নৈতিক শক্তি ও সমন্বয়-সাধনের ভাণ্ডার আমাদের আছে।

আমাদের প্রত্যেকে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুক, তার পিতার গ্রাম থেকে যে শূদ্ররা এসেছে, তারা কোথায়? কেউ কি জানে না? তাহলে দুঃখের কথা যে মানুষ তার অভিন্নতা ও একতার কর্তব্যসাধনে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে! কেউ তাদের সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পারে? তাদের সঙ্গে নিজের সুযোগ-সুবিধার কিছু

অংশ ভাগাভাগি করতে পারে ? যতক্ষণ না কেউ পরীক্ষা করছে কেউ জানে না, এই সুযোগ-সুবিধাগুলি সংখ্যায় কত বা কত বিপুল। ভারতীয় নীতিগুলির মধ্যে কত দ্রুত একটি বিপ্লব সাধিত হতে পারে, যদি প্রত্যেকটি ভারতীয় ছাত্র প্রতি বছর, যাদের শিক্ষার কোন উপায় নাই, তাদের কিছু লোককে অথবা কিছু লোকের একটি গোষ্ঠীকে অন্তত বারটি পাঠ শিক্ষা দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করে। বারটি পাঠ দান কারও ওপর এমন কিছু গুরুভার নয়, কিন্তু এর দ্বারা শিক্ষার্থীর কী গভীর উপকার হয়! শিক্ষকের দেওয়ার ক্ষমতা অনুসারে এই শিক্ষাদান যে কোন আকারের হতে পারে। যদি কারও পক্ষে কেবল ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাই হবে। পড়া, লেখা ও গণনা শিক্ষা ভালই হবে। কিন্তু এগুলির যে কোনটির চেয়ে আরও ভাল হবে ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা, অথবা সরল বৈজ্ঞানিক ধারণার আদান-প্রদান বা আমাদের প্রতিদিনের ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ শিক্ষা।

আমরা কি চিন্তা করে দেখেছি কয়েকটি অর্জিত নীতি জীবনকে কিভাবে সাহায্য করে, কিভাবে বুদ্ধিগত অনুমান মনের মধ্যে অঙ্কুরকে বিকশিত করে ও দিনগুলির রঙ গাঢ়তর করে ? জ্ঞান জীবনের প্রকৃত খাদ্য। আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যা আছে, তা নিয়ে সকলকে আমাদের সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা

সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্বের ফলে অশুভ কাজ হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচুর বলা হয়ে থাকে। যাই হোক, হতে পারে, এরূপ বিবৃতি কোন কিছুকে একেবারে বিনা বিচারে স্বীকার করে ; সেগুলি যেন চিন্তাহীনতার ফল ; এবং সেইজন্য সমগ্র প্রশ্নটি সম্প্রদায়গুলির ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্পর্কে সযত্ন বিবেচনার দাবি রাখে।

নিঃসন্দেহে যে মেজাজ মতবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যের ওপর বরাবর চুলচেরা বিচার করে, বিবাদকে আহ্বান জানায়, আর সামান্যতম ছুতায় সমাজকে বিভক্ত করে, তা ক্ষতিকর ও নিন্দনীয়। এই বিবরণ অনুযায়ী যদি সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজনীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়, তবে তাদের সম্পর্কে যত কম ভাবা যায়, তত ভাল। সব সম্প্রদায়কে অশুভ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, এবং তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে কদাচিৎ কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মেজাজ বা চরিত্র সৃষ্টি করাই কি অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় ?

মানুষের আকাঙ্খা নিজেকে অন্যান্য সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়, বরং একটি সাধারণ সত্য বা আদর্শের প্রতীককে কেন্দ্র করে নিজেদের একসঙ্গে মিলিত হওয়া, যা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্ম দান করে। সম্প্রদায় একটি উপাসনালয়, একটি প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে, যা বেশীও নয় কমও নয়, "একদল বিশ্বস্ত লোকের একটি সঙ্ঘ।" এই বিচারে, আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়ন বা দক্ষ নীতি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছামূলক

সহযোগিতার মধ্যে কিছু ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি দলকে আমরা অবশ্যই সম্প্রদায় অথবা উপাসনালয় বলতে পারি। এক বিচারে মেডিক্যাল সোসাইটি অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের সমাবেশকে আমরা উপাসকমণ্ডলী বলতে পারি। যেহেতু এই সব দল বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত, এক বিচারে, এগুলিও 'উপাসনালয়'। এবং যখনই আমরা একথা বলি, আমরা উপলব্ধি করি যে, এই দল বা সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে একটি ঐক্যের প্রমাণ, পার্থক্যের প্রমাণ নয়; একটি মিলন, বিভেদ নয়; একটি ভ্রাতৃত্ব, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ নয়।

আমরা যদি ধর্মীয় দলের দিকে তাকাই, যেখানে কিছু কেন্দ্রীয় নীতি অথবা আচরণের সমাবেশ, যেমন ধর্ম-যাজক সংক্রান্ত গীর্জা। এই ধরনের সম্প্রদায়গুলি কী জগতে কোন বৃহৎ ও উদার উদ্দেশ্য পালন করে না, যা থেকে আমরা শিখতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা তা করে। প্রথম ক্ষেত্রে তারা একটি ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, এমন কি নির্দিষ্ট বিচারে একটি আশ্রয় গঠন করে। সংগ্রামী, দারিদ্র্য-পীড়িত সদস্য তার সাহায্য কারীদের পায়, যাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তার ভাল হওয়ার মধ্যে আছে, যারা তাকে জগতের অবজ্ঞা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। সম্প্রদায়গত এই দৃষ্টির পরিচয়, ইহুদী, জৈন ও পার্সীদের মধ্যে দেখা যাবে।

সম্প্রদায় একটি বিদ্যালয়ও বটে। সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে ভাবের একটি উত্তরাধিকার আছে এবং তাদের শিক্ষার জন্য উপাসনালয়গুলিই দায়ী। সৈন্যবাহিনীতে স্থান পাওয়ার জন্য তাদের জন্ম এবং সৈনিকের নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার শিক্ষা তাদের জীবনের প্রথম থেকেই শুরু।

সম্প্রদায় একটি কর্মকেন্দ্র। প্রত্যেক সদস্যের জীবন তার সব কিছুর মধ্যে নৈতিক উৎসাহে পূর্ণ ও যা তার পথ-প্রদর্শক এবং স্থায়িত্ব। গীর্জা বা উপাসনা মন্দিরের সম্মান তার প্রতিটি সন্তানের নিকট সর্বোচ্চ সম্ভব সাফল্য দাবি করে। সে তার বীর সন্তানকে বিদায়ের সম্বর্ধনা ও প্রত্যাবর্তনের অভ্যর্থনা জানায়। সন্তানের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কাজ তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে ও সন্তানের ছায়ায় যারা বাস করে তাদেরই প্রাপ্য করে তোলে। যে তরুণরা দূর শহরে ভাগ্যান্বেষণে এবং দুঃসাহসিক অভিযানে যায় তাদের জন্য ঐ সব সম্প্রদায় বন্ধু ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে। উপাসনালয় মা, বন্ধু এবং অভিভাবক, গুরু প্রধান সেনাপতি এবং প্রতীক, একের মধ্যে সব। একত্রে সব মিলিয়ে সম্প্রদায় কি অসৎ?

তবুও সম্প্রদায় বা দলের শেষ ব্যবহার সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে যাওয়া। এর সবচেয়ে বড় পাপ সত্যকে অস্বীকার করে চলা। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই শেষ বিচারের দিন। এমনকি তাদের সর্বোচ্চ সীমাতেও, যখন সকলের সামনে জীবনের ভূমিকা সম্মানের সঙ্গে পালিত হয়েছে, তখনও প্রশ্ন থেকে যায় কোন্ নীতিতে সব-কিছুর যোগফল হিসাব করা যায়। আমরা কি নিজেদের সম্পূর্ণ অভ্রান্ত দাবি করেই কর্তব্য শেষ করব? অথবা, আমাদের শেষ কথা হবে, "দেখ, এই সেই আলো, যা জগতের প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে?"

ভারতে, যে দেশ থেকে নিশ্চিতরূপে প্রবাহিত এই শব্দগুলি এইমাত্র উদ্ধৃত করা হোল, এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য মনোভাব সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কোন একটি গীর্জার বা উপাসনালয়ের সত্যের উপর একচেটিয়া অধিকার নাই। কোন একটি মেষপালক একাই অভ্রান্ত নয়। মানবতা ব্যতীত শেষ সম্প্রদায় কিছু নাই এবং সেই মানবতা, যেমন বুদ্ধ চিন্তা করেছিলেন, সকল জীবকেই অন্তর্ভুক্ত করে ও আত্মাকে মন্দিরে স্থাপন করে।

বোধ করি সম্প্রদায় গঠনের দিন চলে গিয়েছে, কিন্তু তাদের শক্তি ও তা থেকে আমাদের জীবনকে উৎসাহিত করার দিন যায়নি। যেহেতু উপাসনালয় একটি বিদ্যালয়, একটি আশ্রয়, একটি ভ্রাতৃত্ব, সুতরাং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রামকে তাই হতে হবে। যেহেতু সম্প্রদায় মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা, আমাদের দেশ ও দেশবাসীদের আমাদের নিকট তাই হতে হবে। ধর্মীয় দল একটি সাধারণ সত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের স্থান-মাহাত্ম্যের আহ্বান আমাদের সকলের প্রতি একত্রে। প্রাচীন আর্য জাতি পূজা-বেদীর প্রচলন করেছিল ও পবিত্র হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল, যখন প্রথম এসে এই স্থানকে তারা পবিত্রতম মনে করেছিল। আমাদের কাছেও তাই প্রত্যেকটি সাধারণ গৃহ বৈদিক পূজা-বেদী। সংসার, গ্রাম, শহর এবং দেশ এগুলি কি আমাদের হৃদয়ে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের আলোক সঙ্কেত নয়? নয় কি মাতৃত্বের প্রগাঢ়তা? মায়ের মন্দিরের আলোকে জন্মলাভ করেছে যে সন্তানেরা, সেই আমরা কি ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে আবদ্ধ সকলেই এক নই?

সমাজ

খ্রীষ্টানদের একটি গীর্জা দেখে যে কোন একজন পরিদর্শক ইউরোপীয় জাতিগুলির সংগঠন ও সহযোগিতার সহজাত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হবে। তাদের ধর্মীয় চিন্তা ইহুদীদের মতো; হিন্দুধর্মের উর্বর পটভূমির তুলনায় আমাদের কাছে প্রায়ই মনে হতে পারে দুর্বল ও বালসুলভ, কিন্তু তাদের আনুষ্ঠানিক দিক ও গীর্জায় প্রার্থনা-বিধির প্রকাশভঙ্গীর মনোহারিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

আমরা খ্রীষ্টানদের সব পদ্ধতিগুলিকে সমশ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। প্রাচীন লাতিন গীর্জা অনেক বেশি ঐতিহাসিক ও এশীয় আচার অনুষ্ঠানের অনেক কাছাকাছি। এর কাজের সাধারণ চমৎকারিত্বের সঙ্গে ইংলণ্ডের আধুনিক প্রটেস্ট্যান্ট্‌দের আচরণের তুলনা হয় না। রোমান গীর্জায় একজন যাজক নীরব নতজানু জনতার সমাবেশের পক্ষে প্রচুর কাজ সম্পাদন করেন। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকার সঙ্গে সমান্তরাল ঐ সব যাজকদের ভূমিকা। ইউরোপীয় মনের সুনির্দিষ্ট প্রকাশ

যে প্রতিভার মধ্যে, তা হোল, সাধারণ প্রার্থনা সভার আবিষ্কার। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, এই প্রথা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই মুসলমানরা এই বিষয়ে প্রথম চিন্তা করেছিল এবং সন্দেহ নাই, ধর্মযুদ্ধের সমগ্রকালব্যাপী ইউরোপ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির ধারণা থেকে সুসিক্ত হয়েছে। তারপর আবার, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ দখলের মধ্যে সংস্কার-সাধনের কারণস্বরূপ মহাশক্তিশালী অবদান নিহিত। এই ঘটনা অতি অবশ্য প্যালেস্টাইন ধর্মযুদ্ধের মুসলমানদের অনুসৃত পথে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ও গভীরতায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে। এবং কে বলতে পারে, কোন্ প্রভাব জাতির অথবা স্বতন্ত্র মানুষের মনোজগতের গভীরতম প্রদেশে শক্তিশালী অঙ্কুরোদ্গমের কাজ করে?

যে অর্থ ই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে খ্রীষ্টধর্মের আরম্ভ এশীয় ভাব থেকে কিন্তু ইউরোপীয় প্রোটেস্ট্যান্ট্‌দের বৈশিষ্ট্যসূচক চারিত্রিকতা অর্জনের মধ্যে এর শেষ। অর্থাৎ উপাসনার নির্দিষ্ট অঙ্গ হিসাবে সম্মেলনের সমবেত প্রার্থনা ইসলাম থেকে শুরু কিন্তু শেষ হয়েছে ইংলণ্ডের গীর্জার মত স্থানগুলিতে।

হিন্দুধর্মে উপাসকমণ্ডলীর একত্রে পূজা বিধি মৌলিক, কিন্তু এযাবৎ পুরোহিত বা একক পূজারীতির বাইরে অন্য কিছুকে তারা বড় রকমের স্বীকৃতি দেয়নি। ইউরোপীয়দের অপেক্ষা হিন্দুদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য অনেক বেশি গভীর, যে গণতান্ত্রিক পূজার ধারণা সম্পর্কে বলা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়। তবুও, এই একক পূজার মধ্যে প্রার্থনার অনুষ্ঠান ও আচার ইত্যাদির মসৃণতা, লিখিত প্রার্থনা ও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ দেখতে পাই। আবার এর মধ্যে ইউরোপের বৈপরীত্য দেখা যায়, যেখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার বিরুদ্ধে ও স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা বাস্তবে উন্নত এবং সকল পূর্বসিদ্ধান্তের অভিব্যক্তি ও আকার প্রত্যাখ্যাত।

খ্রীষ্টানদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় ঋষি ও সাধুর জন্ম হয়েছে। কেবল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের মাঝে মাঝে একটি ফ্রান্সিস্, একটি টেরেসা অথবা একটি জোয়ানের দেখা পাই। এবং আমরা তাঁদের সাক্ষাৎ পাই ভাব এবং তপস্যার গীর্জায়, অথবা সাধন-ভজনের মধ্যে। একজন ফ্রান্সিস্ রিড্‌লে হ্যাভারগল্ এবং আমেরিকার দ্বিতীয়বার খ্রীষ্টের আবির্ভাবে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সত্ত্বেও, ঋষিদের মধ্যে সুইডেনবর্গ এবং সাধুদের মধ্যে জন ওয়েস্‌লের অনুগামীবৃন্দ এবং ক্যাথেরিন বুথ সত্ত্বেও প্রটেস্ট্যান্ট্ ধর্মের নিকট প্রাপ্য সংখ্যা তারা আজও পরিপূরণ করতে পেরেছে কিনা বলা কঠিন। খ্রীষ্টধর্মের শক্তি, ইউরোপের শক্তি প্রকৃতপক্ষে তার ব্যতিক্রমের মধ্যে নাই। এর শক্তি তার গড়পড়তা মানের মধ্যে নিহিত। এর বিরাটত্বে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু একটি কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন করার মধ্যে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য; কিছু পরিমাণ কলাকৌশলহীন, আক্রমণাত্মক, অত্যন্ত নিশ্চিত ভাব, চূড়ান্ত সীমাবদ্ধ ধারণা সত্ত্বেও যখন আমরা বিবেচনা করি বেশির ভাগ লোকের দ্বারা সেই কাজটি গৃহীত, তখন এর সার্থকতা এবং তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে কত সামান্য এর ত্রুটি হতে পারে।

এই কারণেই খ্রীষ্টধর্ম তার দীর্ঘতম উচ্চতাগুলিকে মাথার দিক থেকে ছাটাই ক
দিয়েছে, যেন আর কেউ না অতিরিক্ত বামন হতে পারে। এইজন্য তার উপাস
অনেকটা সাহিত্য ও সঙ্গীতানুগ, একথা ভালভাবেই জেনে যে পরিণামে আমাদে
স্বভাব অনুসারে নির্দিষ্ট নীতিগুলির খুব কাছাকাছি পৌছনো ছাড়া, তারা অবিরা
নীতিগুলির গ্রন্থিবন্ধনের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিতে পারবে না। এই কারণে খ্রীষ্ট
পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকভোগ থেকে উদ্ধারের নীতির উনিশ শত বছরের পুরাতন
সংকীর্ণ ভূমিতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। এই জন্যেই সে সেবাকে জ্ঞানের উর্ধে
সামাজিক উপযোগিতাকে ভক্তির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে, যাতে সে একটি শক্তিশালী
পারস্পরিক সংবদ্ধ, আত্মসম্মানজনক গড়পড়তা মানের সমতল-সীমায় তা
বহুসংখ্যক মানুষকে স্থান দিতে পারে।

ধর্মের ব্যাপারে একজন হিন্দু চাষীকে একজন শিক্ষিত ইউরোপীয়ের ছেলেমানুষী
তুলনায় অভিজ্ঞ বলে মনে হয়। নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে একজন নিরহকা
ইউরোপীয় স্পষ্ট এবং অনিবার্য সৌজন্য দেখাবে, যা একজন ভারতীয় নেতা
রাজনীতিকের কাছ থেকে সুপ্ত।

কিন্তু আমরা ভাবের আদান-প্রদানের যুগে এসেছি। মানবতা পুনর্বার তা
পাঠগুলিকে উপস্থাপিত করে না। তার বিরাট সাম্রাজ্যের এক দেশে যা শিক্ষণীয়
মানবতা আশা করে, অন্য দেশ তা গ্রহণ ও ব্যবহার করবে। নিঃসন্দেহে, পূর্বে
চিন্তা পশ্চিমের উপর ক্রিয়ার অভিযান করতে উদ্যত। এবং পশ্চিমের নীতিগু
পালাক্রমে পূর্বের ক্রমবিবর্ধনে তার ভূমিকা পালন করবে। ধর্ম-প্রচারকদের মধে
সাধারণভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সামান্য কারণ এই অনুসারে কেউ কাউকে
স্থানচ্যুত করবে না এবং প্রত্যেকেই পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।

ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম সন্দেহাতীতভাবে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক উপাদান হিসাবে বিকা
লাভ করবে। সমবেত প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানের মূল্য সে উপলব্ধি করতে পারবে
সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নতুন চিন্তার উপলব্ধিও ঘটবে
সেবার মনোভাব, কর্মের আদর্শ আমাদের আত্মোপলব্ধির উচ্চতর রূপের জ
সমাজে স্থান লাভ করবে। আশা করা যায়, ঈশ্বরাভিমুখী পথে আত্মার নিঃসঙ্গতা
জন্য আমাদের যে অনুরাগ, তা কখনও হারাব না। কিন্তু এটি না শিখেও আম
ভালভাবেই জনতার সম্ভাবনাময় শক্তিকে জোরাল করতে পারি। কিছু পরিমাণে
এই প্রবণতাগুলি আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মধ্যে উদাহ
স্থাপন করতে পেরেছে। বাংলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজ ইংলণ্ডে
সরকার অনুমোদিত গীর্জা ও মার্টিন লুথারের অনুগামী গীর্জাগুলির মতো অনেকখানি
আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছে। এটিকে প্রটেস্ট্যাণ্ট বলতে হয়, তবুও প্রার্থনাদি
অনুষ্ঠানমূলক; ঐতিহ্যপূর্ণ, সম্মেলনমূলক। অপরপক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ইংলণ্ডের
সরকারী গীর্জাকে না-মানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবুও বোধ হয় এর মধ্যে

ইউরোপের প্রাচীন মতের বিরোধীদের অপেক্ষা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রার্থনা ও বিধি-নিয়মের প্রতি বেশি শ্রদ্ধা আছে।

তৎসত্ত্বেও, আমরা চাই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিকে আধুনিক রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের মধ্যে গ্রহণ করতে। যদি স্বামী বিবেকানন্দের কথানুসারে হিন্দুধর্মকে অগ্রগামী হতে হয় পূর্বেই, তবে তার বিপথগামী নিজ সন্তানদের ফিরিয়ে নিতে হয় ও বিদেশী ধর্মান্তকরণের দিকে বাহু প্রসারিত করতে হয়,—এর গণতান্ত্রিক শাখার বিস্তার ঘটাতেই হবে। এই ধর্মের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাধারণ মানুষ অবশ্যই স্থান ও ঐক্যের সুর খুঁজে পাবে। স্তোত্রগান ও প্রতিবেদনের মধ্যে শোভাযাত্রাকে সংবদ্ধ থাকতে হবে। সমাবেশের সময় ঘোষিত থাকবে, এবং মন্দিরের সিঁড়িগুলিও ধর্মোপদেশ প্রচারের বেদী হিসাবে, যে স্থান ধর্মব্যাখ্যার, ধর্মসংক্রান্ত পরামর্শের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। এই সব পরিবর্তন স্বতন্ত্র পূজাকে স্থানচ্যুত করবে না। আমাদের ধর্ম ভাণ্ডারের ক্ষতি হবে, এমন ভয়ের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ এই সম্পদের প্রকৃত মূল্য আমরা কেবল এখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

আমাদের জনসাধারণের ওপর ঈশ্বরের এক বিরাট নতুন প্রবাহিত ধারা বর্ষণের এই দিনগুলিতে মূল উপাসনা মন্দিরও তা অনুভব করবে ও ভাষায় রূপ দেবে, যার প্রতিফলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রতি স্তরে অতীতে ঘটেছে। বহুজনের হিতার্থে আমরা কর্মশক্তিকে উচ্চস্থান দিতে শিখব ও কর্মকে আদর্শে রূপায়িত করব। কিন্তু, এসবের জন্য হিন্দুধর্ম জ্ঞান, ভক্তি, আত্মত্যাগ ও মুক্তিপথের পথিকদের শিক্ষালয় হতে বিরত থাকবে না। ধর্ম নিষ্ক্রিয় এবং স্থির নয়। ধর্ম প্রচণ্ড শক্তিশালী, চির-বিকাশমান। এই সত্যের প্রমাণ আমাদের জন্য প্রতিক্ষমান।

অতীত ও বর্তমান

কিছু লোক সত্যকারের ভারতীয় হতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকায়, আবার কিছু লোক একই লক্ষ্যে সামনের দিকে তাকায়। এটা স্পষ্ট যে আমাদের দুটিরই প্রয়োজন, যদিও দ্বিতীয়টির প্রয়োজন প্রথমটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দুটির প্রয়োজন এই জন্য যে, অতীতের শক্তি থেকেই ভবিষ্যৎ জন্মলাভ করবে। শুধু মাত্র তীব্র তিরস্কারের দ্বারা আমাদের কেউই শিক্ষালাভ করতে পারে না। যে শিক্ষক আমাদের গড়ে তোলেন, তিনি আমাদের নিজেদের চেয়েও ভাল বোঝেন, আমরা প্রকৃতই কি চেয়েছি এবং প্রচেষ্টা করেছি, আমাদের প্রচেষ্টা কতদূর ঠিক ছিল, এবং কোন দিকে যে কে আমরা আরও সুন্দর ও ভাল করতে পারব। যিনি আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং আশার সঞ্চার করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষাগুরু।

একই ভাবে, অবজ্ঞা ও তিরস্কার দিয়ে কোন জাতিকে সাহায্য করা যায় না। যে অতীত ব্যর্থ হিসাবে স্বীকৃত, তার ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় না। যে এই চেষ্টা করে, সে কখনো নিজের পরাজয়ের কারণ বুঝতে পারবে না। শিক্ষা দেওয়ার আগে আমরা সেই অমৃতের নিকট প্রার্থনা করব, যিনি নিজেকে শিক্ষার্থীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সেবাই প্রকৃত পূজা। কারণ আমি তোমাদের মধ্যে অসীম, শুদ্ধ, মুক্ত, দুর্নিবার ও চিরন্তন আত্মা দেখতে পাচ্ছি,—আমি এর উদার অভিব্যক্তির পথে কিছু কিছু বাধাকে অপসারিত করার চেষ্টা করতে পারি। যদি তোমাদের মধ্যে সমগ্র মানবতাই না থাকে, তবে চেষ্টা করে কি হবে? এরূপ চেষ্টার কোন ফল নাই।

তাহলে এই দাঁড়ায় যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের মত সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি প্রথমেই তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ওপর এবং অতীতে তারা এই লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য কি কাজ করেছে তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে। সুতরাং সব বড় সামাজিক বিপ্লবের জন্য অবশ্যই রক্ষণশীলতার একটি নির্দিষ্ট মৌলিকতা চাই।

কিন্তু অতীতের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই অপেক্ষাকৃত ভাল হবে। সর্বশেষ, আমাদের জানা থাক আর নাই থাক, আমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে কিছু শক্তি নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এবং অপরের অগ্রগতির জন্য আমাদেরই পথ কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। সীমাবদ্ধতার মনোভাব, অপরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি প্রত্যাখান পরিণামে তরুণদের এতখানি ধৈর্যহীন করে তুলবে যে তারা অন্ধ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু দোষ শুধু রক্ষণশীলতার মধ্যে নাই, আমাদের তরুণরা নিজেরাই একদিন এ জিনিস দেখতে পাবে, বরং দোষ আছে অগ্রগতির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার মধ্যে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, সব ধর্মই সত্য ও বাস্তবিকই তাদের মধ্যকার প্রতিটি বিষয় সত্য; শুধু সেইগুলিই সত্য নয়, অন্য ধর্মের বিশ্বাসগুলিকে যেগুলির দ্বারা তারা মিথ্যা ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে, 'তরুণরাই ভুল' এই কথা বলা ছাড়া আমাদের রক্ষণশীলরা যথেষ্ট খাঁটি, এবং তরুণরাও পিছন ফিরে তাকানো প্রবীণদের বিরুদ্ধে জ্বালাতন করা ছাড়া খাঁটি।

অন্যের সাফল্যের জন্য ভালোবাসা ও প্রার্থনা করার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই। ভারত আমেরিকার বিবর্ণ অনুকরণে রূপান্তরিত হয়েছে, এটা কি আমরা দেখতে চাই? ঈশ্বর না করুন! কী চমৎকার, আমাদের ধৈর্যহীনতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রাচীর, আর সকল নব-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদের রক্ষক ও জাতীয় বর্ণের প্রহরী এই সব একনিষ্ঠ প্রাচীন বিশ্বাসীরা! আমরা কি দেখতে চাই, ভারতের ডানা দুটি বদ্ধ, মুরগির খাঁচার সঙ্গে শিকলে আবদ্ধ, কিছু করতে বা কিছু হতে অক্ষম, আর যেখানে ইচ্ছা সে উড়তে পারছে না? যদি তা না হয়, তাহলে, আমাদের খেয়ালী ছেলেরা ভবিষ্যতের ওপর যে মহত্তম আক্রমণ করুক না কেন, আমাদের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ সর্বত্র তাদের সঙ্গে থাকবে। আরও, আরও, বলিষ্ঠ আত্মাগুলি, তোমাদের অগ্নিগর্ভ আশা নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চলো। আমরা জানি, তোমাদের গ্রাম,

তোমাদের পিতা, পিতামহের জন্য তোমাদের বুকে ভালবাসার আগুন জলছে। বরং আমরা মনে করি, আমাদের অপেক্ষা তোমাদের বাদ দিয়ে কী দেশ চলবে! সময় আসবে, যখন তোমরা তোমাদের পুরাতন ঘরে ফিরে আসবে, ভ্রমণে ক্লান্ত, লড়াইতে শ্রান্ত; তোমাদের ফাঁক ভরে দেওয়ার জন্য সন্তানদের রেখে, তোমাদের হৃদয় নিয়ে প্রাচীন জ্ঞানের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষে মুক্তির পথ খুঁজবে। তখন তোমরা সেই সব রূপালী-চুল বৃদ্ধ যারা জন্মভূমিকে রক্ষা করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। এই পুরাতন গৃহের মতো এত স্নিগ্ধ আশ্রয় আর কিছু নাই। এই মন্দিরগুলির ঘণ্টাধ্বনির মতো কোন সঙ্গীতই এত মধুর নয়। ভবিষ্যতের জন্যই অতীত বেঁচে থাকে। ভবিষ্যৎ ছাড়া অতীতের আর কোন ভক্ত নাই।

ধর্ম এবং জাতীয় সাফল্য

ধর্মই দেশগুলোকে জীর্ণ করে দেয়, ভারতও শুধু ধর্মের জন্যই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে, আর ধর্মের বাড়াবাড়ি নাই বলেই জাপান একটি সফল দেশ, যে সব বেপরোয়া বাজে ইত্যাদি আলোচনা কখনো কখনো দেশবাসীর মধ্যে হয়ে থাকে, তা আমরা কড়াকড়িভাবে বাতিল করে দিতে পারি না।

অসত্যের জট পাকানো এই ব্যাপারের সূত্রপাত কোথা থেকে হবে, সেইটে জানা একটা সমস্যা। ধর্ম কি, এ সম্পর্কে আমাদের বন্ধুদের মতামতকে কি আমরা প্রথমেই আক্রমণ করব? অথবা কি কারণে দেশগুলির ব্যর্থতা ও সার্থকতা অর্জিত হয়, এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, আগেই বুঝতে চেষ্টা করব? আমাদের মধ্যে কিছু লোক জাপানের সার্থকতা স্বীকার করতে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে অস্বীকার করে, যেহেতু, তার ধর্ম নাই এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সে পিছিয়ে পড়বে ও বিস্মৃত হয়ে যাবে, এ কথা নির্ভুলভাবে বিশ্বাস করতে তারা চায়।

আবার আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক, ভারতবর্ষ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে, একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সকলের বিরুদ্ধে বিপরীত মত পোষণ করে তাদের বক্তব্য এই যে, ভারত বিরাট এক ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত এবং তার শিরায় শিরায় তারুণ্যের রক্ত প্রবাহিত।

এই সব ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত মানসিক প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা বৃহৎ অংশে আমাদের দৃষ্টিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে। অতএব তর্কবিতর্ক অর্থহীন। যে নতুন স্বর্গ ও মর্ত্য আমাদের চারপাশে গড়ে উঠছে, তার সত্যতা নিরূপণে আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতি এই বিষয়ে প্রকৃতই সার্থকরূপে নির্দেশক হতে পারবে। এই বিতর্কের সৃষ্টি, যারা হতাশা ও বার্ধক্যজনিত ক্লান্তির কথা বলে, তারা করতে পারবে না।

আমাদের বন্ধুরা ধর্ম বলতে কি বোঝেন, এইটিই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বোধ করি, এই সংজ্ঞা ঠিকমত নিরূপিত হলে দেখব যে, ভারত আজও মৃত নয়, তার কারণ, তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে তার ধর্মের কাছে ঋণী। ধর্ম এই অর্থে গোঁড়ামি, ভয়, পৌরাণিক কাহিনী অথবা প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার নয়। এটি একটি জীবন্ত চিন্তা ও বিশ্বাস, চরিত্রের মধ্যে যার প্রতিক্রিয়া।

এই অর্থে হিন্দুধর্ম কোন পলাতকের প্রতিমা পুজা নয়। জাতিগুলির জীবনে সার্থকতা ব্যর্থতার মতই ক্ষণস্থায়ী। হিন্দুধর্ম সার্থকতার নীতি উপদেশ নয়। এমনকি এই ধর্ম কোন সংক্ষিপ্ত পথ সহ্য করে নেওয়ার ঘোষণাও করে না। এসব যাদুর রাজ্য। আমাদের ধর্ম শ্রেণীবদ্ধ ঐন্দ্রজালিক সূত্রের চেয়ে কিছুটা ভাল। যদি হিন্দুধর্ম সার্থকতার উপদেশাবলী হোত, তাহলে এর অভিজ্ঞতা অর্ধেকের বেশি হোত না।

আমাদের মধ্যেকার বিশ্বাসের প্রতি যদি আমরা সৎ থাকি, আমরা সাক্ষীর মতো জয় এবং পরাজয় দুটিরই চশমাতে দেখি। আমাদের সাধ্যানুসারে ক্ষমতার বিজয় কামনা করি, কিন্তু তার দাসত্বে বাঁধা পড়ি না। আমাদের সব ক্ষমতা দিয়ে পরাজয়কে উল্টে দিতে চাই, কিন্তু তা সত্বেও, এর দ্বারা আমরা মাথা নত করি না। কি জয়ে, কি পরাজয়ে, আমরা অচঞ্চল, ধর্মের শক্তিতে সার্বিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণে সচেতন, যা ভাল কিংবা মন্দ জীবনের কোন পরিবেশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না। আমরা কি সত্যিই তাদের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত, জগতে যাদের সব ভালো কেবল নিজেদের কেন্দ্র করেই? আমরা কি জানি না যে, যুগ্ম বিপরীতে স্পন্দনশীল দোলন আছে, ভালোর পিছনে আছে মন্দ, যশের পিছনে আছে কলঙ্ক, উজ্জ্বল সার্থকতার পিছনে আছে বিপর্যয়ের অন্ধকার?

পরিস্থিতির জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানে মানবিক চিন্তা ও স্বভাবের পুঞ্জীভূত সম্পদ-ধর্ম একটি স্থায়ী উপাদান। যৌথ ব্যক্তিত্বের এই গঠন দেশের ধর্মীয় ভাবগুলিকে রক্ষা করার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। কে প্রাচীন মিশর অথবা মেসোপটামিয়া, ক্যালডিয়া অথবা আসিরীয়ার পুনরুদ্ধার করবে? কেউ না, কারণ যে কারণে তারা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল, সেই কারণগুলি চিরকালের মতো অন্তর্ধান করেছে। একটি জনতার প্রতিভার কেন্দ্রীয় প্রকাশ মাধ্যমকে অবলম্বন করে এমনকি একটি ভাষাও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে। ক্ষণিকের ঔজ্জ্বল্যে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। রোম আজ কোথায়? কোথায় পর্তুগাল? স্পেনই বা কোথায়? ইতিহাসের বিচারে কয়েকটি শতাব্দী একজন সাধারণ মানুষের জীবনে এক ঘণ্টা মাত্র। সময়ের উড়ন্ত গতিতে জাতিসমূহের ভাঙ্গা গড়া হয় না; তাদের দৃঢ়তা ও ধৈর্যের দ্বারা, যা তারা ধারণ করতে পারে কি পারে না; তাদের নিজস্ব বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে তারা বহন করতে পারে কি পারে না, তার ওপর নির্ভর করে সব কিছু। অসাধারণ বাণিজ্যিক শোষণের মুহূর্ত ইতিহাসের সার্থকতাকে গঠন করে না, যতক্ষণ না কতকগুলি শক্তি বিজয়ীর ব্যক্তিত্বকে ঠিকমত রক্ষা করে চলে। বিজয়ীর চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতা

না থাকলে বাণিজ্যিক সফলতা নিজেই স্থায়ী হয় না। আমাদের ধর্মের শিক্ষা যে, এই জগৎ প্রকৃত নয়। যে আন্তরিকতার সঙ্গে এটা বিশ্বাস করে সে নিজের মন এবং বিবেকের জীবনকে বাহ্যিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে পণ্য দ্রব্যের মত বিনিময় করতে পারে না কিছুতেই। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের উর্ধ্বে বিবেকের প্রাধান্যকে স্থান দিতে পারা পৃথিবীর উত্তরাধিকার অর্জনের পক্ষে একটি প্রধান গুণ।

আত্মত্যাগের শক্তি

প্রতারণাপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি সমাজের বিশেষ অবস্থাসমূহের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, আধুনিক কালে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি সর্বজনীন, সেটি এই, "একি কিছু দেবে?" সর্বদাই এই মন্তব্যের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত, "কাকে দেবে?" এবং যতক্ষণ না স্পষ্ট ও পুরো উত্তর পাওয়া যায় এই প্রশ্নের, আর কোন উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

সাধারণভাবে দেখা যাবে এই প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ব্যক্তির উদ্দেশে। একটি নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি অনুসরণ করার ফলে সেই ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে? যদি থাকে, ঐ আচরণ উপদেশ-যোগ্য, যদি তা না থাকে তাহলে নয়।

এখন এর সবটাই খুব ভাল হতে পারে যদি ব্যক্তির ধারণা অথবা প্রবণতায় তার ব্যক্তিগত উপকার সম্পর্কে যথেষ্ট বড় রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারতো। দুর্ভাগ্য-বশত যে শ্রেণীর মনের কাছে এই প্রশ্ন স্পষ্ট ও শক্তিশালী আবেদন সৃষ্টি করে, কোন কিছুর ওপর বড় রকমের গুরুত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতা তার নাই। যদি আমরা অধার্মিক জীবন-যাত্রায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করি, তাহলে এটি একটি সঙ্গত প্রশ্ন, "একি কিছু দেবে?" কারণ যে কোন প্রকারের অধর্ম অথবা পাপ হোক, দীর্ঘ ব্যবধানে শুধু ব্যক্তি-স্বার্থের নয়, সমাজেরও ক্ষতিকারক।

কিন্তু অধর্ম ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় হলে, এর ফল কি? ধরা যাক, এই প্রশ্ন স্বর্গীয় সুখ ত্যাগ করে মাটির পৃথিবীতে রক্ত-মাংসের মানুষের দেহ ধারণ করার জন্য নেমে আসার আগে একজন অবতার অথবা অধিকারী পুরুষকে করা হোল। আমরা কি তাঁকে আমাদের মধ্যে অবতরণ না করার জন্য প্রার্থনা করব, যেহেতু এই কাজ কোনদিন তাঁকে কিছু দেবে না? যদি তাই হয়, জগতের কোথায় থাকবে মানুষের আশা?

পক্ষান্তরে মানবতার ইতিহাস জুড়ে, প্রতিটি অগ্রগতি, প্রতিটি আবিষ্কার, প্রতিটি সাফল্য তাঁদের দ্বারাই অর্জিত, যাঁরা নিজেদের লাভের ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ

করেছিলেন ও মনুষ্য জাতির জন্য শ্রম স্বীকার করে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতে আমরা একটি সন্ন্যাসীদের উপযুক্ত আদর্শ হিসাবে যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমি আমাদের শিখতে হবে, সন্ন্যাসী ছাড়া কোন সমাজ হয় না এবং সন্ন্যাসীদের জন্যও অনেক সামাজিক প্রয়োগ এখনও বাকি আছে।

বাস্তবিকপক্ষে, সব স্তরে ব্যক্তিকে দেওয়ার মত ক্ষমতা খুব কম পরিকল্পনারই আছে। শিক্ষার চেয়ে বড় সামাজিক প্রয়োজন আর কিছুই নয়। কয়েকটি বিশেষ দেশের ব্যতিক্রম ছাড়া সমাজে শিক্ষাদাতার যথার্থ মূল্য কি দেওয়া হয়? এবং এটা কি সাংঘাতিক নয়? রোমান ক্যাথলিক ধর্ম নাই এমন সব দেশে কেন রোমান ক্যাথলিক গীর্জা ধর্মীয় নির্দেশে শিক্ষার এত বোঝা বহন করে? একমাত্র কারণ এই যে ব্যক্তিগত কর্মী বিনামূল্যে যতখানি সম্ভব তার সম্প্রদায়ের সূত্রে সেবা দান করে। এইভাবেই তার সম্প্রদায় বিজয়লাভ করে। যে সব ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষালাভ করে, সম্মানের নিশ্চয়তা ও তাদের নিঃস্বার্থপরতায় এর জয় সূচিত করে। আজকাল এই শিক্ষার অবস্থা। আদি যুগে মধ্য ইউরোপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবস্থাই ঘটেছিল। জে. আর. গ্রীন ১২২৪ খ্রীঃ অব্দে যে সব খ্রীষ্টান ভিক্ষু অথবা সন্ন্যাসীরা ইংলণ্ডে এসেছিল, তাদের সম্পর্কে বলছেন,—

"খ্রীষ্টান ভিক্ষুদের কাজ দৈহিক এবং নৈতিক দুই-ই ছিল। পৌরসভাবিশিষ্ট শহরগুলির দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি মধ্যযুগের স্বাস্থ্য-রক্ষা সংক্রান্ত বিধিগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল, ফলে জ্বর অথবা প্রেগ অথবা আরও সাংঘাতিক কুষ্ঠ রোগের দূষিত ক্ষতে শহরতলীর জঘন্য বাসাগুলো ভরে গিয়েছিল। এইসব স্থানে বারংবার যাতায়াতের নির্দেশ ফ্রান্সিস্ তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন, গ্রে ভ্রাতৃবৃন্দ অবিলম্বে শহরের নিম্নতম ও দরিদ্রতম এলাকাগুলিতে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল দুর্গন্ধপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধির আস্তানায়, সাধারণত কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে এই স্থানটিকে পছন্দ করার ঝোঁক ছিল। লণ্ডনে তারা নিউ গেটের কসাইখানাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল, অক্সফোর্ডে তারা টেমস্-এর স্রোত ও দেওয়ালের মাঝখানে জলাভূমি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কাঠ ও মাটির কুঁড়ে ঘর, তাদের চারপাশে ঘেরা জঘন্য কুঁড়ে ঘরগুলোর মত, কর্কশ বেড়া ও খানার মাঝখানে বন্দী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা,—এই ছিল অবস্থা।"

এসব ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে সিস্টার সিয়ান নামে একদল কঠোর আত্মসংযমী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল, যারা ফরাসীর বিস্তীর্ণ পতিত জমি ও জঙ্গল এলাকাগুলিতে এবং রাইন নদীর দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মঠ ও গীর্জা নির্মাণ করেছিল, ব্যাপক আকারে শুরু করেছিল কৃষির কাজ, জলাভূমিগুলির জল নিষ্কাষণ করেছিল, পরিষ্কার করেছিল সাধারণ জমিগুলি। এই সিস্টার সিয়ানরাই পরবর্তীকালে মাতৃগৃহ ইংলণ্ড থেকে কন্যাসম্প্রদায়কে নরওয়েতে বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, এবং তারাই কেবল সে

দেশে পাথরের তৈরি বাড়ি, রোমান হরফ এবং জাতীয় মহাকাব্য লিখতে শিখিয়েছিল।

এমনকি পশ্চিমও তার আত্মস্বার্থ ও তাদের কর্মশক্তির কার্যকরী মতলব হিসাবে দ্রুত লাভের উচ্চ-ঘোষণা সত্বেও, সেই পশ্চিম বিনা বেতনের শ্রমের ওপর গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা শ্রমের মজুরী লাঘব করেছে, না হয় ছেড়ে দিয়েছে ও সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সঞ্চয়ের অনুমতি দিয়েছে। কোন একটি কাজ সম্পূর্ণ সংগঠিত হয়ে গেলে ও তার সাধারণ পরিমাপের ভিত্তি তৈরী হলে আশা করা যায়, বেতনের বাজার দরের দাবি। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হবার আগে কোন একজনকে অথবা বহুজনকে সাহসী অগ্রণীর ভূমিকায় পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আসতে হয় সম্প্রদায় অথবা জাতির স্বার্থে।

এমনকি ভারতেও ইংরাজরা তাদের সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থপরতাসহ যদি অধিকার অর্জনের পিছনের ইতিহাসের দিকে তাকায়, আমাদের স্মরণে আসে, একজন ইংরাজ চিকিৎসকের কথাই মনে পড়বে, যিনি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পুরস্কার না চেয়ে ইংরাজ বণিকদের জন্য কারখানা স্থাপনের সুযোগ সুবিধা চেয়েছিলেন। কর্তৃত্বে সন্ন্যাস না থাকলে কোন আন্দোলনকে ভয় করার প্রয়োজন নাই। যাই হোক আমরা দেখতে পাব, এরূপ সন্ন্যাসের প্রতিরূপ সর্বদা একটি শক্তিশালী ও সম্প্রদায়ের সদা-জাগ্রত কল্পনা। ডাঃ হ্যামিল্টন বণিকদলের প্রয়োজন সম্পর্কে এত বেশি সচেতন ছিলেন ও নিজেকে তাঁদের একজন বলে এত বেশি ভাবতেন যে, তাদের জন্য তাঁর নিঃস্বার্থপর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর তাই, সামাজিক মিলনের নতুন ধারণার অভ্যুত্থানের সঙ্গে একটি নতুন যুগেরও প্রকৃত জন্মলাভ ঘটে থাকে।

কোন প্রশ্ন নাই, জাতীয়তাবাদের নামে ভারতবর্ষে পরিণামে কি ঘটবে।, জাতির চিন্তাই কেবল প্রচুর প্রাণবন্ত হোক, এবং এই অনুশীলনের গতিই সবপ্রয়োজনীয় ত্যাগকে বহন করে নিয়ে যাবে। আর জাতির স্বার্থে, শহরের স্বার্থে, সর্বসাধারণের স্বার্থে, এই ত্যাগ উচ্চতর ও গভীরতর ত্যাগের পাঠশালা হবে, যাকে হিন্দুধর্মে বৈরাগ্য বলা হয়। যিনি নাগরিক সন্ন্যাস-অনুশীলন করেছেন, জাতির সেবায় তিনি সর্বোত্তমরূপে প্রস্তুত। যিনি জাতীয় নিঃস্বার্থপরতার স্বার্থে নিজেকে সংযত ও পবিত্র করেছেন, তিনি শেষ এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, জীবনে যার প্রতিক্রিয়া জ্ঞান অথবা ভক্তি অথবা কর্মযোগ।

কিন্তু কি বিস্ময়কর সাধনা-পরম্পরার মধ্যে এই যুক্তি অর্জন। ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাবি ত্যাগ করতে হবে, আর বাপ-মা'কে করতে হবে ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার গভীরতর ত্যাগ। তা সত্বেও নতুন যুগের এই ত্যাগীরা গেরুয়া পরবে না। কোন এক অফিসের চেয়ারে বসা অথবা কোন কারখানা পরিচালনা করা, সহকর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ তালিকার মধ্যে এনে অথবা শ্রমিকদের বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি নাড়ীর ও শক্তির প্রতি মনোনিবেশ করা, নিজেকে

শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া, অথবা এমনকি, বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের সঙ্গে নিজের সংসার পরিচালনা করা ইত্যাদি কোন কিছুই সীমায়িত স্বার্থে নয় এবং ভারতীয় জনসাধারণের জন্য নিজ স্বার্থের বিপক্ষে, এই হবে আধুনিক যুগের গেরুয়া পোশাক।

গীতা বলছেন, "যিনি ভয় কিংবা আকাঙ্ক্ষা কিছুই জানেন না, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।" সন্ন্যাসীর পোশাক নয়, সন্ন্যাসীর হৃদয়। যাঁর নিজের জন্য ভয় নাই, আশাও নাই। যিনি ব্যষ্টির স্বার্থে, প্রয়োজন হলে নিজের পরিবারবর্গকেও অনশনরত দেখতে পারেন। যিনি নিজের পরাজয়ের ফলে ভবিষ্যতে আর কেউ সফল হতে পারে, এ জন্য সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। যাঁর কাজের বাইরে কোন গৃহ নাই, স্বার্থহীন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন অধিকার নাই, তাঁর রক্তের দ্বারা সাথীরা উপলব্ধি করবে, এ ব্যতীত কোন আশা নাই। ছাত্রদের প্রত্যেক শ্রেণীতে এই ধরনের ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। আমরা সাহস করে তাদের ও তাদের প্রতিবেশী এবং বাপ-মায়ের উদ্দেশ্যে বলতে পারি, তোমাদের ভিতরকার আলোড়িত উচ্চাশাকে বিশ্বাস করো! তোমাদের মহতী আশার ওপর সব ঝুঁকি নাও! নিজেদের ওপর আর যারা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তাদের ওপর আস্থা রাখো! এগিয়ে যাও! যা দেখবে তাই করো এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মায়ের ওপর নির্ভর করো। কারণ যথার্থই তোমাদের হৃদয় ও মনের, তোমাদের জীবন ও কর্মের নবভারত এখনও হয়নি। এবং তোমরাই আশীর্বাদধন্য, যারা না দেখেও বিশ্বাস করতে পার!

পবিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ

এবং প্রভু বললেন, "সাইমন, সাইমন, শয়তান তোমাকে নিতে ইচ্ছা করেছে, সে তোমাকে গমের মত ছেঁকে নিতে পারে!"—এই বিষণ্ণ কথাগুলি শত্রুর হাতে প্রতারিত হওয়ার একঘণ্টা কি দুঘণ্টা আগে খ্রীষ্টের উক্তি হিসাবে সেণ্ট লিউকের খ্রীষ্টান-নীতি উপদেশাবলীর মধ্যে উল্লিখিত। অবতারের এরূপ শক্তি যে, যখন সমগ্র জগৎ তাঁকে তাঁর বিচারের কাঠগড়ায় ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, তাঁর দুর্বলতা ও অবহেলিত অবস্থায় একটি বিশ্বাসের মধ্যে সম্মোহিত করছে, তখন একমাত্র তিনিই জগৎকে বিচারের সামনে দাঁড় করিয়ে গমের মত বেছে নেওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে সচেতন। তিনিই একমাত্র অপরিহার্য বিষয় মানবতার জরায়ু-গর্ভে শিহরিত হচ্ছেন, আন্দোলিত হচ্ছেন সবদিকে। তিনিই সাধারণ মনের সব ক্ষীণতা ও দুর্বলতাজনিত বিপর্যয়ের কেন্দ্র, প্রকৃতই আধ্যাত্মিক জগতের এই বিষয়গুলির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ পদার্থ-বিদ্যার তরল পদার্থের আত্মবিরোধী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে অবতারের আবির্ভাব একটি যুক্তিসম্মত প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক আলোক কেন্দ্র হিসাবে তিনি ব্যতীত আমাদের উদ্দেশ্যহীন প্রেরণাগুলিকে

চরিত্রের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সমন্বয় করার ইচ্ছা অসম্ভব হতে পারে। যে পরিমাণে আমরা মানুষ, এমনকি আমাদের মধ্যে নীচতম, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও তাঁর সাক্ষী, কারণ আমাদের সব প্রচেষ্টাই তাঁর মধ্যে তুঙ্গীভূত। এমনকি আমাদের সামান্যতম প্রচেষ্টাও তাঁর বিরাট সাফল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরই আলোতে, কত সত্যি যে, লঘু দায়িত্ব নয়, আরও শক্তির জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত! আমরা শক্তি চাই, প্রশান্তি নয়। প্রশান্তি একটি পরিণাম মাত্র। অভ্যাসের দ্বারা এর চর্চা করা যায়। কিন্তু মূলে যদি আমাদের শক্তি থাকে, তাহলে প্রশান্তি, শান্তি এবং দৃঢ়তা ফুল হয়ে ফুটবেই।

যে অহং দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম সম্পূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে প্রপঞ্চময় সত্তাতে নিবদ্ধ। অহং নিজেকে আক্রান্ত, পরিত্যক্ত, দুঃখী ও ঘৃণার পাত্র দেখে। যে অহং নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম মনে করে, সে প্রত্যক্ষভাবে এই সব কোন কিছুর সম্পর্কেই সচেতন নয়। দূরে থেকে সে এইসব বিষয়ের সাক্ষী হতে পারে। কিন্তু তার স্থির দৃষ্টি বিপরীত দিকে আধ্যাত্মিক জগতের প্রগাঢ় আন্দোলন, আবর্তনের দিকে নিবদ্ধ, তাঁর কাছে জগৎকে যেন একটি পরীক্ষাগারে রাখা হয়েছে। যাঁর আত্মানুভূতি সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে এক, তিনি কি করে নিজেকে নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ভাবতে পারেন! তিনি নিজেকে নির্যাতনকারী আবার নির্যাতিত বলে জানেন, দুটি-ই "মায়ের খেলা"। অথচ সচ্চিদানন্দই তাঁর সজ্ঞান চেতনা, পরম স্বর্গসুখ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। এবং তাঁর মধ্যে আমাদের সব আশা ও প্রতীক্ষার সাক্ষাৎ।

এক প্রকারের উপলব্ধি আছে, যার বিকাশ ঠাকুর ঘরের মধ্যে এবং আর এক প্রকারের বিকাশ কর্কশ ও অমসৃণ জগতের মধ্যে। আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি-ই উপলব্ধি। দুটিকেই ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে মনের মধ্যে পথ কেটে চলতে হয়। হাটে-মাঠের জীবনেও অবতার-বিজ্ঞানই কেবল আমাদের সাহায্য করতে পারে। সব আনন্দ, সব জ্ঞান এমনকি পার্থিব আনন্দ ও জ্ঞান, সবই সচ্চিদানন্দে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

এইরূপে অবতার আসেন, শুধুমাত্র তথাকথিত পবিত্রদের মধ্যে নয়, আমাদের সকলের সামনে, আমাদের সকল কাজের মধ্যে তিনি চলা-ফেরা করেন। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে একমাত্র ভারতেরই সেই সাহস আছে, যা ধার্মিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ, উচ্চ ও নীচের মধ্যেকার মানসিক বাধার প্রাচীর মুছে দিতে পারে। একমাত্র ভারতই অদ্বৈতবাদের বিরাট দার্শনিকতা দিতে পেরেছে, দিতে পেরেছে মানুষকে শুধুমাত্র জীবনের সাক্ষী ও জীবনকে শুধু একটি খেলা হিসাবে ঘোষণা করার কল্পনাশক্তি। আমাদের প্রাচীন পুরুষদের কর্মের ও স্বপ্নের যোগ্য হওয়া একটি মহান দায়িত্ব। যদি আমরাই তাঁদের পথ অনুসরণ না করি, তবে কি করে অন্যকে আহ্বান জানাব?

মানুষের মত আচরণ কর

আমাদের সব কিছুই মনের মধ্যে। আমরা যা দিতে পারি না, তার বাইরে কোন শক্তি নাই। বাইরের জগৎ আমাদের ওপর যা আরোপ করে বলে মনে হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেটা মনের খেলা ছাড়া কিছু নয়। প্রথমেই যা চিন্তা করা হয়, এটি তারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। বুদ্ধ বলেন, "আমরা যা চিন্তা করি, আমরা তারই পরিণামমাত্র, এটি আমাদের চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের চিন্তারই সৃষ্টি।"

এই কারণেই শিক্ষা-জীবনের ক্ষেত্র এত গুরুত্বপূর্ণ। মনকে কাজের উপযোগী অবস্থার মধ্যে রাখতেই হবে। একে রাখতে হবে ইচ্ছার আদেশাধীন, সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সম্ভব কর্মের স্তর পর্যন্ত। যে কোন সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মনকে যোগ্য হতে হবে এবং উপযুক্ত রকমের সাড়া দিতে হবে। মানুষ সামান্যতর আহার, এমনকি তার চেয়েও কম খেতে পারে কিন্তু মনকে মলিন হতে দিতে পারে না। তারা পারে না শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে।

এর মধ্যে, কোন্ বিশেষ বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষালাভ করব, সে প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটি মনেরই, বিষয়ের পিছনে যে শিক্ষা আছে তার। অনুশীলনের আকৃতি যাই-হোক না কেন, আমাদের বুদ্ধিগত সম্ভাবনা রাখতেই হবে। এই প্রশ্নের মধ্যে দুটি উপাদান আছে,—একটি বিশেষ যন্ত্র বা হাতিয়ার সম্পর্কে, অন্যটি মানসিক শক্তি, শারীরশিক্ষা, যা—মানসিক অবধারণা দেয়। এটা ভাল, সন্দেহ নাই তরবারির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আরও ভাল, বাহুতে শক্তি ধারণ করা। সংস্কৃত হোক বা কারিগরী বিদ্যা হোক, অঙ্ক হোক অথবা কবিতা হোক, ইংরাজী হোক অথবা প্রাচীন গ্রীস বা রোমের রচনা বা শিল্প হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এগুলি আমাদের ক্ষমতা বা শক্তি অর্জনের মাধ্যম খেলনামাত্র। আমরা যা চাই তা হোল শক্তি, মনঃসংযোগ ও চিন্তার শক্তি।

এই শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত আশ্চার্যজনকভাবে সৌভাগ্যবান। এই গভীর মনঃসংযোগের অর্থ সমাধি। প্রার্থনা, পূজা ও জপ সব কিছুর লক্ষ্য সমাধি, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিন্দুতে উপস্থিত হওয়া। মানুষ শেষ পর্যন্ত অন্যের তুলনায় নিজেরা পরিমাপ করবে শক্তির বিচারে নয়, মনের বিচারে। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হয়তো অদৃশ্য, হয়তো দ্রবীভূত অবস্থার মধ্যে আছে, ঘনত্ব সৃষ্টির জন্য হয়তো অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তাদের কেবল অনুশীলন করে যেতে হবে। তাদের কখনও বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। এবং নিজেদের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও চলে যাবে না।

তবুও, আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অদৃশ্য হয়ে যেতে অথবা মুলতুবী থাকতে দেব না। আমরা এর প্রতিশ্রুতির পূর্ণ সমকক্ষ হব। মনে রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই গোখুরো সাপটার কতটুকু প্রসংসা করেছিলেন, যে শুধু দংশন নয় ফোঁসফোঁসানিও ছেড়ে দিয়েছিল। যে সমগ্র সমাজ ফোঁসফোঁসানিটুকুও জানে, তার আর কামড়াবার

দরকার হয় না। জগতে শান্তি কেবল এই পথেই আসতে পারে। কী তীব্র আর স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তা তাঁর, যিনি এটি বুঝেছিলেন, এবং মানুষের আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। অপর মনটিও কী কর্তৃত্বপূর্ণ ছিল, যিনি আমাদের সব বিতর্কের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে একটিমাত্র ঘোষণায় সব জটিলতার উপসংহার টেনেছিলেন এই কথা বলে, "তোমরা মানুষের মতো আচরণ কর!"

আমরা কি করে মানুষের মতো আচরণ করব? লক্ষ্যে পৌছতে কখনও ক্ষান্ত হয়ে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার উচ্চাশা ও দরবার কক্ষের পিছনের সারিতে থাকা। ভিতরে এবং বাইরে শুধু সংগ্রাম, সংগ্রাম আর সংগ্রাম। সর্বোপরি, সর্বপ্রকার স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। এমন কোন যন্ত্র নাই যা আমরা পরিচালনা করতে পারব না, এমন কোন হাতিয়ার নাই, যাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারব। প্রতিটি ক্ষেত্রে জগৎ-ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা অংশ নেব। এবং আমাদের লক্ষ্য হবে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা। অন্য কারও অপেক্ষা আমাদের এই নতুন শিক্ষা কম হবে না। সত্যের অন্বেষণ আমাদেরই, এবং এজন্য আমরা ভালভাবেই প্রস্তুত। নাগরিক সাধুতাও আমাদের, আমাদের তা শুধু হাতে-কলমে প্রমাণ করতে হবে। সম্মানও আমাদের, আমাদের তা নতুন নতুন আশ্চর্য সব দেশে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। সমাজ সচেতনতা, সঙ্ঘবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য, সবই আমাদের, যদিও এগুলিকে আমাদের অজানা-পথে প্রকাশ করতে হবে। লোকহিতকর মনোভাব ও স্বার্থত্যাগ আমরা এ সব কিছুরই যোগ্য।

কিন্তু, এই কথাগুলির নৈতিক মূল্য উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের সব রকম শিক্ষার জন্য লড়াই করতে হবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আকুল বন্দীর মতো, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের খাদ্যের জন্য ব্যাকুলতার মতো। একটি সুসঙ্গত সংগ্রামের উপায় আমাদের অর্জন করতে হবে, তারপর তোমাদের অনুসন্ধানী আলোর সব ঔজ্জ্বল্য আমাদের দিকে ফিরিয়ে বলো, "ও, তোমরাই আধুনিক অগ্রগতির পরীক্ষা! তোমরা দেখবে, ভারত তোমাদের আলোর তীব্রতার কাছে সঙ্কুচিত নয়!"

অকৃত্রিমতা

আমাদের নিজেদের জীবনে ও আমাদের সন্তানদের শিক্ষার মধ্যে আমরা মৌলিক উৎকর্ষতার দিকে ফিরে যেতে চেষ্টা করব। কেউ আমাদের সাফল্যের কথা বলছে না। সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, সাহস ইত্যাদির দাবিও কেউ করছে না। এগুলি নৈতিক উৎকর্ষ বা গুণের কেন্দ্রীয় অধ্যবসায়ের নানা রকম আকৃতি। একটি মূল অকৃত্রিমতা যা একটি মানুষের সমগ্র জীবনকে ধৈর্যের সঙ্গে কোন একটি ভাবের যোগসূত্র অনুসরণ করায় এবং যা সে অনুভব করে তার নিজেরই মনের মধ্যে।

এই ধৈর্য, দৃঢ়তা, এই অকৃত্রিমতাই ধর্ম—মানুষ ও বিষয়ের প্রধান অংশ, অভিন্নতা। ধর্ম আমাদের বিরাট জাগতিক শক্তির খেলার বস্তুতে পরিণত করে। আমরা আর কি হতে চাই? এ বিবেকের প্রচণ্ড ঝড়ে ঝরা পাতার মত আমাদের সামনের দিকে ঠেলে দেয়। উচ্চতর ভাগ্য আর কি আছে? ভাব বা কল্পনার সহায়কগুলি, ব্যবহৃত ; দেবতাদের ক্রীতদাস, জীবনের কণ্টকময়-পথে ব্যাপক আর্তির হেতু, বিরাম নাই, ভয় নাই, হতাশ-হৃদয়ে পরমানন্দময়।

আমরা অকৃত্রিমতাই চাই। অকৃত্রিমতা সব উপলব্ধির মূল ও ভিত্তি। অকৃত্রিমতা স্বহং গুণাবলীর মধ্যে সরলতম ও সবচেয়ে অধিক দূর যেতে পারে। অদৃষ্টের ওপর অকৃত্রিমতার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্ত হৃদয়-সমগ্র সাফল্যের কারণ। যে অকৃত্রিম, সত্য পবিত্রতা ও সাহসের বিপরীত কিছু কী তার মধ্যে স্থান পেতে পারে? তারা কী সেই একই স্বচ্ছদৃষ্টির বিভিন্ন রূপ নয়? যে ব্যক্তি পদে পদে নিজের আত্মার অনুসন্ধানে এগোতে থাকে এবং শুধুমাত্র সেই একই লক্ষ্যে সচেতন, কোন মিথ্যা, ভীরুতা অথবা স্থূলতা তাকে প্রভাবিত করতে পারে?

অকৃত্রিমতার বিপরীত কৃত্রিমতা, ভণ্ডামী, লোক দেখানো প্রেম। অবিরাম নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা, বড় বড় কথা বলা, পদ্ধতির পরিবর্তে ফলের আকাজ্ক্ষা করা, এগুলি অকৃত্রিমতা সমাধি খনন করা, জয়ের পরিবর্তে ব্যর্থতার বোঝা তৈরি করা। এইসব আবেগকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। এগুলিকে নিচে ফেলে দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। পরম বিতৃষ্ণায় এগুলিকে পরিহার করে চলা শিখতে হবে। সংযম, নম্রতা ও পরিশ্রমের দ্বারা কথার চেয়ে কাজকে বড় করে তুলতে হবে, আমাদের মধ্যেকার সেই সব জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে ও শাস্তি দিতে হবে, যেগুলি নিজেকে জাহির করার জন্য, সস্তা প্রশংসা ও সস্তা জন-পরিচিতি (কেবল মন্দ অর্থেই) অর্জনের জন্য চীৎকার করে।

আধুনিক জগতের প্রত্যেকটি বিষয় উচ্চ ঘোষণার অভ্যাসকে উৎসাহিত করতে চায়। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের শান্ত মর্যাদা ও সরল অহঙ্কার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আত্মসচেতনতা থেকে তাঁরা যে স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন, আমরা তাই চাই। কিন্তু একে পাওয়ার কেবল একটি পথই আছে। তাঁরা যা করেছিলেন, আমাদের সেই কাজই করতে হবে, আমাদের চেয়েও বড় আদর্শ ও কল্পনা আত্মার লক্ষ্যরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্থাপন করে যেতে হবে। যখন আমরা পূর্ণ জোয়ারে অর্থাৎ ঈশ্বরে মিশে যাই, তখনই আমরা সত্যিকারের আরশির প্রতিফলন বা অহং ভুলতে পারি। ঈশ্বরের সেই পূর্ণ প্রবাহ বা জোয়ারের অনেক নাম, তাদের মধ্যে কিছু কিছু কষ্টকর ব্যাখ্যার মধ্যে আশ্চর্যভাবে ঘনিষ্ঠ। অহং-এর বিস্মৃতির জন্য কোন কিছুকে অবলম্বন করে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ।

মৃত্যুর মুখোমুখি

যিনি ৺ভগবানরূপে উপাস্য দেবতার পূজা করেন, সন্দেহ নাই তাঁর সাহসিকতার জন্য তিনি কিছু লাভ করেন, যেহেতু প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত বিশ্বাস ভগবান আর যারই বিরুদ্ধে থাকুন না কেন, তার সঙ্গে আছেন। কিন্তু বিগ্রহ পূজায় ঈশ্বরকে ব্যবহার ও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য হীনতর করায় কলঙ্ক কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না।

ভাগ্য বা অদৃষ্টের ওপর বিশ্বাসে বিপদও আছে। কারণ আমরা যখন নিজেদের নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় বলে মনে করি, তখন ভাগ্যকে একমাত্র কর্তা বলে সহজে স্বীকার করে নিই। তবু বাস্তব সত্য এই যে, আমরাই সক্রিয় ও কর্তৃত্বশালী। আরব সৈনিক যখন আক্রমণোদ্যত অথবা পাগলের মত শত্রুর বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে ছুটে যায়, তখন সে চীৎকার করে ওঠে, "কিস্‌মৎ!" অচিরাৎ জয়ের জন্য এমন সৈনিক আর হয় না। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে যখন সে পিছু হটতে বাধ্য হয়, তখন সেই আবার বিড় বিড় করে ম্লান সুরে বলে ওঠে, "কিস্‌মৎ!" ভাগ্যের ওপর যে বিশ্বাস তাকে মুহূর্ত পূর্বে জগতের দুর্ধর্ষতম সৈনিকে পরিণত করেছিল, এখন তাকেই বাহিনীতে সংহত করা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

মাতৃ-পূজা থেকে যে সাহস জন্মলাভ করে, তা এগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আলিঙ্গনের নাম মৃত্যু, পুরস্কারের নাম যন্ত্রণা, সাহসের নাম পরমানন্দ—সব, শুধু ভালোর জন্যই নয়, সব ললাটেই তাঁর স্পর্শ—সব, শুধু হিতকরই নয়, তাঁর সন্তানের জন্য এই তাঁর ইচ্ছা। সন্তান কেঁদে ওঠে, "আমি কোথায় দেখব, তুমি নাই?" আমি যদি প্রভাতের ডানা হয়ে সমুদ্রের দূরতম প্রান্তে উড়ে যাই, দেখি তুমিই সেখানে! যদি আমি নরকের নিচে নেমে যাই, দেখি, তুমি সেখানেও!

মাতৃ-আরাধনা বাস্তবে বীরের বেদান্ত। তিনিই সব, তিনিই মূল শক্তি, তিনিই অনন্ত শক্তি, তিনিই আদিশক্তি। এই শক্তিতে এক হয়ে যাওয়ার অর্থ সমাধি অবস্থায় পৌঁছনো। অহংকে মুছে ফেলে, ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ঘটিয়ে আমরা সেই দৃশ্যের জগতে প্রবেশ করতে পারি। বেদে আছে, "যখন আকাঙ্ক্ষা চলে যায়, হৃদয়ের সব তন্ত্রী ছিন্ন হয়ে যায়, মানুষ অমরত্বের পথে সিদ্ধিলাভ করে।"

আমরা সাধারণত তাকে ভালবাসি না, যার শক্তি আমাদের কাছে অনেক। নায়েগ্রার পাশে কোন গুহাতে যদি কাউকে একাকী কয়েক মিনিটের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে নায়েগ্রার সব দৃশ্য তার ঘৃণার আবেগে ঢেকে যাবে। এটা দৈহিক আতঙ্কের বাস্তব রূপ। যে মধ্যরাত্রির চরাচর আমাদের কাছে এত উজ্জ্বল মধুর, আমাদের যদি নক্ষত্র-পথে যাতায়াতের স্বাধীনতা থাকতো এবং অতি দূর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হোত, তাহলে একই রকম ঘৃণার সঞ্চার হোত। আমাদের ভাবাবেগগুলির বেশীর ভাগ অতি দ্রুত অবচেতন মনের হিসাব ও মুখোমুখি ঘটনার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তার পরিণাম। মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক "নির্লিপ্তের আনন্দ"

পেয়েছেন। আরও কমসংখ্যক পেয়েছেন মায়ের সঙ্গে সংশেষ ও সর্বোচ্চ পরমানন্দময় মিলন।

যাঁরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হবেন, তাঁরা মৃত্যুকে পূজা করবেনই। দুঃখের, বেদনার পান পাত্র থেকে শেষ বিন্দুটি পান করে নিয়ে—তাঁরা বার বার শূন্য পাত্রটি বাড়িয়ে দেন, আরও চাই। যাঁরা শক্তিমান, তাঁরা পিছনে ফেরেন না; যাঁরা অটল, তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হয় না। যে মোহভঙ্গের কথা আমরা কবিতায় পড়ি, তাতো শক্তির পরিচয় নয়। সেগুলি আত্ম-সচেতন মন ও অহংবোধের হঠাৎ প্রতিক্রিয়া এবং অপ্রত্যাশিত আলোড়ন। বীর তার দুর্নিবার ক্ষমতা ও অপ্রতিহত প্রাণশক্তিতে আনন্দ এবং দুঃখ কোনটাই জানেন না। তিনি এর মধ্যেই পথ চলেন ও আরও দাবি করেন। তিনি শূঙ্গে তরবারিকে পদদলিত করে চলেন। তিনি অহংবোধ অতিক্রম করে চলে যান।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ অবনমিত হওয়ার কথা কখনও ভাবতেন না। কিন্তু, তিনি বহু আগেই রামকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।" এর নাম শক্তি, এর নাম সাহস, যিনি মাতৃ-আরাধনা করেন, তাঁর। যিনি অন্তরূপিণীকে জেনেছেন, তাঁর কিসের ভয়? মৃত্যু তো তিনি তাঁর অভ্যন্তরেই ধারণ করে রেখেছেন। তাহলে, কেন তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন? কিসের মধ্যে তিনি দেখবেন বেদনা ও আনন্দের পার্থক্য? তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন বিরাট মোহ। এই মোহ তাঁর বিরুদ্ধে কি কাজে লাগবে? জর্জ এলিয়ট বলেন, "বলবান আত্মাসমূহ অগ্নিগর্ভ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মত বেঁচে থাকেন, তাঁদের শক্তিকে দুরূতম ক্রিয়ায় ব্যবহার করার জন্য। গতানুগতিক আরামের চেয়ে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আরও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চারিত করো।"

এই কথাগুলি সত্যের ঘণ্টাধ্বনি। কারণ শক্তি এইরূপই। আর মায়ের সন্তানেরাও এরূপ বীর হয়ে থাকেন।

বিলাস ও পুরুষত্ব

অবসর সময় ও আর্থিক সংস্থানের সদ্ব্যবহার অপেক্ষা শিক্ষার বড় পরীক্ষা আর কিছুই নাই। এটা ততখানি আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপার নয়, যতখানি আমাদের পছন্দ বাছাই করার ব্যাপার, যা আমাদের চরিত্রকে প্রকাশিত করে। এই কারণেই, বিলাসিতার যুগ অপেক্ষাকৃত ধনী সম্প্রদায়ের ওপর এত মারাত্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি একজন ভদ্রলোক এবং সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারতো কঠিন শ্রমের অধীনে থেকে, সেই ব্যক্তিই মাত্র একটি জন্তুতে পরিণত হয়, এবং কখনও কখনও প্রকৃতিস্থ বা স্বাস্থ্যবান জন্তুও নয়, যখন দেখা যায় তার সমগ্র জীবন একটা

আমোদ-প্রমোদের খেলায় পরিণত। যাই হোক, যখন বিলাসিতার নমুনাগুলির দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, সেগুলি আমদানী করা ও আমাদের সভ্যতার ক্ষেত্রে বিদেশাগত, তখন বিবেকে বিপদের আশঙ্কা শতগুণ বেড়ে যায়। মোটর গাড়ির সঙ্গে যে প্রচণ্ড অপচয় শুরু হয়েছে, স্বয়ং ইউরোপের নৈতিক চেতনা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ। তাহলে, কি করে ভারতীয় রাজপুরুষেরা মদ, খেলা এবং জুয়াখেলার পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে পারতো? এগুলি তাদের উপর যোগান হয়েছে, অধিকন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা কম বেশী নিজেরাই কোন না কোন নৈতিক আদর্শের জগতে এতকাল অনাক্রান্ত ছিল।

তবুও নির্দিষ্টরূপে যে ধরনের স্বাধীনতা গড়ে ওঠে, তার দ্বারা একটা রীতি বা প্রণালীর বিচার হয়। নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছনোর অনেক রাস্তা আছে। হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় যে কেউ হোক, একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত রুচি ও সম্মানের পথে পৌছতে পারে। কিন্তু যে পথই গ্রহণ করুক না কেন, শেষে নিজেকে তার ভদ্রলোক প্রমাণ করতে হবে অথবা তার শিক্ষা-পদ্ধতি বাতিল বলে গণ্য হইবে। বাজী ধরা, ধোঁয়ার উত্তেজনা, প্রমত্ততা পূর্বের চেয়ে ইউরোপেও ভাল বংশের সন্তানের পরিচয় নয়। এমনকি স্থানীয় অভ্যাসের জন্য যদিও এগুলি ঘটে, উপযুক্ত পরিবেশে সামাজিক অভ্যাসের দরুন প্রকাশ্য আচরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধিত হয়। যদি কোন লোককে তার সঙ্গীদের দ্বারা একজন পৌরুষহীন নির্বোধে পরিণত না হতে হয়, তার জন্য পাশ্চাত্য চক্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আচরণের সচেতনতা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত সংযম, এর সহজ প্রবৃত্তিজাত সৌজন্য ও নারী এবং দুর্বলকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিকট দাবি করা যায়। শ্রমের কাঠিন্য ও আনন্দের সঙ্গে শারীরিক কষ্ট সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতি ভদ্রলোকদের পক্ষে অপরিহার্য। এইভাবে আদশ জাতিগত ধারণা কতকাংশে জাতি বৈষম্যের পাপকে সংশোধিত করতে পারবে। কিন্তু আদর্শের জন্য ব্যক্তি বিশেষের অনুরাগ প্রায়ই স্বয়ংক্রিয় ও অর্ধ-সচেতন। যে সকল বিষয় একজন রাজকীয় ভারতীয় ছাত্র বা নাবালককে প্রভাবিত করে, সেগুলি পুণ্যের পরিবর্তে পাপই হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য অভ্যাসে আক্রান্ত পদমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় অনুরূপ সত্য প্রযোজ্য। আমরা আদর্শ অপেক্ষা বিলাসিতার সংক্রামক প্রভাব আঁকড়ে ধরার জন্য বেশী ঝুঁকে পড়ি। ইংরাজদের সমাজে সকালে চা-পানের রীতি আছে, কিন্তু কেউ যখন রেলপথ থেকে দূরে চলে যায়, তখন পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে তাকে কাজ করতে হয়। আমাদের বিপদ এই যে, আমি যদি চায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়িও, কিন্তু রিকসা, চেয়ার অথবা ডাণ্ডিতে চড়ার অভ্যাস ত্যাগ করব না। ইংরাজ ভাল খায়, ভাল কাজও করে। সে কখনও প্রকাশ্যে নিজের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তোলে না, সে একটি অস্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ত করে ও নিজের ক্ষমতার (যদি সে নিজের নীতিতে অবিচল থাকে) আত্মরক্ষার জন্য সারা জীবন সেই

অস্ত্রটিই ব্যবহার করে, "পুরুষের মতো"। একজন বিদেশীর পক্ষে ইংরাজের মুরগী খাওয়ার অভ্যাস অনুকরণ করা বেশ সহজ ব্যাপার, কিন্তু তার মতো "আমি" এই শব্দটির আয়াসসাধ্য দমন ও নিম্নতর আরাম পরিহার করে চলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লাভ করা যথেষ্ট কঠিন। তার পৌরুষ ও ব্যক্তিগত মর্যাদার ধারণা অপেক্ষা তার সুযোগ-সুবিধাগুলির সমকক্ষ হওয়া বা অতিক্রম করে যাওয়া অনেক সহজ ব্যাপার।

পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজনেই পূর্ব সতর্কীকরণ। আমাদের মধ্যে সামান্য লোকই নৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির জন্য শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করেন। আমাদেরর নিজেদের আদর্শগুলিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পুরুষত্ব ও নারীত্বের গৌরব কিভাবে গঠিত হয়, এ বিষয়ে আমাদের মনকে পরিষ্কার রাখতে হবে। এর দ্বারা শান্তি ও সম্পদের প্রতিটি উন্নতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের নতুন উপাদানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ যেন পবিত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। এর ব্যবহার নয় ব্যক্তিগতভাবে, তবু এ অনেক ভালো।

শক্তি

ত্যাগ সব সময়ই উচ্চের জন্য নিচের আত্মত্যাগ। এ কখনও নিচের জন্য উচ্চের ত্যাগ নয়। ত্যাগ কঠিনের স্বার্থে সহজের যা উপরে ভাসমান কিন্তু গভীরে যেতে চায়। এর প্রস্তাবনা নতুন কর্তব্যের, শান্তি দেয়না কখনও।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অনুতাপ-দগ্ধ গোখুরো সাপের অপূর্ব কাহিনীর একটি বাক্যের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও শক্তির সব মতবাদ নিহিত। "ফণা তুলবে, কিন্তু দংশন করবে না"—জীবনে কত ঘটনাই ঘটে যখন পরিস্থিতির চাবিকাঠি এই বাক্যটির মধ্যে পাওয়া যায়! কত মানুষের সঙ্গে আমাদের অপূর্ব সম্পর্ক অটুট থাকে, কারণ তারা জানে মুহূর্তের ইঙ্গিতে আমাদের আপেক্ষিক সম্পর্কের ন্যূনতম বিচ্যুতির ফলে সব মাধুর্য আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ও আমাদের মধ্যে ভয় দেখানোর মনোভাব ও ভীতিপ্রদ প্রতিকূলতা এসে পড়বে। অন্য কথায় গোখুরো সাপটা তার ফণা উত্তোলন করতে পারতো।

কিন্তু আমরা একথা ধরে নিয়ে নিশ্চয়ই ভুল করব না যে, বদমেজাজের অথবা ক্রোধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে ফণা উত্তোলন করা যেতে পারে। গোখুরো সাপের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধের শক্তি ও জগতে আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রচণ্ডতম হাতিয়ারের শক্তি, মুহূর্তের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষরূপ, এবং সর্বোপরি এর সব কটিই সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ধরা থাকে। সাপের পিছনে যে শক্তি থাকে, তাই তাকে এতখানি প্রচণ্ড করে তোলে।

শিশু, নির্বোধ অথবা কাপুরুষদের বেলায় ফণা তোলার কথা বলে লাভ নাই। আমাদের বীরপুরুষের প্রায়শ্চিত্তের পিছনে বহু বছরের সাধনা ছিল, যে সময় তাঁর গোখুরো হওয়াটাই একমাত্র কর্তব্য ছিল। তাঁর ক্ষমতা অর্জনের পর সেই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি প্রকৃত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। গোখুরো হওয়া প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আমাদের নীতি-উপদেশ দুর্বলের নয়। আমাদের এমনভাবে বাঁচা উচিত, যেন আমাদের জীবদ্দশায় কোন মন্দ না গড়ে ওঠে। এমনকি দংশনেরও প্রয়োজন হতে পারে, যখন গোখুরোর শক্তি থাকবে অবোধ্য, কিন্তু কোন আঘাতই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়, হুঁসিয়ারী দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে আমাদের শক্তি-সচেতনতায় শুধু ফণাই উত্তোলন করা চলবে।

কোন একটি শিশুকে শাস্তি দেওয়ার বেলায় এই সব সত্য সহজে বোঝা যাবে। আমরা সেই সব বাপ-মায়ের কথা কি ভাবব, যাদের সমগ্র আত্মা সন্তানের সংশোধনের জন্য নিযুক্ত? এখানে এটি স্পষ্ট যে, সেক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা, আমাদের নিজেদের কৃতকর্ম থেকে নির্দিষ্ট দুরত্ব থাকবে, যদি সেই শাস্তি কখনও কার্যকরী হয়। ক্রোধের সঙ্গে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা অপরাধীর ঘৃণা ছাড়া কিছুই সৃষ্টি করে না। যার নীতিবোধ আছে, সে যদি গভীর ও কষ্টদায়ক শাস্তি দিয়ে থাকে, যন্ত্রণার মধ্যে তার রূপান্তর ঘটে।

শক্তির ব্যবহার সেই কাজ করতে পারে, শক্তির বাইরেও যার ধারণা আছে। শক্তি সদ্ব্যবহারের জন্য, তার স্রোতে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। এ যেন কুশলী চালকের হাতে শক্ত লাগাম লাগানো ঘোড়া। শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য শক্তির প্রকাশ আগে হওয়া চাই। যার সাহস নাই, তাকে কেউ সম্মান দেয় না; এবং অন্ধ মনুষ্যরূপী বর্বরকেও সম্মান দেয় না কেউ, তার কার্যকলাপ তারই নিজের আকস্মিক ক্রোধের দয়ার ওপর নির্ভর করে। আমাদের ধর্ম শক্তির। আমাদের চিন্তায় শক্তিশালী হওয়া মানুষের প্রথম কর্তব্য। এইভাবে বাঁচা যে, আমাদের অস্তিত্বই ন্যায়পরায়ণতাকে শক্তিশালী ও দুর্বলতাকে রক্ষা করে, এটা ব্যক্তিগত সাফল্যের নিম্নতর রূপ নয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

প্রত্যেক মানুষের নিজের মূল্যবিচার, যে সমাজে সে বাস করে, সেই সমাজ সম্পর্কে তার মূল্য বিচারের রশ্মি কেন্দ্র। পরিবার সম্পর্কে অহঙ্কারের মত জিনিস আর কিছু আছে কি? আছে কি বর্ণ অথবা জাতি সম্পর্কে অহঙ্কারের মত সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন আর কিছু? যে ব্যক্তি অন্যকে উচ্চ সম্মান দিতে জানে, সেই আবার অন্যের কাছ থেকে সৌজন্য দাবি করে। যে মুক্তির বা স্বাধীনতার কথা আমরা অবিরাম ঘোষণা করি, তার দ্বারা জগতের চোখে আমাদের রক্তের স্বাধীনতার মূল্যাবধারণ করি।

সামাজিক এবং জাতীয় রক্ষাকবচ হিসাবে ভারতে জন্ম-গৌরব হাজার হাজার বছর ধরে অনুশীলন করা হয়েছে। অন্যান্য গর্ব বা অহঙ্কারের মতো এটি একটি ধর্ম, যখন এটি ইতিবাচক আবার এটিই অধর্ম যখন অন্যের সমান গৌরবের অধিকার প্রত্যাখ্যান করে। যে আত্মশ্লাঘা সমাজ থেকে বা নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এবং বলে যে আমরা তাদের চেয়ে ভাল, সেটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অনার্জিত ব্যাপার, আর এটা আমরা যাদের অপমান করি, তাদের হতমান করে, তখন বিচারশীল মানুষের চোখে আমাদের হাস্যাস্পদ করে তোলে। আমাদের বংশ যতই বিখ্যাত হোক না কেন, জন্মের উচ্চতা এত বড় হতে পারে না যে, তার চেয়েও উচ্চতর কুলশীল একজনও কেউ থাকবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আনন্দ আপেক্ষিক হতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে এ চিন্তার উদয় হয় যে, সরলতার মধ্যেই মহত্তম বৈশিষ্ট্য নিহত এবং সুযোগ-সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারগুলি নিচতার সীমানাবিশিষ্ট এলাকার মধ্যেই পড়ে।

কর্মের অন্যান্য রূপের মত জন্মের গৌরবকে একটি সুযোগ, একটি দায়িত্ব ও একটি বিশ্বাস হিসাবে গণ্য করা উচিত। যতই উচ্চে আমার স্থান, ততই আমার কর্তব্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য। যতই পবিত্র আমার উত্তরাধিকার, ততই আমার সহিষ্ণুতার শক্তি। যদি আমরা সত্যিই দেখতে পেতাম তাহলে জানতাম, মানুষ মাত্রেই মহৎ জন্মের অধিকারী এবং আমাদের যোগ্যতা দিয়েই তা প্রমাণ করতে হবে। সব জিনিসই সব মানুষের পক্ষে সম্ভব, কারণ সকলেই সমানভাবে সেই অসীম, পবিত্র ও সংজ্ঞ ঈশ্বরের প্রকাশ। মানুষ নিজেদের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর এই পার্থক্য সৃষ্টি করেন না। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সামনে সংগ্রামের অধিকারের দরজা খুলে দিয়েছেন ও আমাদের নিজেদের স্থান সংগ্রহ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

হায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা! আমরা আমাদের জীবন নিয়ে কি করব? এসো আমরা অহংবোধ মুছে ফেলার শপথ নিই। যে কোন পথে, যে কোন কাজে আদর্শের জন্যই আদর্শকে চূড়ান্ত রূপ দিতে চেষ্টা করি এসো। আমরা যা কিছু করি না কেন, শক্তি-মত্তার সঙ্গে করব। আরামকে পদদলিত করে, লাভ পরিত্যাগ করে, স্বার্থ অস্বীকার করে আমরা যে কোন উপায়ে সর্বোচ্চ সাফল্য ছিনিয়ে নেব এবং সাফল্য যতক্ষণ না

হাতের মুঠোতে আসে সংগ্রাম থেকে বিরত হব না। এই কথাই বলেছিলেন, প্রাচীন সংস্কারকরা। তাঁরা বলেছিলেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি ঈশ্বর লাভ করেন। জন্ম একটা প্রাথমিক অবস্থামাত্র এবং সেটা অপরিহার্য নয়। জন্ম শেষ পরিণামের বিকল্প হতে পারে না।

প্রতিটি অধ্যয়নের নিজস্ব সমস্যা আছে। আধুনিক শিক্ষারও সমস্যা আছে নিজের। এযুগের ব্রাহ্মণকে এসবের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তাকে আধুনিক কৌতুহলের অংশ নিতে হবে। যদি একবার আমরা একটি শিশুর মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগাতে পারি, তবে তার সব শিক্ষাই সমাপ্ত হয়ে যায়। আমরাও কি পারি না আমাদের মধ্যে এতটুকু তৃষ্ণা জাগাতে? উড়োজাহাজ এবং মোটর গাড়ি কি ভারতীর মনে কোন সম্প্রসারিত কৌতুহল সৃষ্টি করবে না? ভারতীয় মন কি এরূপ কাজের সমকক্ষ নয়? তাহলে কি ইউরোপীয়দের তুলনায় নিকৃষ্ট? আমরা যদি ওদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবি করি, তবে তা প্রমাণ করার দায়িত্বও আমাদের আছে। এসো, আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙচঙে তুচ্ছ জিনিসগুলোকে বিসর্জন দিই। জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমাদের শিখতে হবে, মানবতার জন্য জয় করতে হবে সত্যকে, ধার করা পালক পরে গ্রাম্য জনতার সামনে বৃথা গর্ব নয়। এসো, নিজেদের ওপর আমরা নিজেরা কঠোর হই। এসো, যে বিষয় আমরা গ্রহণ করি, তার যতটুকু জানার সবই জেনে নিই। এসো, আমরা গুরুত্বপূর্ণ সব বই পড়ি। আমাদের সংগ্রহ নিখুঁত হোক। কোন সমস্যা যেন আমাদের ভীত না করতে পারে। অদৃষ্টের বাধা মানুষ অতিক্রম করতে পারে। এইরূপে একজন স্বর্গীয় শক্তি লাভ করে দেবতাদের দ্বারা পালিত হতে পারেন ও অমর আত্মাদের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেন।

বৃহৎ সংগ্রামগুলিতে সব মানুষই সমান। যে কেউ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উচ্চ অথবা নীচ, পুরুষ অথবা নারী যে বিজয়ী, পুরস্কার তারই প্রাপ্য। কিন্তু কোন মানুষ একা দাঁড়াতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। যে অনেক উঁচুতে ওঠে, তার পেছনে অন্তত ঘনিষ্ঠ কুড়িটি লোক আছে। আমাদের শিক্ষা সবটাই আমাদের নয়। অন্যের মাধ্যমে ও নিজেদের চেষ্টায় আমরা অর্জন করি। আমরা কেবল নিজেরাই প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারি না। আমাদের সমাজের মান অত্যন্ত উচ্চ ও উজ্জ্বল, জগতের সামনে আমরা কৃতকার্য হতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেই যে কোন একজনের সাফল্যে সাহায্য প্রাপ্ত হই এবং একজনের গৌরব সকলের গৌরবে পরিণত হয়।

চিন্তা, চিন্তা, আমরা সুস্পষ্ট চিন্তা চাই। এবং এই সুস্পষ্ট চিন্তার জন্য শ্রমের প্রয়োজন, জ্ঞানের প্রয়োজন, সংগ্রামের প্রয়োজন। স্বচ্ছ চিন্তা ও যথাস্থানে নিযুক্ত অনুরাগ জয়ের অপরিহার্য শর্ত। যে জাতি নিজের ও যুগের প্রতি বিশ্বস্ত সে জাতি বহুলক্ষ মহান ব্যক্তির জন্ম দিতে পারে, কারণ সেই স্বর্গীয় মাতৃত্বের অন্তঃপ্রবাহী ধারা সীমাহীন, এবং একজনের মহত্ত্বতা সকলেরই মহত্ত্বতা।

চরিত্র

চরিত্র অস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন। একজন মানুষের অস্তিত্বই তার সমগ্র অতীতের দলিল। ইতিহাসের গভীর বৈশিষ্ট্যের এটাই হোল রহস্য। একজন মানুষের দেহ যেমন অন্য মানুষের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার হিসাবে অর্জিত হয় না, ভবিষ্যৎকেও তেমন অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কিন্তু অতীতের কতকগুলি অংশ হিসাবেই ভবিষ্যতের জন্ম হয় না। সামগ্রিক-রূপেই এর জন্ম, সৃষ্টি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কর্মের মতবাদ প্রকৃত অর্থে একেই বোঝায়। প্রাচ্যের পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস তার জীবন ও বৈষম্য সম্পর্কে উপলব্ধির একটি চমৎকার উপায়। ব্যক্তি চরিত্রের আলো-ছায়া ও বিচিত্র বর্ণের আভার বৈশিষ্ট্যগুলি অপরে নির্ণয় করতে পারে না। প্রাচ্যের বিশ্বাস মানুষের স্বরূপও কি সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তা বুঝতে পারে। অজ্ঞাতে যা সে করে এবং তার অতীতকেও দেখতে পাওয়া যায়। যার ক্রীতদাসের জীবন ছিল, তার ভাগ্যে সিংহাসন জুটতে পারে, কিন্তু গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সম্রাটের পোশাক ক্রীতদাসের পিঠের চাবুকের দাগ গোপন করতে পারে না। ক্রীতদাস সম্রাটের পদ পেলেও, তার কণ্ঠস্বরে আদেশের স্বর, সঙ্কটের সময় সিদ্ধান্তের চোখ এবং অপমানে অহঙ্কারের ক্রোধোন্মত্ত উচ্ছ্বাস,—সবই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়।

জগতের কাছে শাস্ত্র বাক্য যতই কঠিন হোক না কেন, একজন মানুষের সমগ্রতা তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে আছে। মহৎ আকাঙ্ক্ষার আকুলতা কখনও ব্যর্থ হয় না। উক্ত সিদ্ধান্তও কখনও নষ্ট হয়ে যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "মহৎ প্রেরণাগুলি কেবল মহৎ মনোনিবেশগুলিরই রূপান্তর।" কাজ যেমন মানুষের পরিচিতি, জীবনও সেরকম চরিত্রের অভিব্যক্তি। তাই, চরিত্রই জীবনের চাবিকাঠি। আধ্যাত্মিক সত্য থেকে উদ্ভূত পরিণাম কোনদিন ব্যর্থ হয় না। "আমরা যা কিছু, সবই আমাদের চিন্তার পরিণাম।" ইঞ্জিনিয়াররা বলে, জল তার নিজের সীমা পর্যন্ত ওঠে, এবং জল সম্পর্কে যে কথা সত্য, মানুষের মন সম্পর্কেও সেই কথাই সত্য। এক পা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জিত হলে লক্ষ লক্ষ প্রয়োগ হবে। পর্বতের যতটা উচ্চে বিশ্রামহীন বাধাহীন আরোহণ করা সম্ভব হবে, ততটাই লাভ, উচ্চতার প্রতিটি পদক্ষেপই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কোন ব্যক্তির সাম্রাজ্য শাসন প্রকৃতপক্ষে তার শিশুকালের খেলাগুলির পুনরনুষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। ওয়েলিংটন তাঁর শৈশবে কাঠের সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মধ্যে জীবনের ভবিষ্যৎ সব যুদ্ধের কাজই করেছিলেন।

মানবতার কী অপূর্ব সম্ভাবনা! এমন কোন মানুষ নীচ ও ক্রীতদাস হতে পারে না যে, অসীমের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে। জগতের মধ্যে চরম কথা মানুষ, শক্তি নয়, মানুষের মধ্যে চরম কথা ঈশ্বর। অতএব, সব মানুষ নিজেদের বিশ্বাস করুক। সব মানুষকে আমাদের বলতে দাও, শক্তিশালী হও। আমরা যেন মানুষের মত আচরণ করি। তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে, তাকে

রূপায়িত করো। নিজেকে বিশ্বাস করো। যে চায়, সে পায় ; যে অনুসন্ধান করে, সে আবিষ্কার করে এবং প্রাপ্য তার দরজায় এসে আঘাত করে, দরজা খুলে যায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার অতীত আছে। যে কোন সময় আমার মধ্যে চরম সত্যের আলো বিকীর্ণ হতে পারে। যে কোন সময় আমার ওষ্ঠ, আমার হাত সেই নির্গুণ ঈশ্বরের অঙ্গ হতে পারে। তাহালে গ্রহণে বা বর্জনে কেন আমি দুর্বল হব? আমি কি নিজেই অসীম, অনন্ত নই? কাকে এবং কি কারণে আমি ভয় করব? এরপর সব মিনতি, সব প্রার্থনা আমি দূরে সরিয়ে রাখব, বিসর্জন দেব সব আশা, সব ভয়, সব ইচ্ছা, সব লজ্জা। মানুষ, কেবল মানুষ হয়েই আমি সন্তুষ্ট। কারণ আমি জানি, আমি যদি তা না হতে পারি, রাজা ও রাজত্বের মণিমুক্তা, পোশাক আমার লজ্জা ঢাকতে পারবে না, আর যদি আমার পৌরুষ থাকে, ভিখারীর কম্বল ঢাকা দিয়েও আমার মহিমা থেকে খর্ব করতে পারবে না।

পার্থক্য

যে মানুষ মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়ে ইঁদুর অথবা ছুঁচোর মত বেঁচে থাকে, যে মানুষ কোন একটি আদর্শের জন্য বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। এমনকি একটি ভুল আদর্শও ইন্দ্রিয়গত জীবনের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। যারা সাধু-মহাত্মাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চায় ,তাদের মধ্যে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও, যারা খুব আড়ম্বরপূর্ণ ও যতই দৈত্যের মত কর্মবীর হোক না কেন, নিজের সুবিধা ও আনন্দের স্বার্থে আত্মনিমগ্ন জীবন কাটায়, তাদের চেয়ে অনেক উচ্চ। আকারে কোন কিছু বৃহৎ হলেই আমরা তাকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেব না। এ বিষয়ে পার্থক্যের মূল্য প্রতিটি পুণ্যের ওপর আধ্যাত্মিকতার প্রখর দীপ্তি। পার্থক্য ব্যতীত মানুষ জন্তুর চেয়ে বেশি কিছু নয়, তার জান্তব সুখ যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন।

তরুণরা অসতর্ক ও ঢালাও দান সম্পর্কে উচ্চভাব পোষণ করে। যে ব্যক্তি কখনও কখনও দানে অস্বীকার করে, যে কারণ সে উল্লেখ করে না, সে, যে ব্যক্তি এক কথাতেই পকেট শূন্য করে দেয়, তার মত এতখানি মহৎ ও উদার নয়, এই ধারণাই তরুণদের। পক্ষান্তরে গীতার মত এই যে, যথা সময়ে, যথাস্থানে ও যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে দানই আদর্শসম্মত। শুধুমাত্র উপহার বা দান যা প্রাপকের দিকে কখনও লক্ষ্য করে না বা দানের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আগেই বিবেচনা করে না, এটা স্পষ্ট যে, তার চেয়ে পার্থক্য বিচার করে দান করা উচ্চতর বিষয়।

একই উপায়ে, মানুষ হিসাবে আমাদের মর্যাদা বৃহদাংশে নির্দিষ্ট করে দেয় মন ও দেহের, আদর্শ ও ইন্দ্রিয়, চেতনার মধ্যে আমাদের সাধারণ পার্থক্যের স্তর। কোন

এক সিসিল রোহ্ডসের জ্বলন্ত কর্মশক্তি ও তার আয়তন দেখে তাকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট হব না। বাইবেলে আছে, কেমন করে একজন রাজা নিজের সোনার তৈরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে, সারা জগৎকে পূজা করতে বলেছিল। এবং সেই একই সম্রাট অল্প কিছুকাল পরে উন্মাদ অবস্থায় সম্মোহিত হয়ে গবাদি পশুর সঙ্গে ঘাস খেতে গিয়েছিল মাঠে! স্থূল পশু-প্রকৃতি ঢাকা পড়েছিল চোখ ঝলসানো অহংবোধের তলায়। ঐ একই ব্যক্তি একদিন এক নতুন ধর্ম উপস্থাপিত করে পরে আবার নিজেই হামাগুড়ি দিয়েছিল। একজন দরিদ্রতম ও নিম্নতম ব্যক্তি, যে নিঃস্বার্থপরতা, আত্ম-সংযম ও ভালবাসা দেওয়ার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করে, সে ঐ সম্রাটের চেয়ে বড়। এই কারণেই মনুষ্য-জাতির প্রকৃত সাহায্যকারীরা চরম সত্য ছাড়া অন্য কিছু উপদেশ দিতে পারেননি। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, সেটা সম্পদ, পদ অথবা ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বরং কেবলমাত্র আত্ম-সংযমেরই তুলনামূলক মাত্রার মধ্যে। অবতারগণ, বস্তুর শেষ পরিণাম পর্যন্ত তাঁদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহ এগুলি বন্ধ করেন না। তবুও তার অর্থ এ নয় যে তাঁরা ধর্ম বহির্ভূত সভ্যতাকে ঘৃণা করেন। এ নয় যে, তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ধারণাগুলির ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁদের কাছে গোটা জগৎটাই আত্মার বিদ্যালয়, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সন্তান বিদ্যালয়ে কিরূপ আচরণ করে তার আধ্যাত্মিক অদৃষ্টের কাছে, তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "আঁকড়ে ধরো, যে ভাবেই হোক, জগতে তোমার স্থান খুঁজে নাও।" এই "আঁকড়ে ধরা" আমাদের ভুললে চলবে না। কোন ধার্মিক ব্যক্তি জগতে তাঁর আচরণের কোন ফলাফল নাই, ভাবতে পারেন না। ধর্ম শুধু সাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তপস্যা নয় কেবল ঠাকুর ঘরের ব্যাপার। ঈশ্বরের নাম শুধুমাত্র অবতারদের জন্যই নয়। প্রতিটি মহৎ ভাব, যা ধর্মের এলাকার বাইরে উপস্থাপিত, তাও ঈশ্বরের বেশে আমাদের পূজার জন্য আহ্বান জানায়। আমরা কি আমাদের একই সারিতে শ্রেণীবদ্ধ করব, না কি বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এর উত্তর ঈশ্বরের নিকট কোন পার্থক্য নির্ণয় করে না, কিন্তু গঠন করে, আত্মার শেষ বিচারের দিন। এ আমাদের কাছে জগতে সব পার্থক্যের সৃষ্টি করে। প্রতিদিন, প্রতি কাজ, প্রতিটি প্রশ্নই শেষ বিচারের দিন। জীবন একটি দীর্ঘ পরীক্ষা। প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে আমরা সমগ্র চরিত্রেরই ওজন এনে ফেলি। প্রতিটি কাজ হয় আমাদের সবলতার অথবা দুর্বলতার অবস্থায় ত্যাগ করে। হয় এ আমাদের চরম মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, নতুবা, মূল্য থেকে বিযুক্ত হয়। আকস্মিকতা থেকে আধ্যাত্মিকতা জাগে না। কেবল দীর্ঘ পাথরে খোদাই করা সযত্ন নির্মিত মন্দিরেই বিশ্বজনীন ও চিরন্তন সত্যের ভাবরূপ আছে। যেখানে সব কিছুর মধ্যে সত্যের অধিষ্ঠান, সেখানে সত্যের আলোই আত্মায় আলোকিত হতে পারে। জীবনের প্রতিটি কাজে পার্থক্য বিচার সেই শেষ বৈদগ্ধ্যের সৃষ্টি করে, যার নাম স্বর্গসুখ বা পরমসুখ।

শোভনতা

হিন্দুধর্মের মত এত বেশি পার্থক্যের সৃষ্টি জগতের আর কোন ধর্মেই নাই। এমন কি বৈষম্যহীন প্রেম বা ভালবাসাও তামসিক। ভ্রমপূর্ণ দয়া বা দানও অসম্পূর্ণ। গীতায় আছে, "শ্রদ্ধা ব্যতীত ত্যাগ, দান অথবা সম্পাদিত অনুষ্ঠান এবং তা যতই কঠোরভাবে পালিত হোক না কেন, একে অসৎ বলা হয়, হে পার্থ: এখন এবং ভবিষ্যতেও তা ব্যর্থ।" আবার, "অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত সময়েও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার সঙ্গে যে দান করা হয়, তাকেও তামসিক বলা হয়।"

ভাল প্রেরণাই শুধু নয়। দীর্ঘ চিন্তা ও প্রচেষ্টার অভ্যাসের ফলও প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক কাজে, পার্থক্য নিরূপণই আধ্যাত্মিকতার অগ্রবর্তী আলোক শিখা। সেই স্থপতির জন্য আমাদের শ্রদ্ধা কম, যার তৈরী বিরাট বাড়ির ভিত্তিভূমি নিশ্চিতরূপে ধ্বসে যায়। এবং অনুরূপ ভাবে, আদর্শরূপে যে চিরন্তন বিশ্বাস উর্ধ্বে থাকে, তার প্রতিটি চিন্তা ও কাজের গুণেরও অধিকন্তু থাকবে শোভনতা।

এই পথে, আর সবকিছুর মধ্যে মূল ধর্ম আমাদের ওপর চিন্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধিগত পরিপক্কতার বিষয়ে প্রভাব বিস্তারে কাজে লাগে। হিন্দু বিশ্বাসে শিক্ষা প্রার্থনার মতই প্রয়োজনীয় বিষয়। যেখানেই দেখা যাক না কেন এবং যাই হোক না কেন জগতে একমাত্র ধর্মীয় মতবাদ যে, সত্যের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই। এ সম্পর্কে চিন্তা কর। অন্যান্য ধর্ম-বিজ্ঞানকে সহ্য করতে পারে অথবা সেইসব ধর্মের অধীন ব্যক্তিরা বুঝতে পারে যে, তাদের নিজেদের প্রতি অথবা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য তাদের একটা কর্তব্য আছে; কিন্তু হিন্দুধর্মের পক্ষে এটা প্রয়োজন। কোন গভীর উৎস থেকে নির্গত স্বচ্ছ জলধারার মত মহান হিন্দু চিন্তানায়কদের চিন্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হায়, প্রতিরোধে না থাকলে কর্মপ্রেরণা দূরে সরে যায়! ইউরোপকে ভরে দিয়েছে বিরাট সব পণ্ডিত ব্যক্তিরা। আমাদের কজন আছে! তোমরা তফাৎটা দেখ! ইউরোপে সারা জগৎ, বিশেষ করে পুরোহিত-তন্ত্র কুড়ি বছর ধরে চার্লস্ ডারউইনের পায়ে পায়ে ভীষণ চীৎকার আর আর্তনাদ করেছে। আজও কেউ শুনতে পারে, গীর্জার প্রচারবেদী থেকে বাকলে এবং লেকির বিরুদ্ধে অবিশ্বাসপূর্ণ অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি করা হচ্ছে। প্রত্যেক পুরোহিত গোপনে অনুভব করে, তার নিজের কারণ ও বাধাবন্ধহীন ঐতিহাসিক বা সমালোচকদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে। ভারতে এই ধরনের আশঙ্কাগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা হিসাবেই উল্লেখ করা হয় ও ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের বিরাট ব্যক্তিত্ব—একজন রাজেন্দ্রলাল মিত্র অথবা একজন জে. সি. বোসকে অকারণ হৈ চৈ না করেই গুরু এবং দূরদর্শী হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়। কিন্তু সত্যের উপর আক্রমণ, একে রক্ষা করার জন্য তরুণদের প্রতি একত্র সমাবেশের জন্য রণহুঙ্কারের আহ্বান। আমরা সেই ক্যাপ্টেনের গল্প জানি যে তেত্রিশ জন সঙ্গীসহ আত্মসমর্পণের শর্তগুলি জানাবার জন্য হাসান এবং হুসেনের শিবিরে গিয়েছিল এবং সংবাদ পরিবেশনের পরেই সঙ্গীদের সারিতে তাদের পতাকাতলে দাঁড়িয়েছিল, যদিও

তাদের শেষ পরিণাম হয়েছিল মৃত্যু। সব যুগে এই একই ব্যাপার। সত্য নিজেই তার প্রচার। যা আমরা সত্য বলে পোষণ করি, তাকে আমরা আলিঙ্গন করতে পারি না, যদিও আমাদের বিপর্যয়, দুঃখ এবং মৃত্যু এর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, বিস্তৃতির চেয়ে আক্রমণ করাই ভাল; নীরবতার চেয়ে ভাল ঔদ্ধত্য, পূজার চেয়ে ভাল নির্যাতন; যদি এগুলির সঙ্গে আদর্শ সবসময় মনের সামনে জাগ্রত থাকে।

সেদিন একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক বলছিলেন, "যদি আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য ঘনায়, তাহলে ব্যক্তির দায়িত্ব হবে জীবনের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে, দেশের জন্যই কাজ করা।" বক্তা এখানে ব্যক্তিগত জীবনের কথাই বলেছেন, যে কাজের দ্বারা মানুষ সুখ, সম্পদ ও পদ ইত্যাদি অর্জন করে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আদর্শের দ্বারা জীবন গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সে জীবনে আমাদের দারিদ্র্য, কঠিন পরিশ্রম এবং কখনও কখনও শেষ বিপর্যয় ও ব্যর্থতার মধ্যে চরম মূল্য দিতে হয়। কেবল, আমাদের নিজেদের ও অপরের জন্য অসীম কল্যাণের চেতনা এই ধরনের কাজে প্রেরণা সৃষ্টি করে। এজন্য আমাদের মধ্যেকার বিরাট ক্ষুধাকে জাগাতে হবে। সন্ন্যাসী আত্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল, এসো, আমরা জ্ঞান, সত্য ন্যায় ও শক্তির জন্য ব্যাকুল হই। শিশুরা যেমন অন্ধকারে সাহায্যের জন্য কাঁদে, এসো, আমরা তাদের সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য আকুল হই। কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা সম্ভব হলেই আমরা সাহায্যকারীর উপযোগী হতে পারব, এটা উপলব্ধি করে আমাদের নিজেদের যে কোন পথে সম্পূর্ণ কল্যাণের জন্য শুধু কাজ, কাজ আর কাজ করে যেতে হবে। এবং সর্বোপরি, আমাদের সেই প্রাচীন হিব্রুশাস্ত্রের মত প্রার্থনা করতে হবে, "হে প্রভু, তোমার ভৃত্যদের তুমি পথ দেখাও, আর তাদের সন্তানদের দেখাও তোমার মহিমা।"

কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষুধা যখন প্রবল হয়ে জাগে, আমরা যেন প্রথমেই যা হাতে পাব, তা নিয়ে যেন সন্তুষ্ট না হই। মাথা-গরম কাজ ব্যর্থতার তিক্ততাই সৃষ্টি করে। প্রায়ই আমরা এমন লোক দেখতে পাই, যারা জগতের ভাল কাজ করার চেষ্টা করতে গিয়ে অবিলম্বে ফল না পেয়ে দুঃখে ও বিলাপে নিজের হাত মোচড়াতে থাকে। এটা প্রকৃত দয়া বা দান নয়, এটা সাময়িক প্রেরণা, পরিপূর্ণ তামস। দীর্ঘ কাজ, দীর্ঘ চিন্তা, দীর্ঘ জ্ঞানের বিকাশের দরকার। আগে যে আঘাত হানতে পারে, তাই হিসাবের মধ্যে আসে। এবং এই জ্ঞানের জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই হবে, আবার অভিজ্ঞতার জন্য করতে হবে কাজ।

"মুনি ঋষিরা এই কথাই বলেছেন, ক্ষুরের ধারের মতো তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ এবং দূর, পথ খুঁজে পাওয়া এমনই কঠিন! তবু হতাশ হয়ো না! ওঠো! জাগো! যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌছতে পার সংগ্রাম করো!"

শিক্ষক

প্রকৃত শিক্ষক জানেন, কেউ প্রকৃতপক্ষে অপরকে সাহায্য করে না। একজন নিজের জন্য যতখানি করে, অপরের জন্য ঠিক ততখানি করে না। আমরা তাকে তার নিজেকে সাহায্য করার জন্য উদ্দীপিত করতে পারি, এবং তার চলার পথে প্রকৃত বাধাগুলো মাত্র অপসারিত করতে পারি।

অধিকন্তু, শিক্ষার্থী তার চলার পথ নিজেই গড়ে তুলবে। তার নিজের লক্ষ্য অভিমুখে তাকে নিজেকেই এগোতে হবে। নিজের লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য কেউ অন্যের রাস্তা তৈরী করে দেয় না। শিক্ষকের প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সচেতন মনের মধ্যে প্রবেশ করে বুঝতে চেষ্টা করা, তার প্রকৃত অবস্থা কি এবং কোন্ দিকে সে এগোতে চায়। এ ছাড়া শিক্ষা হতে পারে না।

শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকেই আগে ব্রতী হতে হবে, শিক্ষককে নয়। শিক্ষার্থীর শরীর অথবা মন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত কতকগুলি সংকেত থেকে শিক্ষক মানসিক বিধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং আরও কার্যক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করেন। যাই হোক, যদি ছাত্রের প্রাথমিক শক্তির পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে শিক্ষাদান কাঠ কিংবা ইটকে দেওয়ার মতই হয়ে পড়ে। শিক্ষা অথবা ক্রমবিকাশ সবসময়ই ছাত্রের কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া থেকে আরম্ভ করা উচিত।

চিন্তার নিয়ম স্পষ্ট। মানসিক ক্রিয়া অস্থিরগতি বা হিসাবের অসাধ্য নয় যে, এখানে একটি দমকা বাতাস, আবার ওখানে একটি দ্রুত আবর্তনের মতো। না, চিন্তা সকল সময়ই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। বাস্তব জীবনযাত্রার সূক্ষ্মতা ও জটিলতার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিণতি ও ক্রিয়ার প্রগাঢ়তার আকার ও প্রয়োগের নামই চিন্তা। জল যেমন নিজ সীমারেখা পর্যন্ত উত্থিত হয়, তেমন আমাদের সব অতীত কর্ম আমাদের চঞ্চল চিন্তা কতদূর তার পক্ষবিস্তার করবে, তাও নির্ধারণ করে দেয়। এর উত্থান অনিবার্য, কিন্তু জ্ঞানের স্বচ্ছ পরিবেশে কয়েক ফুট উচ্চে-আরোহণ যে কী শ্রম বিশ্বাসের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়!

বুদ্ধ বলেন, "আমরা যা কিছু চিন্তা করেছি, আমাদের সব কিছুই তার পরিণাম। আমাদের চিন্তাই এর ভিত্তি, আমাদের চিন্তা থেকেই এ উদ্ভূত।" যারা এই পথে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব আবশ্যক হয়ে পড়ে। মনকে লুপ্ত করে দেওয়া, চিন্তার আবর্তন প্রতিহত করা অসম্ভব। একই শক্তি, একই জ্ঞান নতুন নতুন অভিব্যক্তির পথে চিরকাল ধরে চলতে থাকবে। অথবা এ আরও গভীরতা ও প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হবে। এর ধ্বংস নাই, কিন্তু এ নিরুদ্দিষ্ট হতে পারে, বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। মানুষ চিরকাল ঐশ্বরিক ও বিশ্বজগতের আত্মার সঙ্গে অঙ্গীভূত। তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার পুনরুদ্ধারের অপেক্ষায় সম্ভাবনাময় শক্তি তার সঙ্গে থাকবে, যদিও মাঠে ভূমিকর্ষণের কাজ বা বাসন মাজার কাজ ইত্যাদি করতে গিয়ে বাস্তবে ঐ গুণগুলি উধাও হয়ে যায়।

অন্তঃপ্রকৃতিতে আধ্যাত্মিকতা একই সময়ে আসে। বুদ্ধিগত শ্রম লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সত্যের ভূমি প্রস্তুত করে। বিরাট উপলব্ধির সমাজগত অবস্থায় খোলা দরজা হোল মানুষের বোধশক্তি। সুতরাং, মানসিক শ্রমও একটি কর্তব্য। যথার্থ বিশ্বাস একটি কর্তব্য। সাধনা মনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। আমরা সত্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকব। বড় কিছু মত বা দর্শনের জন্য আমাদের লোভ থাকবে। মানবিক অধিকারের প্রথম বিষয় শিক্ষাকে আমরা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করব। একজন ব্যক্তি ঋষিতে পরিণত হন, তাঁর জ্ঞানের জন্য নয়, তাঁর নিঃস্বার্থপরতার জন্য। যে কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য যিনি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন, তিনিই ঋষি। তাঁর যদি অর্থ বা আনন্দের লোভ থাকতো, তিনি নিজেকে শ্রমে নিয়োজিত করতে পারতেন না এবং তা শুধু শূন্যতায় পরিণত হোত। তিনি যদি নাম অথবা যশের কাঙাল হতেন, তবে জগৎকে শোনাবার জন্য অনেকদূর অবধি এগোতেন এবং ঐখানেই থেমে যেতেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত গিয়েছেন। কারণ, তিনি চেয়েছেন সত্য। যে মানুষ সোজাসুজি সত্যকে দেখতে পান, তিনি জ্ঞানী। এই সত্য প্রকাশ ভূগোলের আকারেও হতে পারে। এলিসি রিক্লাস্ বিশ্ব-ভূগোল রচনা করে ও তার সর্বাধিক ফল ব্রাসেলসের শ্রমিকদের দিতে চেষ্টা করে জ্ঞানী হয়েছিলেন পৃথিবীর যে কোন সাধুর মতই। জ্ঞানের জন্যই ছিল তাঁর জ্ঞান এবং জ্ঞানের এই আনন্দ ছিল তাঁর স্বার্থলেশহীন। তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক জগৎ একজন সাধুকে হারিয়েছেন। চার্লস্ ডারউনের "প্রজাতির উৎপত্তি" (origin of species) পড়ে কেউ কি তাঁকে মহামুনি হিসাবে অস্বীকার করতে পারেন? ক্রপোট্‌কিন ইংলণ্ডে এক শ্রমিকের কুটিরে বাস করে ও পারস্পরিক সহযোগিতার আকারে মানুষের সাহায্যের জন্য রুদ্ধশ্বাসে কাজ করে কি ভগবদ্বাক্য প্রচারের একজন মহান দূত হননি?

ভারতে অদ্বৈত মতবাদের সাহায্যে এই সবের মূল্য আমরা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশি করেই জানতে পারি। একমাত্র এখানেই ধর্ম এই শিক্ষা দেয়, কেবল তাই নয় যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়। একত্বের দৃষ্টিই লক্ষ্য এবং যে কোন পথে মানুষের এই লক্ষ্যে পৌছনোর নাম ধর্ম। তাই, অঙ্কশাস্ত্রের উপাদানগুলি সম্পূর্ণভাবে মহাভারতের স্তবকগুলির মতই পবিত্র। পদার্থবিদ্যার জ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞানের মতই পবিত্র। ইতিহাস-বিজ্ঞানের সত্যগুলিও প্রাচীন ঐতিহ্যের বিশ্বাসের মতই বাঞ্ছনীয়।

সনাতন ধর্মের মহান আদর্শ প্রকাশের জন্য, আমরা আর একবার আমাদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালতে চেষ্টা করব। মহান কখনও ধ্বংস হয় না, কিছুটা অস্পষ্ট বা গুপ্ত হতে পারে মাত্র। এই অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁদের প্রচণ্ড আবেগের কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান করেন। শিক্ষায় তাঁরা বিরতি দেন না। আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট হয়েছে বলে কেউ কি কোনদিন মধ্যপথে বিরতি দিয়েছে? এরূপ ব্যক্তি কোনদিন আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন না। বুদ্ধিগত অভীষ্টলাভের

সব চেষ্টা সম্পর্কেও ঐ একই সত্য। যিনি একবার জ্ঞান-পিপাসার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, তিনি কখনও মাঝখানে থেমে যান না। যদি শুদ্ধভাবে একটি পা এগিয়ে থাকেন, অভীষ্টবস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নিতে আর পারেন না। মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি শাখায় যতক্ষণ না আমাদের সমাজ বিরাট সব প্রতিভার জন্ম দিতে পারে, ততক্ষণ আমাদের সন্তোষ নাই। অদ্বৈতের প্রকাশ যন্ত্রের মধ্যে, যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে, শিল্প, দর্শন ও ধ্যানের মধ্যেই আছে। কিন্তু অর্ধেক প্রচেষ্টার মধ্যে কোনদিনই এ অভিব্যক্ত হবে না। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী জগতের গুরু। তাঁর মনোনীত বিষয় সম্পর্কে তিনি প্রচুর জানেন না, তিনি জানেন, সবকিছুই জানতে হবে। তাঁর নির্দিষ্ট কাজটি তিনি বিশেষ ভালভাবে করার প্রয়োজন মনে করেন না, এটি করা সম্ভব বলেই তিনি করেন। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে দেখেন। যে ছাত্রদের তিনি শিক্ষাদান করেন, তাদের মধ্যে তিনি সমগ্র জাতি ও মানবতাকে দেখতে পান। কাজের মধ্যে তিনি দেখেন নীতি। নতুন চিন্তার মধ্যে তিনি নিজেকে সত্যের কাছাকাছি দেখতে পান।

আমরা মানুষ, জন্তু নই। আমরা মন, দেহ নই। আমাদের জীবন চিন্তা ও উপলব্ধির, আহার ও নিদ্রার নয়। সব কটি যুগ, বৈদিক থেকে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন পর্যন্ত, সবই বর্তমানের এই মুহূর্তের মধ্যে। সবই আমার বলে দাবি করতে পারি। এই অসীম শক্তির ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান চাই, তাই আমি সব জ্ঞানই চাই। সেবার জন্যই আমি মানবতার সেবা করব। অতএব আমি ত্যাগ করব সব স্বার্থপরতা। আমি কি ভারতীয় মুনি-ঋষিদের সন্তান নই? আমি কি নই একজন অদ্বৈতবাদী?

গুরু এবং তাঁর শিষ্য

যদি হিন্দুধর্মের মতবাদগুলি যথেষ্ট প্রশস্ততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে স্পষ্টরূপে রূপায়িত হয়, তবে সন্দেহ নাই চিন্তা বা মননের সকল দিকের চাবিকাঠি পাওয়া যাবে। মানুষের মুক্তির জন্য অবিরাম ধারণার বিস্তারে নিজের ভূমিকা পালন করে যাওয়া হিন্দুধর্মের দূর কল্পনার উদ্দেশ্য এবং জগৎব্যাপী প্রতিটি পরিকল্পনায় জ্ঞানার্জনের অকথিত প্রচেষ্টা। হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের উৎস সম্পর্কে ধম্মপাদের এই কথাগুলির চেয়ে আরও ভাল ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই। "আমরা যা কিছু হয়েছি, সবই আমাদের পূর্ব চিন্তার পরিণাম। এর প্রতিষ্ঠা আমাদের চিন্তার ওপর, আমাদের চিন্তা থেকেই এ উদ্ভূত।" সারা পৃথিবীতে এই একমাত্র সত্যের ওপর ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে একজন ভারতীয় চিন্তাশীলের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদরূপে ভারতে গুরুভক্তির বিষয়টি সর্বাধিক কৌতূহলপূর্ণ ও উন্মোচনের পক্ষে কঠিন। কোন একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে পৌছতে হলে, সেই তত্ত্বের গুরুর নিকট মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করতে হয়, এবং এইসঙ্গে যখন তাঁকে ব্যক্তিগত সেবা করা হয়, সত্য যে, ছাত্রকে বিশ্বাস অর্জনের জন্য পরীক্ষিত হতে হয়। কিন্তু আমরা যদি মনে করি এ শুধু ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহলে আমরা ভুল করব, যেমন আমরা ভুল করব শুধু ধর্মের রঙ-মাখানো কতকগুলি ঘটনা শেখানোর জন্যে যদি কাউকে আমরা গুরু বলি।

সব সত্যের জন্যই আমাদের ভাবগ্রাহী মনোভাব থাকবে। যাঁর কাছ থেকে আমরা শিখব, তাঁর বা তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে। আমাদের সশ্রদ্ধ বাধ্যতার ওপর বয়স, মর্যাদা ও আত্মীয়তা ইত্যাদি সবারই দাবি থাকবে, কিন্তু চরিত্র ও শিক্ষার প্রতি আমাদের যে গভীর বশ্যতা থাকবে, তা থেকে কোন কিছুই জয় করতে পারবে না। সব শিক্ষাদাতার মধ্যে এমন একজন হবেন, যাঁর নিজের চরিত্রই হবে প্রধানতম শিক্ষা। তিনি একাই সেই পথপ্রদর্শক, যার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি বিষয়ে আমরা নিজেরা যা করি, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও, আমাদের সব সময় শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের উৎসটির কথা মনে রাখতে হবে। যার সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক না কেন, সে যেন আমাদের সম্ভাব্য জ্ঞানদাতা হিসাবেই প্রতিভাত হয়। আমরা এই উপলব্ধির সন্ধানে থাকব যে, প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছে। এইভাবে মনোযোগের অভ্যাস, অপরের জ্ঞান ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নতুন কোন সত্যের আকাঙ্ক্ষা, সবই যে উন্নত সমাজে মিশতে অভ্যস্ত, তার পরিচয়। নিজমতে একগুঁয়েমি এবং ভাব বা নীতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্বের বিস্মৃতি অপেক্ষা ইতরতা ও সৎসংসর্গের অভাবের সবচেয়ে বড় পরিচয় সম্ভবত আর কিছুই নাই।

এই ধরনের ভুলগুলির প্রতি তরুণরা প্রতি পদক্ষেপেই প্রলুব্ধ হয়, যেযুগে নতুন কোন ভাবধারা গৃহীত হয়ে থাকে। ঘটনা এই যে, তারা তাদের পিতাদের পথ থেকে বিচ্যুত এবং তাদের পিতারা যে একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী এবিষয়ে তারা অন্ধ। এমনকি নতুন ভাবধারার মধ্যেও তাদের চেয়ে অগ্রজ ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিরা আছেন! যে ভাবেই হোক, কোন ভাবধারার যথেষ্ট মূল্য থাকে না যদি সামাজিক সুসঙ্গতি ও প্রাচীনতর সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি না থাকে। তবু, এই অসতর্কতা ও নম্রতার অভাবের জন্যই একজন তরুণ তার নিজের মুখের ওপর একটি সুন্দর সমাজের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। তাকে একবার পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর নিকৃষ্টতর সঙ্গীদের মধ্যে সে মিশে যায়। তার জ্যেষ্ঠরা তাকে সহনশীলতার বাইরে মনে করে। যদি কোন তরুণ নিজের নেতৃত্বে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে, তবে সে একটি সামাজিক আবর্জনা। বিরাট প্রেরণাগুলি উপযুক্ত শিষ্য, শহীদ ও আত্ম-নিবেদিত সেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যার মধ্যে সমান অংশে আছে আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও নম্রতা। যারা নিজেরা নেতৃত্ব দিতে উৎসুক, তা

যে কোন টাকা পয়সা লেন-দেনের টেবিলের অন্তরাল থেকে অথবা কোন বৃহৎ অট্টালিকা থেকে ভাড়ায় পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃত নেতাদের আমরা একবারেই বুঝতে পারি, তাঁরা তৈরি হন, জন্মান না। বিশ্বস্ত অনুগামীদের মধ্য থেকেই তাঁরা আসেন। প্রচুর সেবা, গভীর ও নম্র চেতনার সাহায্যে, এসো, আমরা যতশীঘ্র সম্ভব তাঁদের প্রস্তুত করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সেই সব আত্মা, যাঁরা গুরু হতে জন্মেছেন, তাঁরা ছাড়া প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ গুরুগিরির পাহাড়ের ওপর জাহাজের বিপর্যয় ডেকে আনে।" এসো, আমাদে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চাবুক চালিয়ে উৎসাহিত করি, কারণ ত্রুটি অন্য কিছুতে নয়, শুধু এই গুলিতেই অনুপস্থিত।

মানবতার নির্দিষ্ট সারিতে যত কিছু উপস্থিত, গুরু সেগুলির সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘটিয়ে দেন। তাঁর মধ্যমে আমরা আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত জীবনে প্রবেশ করি, যেমন আমাদের পিতা মাতার মাধ্যমে মানুষের শরীর লাভ করি। তিনি তাঁর কাল পর্যন্ত সব কিছুরই প্রতিরূপ আমাদের জানার জন্যে উপস্থাপিত করেন। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে প্রথম, তাঁর শেখার আসাধারণ ক্ষমতা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্রদের শেখার জন্য অনুশীলন করানো। যিনি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে সর্বাধিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান নেতা। শিক্ষার সর্বোচ্চ পরিচয় আনুগত্য স্বীকারের ক্ষমতা। আনুগত্য নির্বোধ বা নিষ্ক্রিয় নয়। অর্জুন একাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শোনেননি। তাঁর স্পর্শ অনুভূত হয়েছিল ও তাঁর কথাগুলি আনন্দিত ঘোড়াগুলির দ্বারাও শ্রুত হয়েছিল। আমরা একথাও নিশ্চয়ই ভুলবো না, যে শব্দতরঙ্গগুলিতে গীতার সৃষ্টি, তা রথের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। রথ, ঘোড়া এবং মানুষ সকলেই শুনেছিল, কিন্তু তাদের তিন প্রকারের আনুগত্যের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল না? না, দুজন মানুষ শুনতে পারে পৃথকভাবে। অসময়োচিত কাজের চেয়ে স্থূলতর আর কিছুই নাই। কিন্তু যে আনুগত্য বা বশ্যতা আমাদের অগ্রগতিকে সূচিত করে, তা তীব্র আবেগপূর্ণ, অলস নয় এবং এর মধ্যে আমাদের অতীতের সব প্রচেষ্টার ফল নিহিত।

গুরুর ক্ষমতাই আমাদের উপলব্ধির পিছনে শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের প্রচেষ্টার ধারা যাই হোক, এর মূল্য খুবই কম, যদি আমরা নির্জন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই ও আবার সবত্র নতুন করে শুরু করি যেন মানুষের আবিষ্কারগুলি স্বতন্ত্র সঙ্কেত। গুরুর সঙ্গে অভিন্নতার জন্যেই আমাদের এই স্থান, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। আমরা যতই জানব, মানবিক জ্ঞানের জন্য আমাদের অবদান ততই ক্ষুদ্র মনে হবে। আমরা যতই জানব, ইতিহাস ততই উচ্চনাদে আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, আমরা যতই মহান পুরুষদের কাজের পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে পারব, ততই আমাদের নেতৃবর্গের মত আমরাও কষ্টের সঙ্গে দেখব, তার হয়ে নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা কী কঠিন!

এবং যখন আমরা মিলনের পূর্ণতার মধ্যে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারব, তখন শুধুমাত্র তখনই আমরা গুরুকে ভুলতে পারব ও মুক্ত হতে পারব। কারণ জ্ঞানী, জ্ঞাত এবং জ্ঞান সব এক হয়ে যাবে।

উপলব্ধি

সময় এসেছে, যে সব মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের জীবন-কাহিনী লেখা শুরু করা হচ্ছে, উত্তর পুরুষদের কাছে সে সব কাহিনী পৌঁছে দেবার জন্য। বর্তমান বংশধরদের জন্য যে সম্পদ তাঁরা দিয়েছেন, এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা গড়ে তুলতে পারি, ভবিষ্যৎ যুগে অসংখ্য মানুষ আকুল আকাঙ্ক্ষায় এই দিনগুলির দিকে তাকাবে, অথবা আমাদের মতো যারা এইসব স্মৃতি ধারণ করে আছে, তাদের মুখগুলি স্মরণ করবে। আমরা তাদের মধ্যে, যারা দেখেছে এবং যারা কেবল শুনছে। আমরা উভয়েরই অনুভূতির অংশীদার।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করে প্রথমেই যা একজন মানুষকে অভিভূত করে, তা হোল তাঁর উপলব্ধি। উপলব্ধিই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এবং শেষ কথা। পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে তিনি তা রক্ষা করেন। তাঁর এত অফুরন্ত সম্পদ ছিল! আর, আমাদের এত কম, এত ক্ষুদ্র! অথচ সেই ক্ষুদ্র সম্পদটুকু রক্ষা করার জন্য আমরা কি করি? 'এম' (মাস্টার মহেন্দ্র) তাঁর লেখা কাহিনীর মধ্যে বলেন, কেমন করে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সকালে মন্দিরের পূজার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে এক ঝলক আলোর মত ঝলসে উঠলো যে, সমগ্র পৃথিবীটাই একটা পূজা-বেদী, এবং ফুলগাছে যত ফুল ফুটে আছে সবই তো ঈশ্বরের পায়ে পূজার জন্য নিবেদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার জন্য আর কোনদিন ফুল তোলেননি।

চিন্তার মুহূর্তগুলিতে ক্ষণিক আলোর দীপ্তি ও তার প্রকাশের জন্য আমরা কি ত্যাগ করি? প্রত্যেক তীর্থযাত্রী তীর্থ পরিক্রমার শেষে স্মৃতিস্বরূপ কিছু মিতাচার অভ্যাস করে। প্রতিদিনের জীবনে সেই মিতাচারের কথা যখন একবার মনে পড়ে তখন ঐ তীর্থযাত্রীকে তার আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্য সে নিরাপদে স্বগীয় সান্নিধ্যে চলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ফুলগুলি দেখে তুলতে পারলেন না, তাঁর সেই ক্ষণিক আবেগের মধ্যে বিস্তৃত উপলব্ধিকে দিনে দিনে নতুনতর ও গভীরতর করে সারা জীবন তিনি বুকের মধ্যে ধরে রাখলেন। আমরা, আত্মার এই জীবনের কত বিরাট মুহূর্তকে ছোট ছোট কাজের চাপে ও ব্যস্ততায় অদৃশ্যে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছি। বৃহৎ নয়, ক্ষুদ্র জিনিসগুলিই আমাদের কাছে মূল্যবান। আমাদের মধ্যে যদি অপরিসর সঙ্কীর্ণতা এমন হয়, তবে উচ্চতর উপলব্ধিগুলি কেনই বা আমাদের কাছে আসবে? কেবল দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে আমরা সামান্যতম জ্ঞানের আলোর ঝলক পাই। যখন পাই, এর ওপর আমরা কি মূল্য আরোপ করি?

কতদিন এর প্রতি আমরা বিশ্বস্ত থাকি? সত্যিই, আমাদের অধিকাংশের জীবন ঢালু বালির পাহাড়ে ওঠা কোন মানুষের পদচিহ্নের মতো। আমরা যা অর্জন করি, অচিরাৎ তা হারাই আবার নতুন আকর্ষণের মধ্যে ধরা পড়ি, এবং ভুলে যাই যে, কোন কিছু ঘটেছিল।

কোন মানুষই, আত্মার যে জীবন, তা থেকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এ শুধু প্রভাবশালী নয়, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বাস্তব, যা আমাদের ঘিরে রাখে। চেতনার অবগুণ্ঠন সময়ে সময়ে পাতলাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে এবং ঈশ্বরের করুণা-প্রবাহ সবদিক থেকেই প্রবেশ করবে। এটা আমাদেরই দেহের আত্মভূতকরণ অসংখ্য ভাঙা আর মোচড়ানো সূর্যকিরণে, যা অরূপণ আলোকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখে। এই অবস্থার প্রতি যখন আমরা অপ্রতিরোধী হয়ে পড়ি, যখন এই আলোকে আমরা স্নাত হই, যখন আমরা সেই অসংখ্যের পিছনের এক ও অদ্বিতীয়কে স্থান ছেড়ে দিই, তখন আমরা বুঝতে পারি, আত্মাও সবরূপ ধারণ করতে পারে। জীবন অথবা মৃত্যু, সুখ অথবা দুঃখ, মহত্তর দূরদর্শী জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা সবই আত্মিক শক্তির দ্বারা নিরূপিত। শুধু এর কাছেই আর সব নমনীয়। এর দ্বারাই আর সবকিছুর পরিমাপ ও ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে এই একটি প্রশ্নই শুধু ওঠে-না, "এর দ্বারা একজন কি শিখলো?" এই সঙ্গে অন্য প্রশ্নটিও ওঠে, "এই জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য কি ত্যাগ সে করেছে?"

সেই রাজার কথা কল্পনা কর, প্রজাপতির পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে, যে রাজ্যের কথা ভুলে গেল। কল্পনা কর, সেই প্রেমিকের কথা যে ঘুড়ি ওড়ানোর খেলার জন্য ভুলে গেল তার প্রেমিকার কথা। তবুও, এটাই কি আমাদের কাজ, যখন সেই অসীম সত্য থেকে পিছন ফিরে আমরা অন্ন-বস্ত্র ও পার্থিব-লাভের দিকে কেবল তাকাই? এসো, আমরা নতুন করে শিখি, যখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কথা চিন্তা করি, তখন দেখতে পাই, আত্মাই একমাত্র জীবন এবং ঈশ্বর শুধু মহত্তম নয়, একমাত্র সত্য।

প্রগতি

"আদর্শ হিসাবে প্রেম, ভিত্তি হিসাবে আদেশ ও পরিণাম হিসাবে প্রগতি"—অগাস্ট কম্‌তে, একজন আধুনিক শিক্ষাদাতারূপে এই কথাগুলির মধ্যে মানব-সমাজ সম্পর্কে তাঁর আকাঙ্ক্ষার উপসংহার টেনেছেন। একটিমাত্র গোলার্ধের পরিবেশের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ, প্রগতির ধারণা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত স্বীকৃতি মাত্র। প্রগতিই শেষ পরিণাম কিনা, প্রাচ্যের এই সংশয় কম্‌তের (August Ccmte) মধ্যে জাগেনি। "শেষ পরিণাম রূপে প্রগতি" তাঁর কাছে একটি পরম সত্য,—এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, অপর পক্ষে তাঁর একটি চিঠির মধ্যে উল্লেখ করে বলেন, "'সামাজিক প্রগতি' এই আখ্যার ততখানি অর্থ, যতখানি অর্থ হতে পারে, গরম বরফ অথবা অন্ধকার আলো ইত্যাদি এই ধরনের কথাগুলির। চূড়ান্তভাবে 'সামাজিক প্রগতি' বলে কোন বস্তু নাই।"

বাস্তবে, দুটি বক্তব্যই সত্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, এবং এটা এক শ্রেণীর লোকের কাছে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে, যদি ঋষি ও ভাববাদী গুরুদের বক্তব্যগুলিকে তারা তাদের পার্থিব জগতের মূল পথ-প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করে মনে মনে বিভ্রান্ত হয়। অথবা, তারা যদি পক্ষান্তরে মনে করে যে, সমগ্র বিশ্বজগতের উদ্দেশ্য পরিণামে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মে অনুশাসিত। কি করে দোকান চালাতে হয়, এটা শেখার জন্য কেউ কি কোন পরমহংসের কাছে যায়? অথবা, কি করে চরম বৈরাগ্য অর্জন করতে হয়, এটা শেখার জন্য কি কেউ যায় বেনিয়ার কাছে?

'সামাজিক প্রগতি', এই উক্তি আত্মার দিক থেকে পরস্পর বিরোধী, এই বিবৃতি সম্পূর্ণ। তাছাড়া, এর জন্ম একটি পাশ্চাত্য মনে। বিষয়ের মধ্যে আত্মার অসীম পরিধি আছে, এই ধারণার বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম।

জড়বাদী সভ্যতা ও জড়বাদের মধ্যে এটি অন্যতম আধ্যাত্মিক প্রেরণা। মানুষ যখন সুখ, আনন্দ ও কামনা বাসনাগুলিকে শেষ পরিণামের মধ্যে স্থাপন করতে আকুল কামনা করে, তখন তারা শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতি-সাধন ইত্যাদিকে শেষ কথা বলে ঘোষণা করার সুযোগ নেয়। "মানবতার জন্য কাজ", একজনের জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে খুব চমৎকার শোনায়।

এখানে প্রাচ্যের নির্মম বিশ্লেষণ এসে পড়ে। তাহলে কি মানবতার চিরন্তন প্রয়োজন কর্মসাধনা? আমার সৌন্দর্যময় সত্তার দাবি কি অপরিহার্য সত্তা হিসাবে কেবলই অন্যের প্রয়োজনে? সভ্যতা কি আত্মার অসীম আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও অনন্ত প্রেমকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম? মানুষের কর্ম, যা নিজের মধ্যেই প্রেরণাদায়ক বা উদ্দেশ্যমূলক হিসাবে স্পষ্টত বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটি উপায়মাত্র এবং সেই লক্ষ্য বাইরের কোন কিছুর দ্বারা নয় ব্যক্তির নিজেরই সচেতনতার পরিমাপ। অন্য কথায়, "সামাজিক প্রগতি" এরূপ কোন চূড়ান্ত কথা নাই। এটি একটি পূর্ণ সত্য। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমরা যেন অন্ধ না হই যে, এর মধ্যে অংশত আমাদের স্থান আছে এবং "সামাজিক প্রগতি" প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তবপূর্ণ ঘটনা।

পরমহংসের নিকট পিতা-মাতার ভালোবাসা কিছুই নয়। তিনি একটি সত্য লাভ করেছেন, যার তুলনায় এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কিন্তু একটি দুষ্ট ছেলেকে কে বলবে যে, তার বাপ-মায়ের ভালবাসার কোন মূল্য নাই? অন্তে যে দড়িটা কেটে দেয়, সেই দড়ির সাহায্যেই একজনকে ওপরে উঠতে হয়। অনুরূপ, এই জাগতিক জীবনে তাদের পক্ষে প্রগতির পিছনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা একটি সত্য এবং যথার্থ উচ্চাশা। এই জগৎ আত্মার বিদ্যালয়স্বরূপ। এটা সত্যি যে, বিদ্যালয়ের ওপারেও একটি জীবন আছে এবং এটি তাদের পক্ষে সর্বোত্তম, জীবনের বিদ্যালয়ে যে আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত হতে পেরেছে; এবং এর কাজ খেলাধুলা, ও মায়াময় বৈশিষ্ট্য সব কিছুতে। সন্ন্যাসের বিদ্যালয় গৃহস্থাশ্রম। শিথিল জীবনের নাগরিকরা মহৎ সাধু করতে পারে না। সম্পূর্ণ উল্টো। যখন প্রগতির আদর্শ

চূড়ান্তরূপে সম্পাদিত হয়, যখন অপরের কল্যাণের জন্য আমাদের জীবন সমর্পণ করি, তখনই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি বুঝতে সক্ষম হই।

আবার বোধহয় সমগ্র মানবতার নিবন্ধভুক্ত, পূর্ণ প্রগতি কিছু নাই। পাশ্চাত্যে এক শ্রেণীর মধ্যে পার্থিব বিলাসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও অধোগামিতা। ইউরোপের উত্থানের পাশাপাশি চলছে এশিয়ার ক্ষয়। আপাতত ভালরূপে যা প্রতীয়মান, তা মন্দেরই প্রকাশ। লাভ-লোকসানের ছায়ায় আবৃত হ্যাঁ, এই ঘটনাবলীর মধ্যেই রয়েছে লড়াইর সুর। শেষ প্রগতি নাই, কিন্তু, প্রতীয়মানতার স্পন্দমান আন্দোলন আছে। চিরকাল ধরে ইউরোপের উত্থান চলতে পারে না, যেমন চিরকাল চলতে পারে না এশিয়ার ক্ষয়। পরস্পর বিরোধিতার দ্বারা প্রত্যেকের গতিবেগ সঞ্চয়। যদি পতনোন্মুখের প্রেরণা-শক্তি দ্বারা অধঃপতন ঊর্ধ্ব-আরোহণে রূপান্তরিত না হয়, তাহলে বিপরীত উত্থানের অর্থাৎ বিপরীত গোলার্ধের শক্তি কোথা থেকে আসবে?

মানবতা অখণ্ড, এর প্রতিটি অংশ সবার পক্ষেই প্রয়োজনীয়। রোমানদের গঠনক্ষমতা হিন্দুর নিকট যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া উচিত, যেমন হিন্দুর উপনিষদের শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি টিউটনদের নিকট হওয়া উচিত। আপেক্ষিকভাবে স্থান কাল ভেদে প্রগতি একটি শর্ত; এবং আমাদের একান্ত কর্তব্য বাঁচার জন্য একে অবলম্বন করা।

তমোগুণসম্পন্ন লোকেরা নিজেদের আলস্যকে সত্ত্বগুণ বলে দাবি করে। যাই হোক, রজোশক্তির মাধ্যমেই সে উঠতে পারে। শান্ত পবিত্রতা ও অলস মন্থরতা দুয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। আমরা রাজসিক হই, এসো। আমরা এমন কাজ করি এসো, যেন মনে করি প্রগতি একটি পূর্ণ সত্য; এবং তবুও আমরা পরম জ্ঞানের রাজ্যে যেতে পারব, যেহেতু, "বহু এবং এক একই সত্য।"

কাজ

আবির্ভূত সব মহাপুরুষ কাজের কথা বলেছেন। মানব জাতির সেবা ছাড়া তাঁরা আর কি জন্য এসেছিলেন? সেই পরম স্বর্গসুখের মধ্যে থাকাই তো তাঁদের পক্ষে সহজতর ব্যাপার ছিল। তাঁদের দৃষ্টিতে সকল সময় ছিল সেই এক অখণ্ড সত্তার দৃশ্য। কিছু ক্ষণিক আলোর আভাস ছাড়া সেই পরমানন্দ ত্যাগ করে তাঁরা বহুর মধ্যে নেমে আসবেন? সবই মানুষের জন্য। এ সবই যাতে মানুষ তাঁদের পাশে পৌঁছতে পারে, তার জন্য। সবই মানুষকে সম্পদশালী করার জন্য, তার জন্য তাদের দরিদ্র করে দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করেও। তাহা, অবতার ও ঈশ্বর-প্রেরিত গুরুদের কী সুন্দর জীবন! সাধু ও শিক্ষা-গুরুদের কী বিস্ময়কর দয়া! আমরা কি উপায়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলব!

এর একটিই উত্তর,—কাজের দ্বারা। আরাম, সুবিধা ও অবসর থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। নিজেদের আত্ম-স্বার্থ থেকে মুক্ত করে। পরের জন্য এবং ভাব ও আদর্শের জন্য কাজ করে। "যেহেতু, অজ্ঞ যুদ্ধ করে স্বার্থপর অভিপ্রায় থেকে, আমরা যুদ্ধ করব নিঃস্বার্থভাবে।" একজন নীচতম কৃপণের মতই আমাদের প্রচেষ্টা প্রগাঢ় হবে। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত আমরাও প্রাণপণ পরিশ্রম করব, পরের মঙ্গলের জন্য। আমাদের আত্মত্যাগের মধ্যে ততখানি প্রেরণা-শক্তি থাকবে, যতখানি প্রেরণা অধিকাংশ মানুষের থাকে আত্ম-সংরক্ষণের জন্য।

একজন সন্ন্যাসী নিজের ব্রতের নিকট কতখানি বিশ্বস্ত! পতনকে তার কত ভয়! সে যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে, তাহলে কি সীমাহীন ত্যাগের স্বপ্ন সে দেখে! অনুরূপ, আমরাও কাপুরুষতা, আপোস ও কাজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সঙ্কোচে কাঁপতে থাকব। যাঁরা জীবনকে জেনেছেন, তাঁদের কাছে আমারা জেনেছি যে, একটি ন্যস্ত-বিশ্বাসকে প্রতারণা করার মত নরক জগতে আর কিছু নাই।

সবকিছুর ওপরে আমরা কি চাই আমাদের বিশুদ্ধতার আদর্শ পূর্ণ হোক? তাহলে আপোসের স্থান কোথায়? আপোসের অর্থ বিপরীত আকাঙ্ক্ষাগুলির নীচ ভিত্তি-স্থাপন। যদি আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষাই থাকে, তবে আপোসের কি মতলব থাকতে পারে? আমাদের প্রত্যেকে নিজের নিজের কাছে শপথ গ্রহণ করুক যে, কোন কিছুর আধখানা অনুসরণ সে কিছুতেই করবে না। করবে না, মৌখিক-কাজ, দুর্বল হাঁটুবিশিষ্টের মত ভীরুতা, আর ধরবে না দু-মুখো নীতির রাস্তা। এসো, আমরা আমাদের জীবনগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিই তুচ্ছ বস্তুর মত মুক্ত মনে, আনন্দের সঙ্গে। যদি আমরা উত্তম আনন্দের মধ্যে পাই, তবে আমরাও পঞ্চাশ ভাগ দেব।

এসো, আমরা নিজের নিজের কাজের প্রতি বিশ্বস্ত হই, খাঁটি হই। আমাদের স্বধর্মই আমাদের কাজ। "প্রত্যেকের নিজের ধর্মই ভাল। যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, স্বধর্ম পালন করাই শ্রেয়ঃ, অন্যের কাজ সহজ হলেও।" যে বিষয় আমার সামনে এসে দাঁড়ায় ও আমাকে ভীত করে, যা খুবই দুরূহ বলে মনে হয়; যার ওপারে আমি সাহস করে তাকাতে পারি না,—সেখানে, ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে আছেন "মা"! সেই ভয়ঙ্করীকে দর্শন করার জন্য আমি সেখানেই দৌড়ে যাব। সেখানে আমাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দাও!

রাসেল লাওয়েল প্রশ্ন করেন, "মঞ্চের ওপর চিরকালই কি ঠিক?" আবার, "সিংহাসনের ওপর চিরকালই ভুল?" তারপর নিজের উত্তরে নিজেই ফেটে পড়েন:

> "কিন্তু সেই মঞ্চ ভবিষ্যৎকে আন্দোলিত করে!
> এবং অনুজ্জ্বল অজানার অন্তরালে,
> ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা ঈশ্বর,
> নিজের ওপর নিজেই চোখ ফেলে।"

এটি একটি চমৎকার নীতি উপদেশ। ভয়হীনতার, সাহসের ও আত্মজয়ের। আমাদের মধ্যে যে বিরাট দেবত্ব লুকিয়ে আছে, তাকে জাগাতে হবে। হে ঈশ্বর,

তোমার নামে সবই সম্ভব। আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব, জয় ও পরাজয় দুই-ই সমান।

কিন্তু কি উপায়ে লড়াই করব? আমাদের অধিকাংশই কাজের দ্বারা। জগতের কাজ সবচেয়ে বড় সাধনা, যার মধ্যে সঞ্চিত হবে চরিত্র-সম্পদ, আর সময় এলে যার দ্বারা আমরা নির্বিকল্প সমাধির স্তরে উন্নীত হতে পারি। চরিত্রই আত্ম-সংযম। আত্ম-সংযমই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আত্ম-নিয়ন্ত্রণই মনঃসংযোগ। মনঃসংযোগের পূর্ণতাই সমাধি। পূর্ণ কর্ম থেকে পূর্ণ মুক্তি। এই হোল আত্মার দোলন। এসো, আমরা কর্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।

কাজের মাধ্যমে উপলব্ধি

মানুষের মনের কর্মহীন ভাব বা ধারণার ওপর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার নজীর ইতিহাসের পাতায় আমার পেতে পারি। শক্তির উর্ধ্বতন বিকাশের জন্য বস্তুগত অবস্থাসমূহের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন চিরন্তন। যখন কর্ম শেষ, জ্ঞানের আলো হাতের কাছে উপস্থিত, তখন এই অবস্থাকে অবশ্যই অতিক্রান্ত হতে হয়। কিন্তু, অবস্থা এই যে, পৃথিবীতে অতি নগণ্যসংখ্যক মানব জাতি আছে, যাদের যে কোন সম্বন্ধে, পারিপার্শিক অবস্থাসহ সমগ্র শক্তিকে দৃঢ় প্রচেষ্টা ও সুসংহত সংগ্রামের মধ্যে অনিবার্যরূপে নিক্ষেপ করতে হয়নি। একমাত্র এর দ্বারাই ভাবগত বা কল্পনাগত প্রগতি সম্ভব। কেবল, এর মাধ্যমেই চেতনার পুষ্টি সাধন হতে পারে।

আত্মার পুষ্টির জন্য যেমন বেদান্ত বা গুরুর প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন কাজেরও। কারণ, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যখন পৌঁছনো যায়, তখন অন্যগুলিও আসে। কিন্তু কর্ম সকল সময়ই আমাদের শক্তির মধ্যে। ভক্ত পূজার অনুষ্ঠানগুলি অভ্যাস করে। কাজও পূজা, যা মানুষ সেই বিরাট শক্তির নিকট নিবেদন করে, যে শক্তি প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত, সেই 'মা', সেই 'আদি শক্তি'।

ভাব বা কল্পনা, কতকগুলি শব্দসঙ্কলিত চিন্তা, শব্দবহুল দার্শনিক সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে যায়, যা সংশোধনের অতীত। বুদ্ধিগত অর্থ নৈতিকতার অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক একটি বিষয় চুল-চেরা অধিবিদ্যা। এটা সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত হতে পারে, কিন্তু মানসিক শক্তির প্রকৃত প্রকাশ কোনদিনই হতে পারে না। একে নিজের পথে চলতে দিলে মানসিক ও নৈতিক বিভক্তের সূচনাই প্রমাণ করে। একে সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ধাপে ধাপে কল্পনা ও আদর্শের বাস্তব উপলব্ধির স্বার্থে বিবেক-বুদ্ধিপূর্ণ প্রচেষ্টার সাহায্যে।

নৈতিক বিশ্বাসপূর্ণ অনেকগুলি যুগের সঙ্গে জগতের পরিচয় আছে। ঐ যুগগুলির বেশির ভাগই কর্মহীনতার যুগ নয়। একথা সত্য যে, ইউরোপের ত্রয়োদশ শতাব্দী

খুবই বিতর্কের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, কিন্তু এই শতাব্দীতেই অপূর্ব সব গীর্জা নির্মিত হয়েছিল। সুন্দরতম গীর্জাগুলির বেশির ভাগই তখনকার নির্মাণ-শৈলী। ভারতেরও মহান যুগগুলি উপেক্ষিত হয়েছে, যেহেতু, সেই যুগগুলি যুদ্ধের অগ্নিশিখায় বা রাজবংশগুলির ধ্বংসের দ্বারা চিহ্নিত নয়। কিন্তু বিশ্বাসের যুগ, বাস্তবে গঠনের যুগ, বিকাশের যুগ, কলা ও শ্রমশিল্পের যুগ, শিক্ষা-বিস্তার ও শিল্পদক্ষতার যুগসমূহকে বোঝায়। মহান বিশ্বাস শক্তিশালী কর্মের সহগামী ও অবলম্বন।

আবার আমাদের মাঝখানে সত্যের উচ্চভেরী বেজে উঠেছে। ইতিহাসের প্রতিটি মহৎ প্রেরণার অগ্রদূত আমাদের সেই ধর্মীয় সম্পদের উপলব্ধিতে দেশ আর একবার জেগে উঠেছে। বিবেকানন্দের মধ্যে গুণগতভাবে এই আধুনিক অবিশ্বাসী যুগেরও উপযোগী বেদ ও উপনিষদের নবরূপায়ণ পেয়েছি, যার বিশ্বজনীন আবেদন বিদেশী জনসাধারণের সামনে আমাদের সাহিত্য সম্পদের দরজা খুলে দিতে সক্ষম। মনে হতে পারে, এই সময় মন্থর গতিতে আসছে, কিন্তু এ নিশ্চিত আসবেই, যখন আধুনিক সচেতনতার ওপর ভারতীয় চিন্তার অন্তঃপ্রবাহ ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের নিকট এই অপস্রয়মাণ শতাব্দীগুলির মহান ঘটনা হিাবে প্রতিভাত হবে।

এই অন্তবর্তী কালে আমরা কি করব? আমরা কি আমাদের অতীতের সম্পদ দিয়ে জগৎকে সমৃদ্ধ করব, আর আমরা নিজেরা থাকব দারিদ্র্য-পীড়িত ও নগ্ন হয়ে? তা যদি না হয়, কি করে নিষ্কৃতি পাব? কি হবে আমাদের কর্মধারা? আমাদের ধারা অবশ্যই হবে কর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি। আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বের অধিবিদ্যার অনুসরণ করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের ঘোড়দৌড়ের পথ। এর ওপর আমাদের সত্তা সম্পূর্ণ ঢেলে দিতে হবে ও সেখানে আমাদের পুরস্কার বা ক্ষতিপূরণ ছিনিয়ে নিতে হবে। জগতে এই আমাদের প্রতিযোগিতার কাজ, ভারতীয় জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশালতা প্রমাণ করা, প্রমাণ করা ভারতীয় মনের গভীরতা ও অকৃত্রিমতা, অনুসন্ধিৎসার সেই এলাকায়, যা সময়ের গতিতে এখন সব জাতির কাছে উন্মুক্ত।

আমাদের মধ্যে প্রায় একই রকম আর একটি কষ্টসাধ্য কর্তব্য আছে। আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞানকে ভাগ করে নিতে হবে। এই সাধনাই আমাদের শিক্ষাকে বাস্তব করে তুলবে। এই সেই অভ্যাস, যা একে শুধুমাত্র কথা থেকে প্রকৃত জ্ঞানে রূপায়িত করবে। এই সংগ্রামই স্বাস্থ্যকর, গভীর মনোযোগের, নিবিষ্টকারী, যা আমাদের দেবে নতুন আধ্যাত্মিক শক্তি ও সংযোজন করবে ডানা।

বিশ্বাসের শক্তি

সনাতন ধর্ম তার সমগ্রতার মধ্যে যে সম্পদ ধরে রেখেছে, সে সম্পর্কে আমরা অকস্মাৎ চেতনা লাভ করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকে। সংস্কৃতি, চিন্তা, সংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বৃহৎ নিয়ম প্রণালীগুলির জন্য "সঙ্কটে আলোর দিশারী" প্রয়োজন, যার মধ্যে সম্প্রদায়গত উচ্চাশাগুলি মুহূর্তের জন্য প্রত্যেকের বোধগম্যতায় বাস্তব ও দৃশ্যমান হতে পারে। এবং, যেখানে একশ্রেণীর জনতার প্রচেষ্টার মধ্যে হৃদয়ে সত্য ও আন্তরিকতা থাকে, মহান আত্মাদের আবির্ভাব তখনই হয়। আমেরিকার ইতিহাসের এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে আব্রাহাম লিংকনের কর্তৃত্বে জাতীয় আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। এই আদর্শগুলিকে আজ হয়তো মনে হতে পারে আশ্চর্য জটিল পথে প্রতারিত করা হচ্ছে, তবু এসত্বেও, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র তার আদর্শ, এবং তার নিজের আন্তরিকতায় বিশ্বাস ও তা উপলব্ধি করার ইচ্ছা হারাবার মত এমন কোন বিপর্যয় তার ওপর নেমে আসবে না।

যে ব্যক্তি তার নিজের ওপর ও দেশবাসীর আন্তরিকতার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, সে একজন নিন্দুক প্রকৃতির লোক। সে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে ও সব প্রচেষ্টাকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, যেহেতু প্রচেষ্টার মধ্যে ভুল থাকবেই। সব অনুভূতি তার কাছে হাসির খোরাক, কারণ তার জ্ঞানে সবই ছেলেখেলা। প্রার্থনা ও আশাকে সে লঘু চোখে দেখে কারণ মনে করে এসব ভণ্ডামী, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে একজন নিন্দুক পচা ঘায়ের পোকা। সে খোলাখুলি তার স্বার্থপরতাকে নিঃস্বার্থ লক্ষ্যের সত্য বলে ঘোষণা করে ও নিজেকে বেশ মহৎ বলে বিশ্বাস করে। বিভক্তি ও পারস্পরিক বিরোধিতার যুগগুলিতে নিন্দুকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে থাকে। মহান ও সম্মিলিত উৎসাহের যুগগুলিতে এদের পাওয়া যায় না। সেই জন্যই, জাতীয় স্বাস্থ্যের স্বার্থে বৃহৎ নাগরিক আন্দোলনের প্রয়োজন, সেই আন্দোলনের প্রস্তাবিত লক্ষ্যের শেষ পরিণতি যাই হোক না কেন। স্রোতাবেগের প্রবল প্রবাহে ভাবাবেগে দুর্বল ও নিষ্ফল নীতির নিন্দুক লোকেদের ঝাঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয় ও তাদের এমন সব বন্দরে হাজির করা হয়, যা তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় কখনো উপস্থিত হতে পারত না। কোনদিনই সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়া অপেক্ষা গলাকাটা ঠগদের সঙ্গে মিলিত হওয়া বরং ভাল। মানবতা এখনও সমগ্রভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হয়নি। জনতা সর্বজনীন হৃদয় ও মন নিয়ে এক হয়ে কাজ করে, বহুতে বিভক্ত হয়ে নয়। প্রেরণাদায়ক কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে তাল ঠিক রেখে একটি বিরাট যন্ত্রের একটি মাত্র অংশ হিসাবে কাজ করে যাওয়া অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নাই, সামগ্রিক স্বার্থের উপলব্ধি ও অপমান আঘাত থেকে যা প্রতিক্ষিপ্ত হবে।

কিন্তু এই শক্তি সম্পূর্ণ হৃদয়ের শক্তি। এই শক্তি যাঁর আছে, তিনি একটি ছোট্ট শিশুর মতো, এবং তাই তিনি তাঁর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর নিজের মঙ্গলের অপেক্ষা তাঁর চারপাশের জগতে বৃহত্তর পরিণতি আছে কিনা এ নিয়ে তিনি কখনও প্রশ্ন তোলেননি। তিনি আরও পরিণতির চেষ্টা করেন। জ্ঞানী এবং দূরদর্শীরা বলুন, তাঁরা কি করবেন। নির্মীয়মান বিরাট প্রাচীরে তিনি নিজেকে একটিমাত্র ইট বলে মনে করেন, স্মৃতিরক্ষার শিলাস্তূপের মধ্যে নিজেকে মনে করেন একটি পাথরের টুকরো। যেখানে এরূপ একজন নিঃস্বার্থপর মানুষ থাকেন, তার পিছনে পিছনে হাজার হাজার মানুষ আসে। একই কারণের জন্য তাঁর অস্তিত্ব সমধর্মীদের তৈরি করবে।

আমাদের পক্ষেও তাই, হিন্দুধর্মের আদর্শে এই শিশুসুলভ সরল-পথেই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। যদি আমরা প্রশ্ন করি, তাঁরা কি, তাহলে আমাদের সামনে কি দুটি উদাহরণ নাই, যাঁদের পদচিহ্ন আমরা অনুসরণ করতে পারি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখেছি, হিন্দু ধর্ম কি ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আদর্শ পেয়েছি, কি হবে। একজনের পিছনে আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য। এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ। একই মুদ্রার মুখের দিক যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হয়, তবে অপর দিক বিবেকানন্দের আধুনিক শিক্ষা।

যদি কেউ ব্রহ্মজ্ঞানী অবস্থার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, মনে রাখতে হবে, তাঁর আর পতন হয় না। তাঁর উপলব্ধি তারপর একবার একের মধ্যে, আবার বহুর মধ্যে আন্দোলিত হতে থাকে, কিন্তু তিনি নিজে একই সত্তা, একই বিকাশ ও একই পবিত্রতা নিয়ে অটুট থাকেন। একই সত্য তাঁর সামনে বহুরূপে দেখা দেয়। "জন্ম-ব্রহ্মজ্ঞানী" যা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বলতেন, তাঁর স্পর্শ দ্বারা তাঁকে পবিত্র করে নেন, তাঁর জীবিতকালেই দিয়ে যান "অভিজ্ঞান পত্র", যা অন্যেরও প্রয়োজন। তাঁর নিকট জীবন ও সমাধি একই অভিজ্ঞতার দুটি স্তর।

ঐ একই ঐক্য গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে মঙ্গলজনক। মহৎ গুরুগণ এক সমগ্রতার মধ্যে উপনীত হন, তাঁদের শিষ্যরা এটি অর্জনের চেষ্টা করে বহুকে জয় করে। কিন্তু এ সব কিছুই এক। ত্রাণ-প্রাপ্তদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তিরও গীর্জার একটি অংশ হিসাবে যেমন মূল্য, ত্রাণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তির সেই একই মূল্য।

উদাহরণস্বরূপ, বিবেকানন্দের মধ্যে হিন্দুধর্ম মুক্তির উপলব্ধি অর্জন করে। এবং একজন নগণ্যতম কাজের লোক, যে তার প্রতিদিনের কর্মসূচীর মধ্যে তাঁকে আন্তরিক ভাবে অনুসরণ করে, মুক্তি কেবল দোদুল্যমান পেণ্ডুলামের অপর প্রান্তে চলে যায়। দুটিই এক। তাদের দৃশ্যও এক। ঐকান্তিকতা তাঁদের মিলনের সূত্র, দুজনেরই ঐকান্তিকতা ও শিশুসুলভ সহৃদয়তা।

এইরূপে আমরা সকলেই এক। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের কর্তব্য যোগীর সন্ধ্যাকালীন ধ্যানের মত শুদ্ধ ও পবিত্র হবে। ইংরাজী অথবা পারসিক, রসায়ন অথবা যান্ত্রিক উৎপাদন যাই পাঠ করি না কেন, পবিত্র মনে করতে হবে। সব

কাজই পবিত্র। সব কাজই উদ্‌ঘাটন। সব জ্ঞানই বেদ। প্রাচীন যুগের ধর্মের মত আধুনিক ইতিহাসও তার একটি অংশ। শাস্ত্রের মধ্যে ভারত একটি উদাহরণ হবে, আর রাজা ও জন নেতারা এর বাইরে থাকবে? তা হয় না। আমরা এক। আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সবাই এক। প্রাচীনতম ও সর্বাধুনিক, এক। সময় এক। ঈশ্বর এক। এর চেয়ে পবিত্রতম সময় আগে কখনও ছিল না, আমি যে কাজই করি না কেন, হোক সে তাঁত বোনা, ঝাঁট দেওয়া, হিসাবে রাখা, অথবা বেদ পাঠ করা অথবা ধ্যানাভ্যাস করা, এমনকি নগ্ন মুষ্টির আঘাতও যদি দিতে হয়, তাও। আমার চূড়ান্ত জ্ঞানের মধ্যে আমার জীবন প্রকাশিত হোক। প্রচেষ্টা যত কঠিন হোক, আমি যা উচিত মনে করি, তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে দাও। যত সাহসী প্রচেষ্টার প্রয়োজন হোক, কোন বড় কিছু যেন আমাকে বৃথা আহ্বান না করে। অমি ব্যর্থ হব। হাঁ, তাই! আমার পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু আমাকে আমার পরাজয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে দাও। আমার ব্যর্থ হওয়ার অধিকার আছে। কেবল ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার দ্বারাই আমি সফলতা অর্জন করব।

আমাদের চারপাশের জগৎ পবিত্র। এ তখনই অবাস্তব হয় যখন এর ওপারে মহত্তর বাস্তব আমরা খুঁজে পাই। ততক্ষণ পর্যন্ত এর সঙ্গে আমরা পুরুষের আচরণ করে যাব। আত্ম-স্বার্থে নিমজ্জিত হয়ে নয়, আমার দম্ভ বা আরামে প্রলুব্ধ হয়ে নয়; নীচ ভাবধারার দাসত্ব করে নয়; সুতরাং সে মহত্তমকে আমরা জানি, সেদিকে আমাদের জোর করে এগোতে হবে। পথে যদি পতন হয়, যা আমাদের অনেকেরই হবে, তবু আমরা জেনে যাই যে, আমাদের প্রচেষ্টা সুন্দর ও উপযোগী। এইভাবে মানবতার মধ্যে আমরা ঈশ্বরেরই আরাধনা করেছি। পূজা বা উপাসনাকেই আমরা 'কর্ম' এই আখ্যা দিয়েছি। যে ছেলেটি সেদিন দুজন শ্রমিককে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে শহরের নর্দমায় প্রাণ হারালো, সে একজন সাধু এবং শহীদ ছিল। ঠিক তাই হোত, যদি সে তার মতের মূল্য দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতো অথবা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিত।

মৌমাছি ও পদ্ম

যুগ পরিবর্তনকালের এই ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও যথাযথ আর কিছু আছে কিনা আমাদের মনে হয়না: "তোমার নিজের পদ্মফুলটিকে ফোটাও, মৌমাছিরা আপনিই আসবে।" সারা দেশব্যাপী কর্মীদের আশা পরিত্যক্ত। এখানে একটি পত্রিকা আছে, ওখানে ব্যবসা। কোথায় একটি লোক বিজ্ঞান অথবা আবিষ্কারে নিযুক্ত। আবার, সে কিছু একটা শিল্প অথবা শ্রম সংগঠনের চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেই জটিল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি, যা মনে হয় নৈরাশ্যজনক চিত্র। প্রায় প্রত্যেককেই সহযোগিতার অভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। প্রত্যেকেই সাফল্যের উপাদান ছাড়া সফল হতে চাচ্ছে।

এই অবস্থায় সকলকেই বলব, "ভীত হয়োনা! কুয়াশার মধ্য দিয়ে তুমি একটি পদক্ষেপ দেখতে পাও? দৃঢ়তার সঙ্গে একটি পা ফেল। তোমার যা করার তুমি করেছ, আগামী সকালে তুমি কি দেখবে, তুমি ব্যর্থ হয়েছ? যদি চাও, ব্যর্থতাই আশা করো, কিন্তু আজ তুমি সামনে সাফল্যের আশা রেখে কাজ করে যাও। কামানের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। সৎ হও।" এমন একজনও নেই যে উপায় বলে দিতে পারে। কদাচিৎ একজন নিপোলিয়ন জন্মায়, যে হাতের কাছে তাই পায়, কাজের জন্য যা তার প্রয়োজন। এমনকি, তাও প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগের প্রচেষ্টার ফল। আমাদের এক্তিয়ারে যা আছে, তা আমাদের নিজেদের কর্ম-প্রচেষ্টা। "তোমার নিজের পদ্মফুলটিকে ফোটাও।" নিজের প্রতি বিশ্বস্ত হও।

কিন্তু এই ছবির আর একটা দিক আছে। মৌমাছিরা আসে। পদ্ম আজ আর কালের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে না। সে জানে না, সকালেই তার পাপড়িগুলি হয়েছে প্রথম পূর্ণতায় বিকশিত। সে কেবল মৌমাছিদের আসা দেখেই বুঝতে পারে। তরুণ খেলোয়াড় নিজের মধ্যে কঠোর সংযম ও সূক্ষ্মতর সামঞ্জস্যের মধ্যেকার তফাৎ বোঝে না, বোঝে না, গতকাল ও আজকের কাজের মধ্যে পার্থক্য। আমরা জানি না, সাফল্য কখন আসবে। যাই ঘটুক না কেন, আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে কাজ করি। যখন জয় আসবে, দেরিতে হোক অথবা শীঘ্র হোক, আমরা তখন কর্মরত।

"লাভ এবং লোকসান সবই সমান।" এটি শুধু ধর্মাভ্যাসের পক্ষে যুক্তি নয়। প্রতিটি পরিকল্পনায় এটি একটি সোনার অনুশাসন। যে এটা অনুসরণ করে, সে চিরকাল কৃতকার্য। মন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যথার্থ অবলম্বন কেন্দ্রে স্থির হতে না হতেই ফল শুরু হয়। আমাদেরই উদ্দেশ্যের বিভ্রান্তি, আমাদেরই লক্ষ্য-সন্ধানে অন্ধতা এতদিন আমাদের বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ্য যদি ঠিক হয়, তবে শরসন্ধান অব্যর্থ। ঠিক সময়েই অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব ধনু ফিরে আসে।

কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্ প্রচেষ্টায় আমাদের অধিকার আছে। মানুষের ইচ্ছা একটা বিরাট সাপের মতো। তার শেষতম প্রান্তে, অথবা তারপরে, বা তারও পরে আঘাত করার স্থান নয়। তার সর্পিল আকারের একেবারে মাঝখানে আমরা সেই মারাত্মক চিহ্নটি দেখতে পাই। মাথা উঁচুতে তুলে গোখুরো তার লক্ষ্য দেখে নেয়, তারপর আঘাত করে। আমাদেরও ঠিক জায়গায় দাঁড়াতে হবে, নিজেদের কেন্দ্রীয় ভারসাম্য ঠিক রেখে মানসিক স্বচ্ছতা লাভ করতে হবে। স্কুল শিক্ষক সানন্দে কাজ করেন, কিন্তু তাঁর সামনে বেঞ্চের ওপর কাউকে তিনি দেখতে পান না, যার মধ্যে বীরত্বের উপাদান আছে। স্কুল শিক্ষক সকলকেই বীর মনে করে শিক্ষা দিয়ে যাবেন। তাঁকে পরিষ্কার চিন্তা ও প্রত্যয়ে পৌঁছতে হবে। জয় ও পরাজয়কে সমান করে নিয়ে তাঁকে সকল শক্তি দিয়েই শিক্ষা দিতে হবে। যিনি এটা পারেন, তিনি বীর সন্তানদের সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর নিজের পদ্মফুলটিকে নিজেই ফোটান। মৌমাছিরা নিজেরাই আসে। কুম্ভকার ঐকান্তিকভাবেই তার দ্রব্য লোককে সরবরাহ করতে চায়। সে ভাল পাত্র তৈরী করুক। তার আবেগপূর্ণ কর্মশক্তি দেখে চুল্লিতে

আগুন দেওয়ার জন্য সেই লোকগুলিই এগিয়ে আসবে। সে মাটির পাত্র ইত্যাদি ঢালাই করার কথা ভেবেছিল, এখন মানুষের ইচ্ছায় মাটি থেকে মানুষকেই ঢালাই করে নিতে পারে। কী বিস্ময়ে, পদ্মকে তার নিজের বিকশিত হওয়ার খবর মৌমাছির মুখ থেকে পেতে হয়! আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাগুলিও এত নীরব। তবু, সব কর্তৃত্বপরায়ণতা তাদেরই হাতে। ঘটনা তাদের অনুসরণ করে, তারা আগে যায় না। সবসময় উপায় তার কাছেই আসে, যে উপায়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে। জয় কিংবা পরাজয় কি আমার কাজ? সংগ্রামই তোমার কাজ।

যত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছতে চেষ্টা করব, আমাদের কর্তব্য তত উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ হবে। পথের প্রতিটি ইঙ্গিতে আমরা লড়াই করব। শেষে কাজটিকে গতানুগতিক বা তুচ্ছ মনে হতে পারে। কত সৈন্যকে একটা চাবি ঘোরাতে বা কামানের একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গে জীবনের মূল্য দিতে হয়। কিন্তু, সেই চরম মুহূর্তটির জন্য তার জীবনের সমগ্র অতীতের প্রস্তুতি ছিল। গ্লাডস্টোন অথবা ডারউইনের স্কুল-কলেজের জীবনে কঠোর সাধনা ছাড়া অসাধারণ কোন ক্ষমতা ছিল না। হয় তো, তাঁদের আত্মা আগে থেকেই জানতো যে, বড় যুদ্ধের আগে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের মতো ভবিষ্যতের জন্য প্রাত্যহিক কর্মসূচীর মধ্যেও প্রস্তুতির প্রয়োজন। হতে পারে, এরূপ ব্যক্তিদের বৃহত্তর জীবনের সহজাত চেতনা থাকে। হতে পারে, নাও হতে পারে। তাঁরা কিংবা আমরা কেউই অদৃষ্টের ওপর হুকুম জারী করতে পারি না। কিন্তু আমরা সকলেই কাজ করে যেতে পারি।

সংগ্রামের জন্য আমাদের উচ্চতর আদর্শ চাই। ডুবুরি মুক্তোর সন্ধানে প্রচেষ্টা করে। কৃপণ সোনা সঞ্চয় করতে ব্যাকুল। প্রেমিক প্রেয়সীর মুখের একটুকরো হাসির জন্য সংগ্রাম করে। সমগ্র মনটাই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ। আবার, যে চাষীর ফসল নষ্ট হয়েছে, তার সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান উক্তি। দু একবার ফসল নষ্ট হলেই ভদ্রলোক-চাষী চাষের আশা পরিত্যাগ করে, কিন্তু প্রকৃত চাষী তার ভাগ্যে অতীত ফসলের কথা না ভেবে চাষের সময় ঠিকই বীজ বপন করে। যতক্ষুদ্র কাজ হোক, এই আমাদের প্রেরণা হওয়া উচিত। আবার, বার বার অপরিশ্রান্ত পুনরাবৃত্তি। মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম। সাঁতারুর সামনে দৃশ্যের মধ্যে ডুবন্ত জাহাজ; পর্বতারোহীর সামনে দুর্লঙ্ঘ বরফের চূড়া; আমাদেরও তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজে পরিশ্রমের মধ্যে খাঁটি হতে হবে।

স্কটল্যাণ্ডের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন ক্ষুদ্র দোকানদারের মধ্য থেকে বিরাট ব্যবসায়ীদের উৎপত্তি, যাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও গুদামঘর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো। একই অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাডাম স্মিথের "জাতিসমূহের সম্পদ" (Wealth of Nations) রচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উচ্চ ও উন্নত কাজের পাঠশালা। "তোমার হাত যে কাজ খুঁজে পাবে, তোমার সব শক্তি দিয়ে তা করবে।"

আদর্শ জীবন

আদর্শগত জীবন মহৎ। মানুষ মরে যায়, কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে। বংশের পর বংশ চলে যায়, তাদের মৃত্যুতে আদর্শের সুতোয় গাঁথা বিষয়গুলি আরও শক্তিশালী হতে থাকে। কেউ যেন একথা না মনে করে, তার পরাজয়ের মধ্যেই সত্যের বিপর্যয় ঘটে। একটা জীবন গেলে কি যায় আসে? চিন্তাশীলদের মৃত্যুতে চিন্তা আরও শক্তিশালী হয়।

মানুষের ত্যাগের ধর্মে কালের সূচনা থেকে এইগুলি ছিল অস্পষ্ট ও গূঢ় রহস্যপূর্ণ উপলব্ধি। পরোক্ষ অর্থে সব বিশ্বাসই মানুষের বলি চায়। আমাদের কার কী, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর পিছনের অনন্ত আলো যতক্ষণ না দেখা যায়। এই জীবন তরীখানি ভেঙ্গে যাক, কখনও কখনও কি এর প্রয়োজন হয় না?

এটা প্রায়ই ঘটে, একজন মানুষ, প্রতিটি বিষয়, যা সে বিশ্বাস করেছে তার যোগফল মৃত্যুর মুহূর্তে প্রমাণিত হয়? মৃত্যু উৎসর্গ করে। মৃত্যু নৈর্ব্যক্তিকতা প্রদান করে। এ অকস্মাৎ অন্তের দৃষ্টি থেকে মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে রাখা সব ক্ষুদ্র স্নায়বিক উত্তেজনাকে প্রত্যাহার করে নেয়, সমকালীনদের আগে, তার ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও, নিজের মহিমায় প্রকাশিত হয়।

সর্বোচ্চ কাজ হয়, যদি কোন মানুষ অবসর নিতে পারে, এটা কখনও কখনও ঘটে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বিরাট পুরুষেরা সবসময় নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে যত্নবান হবেন, যখন ডাক এসে যাবে। কেবল একা স্বাধীনতার মধ্যে একটি শিশু, ছাত্র অথবা ভক্ত শিষ্যপ্রাপ্ত ধারণার রূপ দিতে পারে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম হলেই তা মাটিতে পোঁতা হয়। নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থেকেই বিকাশের দুর্বোধ্য পদ্ধতিগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা সবসময়ই চাই আমাদের চেয়ে বড় কিছুর জন্ম দিতে। কিন্তু এজন্য আমরা অবশ্যই ফলের আশা করব না। দিয়ে মরে যাওয়া, কাজ করে ফলের দিকে না তাকানো একটি উচ্চভাব এবং জাগতিক পরিবর্তনের রাস্তা খুলে দেয়।

আমাদের মধ্যে কতজন পারি মায়ের সমুদ্রে নিজেদের নিক্ষেপ করতে? নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা থেকে বিরত হতে কতজন পারি? কতজন পারে তালগাছের মত উচ্চতা থেকে নিজেদের নিক্ষেপ করতে? যাঁরা পারেন, যাঁদের সত্যে বিশ্বাস আছে, তাঁরা ভবিষ্যতের জনক, জগতের গুরু, কারণ তাঁদের মধ্য দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পূর্ণরূপে প্রবাহিত হন। একটি খ্রীশ্চান স্তোত্র বলে,—"আমি কিছুই হতে চাই না! শুধু তাঁর চরণতলে পড়ে থাকতে চাই, একটি ভাঙা, শূন্য তরণী, প্রভুরই উপযোগী! আমার শূন্যতা তিনি ভরে দেবেন, তাঁরই সেবায় আমি এগিয়ে চলি! ভাঙা, তাই তিনি আমার মধ্য দিয়ে খুশীমত প্রবাহিত হবেন! আমি কিছুই হতে চাই না, শুধু তাঁর চরণতলে পড়ে থাকতে চাই, এই ভাঙা শূন্য তরীখানি, তাঁরই উপযোগী!"

জীবনের গঠন

একথা প্রায়ই মনে হতে পারে, সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে গরিবকে যথার্থই নিজের স্থান পূরণ করার জন্য তার জীবন তাকে হাতুড়ি পিটিয়ে গঠন করেছে, এবং সুবিধা-ভোগী ধনীদের স্পষ্টত বাধা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ মঞ্জুর করা হয়েছে। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এই হাতুড়ির আঘাত একটি অভিজ্ঞতা ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাতে দারিদ্র্যের ক্রয় ক্ষমতা ধন-সম্পদের চেয়ে বেশি।

কর্ম, দারিদ্র্য ও অসহায়তা মজুত স্বভাবের জন্য মহান বিদ্যালয়। যে ব্যক্তি জীবনের কোন সময়ে প্রতিটি শব্দের পরিপূর্ণ গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন ও যা অন্যের হৃদয়ে ক্রিয়া করে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সমাজ-চেতনার পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সক্ষম। যাঁর একক আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, একমাত্র তিনিই অন্যের প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে যথার্থ সমতা রক্ষা করতে পারেন। এর পদ্ধতি ও আচরণগত প্রকাশের পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু একজন রাজার মর্যাদার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান। আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত, যেন যে কোন সময় আমরা কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারি। কাজের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে। যে সেবকের বা কর্মীর গৌরবকে ব্যর্থ ও বিফল করে দিতে চায়, সে নিজেরই নিম্ন পদস্থদের কাছ থেকে পরাজয় ডেকে আনে।

প্রভু এবং ভৃত্য, রাজা এবং প্রজা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ সৈনিক, একমাত্র বন্ধন, যা এদের একসূত্রে রাখতে পারে, তা এদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, প্রতি কথায়, প্রতি কাজে এবং উভয় পক্ষেরই নিখুঁত আচরণের আদর্শ পালন করার সহযোগিতাকে অবিরাম অবচেতন মনে স্বীকৃতি দানের মধ্যে। মনের চোখ দিয়ে যে ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীকে দেখে, সে সেনাপতির প্রাপ্য বশ্যতা স্বীকার কোনদিন ভুলবে না। এবং তিনিও একটি সমগ্রের অংশ হিসাবে ক্ষমতার অধিকারী এ বিষয়ে সচেতন থাকলে, তাঁর ব্যবহারে ভদ্র ও সহৃদয় হবেন। যখন অবাধ্য ব্যক্তিকে হঠাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মত প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ ঘটে, তখন দীর্ঘকালের ভদ্র অভ্যাস এবং এখনও যে দাবি ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে, তা আদর্শের নামেই করা হয়, যা ঐ দণ্ডাদেশকে ক্ষমতা দেয়, যাতে অন্যরাও ঐ অভ্যাস কার্যকরী করার জন্য ত্বরান্বিত হয়।

এরূপ কর্তৃত্ব রক্ষা করার জন্য কতখানি আত্ম-সংযম প্রয়োজন! কী জটিল অভিজ্ঞতা! আইন প্রয়োগকারীর মস্তিষ্কের কোষে কতদিন এই স্মৃতি জাগরূক থাকবে! এরূপ কর্তৃপক্ষই গভীর ও সহিষ্ণু। এটি বাস্তব, যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কেবল সেই মানুষ আদেশ রক্ষা করতে পারে, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যার মেজাজ নিজেরই অধীন নয়, শিশু, ভৃত্য ও প্রজারা তাকে অবজ্ঞা করে। আবার অপরকে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনার ক্ষমতা অভ্যাস করতে হলে, প্রথমেই আমাদের নিজেদের নিয়মশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এইভাবে, কর্তৃত্ব ও আনুগত্য একই ক্ষমতার দুটো পিঠ ছাড়া কিছু নয়। আমাদের শিক্ষা যত বেশি হবে, নির্দেশ পালনের ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে। গতকাল যে আদেশ পালন করে, আজ সে শাসন করে। আজ আমাদের আনুগত্যের মধ্যে থাকতে দাও, যাতে কাল আদেশ দিতে পারি। এই কয়েকটি শক্তিশালী মানবিক সংযোগের একান্ত তথ্যগুলির মধ্যে পড়ে।

একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় শিক্ষক হতে নয়, বরং শিক্ষায় অনুশীলিত হতে তিনি তাঁদের নিকট সুশিক্ষিত, যাদেরকে তাঁর সব দেখা ও শোনার অভিজ্ঞতা পাঠের মধ্যে পরিবেশন করেন। যাঁর চেতনার দরজা খোলা, মস্তিষ্ক জাগ্রত, কালাও নন অন্ধও নন, তাঁর প্রচুর দেখা কিংবা শোনার অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তিনি সর্বাধিক শিক্ষিত। অশিক্ষিত লোক, তার চোখের তলায় সবই অপরীক্ষিত অবস্থায় চলে যেতে দেয়। তার কাছে নিয়মবিধি স্বেচ্ছাচারী ও অর্থহীন যোয়াল। যে দীর্ঘ ইতিহাসের এটি আধ্যাত্মিক রহস্যের প্রতীক, প্রাচীন পুরুষ ও অধস্তন বংশধরদের যোগাযোগের সূত্র, তাতে একজন চাষী বা চৌকিদারের কতটুকু জ্ঞান? যিনি প্রচুর জানেন, তিনিই সর্বোত্তম শিক্ষিত, এমন কোন কথা নাই। বরং, সেই সুশিক্ষিত, যিনি অভিজ্ঞতাগুলি থেকে যা অর্জন করেন, তার সদ্ব্যবহারে সর্বাধিক প্রস্তুত। এইভাবে প্রতিটি মানসিক কাজ অন্যগুলির জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। প্রতিটি চিন্তা আরও চিন্তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। প্রকৃত মনঃসংযোগের প্রতি মুহূর্ত মনের ওপর এবং জগতেরও ওপর আমাদের কর্তৃত্বের ক্ষমতাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে।

তাহলে যিনি বিদ্বান, জীবন যাপনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন শিক্ষায়, আর যিনি একই শিক্ষায় নিজের উন্নতি ও বিলাসী আনন্দময় জীবনের জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টায় থাকেন, এই দুয়ের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য! একজন সরস্বতীর প্রিয় সন্তান, আর একজন তাঁর ভাড়াটে চাকর বড় জোর। আমাদের শাস্ত্রের আদেশগুলি থেকে এই বৈশিষ্ট্যই পরিবেশিত, ভালবাসার জন্য ভালবাসার শিক্ষা, জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অনুসরণ, ন্যায়পরায়ণতার জন্য ন্যায়ের শিক্ষা। নিষ্কলঙ্ক উদ্দেশ্য স্বার্থের ঊর্ধ্বে চলে যায়, স্বপ্ন-দর্শনকারীকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, স্বপ্নের পূজা বেদীর সামনে এই দৈব দুর্ঘটনা হতেও পারে,—প্রকৃত সাফল্য অর্জনের এই একমাত্র সম্ভাব্য অবস্থা। এই কারণেই আমরা সাধু মহাত্মাদের বংশধর হতে চাই, কোন বিজয়ী জাতির বংশধর হতে নয়। বিজয়ী তার ত্যাগের মূল্য পায়, সে ব্যয় করে, যা সে জয় করে। সাধু তাঁর শক্তি অগ্রবর্তীদের সঙ্গে যুক্ত করেন, যারা পরে আসবে, তাদের জন্য করে যান সঞ্চয়। যে দেশ এই শক্তির বীর সাধকদের জন্ম দিয়েছে, সে দেশ মহান! মা, তোমার পবিত্র চরণের ধূলি আমাদের কাছে কত পবিত্র!

জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা

ভারতে একটি নতুন সভ্যতা বিবর্ধিত হচ্ছে। নতুন ভাবাদর্শ ও নতুন প্রণালী ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। বিভিন্ন দিকে নতুন নতুন বিকাশের জন্য সে নিজেকে প্রসারিত করছে। এরূপ যুগের বড় বিপদ এই যে, নৈতিক স্থিতিশীলতার হানি হতে বাধ্য। কারণ, সব সময়ই সভ্যতার লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা নৈতিকগুণের প্রাধান্য অটুট রাখা। প্রচণ্ড পরিবর্তনে সময় পুরাতন বন্ধন ও সম্পর্কগুলিকে ভেঙে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়

নীতি ও সমাজকে ধ্বংস করে, ওপরের আবর্জনা অগ্রগামী হয়। আমাদের ধর্ম বা জাতীয় ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'সভ্যতা' (civilisation) এই শব্দটি সমানভাবে তুলনীয়। একটি জাতি তখনই বিবেচিত হয়, যখন তার পুরাতন মূল্যবোধের প্রমাণ দিতে পারে, চরিত্রকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ হিসাবে সব সময় গণ্য করে, যখন ভণ্ডদের তাদের উচিত মূল্যে ধরা হয়, এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ভালকে রূপ দিতে আর মন্দকে এড়িয়ে যেতে সবসময়ই প্রস্তুত থাকে।

কোন দেশের জনতা দাবি বা অহংকার করতে পারে না যে, তারা এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। এটি স্পষ্টত এক জাতি যার মধ্যে সফলতা আপেক্ষিক পরিমাপের। তবু, যদি জাতীয় ও সামাজিক প্রথাগুলির মূল্যায়নের জন্য পূর্ব বিচারে মানদণ্ড থাকে, তবে তা সম্পদ, শিল্প বা সুখের ভিত্তিতে নয় নৈতিক ভিত্তিতেই হওয়া উচিত, যার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হবে। কালজীর্ণ বিধি আমাদের দৌর্বল্যের ওপর যতখানি নির্ভর করে ততখানি করে আমাদের শক্তির ওপর। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন, "রান্নার হাঁড়ি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নয়।" প্রকৃত নৈতিক আদর্শ ইচ্ছা, শুদ্ধতা, চরিত্র ও ত্যাগের জ্বলন্ত আগুন। একটি জাতীয় সিদ্ধির হিসাব আমাদের করতেই হবে। তবু, কিছু জিনিস স্পষ্ট। দীর্ঘকাল যেসব দেশ ত্যাগের ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে,—দিয়েছে দারিদ্র্য, নীচের ধর্ম, আত্মকৃচ্ছ্রতা, সর্বজনীন সম্পত্তি ও ভ্রাতৃসুলভ প্রেমের ধন,—যখন দেখা যায় সেই সব দেশ হঠাৎ সব পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক অথবা এক সঙ্গে তিনটিরই শোষণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে—তখন আমরা তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই ও যার ওপর আমরা রায় দিতে বাধ্য হই।

প্রেরণা যখন বিরাট হয়, তখন মানুষের ইচ্ছার পক্ষে একটি গভীর ও খাঁটি মতবাদ যে হাতিয়ার হিসাবে যথেষ্ট নয়, এটা স্পষ্ট। তাছাড়া মতবাদের সত্য ও অসত্যের সঙ্গে আরও গভীরতর প্রশ্ন বিবেচনাযোগ্য, তা হোল মানুষের প্রকৃতি কতখানি তার সঙ্গে সংপৃক্ত, কতখানি তার প্রতি অবনত, কতখানি তার সঙ্গে অঙ্গীভূত। একটি জাতি যতক্ষণ সর্বতোভাবে তার ধর্মের সঙ্গে সিক্ত না হয়, সুযোগ এলেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে একে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবং এখানেই সভ্যতার পরাজয়। ইতিহাসের মর্যাদার ওপর এটি একটি অশুভ লক্ষণ।

যাই হোক, এখানে বিভিন্ন বিশ্বাসের বুদ্ধিগত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এসে পড়ে। স্পষ্টত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের একটি বিধি, আমাদের সমগ্র বোধশক্তির অকুণ্ঠ সমর্থনের ওপর যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, আমাদের সুন্দর গল্পের প্রতি কম বেশি যে বিশ্বাসপ্রবণতা থাকে, তা অপেক্ষা আরও ফলপ্রদভাবে সংযত ও অনুপ্রেরণা দেবে। এখানে আমরা ধর্মের গুরুত্ব দেখতে পাই, যার মর্যাদাহানি হয় না। এখানে আমরা আরও দেখতে পাই উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের ব্যর্থতার রহস্য। বিজ্ঞান তার যান্ত্রিক আবিষ্কারের জোরে খ্রীষ্টধর্মের লোকদের জন্য একটি নতুন জগৎ গড়ে দিয়েছে। যে খ্রীষ্টধর্ম একদিন জগতে মহান পথ-প্রদর্শক ও মহান শক্তি ছিল, সেই বিজ্ঞানই তাকে অবজ্ঞার সঙ্গে

প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং কোন খ্রীষ্টান তার ধর্ম ছাড়া, একজন সশস্ত্র দস্যু ছাড়া আর কি হতে পারে।

বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার পক্ষে খ্রীষ্টধর্ম যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। আধুনিক সভ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হিন্দুধর্ম কি যথেষ্ট শক্তিশালী? আমরা বলি, হ্যাঁ। হিন্দুধর্মের অভ্যাসগুলির পিছনে সর্বজনীন বেদান্ত-দর্শন বিরাট উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক পরিকল্পনার উদাহরণ ও গবেষণাস্থল। বেদান্তের মধ্য থেকেই, আবার হিমালয় পর্বতশ্রেণীর তুষারশুভ্র মুকুট গৌরী-শঙ্করের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ।

আমরা বিরাট এক ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আমাদের ছুঁড়ে দিতে উদ্যত। হিন্দুধর্মের নবতর বিকাশই ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতি। সমাজ, গোঁড়ামি ও নাগরিক জীবনের পরিবর্তে। নতুন পূজা ও সাড়ম্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কঠোরতার পরিবর্তে আমরা লড়ায়ের ময়দানে প্রস্তুত হচ্ছি সহযোগিতা ও আত্ম-সংগঠন শেখার জন্য। কিন্তু, এতে কি? এর দ্বারা কি সনাতন ধর্ম টলে উঠবে? না, আমরা কি বহুকাল আগে বলিনি, "একম্ সৎ বিপ্র বহুধা বদন্তি?" সব অস্তিত্বই এক, জ্ঞানীরা শুধু বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

যাঁকে একদিন আমরা গোপালরূপে পূজা করেছি, আজ তিনি এসেছেন মায়ের বেশে। নারায়ণরূপে যাঁর চরণে আমরা ফুল নিবেদন করি, আজ তার বদলে তিনি জীবন ও মৃত্যু নিবেদনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

এতে কি হয়, সন্ধ্যায় মন্দিরে ঘণ্টা না বাজিয়ে যদি আমরা ধ্বংসের হাত থেকে একটি শিল্পের পুনরুদ্ধার করি? কি ক্ষতি হয়, যদি আমরা পূজা-বেদীর বদলে কল-কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলি? কি ক্ষতি হয়, "ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস" না হয়ে যদি আমরা "মাতৃভূমির ক্রীতদাস হই?" যদি পূজার বদলে, যাদের নিদারুণ প্রয়োজন, তাদের আমরা সহনশীল সেবা, খাদ্য, শিক্ষা, জ্ঞান দিই, তাহলে কি ক্ষতি হয়? "সব অস্তিত্বই এক", অতএব সব পথই সেই এক অভিমুখে। প্রার্থনা করার মত যুদ্ধ করাও পূজা। শ্রমের কাজ গঙ্গাজলের মতই গ্রহণযোগ্য। অধ্যয়ন অনশন অপেক্ষা কঠোর সংযমের ব্যাপার ও মূল্যবান। পারস্পরিক সাহায্য যেকোন পূজার চেয়ে ভাল। কারণ, আন্তরিক মনোনিবেশই সেই এক, সেই একমাত্র লক্ষ্যকে দর্শনের একমাত্র উপায়।

হে মানুষ, তুমি যেই হও, জাতির এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তুমি এগিয়ে চলেছ, তোমার কাজের হাতিয়ারটিকে তুমি তোমার বুকে জড়িয়ে ধরো। শ্রমের কাজে মন এবং দেহ একসঙ্গে যুক্ত হোক, প্রতিটি মাংসপেশী হোক দৃঢ় সংবদ্ধ, প্রতিটি শক্তির উৎস হোক উত্তেজনায় কঠিন। তোমার সব দক্ষতা মিলিত হোক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে। যে কাজ তুমি হাতে নিয়েছ, তোমার দিবারাত্রির চিন্তা সেই কাজের ওপর পড়ে থাকুক। তোমার চরিত্র তোমার পথ-প্রদর্শক হোক, তোমার একটিই স্বপ্ন হোক কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপদান। তাহলে জ্ঞানের সময় আসবে। এবং নতুন যুগ

মাতৃভূমির সন্তানদের উপহার দিয়ে যাবে এমন এক জাতি, যার হাটে-মাঠে ছড়িয়ে পড়বে সাধু ও পবিত্র ব্যক্তিরা এবং নাগরিক ও জাতীয় জীবনে বীরপুরুষেরা।

"সময় পরিণত, পরিবর্তনের জন্য অধীর অপেক্ষমান ;
তবে তা আসুক : আমার ভয়ঙ্কর আতঙ্ক নাই,
যা মনুষ্যজাতির সহজ প্রবৃত্তিতে অভিহিত ;
আমি মনে করি না ঈশ্বরের জগৎ হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন
আমরা প্রাচীন লিপিগুলি ছিঁড়ে ফেলছি বলে।"

জে আর. লাওয়েল।

পূজার ফুল

যখন আমাদের হাতে কোন একটি পুরাতন বই, পুরাতন কোন ছবি, পুরাতন কোন যন্ত্র, এমনকি সাধারণ একটি তালা। পিতলের কোন কাজ অথবা এক টুকরো কোন নক্সার কাজ ধরা থাকে আমরা সাময়িক একটা মানসিক ভাবের মধ্যে কখনও কখনও চলে যাই। এটা অবসর সময়ের সরল মেজাজ, কিন্তু যে বস্তুটি হাতে ধরা থাকে, সেটি কারও সারা জীবনের লক্ষ্য। এই শ্রমের ওপর কারিগর তার সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছিল। তার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে তার সবটুকু ধর্ম নিহিত। সেই মুহূর্তের জন্য মানবতার অস্তিত্বের মধ্যে, যা আমরা মানুষের জীবন বলি, তাই তার ধর্মাচরণ।

এইভাবেই বড় জিনিসগুলি তৈরি হয়। মানুষ এইভাবেই তার অবদান রেখে যায়, কিন্তু অমনোযোগী দৃষ্টিতে সেগুলি হয়তো মূল্যের উপযুক্ত নয়। একটি বীণা অথবা বেহালা তৈরী করতে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির সযত্ন অনুসন্ধান, সতর্ক পরিপক্কতা, অবস্থার আন্তরিক অনুশীলন, প্রচুর সময়ের ব্যয় ইত্যাদি সব কিছুরই প্রয়োজন বাদ্যযন্ত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য। কিন্তু, এইগুলি আর সব স্বতন্ত্র মানুষের মত পেয়েও কিছু লোকের স্বর ইতিহাসে বেঁচে থাকে। প্রায়ই এসব ঘটেছে, একটি মূর্তি নির্মাণের ভাস্কর্য বা একটি পাণ্ডুলিপি চিত্রোজ্জ্বল করার জন্য শিল্পীর বহু বছরের শ্রম লেগেছে। এইসব বস্তুকে আমরা রাজা মহারাজাদের সম্পদ ও মধ্যযুগীয় বলে থাকি। একথা বলা যায়, এগুলি ইউরোপীয় মধ্যযুগের সমকালীন যুগগুলিতেই প্রস্তুত। কিন্তু ভারতে মধ্যযুগ এই সেদিন পর্যন্তও ছিল। এখনও আমরা এই মধ্যযুগের পরিচয় পাই নিম্ন শ্রেণীর রাস্তায়, বাজারে ও রেললাইন থেকে দূরে গ্রামের মধ্যে। সমগ্রভাবে ভারত একটি মধ্যযুগীয় দেশ। তার যুগ পরিবর্তনের যুক্তিস্বরূপ প্রমাণ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে।

তাহলে মধ্যযুগে তার এই সৌন্দর্য ও নৈপুণ্যের যাদু সৃষ্টির কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল? কিছুক্ষণ এই বিষয়ে পরীক্ষা করা উপযুক্ত হবে। প্রথমে, এদের জীবন খুব সরল ছিল। যে ঘরে কাজ করতো, সেই ঘরেই বাস করা, খাওয়া, ঘুমানো সব কিছু।

তার আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য উদ্দেশ্য দ্বারা সে পরিবেষ্টিত ছিল না। কাজে মন ঢেলে দেওয়াই ছিল তার একমাত্র ইচ্ছা। বড় জোর, অলঙ্কার বলতে তার থাকতো ঠাকুর দেবতার ছবি এবং তার নিজের কাজের কিছু নমুনা। এইভাবে নিখুঁত কাজের বাসনাই তার পুষ্টিসাধন করেছে। আমরা প্রায়ই অনুভব করি না একজন বড় শিল্পী সম্পূর্ণ সরল পরিবেশের নিকট কতখানি ঋণী থাকে। যে কোন বাজারে যে কোনদিন এই ধরনের সরলতা আমরা কিছুটা দেখতে পাব। একজন দোকানদার দোকানেই থাকে ও তার মালপত্রের মাঝখানে বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যর্থনা জানায়। মধ্যযুগীয় লোকদের পড়ার ঘর, গবেষণাগার, থাকার ঘর, সব একটাই।

এই ব্যাপারে উল্লেখ করার মত আর একটি বিষয়, শিল্পী-কারিগরদের চাহিদার স্বল্পতাও কতকাংশে, দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য হেতু ধনী হওয়ার জন্য তাদের ব্যস্ততা ছিল না। এ জন্য তারা প্রচুর সময় ব্যয় করতে পারতো। তার প্রস্তুত করা শিল্প বহুলাংশে তার একমাত্র পুরস্কার। সে ছাড়া, তার একটি নির্দিষ্ট বক্র রেখা বা নির্দিষ্ট রঙ পছন্দ করার কারণ, আর কেউ জানতো না। নিজের শিল্প কর্ম দেখে তার মনে যে স্বস্তি, যে সন্তোষ ও সাফল্যের বোধ জেগে উঠতো, তা আর কেউ বুঝতো না। তার নিজের কাজ থেকে যে আনন্দ সে আহরণ করে নিত, সে কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করার কল্পনা বা আশা তার কোনদিনই ছিল না। কাজের জন্যই কাজটি করা হোত।

একটি কাজের উদ্দেশ্যের চেয়ে শক্তিশালী ও স্পষ্ট বক্তব্য আর হয় না। অর্থ অথবা যশের আকাঙ্ক্ষা শিল্পের প্রকৃত মহত্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অকৃত্রিম কর্মী কখনো প্রচার কামনা করে না। ভাল কাজ করেই সে সন্তুষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সেই গল্পের কৃষক বার বার তার কাজে ফিরে যায়, হতাশার কারণ যাই হোক। সব শক্তি দিয়ে সে চেষ্টা করে, তার নিজের পদ্মফুলটি ফোটাতে। মৌমাছির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

সে তার নিজের অভিব্যক্তির আনন্দের জন্যই কাজ করে, ও সব ভালবাসার মধ্যেই তার কাজের আনন্দ। জগতের মহত্তম অনেক জিনিস হয়েছে এই সুখী ও সরল আত্মা থেকে, যারা খেলনা নিয়ে শিশুর খেলা করার মত কাজের খেলায় আনন্দিত। গীর্জা, মন্দির, ছবি, মূর্তি, শহর ও রাজাগুলি গঠনকারীদের নিজেদের বিষয়-বোধের সহজ রূপায়ণ খেলনা নিয়ে খেলা করার মত, পাখি যেমন সূর্যালোকে গান গায়। আধুনিক সংগঠন অনেক কিছু উল্টে দিয়েছে, যা প্রাচীন সংগঠনগুলি পরিশ্রম করে উদ্ভাবন করেছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এ জীবনকে করেছে জটিল, আমাদের প্রয়োজন দিয়েছে বাড়িয়ে। আমাদের বহু প্রলোভনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যা প্রাচীন যুগের নির্জনতায় আমরা খুব কমই জানতাম। অপ্রয়োজনীয় বস্তু সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন আকাঙ্ক্ষা আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, এবং আমরা বুঝতে পারছি না, এর বিনিময়ে অনেক বেশি মূল্যবান আমাদের কাজের অবিচল নিষ্ঠার শক্তি হারাতে বসেছি। দেওয়ালের ছবি, সোফা, চেয়ার, গোলটেবিল, বিলাসীতার পরিবেশ ও

অসীম ক্লান্তিদায়ক পারিবারিক একঘেয়েমি ইত্যাদির মূল্যে আমাদের মর্যাদাপূর্ণ সরলতার জন্মগত অধিকার ও হৃদয় মনের গভীরতা বিক্রী করে দিয়েছি।

আবার ফিরে যাওয়া অনাড়ম্বর জীবনে এবং সারল্যের উন্নত ব্যবহার! আবার সেই অনাবৃত অঙ্গন, যেখানে ছিল সৌন্দর্য, ছিল গভীর চিন্তা অর্থাৎ সংস্কৃতি! আবার অনাবৃত গৃহতলে বিছানো মাদুর এবং সেই সব মহিমান্বিত চিন্তা! এসো আমরা জীবিকাসর্বস্ব জীবন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করি। এসো, শুধু জীবনের বিকাশের জন্য আমরা সব মন ঢেলে দিই। চাকরীর জন্য বিশৃঙ্খল ঠেলাঠেলি এবং জীবিকার জন্য সংগ্রামের যুগে শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধ জন্মাননি। তালগাছের তলায় কুঁড়েঘর যথেষ্ট সন্তোষজনক, কিন্তু সেদিন দুর্ভাগ্যজনক, যেদিন জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সিংহ-শিশুদের ভারতীয় মায়েরা আর জন্ম দেবে না, ভারতীয় গৃহগুলি আর তাদের প্রতিপালন করবে না।

সন্ন্যাসীর জীবন যেরকম, শিল্পী কারিগরও তার কাজের প্রতি এবং আমরা প্রত্যেকেই হাতের কাজের প্রতি সেইরকমই হব। আমাদের একটি চোখ বিষয়টির ওপর নিবদ্ধ থাকবে, তার ফলের দিকে নয়। নিজেদের আমরা সরল রাখব, বাইরের কোন সাহায্যের ওপর নির্ভর করে নয়, বুকের মধ্যেকার সেই কণ্ঠস্বরে কান রেখে, যা আত্ম-অভিব্যক্তির দিশারী। প্রতি ছত্রে আমরা অনুসন্ধান করব বিচিত্র এবং মুক্তির অংশরূপ, মুক্তিই যার শেষ লক্ষ্য। যখন মুক্তির পর মুক্তি জমা হবে, ঈশ্বর জানেন, সেই পূর্ণত্বলাভ আমাদের কি না।

অনন্ত করুণালাভের পূর্বে বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল পাঁচশো বার। আমরা কি কাজের সময় জীবনের প্রতি বিরক্ত হব, যখন আমাদের দৃষ্টি কোন পূর্ণাঙ্গরূপের প্রতীক থেকে আনন্দ উপভোগ করবে? নিজেদের পূজার ফুলরূপে যে ভক্তি আমরা ঈশ্বরের পদতলে অকৃপণভাবে দিয়েছি, আমরা কি তার হিসাব করব? অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বে সত্যের দর্শনে সব রাস্তা শেষ হয়। তাহলে, এসো, সাহসী হৃদয় নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই, চলতে গিয়ে যেন মূর্ছিত না হয়ে পড়ি। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি, তা সাধনের উপায়কে আমরা লক্ষ্য বলে ধরে নেব। আদর্শের স্বার্থেই আদর্শের পেছনে আমাদের অনুসরণ বাধাবন্ধহীন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ডাক আসে, সব ছেলেখেলা ফেলে দিয়ে আত্মার রাজ্যে প্রবেশের ডাক, যে ডাক আমরা শুনতে পাব।

দায়িত্ব

ভারতে আধুনিক শহরগুলির উদ্ভব এই সূচনা করে যে, আমরা আমাদের অবিভক্ত পারিবারিক সংগঠনগুলিকে পিছনে ফেলে দিচ্ছি, যা এককালে বৃহত্তম ধারণযোগ্য সামাজিক ইউনিট হিসাবে গঠিত হয়েছিল এবং এখনও বৃহত্তর অনেক বেশী স্বাধীন সামাজিক সংযুক্তির মধ্যে প্রবেশ করছে। গঠনযোগ্য ব্যাপকতম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শহর অন্যতম। নাগরিকদের নিয়েই জাতিগঠন, এবং বৈপরীত্যে

শহরগুলি জাতীয়তার বিদ্যালয়। জাতীয় অঙ্গে শহরকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জটিলতম বৈশিষ্ট্য বলতে হয়।

একটি নির্দিষ্ট অণুতে সবকটি পরমাণুর অস্তিত্ব। একটি অপরিহার্য সত্তা। প্রতিটি পরমাণু ও তার ভগ্নাংশ এবং অবশিষ্টের প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক সমগ্রের পক্ষে অভিন্ন। আজ আমরা কি আমাদের শহরগুলি সম্পর্কে এই কথা বলতে পারি? যদি তা না হয়, তবে বুঝতে হবে সেগুলি স্থায়ী ভিত্তিতে সংগঠিত নয়। মধ্যযুগের কাশী, লক্ষ্ণৌতে অতি ক্ষুদ্রতম অংশ ও পরম্পরায় শহরের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কাঞ্চীভরম এবং দক্ষিণ ভারতের আরও অনেক বাজার-শহরের পক্ষে এখনও এই কথা সত্য। আমাদের আধুনিক শহর কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সম্পর্কে কি এই কথা সত্য? যদি তা না হয়, তবে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে সাময়িক প্রমাণিত হয়ে পরিণামে একদিন বিদায় নিতে হবে। যান্ত্রিক জটিলতা ও সাংগঠনিক জটিলতার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আঙ্গিকের দিক থেকে যে সব বিষয় বা হেতু নাগরিক জটিল প্রথার বিষয় বা হেতু নয়, সেগুলি টিকে থাকতে পারে না। এবং কোন নির্দিষ্ট পরমাণুর সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা কি? আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যে পরীক্ষার উপায় মেনে নিতেন, তা ধর্ম। যারা এই মত সমর্থন করে, জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা শহরে আছে, জাতির মধ্যে আছে; যারা তা ধ্বংস ও অবনত করে, তাদের চলে যেতে হবে। তাহলে আমাদের সুসঙ্গতির পরীক্ষা নীতির, চরিত্রের, আচরণের ও ন্যায়পরায়ণাতার। এ সেই বিশেষ ধরনের চরিত্র, যা বৃহৎ সামাজিক সংযুক্তিকে সম্ভব করে তোলে।

তাহলে, এই লক্ষণযুক্ত চরিত্রের আলোচনা মূল্যবান হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকে যদি স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাব। কেউ ভাল আচার-আচরণের ওপর গুরুত্ব দেবে। কোন সন্দেহ নাই, এগুলির খুব প্রয়োজন, এবং আমরা যখন কেবলমাত্র আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে ছিলাম, তখনকার অপেক্ষা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের এই শহরের পরিধির মধ্যে আমাদের আচরণের মানদণ্ড অনেক বেশি নিভুল ও কঠোর হওয়া উচিত। জন-জীবনে শিষ্টাচার একটি বিরাট মসৃণ ব্যাপার। নমনীয় সামাজিক ভাবাবেগগুলি শিষ্টাচারকে আন্তরিক ও স্বাভাবিক করে তোলে, যা মানবতার মূল্যবান উপহারগুলির মধ্যে অন্যতম। শিষ্টাচার বাড়ীতেও অভ্যাস করা যেতে পারে। কেউ তার মা, স্ত্রী বা ভায়ের প্রতি আত্মীয়তার নৈকট্যের দাবিতে বর্বরের মত ব্যবহার করতে পারে না। কেউ তার নিকটতম ও প্রিয়তমদের প্রতি ধৃষ্ট হয়ে, নিজের সর্বোত্তম সত্তা কম পরিচিত লোকদের জন্য সঞ্চিত করে রাখতে পারে কি?

আর একজন লক্ষ্য করবে, সময়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন। নাগরিক চক্রে এইগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনীয়। এগুলি সবই ধর্ম, কারণ, আত্ম-সংযম অন্যের মঙ্গলের জন্য।

অপরের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য হওয়া শিখতে হবে। দায়িত্ব মানুষের ওপর ঈশ্বরের পরীক্ষা। আমরা আমাদের দায়িত্বের সমান যোগ্য হব। যে দায়িত্ব গ্রহণ করে শেষতম অংশ পর্যন্ত আমরা প্রতিপালন করি না, অসম্পূর্ণ ত্যাগের মতো, তা অপদার্থতার চেয়েও খারাপ, সুনির্দিষ্টরূপে ধ্বংসাত্মক। কর্তব্য সম্পাদন, কি সামাজিক, কি নাগরিক, আমাদের অনুভূতি থেকে, আবেগযুক্ত প্রেরণা থেকে, আমাদের মেজাজ থেকে, এমনকি কিছুর পর্যন্ত, আমাদের স্বাস্থ্য থেকে ভিন্নরূপ হলে চলবে না। "আমি দায়িত্বশীল" নিজেদের মধ্যে এই উচ্চারণ আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও কঠিনতম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।

দয়া, কোমলতা, ক্ষমার কোন কারণ নাই,—যাকে দয়া অথবা নমনীয়তা দেখানো হয়, তার প্রয়োজন এমন গুরুতর নয় যে, এর সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত হতে পারে। এবং অনুরূপভাবে, সব সামাজিক উদ্দেশ্যের প্রগাঢ়তা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থপরতা নয়, অথবা ভালবাসা, যশ ও ক্ষমতা, এগুলির মধ্যে যে কোনটি তীব্র হোক না কেন। সব উদ্দেশ্যের সর্বাধিক গভীরতা এই চিন্তার মধ্যে "আমার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত : এই কর্তব্য অথবা এই প্রয়োজন আমারই ওপর নির্ভর করে।" এই সেই চিন্তা, যার শক্তিতে একজন প্রহরী কর্তব্যে থেকে মৃত্যুবরণ করে, একজন অগ্নিনির্বাপক চূড়ান্ত বিপদে ঝাঁপ দেয়, এই চিন্তাই নিষ্ক্রিয় শক্তিকে জাগ্রত করে, নিস্তেজ ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং এই ধর্ম।

উদাহরণ হিসাবে যদি বলা যায়, সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেরণা থেকে কি লাভ হয়, তাহলে আমরা পশ্চিমের দিকে ফিরে তাকাতে রাজি আছি। ভাবাদর্শ উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রণী হলেও, সমাজ সংগঠনে এর প্রতিফলন ইউরোপে আরও ভালভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি আরও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। প্রকৃত চিন্তা ও জ্ঞান আচরণের ভুলত্রুটি সংশোধনে সক্ষম। সামাজিক প্রশ্নে আমরা রক্ষণশীলতা অথবা সংস্কার কোনটারই দাবি তুলছি না। আমরা শুধু যথার্থ বোধগম্যতার কথাই বলতে চাই। আমরা এও মনে করি, যেমন কোন একটির দিকে দ্রুত ধাবিত হবে, তা প্রকৃত বোধগম্যতার পক্ষে সহায়ক হবে না, বরং নিরপেক্ষ ও শান্ত মনের প্রয়োজন।

এবার আমাদের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তুলনা করা যাক। দেখা যাক, যদি সম্ভব হয়, এই বিবেচনা থেকে আমাদের যেন না অধিক কিছু অর্জন করতে হয়।

ধর্মের ক্ষেত্রেও ভারতীয় পূজা একজন পুরোহিতের ব্যাপার, যে ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আচার-অনুষ্ঠানে গায়ক, পরিবেশক, যাজক ও অন্যান্য সবাই মিলে একটা বিরাট সহযোগিতার ব্যাপার। সন্ন্যাস-জীবনে প্রাচ্যের সন্ন্যাসী একজন স্বাধীন ভ্রমণকারী, এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গুরুর নিকট থেকে সংগৃহীত আদর্শের প্রচারের জন্য। তিনি একজন বিরাট অথবা মহত্তম স্বতন্ত্র আলোকের

অংশ। কিন্তু কোন ঘন-সংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে তাঁর নিয়মের প্রশ্ন নাই, যেখানে আনুগত্য অথবা সময়নিষ্ঠা, আদেশ এবং কাজের অভ্যাসগুলি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিমে এই সন্ন্যাস জীবনের গঠন সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে এমনভাবে অঙ্গীভূত যে, কতকগুলি কথা প্রচলিত ভাষার অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত ও সমাজের সকলেই তা বুঝতে সক্ষম। যেমন,—মঠাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টীয় ক্ষুদ্র মঠ, নবদীক্ষিত, মঠের ভোজনকক্ষ, মঠ বা আশ্রমের নির্জন স্থান, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বিরাট ধর্মীয় নির্দেশের ফল। অধিকন্তু সিস্টার সিয়ানরা এখন কৃষির কাজ করছে, ডমিনিকান ও জেসুইটরা দিচ্ছে শিক্ষা, ফ্রান্সিস্‌কানরা নৈতিক ও ধর্মীয় প্রচারকের কাজ করছে,—এক রকমের মধ্যযুগীয় মুক্তিবাহিনী, যারা হাসপাতাল, রেডক্রশ ও অন্যান্য দাতব্য সমিতির মত আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তারাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলির বনিয়াদ গড়ে দিয়েছে।

ভারতেও আমোদের মঠ আছে। ইউরোপীয়দের মঠের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কি? এদের প্রণালী, সংগঠন, পরিষ্কার দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বিভাগ। একজন প্রধান। তাঁর অধীনে একজন ও তারও অধীনে আর একজন। একজন শিক্ষানবীশদের শিক্ষা দেন ও আর একজন অতিথিদের দেখাশোনা করেন। এক ছাদের তলায় বাস করে অনেকে, কিন্তু কেউ কাউকে ডিঙিয়ে যায় না। দিনের মধ্যে একটি ঘণ্টাও পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছাড়া চলে না। সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সুসংবদ্ধ, সাংগঠনিক ও উর্ধ্বতনের প্রতি আছে আনুগত্যের এমন একটি মাত্রা, যা প্রত্যেক সদস্য মেনে চলতে বাধ্য ও যা শক্র রাজ্যজয়ী সৈন্যবাহিনীও পেতে পারে না।

বহু শতাব্দীর প্রচেষ্টায় এই সব উন্নয়নের পূর্ণতা দিয়েছে বিষয় চিন্তার উপাদান, চরিত্র ও আচরণের ধারণা, যার ফলে আজকের বিরাট বিরাট সব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠতে পেরেছে। সমাজ প্রকৃত একটাই, এবং তার প্রতি অংশের পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা সমগ্র অংশেরই জ্ঞান-লাভের সহায়ক।

প্রতিটি মানসিক উপলব্ধির পিছনে, ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত, যাই হোক না কেন, সব সময়ই মজবুত অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে থাকে। কি সেই অভিজ্ঞতার বনিয়াদ, যা ইউরোপীয় জাতিগুলির রক্তে ও শিরায় শিরায় এত নির্দিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মপ্রেরণার উৎস প্রবাহিত করতে পেরেছিল? সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন তাদের সমুদ্র অভিযানের ফলেই গড়ে উঠেছিল এই বনিয়াদ। ইউরোপবাসীরা উপকূলবর্তী অধিবাসী। তাদের সাংগঠনিক ধারণা সরবরাহ করেছে জাহাজের নাবিকেরা, তাদের প্রলোভনের চরিত্র, শুধু তাই নয়, তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পাপ—জলদস্যুতা। জাহাজের নাবিকদলে পরিবারের প্রায় সকলেই থাকে, বাপ ক্যাপ্টেন, বড় ছেলে প্রথম সহকারী, মেজ ছেলে দ্বিতীয় সহকারী, বাকি ছোট ছেলেরা ও ভাইপোরা সব কার্যরত নাবিক—এই ভাবে তারা একটি জটিল কাজের ইউনিটে রূপান্তরিত হয়; সামাজিক যন্ত্র বিশেষ যে ঐক্য ও নিয়মশৃঙ্খলা প্রবল বাতাসের আঘাতের মুখে জীবন অথবা মৃত্যুর কঠিন পরীক্ষা।

ভারতে এবং সাধারণভাবে প্রাচ্যে যে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠেছে, এবং যার দ্বারা সহযোগিতার শক্তি বৃহদাংশে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা হলো ধানের ক্ষেত। একজন কর্তার নেতৃত্বে এখানে পরিবারের সকলেই সমান তালে সহযোগিতা করে। তারা একসঙ্গে বীজ বপন করে, চারা রোপন করে, ফসল কাটে, এবং অন্য সবার ওপরে একজনের অধিকতর সক্ষমতার প্রভাব বিস্তারের মত কিছু ঘটে না। চারা রোপনের কাজে নতুন কোন উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য কারও বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেকের শ্রম কম বেশি বাকি সকলের সঙ্গে প্রায় সমান। কৃষিক্ষেত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূলত গ্রামের বিভিন্ন জাতি, সঙ্ঘ ও পরিবারের অধিকারে। ভারত প্রধানত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তার রাজা মহারাজা ও অভিজাতরা তার নিজস্ব নয়, এজন্য ভারতের অভিজ্ঞতালব্ধ স্থায়িত্ব ও সংহতিকে ধন্যবাদ, তা না হলে যে, কোনরূপ সংবদ্ধ সংগঠন হলে ভেঙে পড়তো। একটিমাত্র বিষয়ে ভারত ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না, সেটা তার সমাজ-সংগঠনের জটিলতা।

বেনারস মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে কোন শহরেরর মতই সুন্দর। এর সঙ্গে তুলনা করার মত ইউরোপের দুটি একটির বেশি রত্ন নাই। তবু, কেউ যদি একটি ইউরোপীয় ক্যাডিড্রাল গীর্জা দেখে থাকে, যৌগিক ঐক্যের অর্থ বুঝতে পারবে। পাশ্চাত্যের ক্যাথিড্রাল গীর্জা শুধু অট্টালিকাই নয়। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মত পাথর ও কাঠের খোদাই ; চিত্রিত দেওয়াল, কাঁচ ও ক্যানভাস ; সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র : প্রাচীন ধাতুর কাজ, কাপড়ের নক্সা, পাঠাগার এবং আরও পঞ্চাশ রকম শিল্প-নৈপুণ্যের একটি একটি অমূল্য সম্পদবিশেষ। বহু লেখকের উল্লেখ অনুসারে এগুলি একটি মাত্র লক্ষ্যে আবদ্ধ বহু বৃত্তির সংশ্লেষণ, একই ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি সর্বজনীন পরিকল্পনার মিলিত উপলব্ধি। ইউরোপীয় ক্যাথিড্রালগুলি জনসাধারণের নিজস্ব ঐক্য ও স্বাধীনতার হঠাৎ উপলব্ধির ফল। সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিদায় ও মধ্য যুগের বড় বড় স্বাধীন নগরগুলির উদ্ভবের যুগে। তাদের হঠাৎ জাগরণ।

জাহাজের নাবিকদের যৌগিক ঐক্যের ফলে এভাবে ক্যাথিড্রালের উৎপত্তি ও নির্মাণ থেকে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যিক সাফল্যের পরিণাম। যারা বড় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজের নিজের দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করে, তারা অন্য যে কোন কাজে নিজেদের অজ্ঞাতে অর্জিত বিরাট শক্তিকে কাজে লাগায়।

আমাদেরও বড় বড় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যাপারেও হতে হবে বিশ্বস্ত। একটি চাকা অথবা স্ক্রু ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু পুরো মেসিনটা এর ওপর নির্ভর করে চলতে পারে। আমাদের কথা হোক আমাদের প্রতিশ্রুতি। যে হাত আমরা ধরেছি, আর কেউ ধরলো না বলে যেন কখনও ব্যর্থ না হয়। তাহলেই প্রত্যেকটি কাজ নতুন শক্তির বীজ বপনের ক্ষেত্র হবে। প্রতিটি লাভ পরিণত হবে জাতির সুরক্ষিত দুর্গে।

নৈতিকতার মধ্যে জগৎ-চেতনা

ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক বিচার করতে গেলে আমরা কেউই স্বতন্ত্র ব্যক্তি নই, বরং আমাদের পশ্চাতে বিরাট সমাজদেহের হাত, পা ও চেতনা-বিশিষ্ট যান্ত্রিক গঠন ছাড়া কিছু নই। এই বিষয়ে আমরা খুবই কম এবং কদাচিৎ চিন্তা করি। তবু, বর্তমান সময়ে কতকগুলি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে মানুষ তার আদিমতম বিকাশের সময় "আমরা", এই চিন্তায় অভ্যস্ত ছিল, চিন্তার জগতে "আমি" এসেছে আরও পরে। এই বিবরণ যতটা আত্ম-বিরোধী মনে হয়, ঠিক ততটা নয়। যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন, যদি একটা ব্যাঙের মস্তিষ্ক অপসারিত করা হয় ও পায়ের পিছনের উপর এক ফোঁটা অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়, তবে পায়ের পাতা দ্রুত সরে যাবে ও গোটা পা-টাই প্রবল আক্ষেপে সঙ্কুচিত হবে। একে বলা হয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এটি চেতনার প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঘটে যাচ্ছে। এই ভাবে, আমাদের অনেক সামাজিক আচরণ, বোধ করি আমাদের চরিত্রের অংশ হিসাবে, অনিচ্ছাকৃত প্রতিফলন।

উদাহরণ হিসাবে কল্পনা কর, আমাদের পারিবারিক সম্মান অপমানজনক অবজ্ঞায় আহত হোল, আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই কি সমানভাবে প্রতিরোধ স্পৃহা অনুভব করে না ? এই প্রতিশোধের স্পৃহাকে পরিবারের পুরুষেরা চেষ্টা করে কাজের আকারে রূপ দিতে আর নারীরা দেয় অভিশাপ। প্রতিশোধ স্পৃহা কি পূর্ব-পরিকল্পিত অথবা সহজাত ? আমরা ইউরোপীয় মনীষীর বক্তব্য থেকে কিছু কি দেখতে পাই না ? এটা কি সত্য নয় যে, পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা এখনও "আমি" নয়, "আমরা", এই চিন্তায় অভ্যস্থ ? এবং মানবতার ক্রমবিবর্ধনের ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই না, আলোচ্য যুগের আগে এই জিনিস আরও অনেক বেশী পরিমাণে ছিল ? যে যুগে ব্যক্তিগত সুবিধার অবকাশ অনেক কম, মানুষ পরবর্তী যুগারম্ভের চেয়ে নিজের পরিবার, জাতি অথবা গোষ্ঠীর প্রতি অনেক বেশি সাচ্চা হতে পারে ? এমনকি, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যখন বাস্তবে তার জ্ঞাতি এবং ভাইদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে অনেকখানি ? তাহলে, দেখা যাচ্ছে প্রতিটি সামাজিক অবস্থা, প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিজের প্রতিবর্তী চেতনা, নিজের বিধি, নিজের আদর্শ সঙ্গে নিয়ে চলেছে। এক বিবাহের পক্ষে যতখানি নৈতিক যুক্তি আছে, বহুবিবাহের স্বপক্ষেও ততখানি যুক্তিই আছে। প্রাচ্যদেশীয়দের মত ইউরোপীয় মহিলাদেরও কবি আছে। সীতার সঙ্গে আদর্শগতভাবে অনেক পার্থক্য থাকলেও জোয়ান অব্ আর্কও একজন সাধ্বী মহিলা ছিলেন।

প্রতিবিম্ব চেতনার সবটুকু ধরলে, এইসব বিধি ও আদর্শকে আদর্শ আচরণের সঙ্গে যুক্ত করলে, আমরা যে সিদ্ধান্তে আসি, তাকে আমরা নৈতিকতা আখ্যা দিতে পারি। নৈতিকতা ব্যক্তির মাধ্যমে মূলত মানবতারই সামগ্রিক অভিব্যক্তি। তার অর্থ, নৈতিকতা সব যুগে সমান অর্থ বহন করে না। বুদ্ধিগত জ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিকতা আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল হয়ে পড়ে। এমন এক সময় ছিল, যখন গোষ্ঠী ও পরিবারের নীতি পুরোপুরি সন্তোষজনক ছিল ; যখন নীতির দোহাই দিয়ে একশ্রেণীর লোক অপর গোষ্ঠী ও তাদের দেবতাদেরও ধ্বংস করে ফেলতো ! বাস্তবিক-

পক্ষে, আজ যখন আমরা আমাদের দিকে তাকাই, আমরা ক্ষমা পেলেও পেতে পারি যে, এখনও সে যুগ সবটাই চলে যায়নি।

ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে হিন্দুরা কোনদিন গোষ্ঠী-নীতি ও গোষ্ঠী-আদর্শ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। আমরা মনে করি, সেদিন যথার্থত যে গ্রানিট পাথরের ভাগ্য নির্মিত হয়েছিল, তা আমার জগৎকে পথ দেখাতে পারবে। বেদান্তের মত একটি দর্শন, অদ্বৈতবাদের মত একটি আদর্শ আজিকের দিক থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা না হলে কোনদিনই এগুলি রূপায়িত হতে পারতো না। এ দেশে এমনও দিন আসবে, যখন তরুণরা জগতের সব দুরূহ জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য ব্রতী হবে, তাদের মূল লক্ষ্য হবে কি উপায়ে সম্প্রদায়গত সংগঠন ও জাতীয় অগ্রগতির মধ্যে এইসব বিষয়ের সম্পর্ক-সূত্র খুঁজে বের করা যায়। এমন হতে পারে, জাতি-প্রথা তার ইঙ্গিতপূর্ণ ধারণাসহ ভুল, আদর্শ ও সামাজিক প্রথার সংশ্লেষণের সঙ্গে বুদ্ধিগত অন্তর্ভুক্তির পক্ষে একটি শক্ত বনিয়াদ ছিল, যা এখনও জগতে ভারতের উপহার হতে পারে। অথবা, এই রহস্যের সন্ধান অন্যত্র পাওয়া যেতে পারে। যেভাবে হোক, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের যোগ্য বংশধর বলে প্রমাণ করতে চাই, তাহলে, তাদের মত গোষ্ঠী-নীতি প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতকে এখন একটি তুচ্ছ বিষয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চিরকাল এটা থাকবে না, বড় হোক আর ছোটই হোক, কেউ প্রকৃত চিন্তার হিসাব করতে পারে না, যেহেতু জগৎ মনের দ্বারা শাসিত, বস্তুর দ্বারা নয়।

আমাদের যোগী ঋষিরা ধ্যানের এমন এক স্তরের কথা বলেন, যে স্তরে আমাদের নিখিল সৃষ্টি-চেতনার উন্নততর বিকাশ ঘটে ও আমরা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলে আমাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। ধ্যানের এই অভিজ্ঞতার নিম্নস্তরে আমরা আমাদের নিজেদের ও সন্তানদের এমন ভাবে শিক্ষিত করে তুলব, যা নিশ্চিতরূপে আমাদের এই জগৎ-চেতনার উপযোগী হবে। এই চেতনার মাধ্যমে আমরা সকল মানুষের যন্ত্রণা ও আশার অংশীদার হওয়ার মত ক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে পারব। কঙ্গোর নিগ্রোদের, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রীদের, চীনের কুলিদের, কোরিয়া, তিব্বত, মিশর ও পোলাণ্ড, সবারই বেদনাদায়ক ঘটনাবলী ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আমাদের দুঃখের কারণ। এগুলি অনুভব করার মত শক্তি আমাদের অর্জন করতে দাও, তারপর, হতে পারে ক্ষমতা পেলে, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা একটি নীতির জন্ম দেব।

এরূপ কতকগুলি পথের সাহায্যে নীতির প্রতিটি অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথম, শিক্ষাপ্রাপ্ত সহানুভূতি, দ্বিতীয়, অনুশীলিত বুদ্ধি এবং তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ নৈতিক আবেগ, যার পরিণতি নতুন এক নিয়ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যেও যা ইতিপূর্বেকার মানবতার ঊর্ধ্বে স্থাপিত নৈতিক আদর্শকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে দেবে তুষার ঢাকা পর্বত-শিখরের মহিমা সত্বেও। অর্থাৎ সব নতুন সামাজিক বিকাশ, নতুন সহানুভূতি, নতুন ভাবাবেগের অভিজ্ঞতা থেকে জেগে উঠবে, আর জন্ম দেবে নতুন উচ্চতর আদর্শের এবং এগুলির মাধ্যমে হবে নিয়ম-কানুনের সংস্কার অর্থাৎ নবীকরণ। একটি প্রথার বদলে আর একটি প্রথা, কেবল এর দ্বারা সমাজের উন্নতি বা সংশোধন হয় না।

স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে বহু বিতর্কিত প্রশ্নটির ক্ষেত্রেও এরূপ চিন্তা আমাদের মধ্যে আসে। ভারতীয় মহিলারা নিজেদের জন্য যা করা দরকার, মনে হতে পারে তা করতে তারা পেরেছে। চল্লিশ বছর আগে বলা হয়েছিল তাদের মাতৃভাষায় পড়া এবং লেখা শেখার কথা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছিল এই প্রচেষ্টা। সহজ প্রক্রিয়াগুলি সংস্কৃতিগত পদ্ধতির প্রথম প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, শহরের ছাপাখানা থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য সস্তা ডাক ব্যবস্থার সাহায্যে। বাইরের সামান্য কিছু শুভাকাঙ্খী ছাড়া ভারতীয় মহিলাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করেছিল। আজ মাতৃভাষায় শিক্ষা অনেকখানি অঙ্গীভূত হয়েছে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে প্রতিটি ছোট মেয়ে মাতৃভাষা শুধু পড়া নয়, লেখাও শেখার আশা করে। এই পরিমাণ জ্ঞান মহিলাদের অন্দরমহলে অর্জন করা সম্ভব, যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালয় গৃহে পরিণত হয়। বাংলায় অন্ততপক্ষে আর..সি. দত্তের (রমেশচন্দ্র দত্ত) ঐতিহাসিক আখ্যান ও কিছু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস গোঁড়া সব মহিলারাও পড়েছেন এবং যথেষ্ট পত্রিকা, এমনকি সচিত্র পত্রিকাও প্রচুর আছে।

কিন্তু আজ মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছি। এক্ষেত্রে বুকের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক কর্তব্য-গুলির মধ্যে শিক্ষা নৈতিকতার দিক থেকে সর্বোচ্চ। এবং ঠিকমত পরিচালিত না হলে এ সহজেই ক্ষতিজনক হবে। তাছাড়া, এর পরিচালনা, অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে উদ্দেশ্যগত একটি ব্যাপার।

আমাদের ভগিনী ও কন্যাদের জন্য শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তারা কি ইউরোপীয় রুচির চাকচিক্যময় পোশাকের আড়ম্বরে সজ্জিত হয়ে বিয়ের বাজারে ভাল স্থান পাওয়ার জন্য বেরুতে চায়? যদি তা হয়, জীবনের কঠোর ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য যে শিক্ষা আমরা দিতে চাই, তার মূল্য কমে যায়। প্রকৃত পক্ষে, এটা সুযোগ-সুবিধার বিস্তৃতিমাত্র, স্বাধিকার দেওয়া নয়; বরং, বোধহয় এই শিক্ষা না পেয়ে তারা আগে ভালই ছিল। অথবা, আমরা তাদের শিক্ষা দিতে চাই এই আশায় যে, আমরা নিজেরা তাদের বিয়ে করব, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ভবিষ্যৎ বিপদের দিনে আমাদের বাঁচাবে বলে? এটা নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক, যদি কোন স্ত্রী বিনা সাহায্যে শিশুর জ্বর হলে তার শরীরের তাপ নিতে পারে। যদি এর চেয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে অনুভব করি যে, আমরা আমাদের সমান সমান বুদ্ধির সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই, প্রাত্যহিক কর্মসূচীর রুটিনে বাঁধা পায়ে চালানো কলের মত অথবা জেলের কয়েদীর মত কারও সঙ্গে নয়,—তবুও আমরা ক্ষুধা উদ্রেককারী খাদ্যের জন্য চেঁচানো কেবল আস্বাদনকারী মানুষ ছাড়া কিছু নয়। এখনও আমরা প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক নই।

একমাত্র ভিত্তি, যার ওপর মহিলারা দাবি করতে পারে অথবা পুরুষ তা অর্জনে সাহায্য করতে পারে, শিক্ষার নামে যে কোন যোগ্য বিষয়; উভয়ের মধ্যে সাধারণ মানবতার সম্পর্ক, যা একজনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অন্যের সম্মান ও দায়িত্ব গড়ে তুলবে

এবং শেষ অবধি একটা নীল কিংবা সবুজ পোশাকের মতই যৌনতার সব প্রশ্ন গৌণ ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, মানবতা প্রথমত হৃদয় ও মন এবং কেবল দ্বিতীয় চেতনা হিসাবেই দেহ। "যা কিছু ন্যায়, যা কিছু শুদ্ধ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য, এগুলির ওপর চিন্তা কর,"—একটি মূল বিষয় যার পূর্ণতা সাধনের জন্য পুরুষদের চেয়ে নারীরা প্রায়ই চীৎকার করছে।

পুরুষের মত নারীরাও যদি মানুষের অস্তিত্ব হয়, তাহলে তার সম্ভাব্য বিকাশের পূর্ণতার জন্য পুরুষের মতই সমান অধিকার আছে। যদি আমরা পৌরুষকে গুরুত্ব দিতে ইতস্তত করি, তাহলে নারীত্বের ক্ষেত্রেও একই ইতস্তত ভাব আসবে। যদি প্রাপ্ত সকল উপায়ে আমরা একজনকে উন্নত করতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই চাইব সমান উন্নত করতে আর একজনকে। নারীর উন্নতি একটি পবিত্র লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এবং এই কাজ মহিলাদের স্বার্থে, এবং কোনভাবেই কেবলমাত্র পুরুষের সুখে-থাকা ও ভাল-থাকার সহায়ক হিসাবে নয়।

পরিশিষ্ট

[ভূমিকা—এস্. কে. র‍্যাট্‌ক্লিফ্., প্রথম সংস্করণ, ১৯১৫]

জীবনের প্রথম দিকের অধ্যায় থেকে ভগিনী নিবেদিতা ছাত্র সমাজের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর কর্মক্ষেত্র বাংলায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যে কোন গোষ্ঠীর ডাকেই তিনি সাড়া দিতেন, তাদের মধ্যে প্রকৃত সন্ধানী আছে, এ বিষয়টি তাঁর সন্তোষজনক মনে হলে তাঁর প্রভাব দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল, সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিল প্রকাশ্য ভাষণগুলি ও তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও উপদেশগুলিও। যখন ১৯০৪ সালে "The web of Indian life" প্রকাশিত হয় তখন তরুণ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল উৎসাহ জেগেছে। ভগিনী নিবেদিতা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও অনুরক্ত আধ্যাত্মিক নেতাদের একজন ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য ও রচনার জন্য প্রতিটি দিক থেকেই দাবি ছিল। তাঁর ওপর অন্যান্য যে সব বিষয়ের দাবি খুব জোর ছিল, তার মধ্যে পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদি পরিবেশনের অনুরোধ তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ও সাময়িকভাবে লিখেছিলেনও প্রচুর। তিনি কলকাতার মডার্ন রিভিউর মত পত্রিকার শিক্ষা-বিষয়ক সাংবাদিকতাকে আন্তরিক উৎসাহ দিয়েছেন, পত্রিকাটি এখনকার মত মিঃ রামানন্দ চ্যাটার্জী পরিচালনা করতেন তখনও। এই প্রশংসনীয় মাসিক পত্রিকাটিতে তাঁর অধিকাংশ রচনা পরবর্তীকালে একত্রিত রচনাসমূহের বই "Studies from an Eastern Home" ও বাস্তবে সবগুলি রচনা "Foot-falls of Indian History" বইতে প্রকাশিত। এই সঙ্গে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় মাসে মাসে সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি লিখতেন, ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ও ছোট ছোট প্রবন্ধ প্রধানত অগ্রগামী জাতীয় আন্দোলনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বক্তব্যের ওপর রচিত। বর্তমান খণ্ডটি ঐসব অংশ থেকে সংকলিত।

প্রথম থেকেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তখন যেভাবে বোঝা গিয়েছিল ও যেভাবে তার প্রচার চলেছিল, তার সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার

চেয়ে স্পষ্টতর কেউ দেখেননি। ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তাবাদের ধারণা ও লক্ষ্য সম্পর্কে এর হ্রস্বতা ও তুচ্ছতার ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে তর্ক জুড়েছিল এই বলে যে, এটা পূর্বের ওপর পশ্চিমের কাজের ফলে উৎপন্ন আরও একটি বিশৃঙ্খলার প্রকাশ। এই বিভ্রান্তিকে অস্বীকার করা যায়নি. কিন্তু ভারতীয় মন ও চরিত্রের যোগ্যতায় ভগিনী নিবেদিতা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে অবস্থান্তরের লক্ষণীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল গতি, যা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা আধুনিক বিদেশী সভ্যতার দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে পেরেছিল। পরবর্তী পদক্ষেপগুলি বেশি নয়, বরং কম, কঠিন যেহেতু সেগুলিকে সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে সেগুলি ভারত নিজেই গ্রহণ করবে। তাঁর ধারণায় পশ্চিমের অবদানকে আত্মস্থ করার ভারতীয় চেতনায় ক্ষমতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এবং, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সাংগঠনিক আদর্শের বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি এই পথ দেখেছিলেন। ভারতের পক্ষে এর অর্থ হতে পারে ধর্মের জাগরণ। অন্য কথায়, পুরাতন বিশ্বাস ও অভ্যাসগুলিকে আধুনিক শর্তে পুনরায় ব্যাখ্যা করা, আদর্শের জন্য ত্যাগের ও পূজার নতুন ধারণা, সমাজ-সেবায় সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ, নাগরিক চেতনার পুনরুদ্ধার, এবং ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণতর বোধগম্যতার মধ্যে এর পুনঃ প্রতিষ্ঠা ; কাজের উন্নত মহিমা, নির্দিষ্ট চরিত্র ও জ্ঞানের ভিত্তিতে, যার মধ্যে নিহিত ভবিষ্যতের কর্তৃত্ব।

রচনাগুলির এই সব বিষয়বস্তু। লেখিকার স্মৃতির প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও রচনাগুলিকে যথার্থরূপে বোঝার জন্য, তৎকালীন পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই এগুলি পড়তে হবে,—ভারতে তাঁর শ্রমপূর্ণ ও জনাকীর্ণ কর্মময় জীবনের কিরূপ অসম্ভব দ্রুততা ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এগুলি রচিত হয়েছিল। পাঠক মন্তব্য করতে ভুল করবেন না যে, ভারত ও তার আত্মার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের পূর্ণতার চিত্র-হিসাবে, তাঁর রচনায় অবিরাম উল্লেখ, "আমরা" এবং "আমাদের" এই শব্দগুলি।

কোন কোন পাঠক হয়ত বিস্মিত হবেন, শিরোনামায় ইংরাজী এবং সংস্কৃত শব্দের ব্যাবহারের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশে, যা বাস্তবে অভিন্ন অর্থেই যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হিন্দুর নিকট ধর্ম একটি শব্দ, যার বৃহত্তর ও জটিল গুরুত্ব আছে, আমাদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত রিলিজিয়ন শব্দটি অপেক্ষা নিয়ম, আচরণ ও উপাসনার সমগ্র সামাজিক ধারণা এর অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম একটি শক্তি অথবা আদর্শ, যা একসূত্রে গ্রথিত করে ঐতিহ্যগত চিন্তা এবং সাধারণ প্রথার বিশ্বাসের মিলন, আনুগত্য এবং বোধগম্যতা, যা সমাজের সাংগঠনিক অথবা ধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টি করে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, "এই সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা এবং আন্তরিকতাই ধর্ম—বিষয় ও মানুষের স্বকীয়তা। তিনি শব্দটিকে জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা বা যথার্থতা এই অর্থে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন এবং এটিকে মোটামুটি বোধ হয় ইংরাজীতে একটি সমতুল আখ্যার কাছাকাছি পেতে আশা করতে পারি।

আমেরিকার বার অ্যাসোসিয়েশনে ১৯১৩ সালে ভাইকাউন্ট হ্যালডেন এই বিষয় সম্পর্কিত উচ্চতর জাতীয়বাদের আদর্শের ওপর কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি

বলেছেন, বৃহত্তর অর্থে নিয়ম বা আইন রাষ্ট্রের উপস্থাপিত শাসন-রীতির চেয়ে বেশি কিছু অর্থ প্রকাশ করে; বিবেকের আনুগত্য ও সমাজের সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। নাগরিকদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আচরণের প্রশ্ন একদিকে কিছুটা আইনের দ্বারা অপর দিকে বিবেকের অনুশাসনের দ্বারা আবৃত। "আরও ব্যাপক পরিচালন পদ্ধতি আছে, যা আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা চরিত্র এবং আইনের অনুমোদন থেকে পৃথক।" লর্ড হ্যাল্‌ডেন বলতে থাকেন:

"ইংরাজী ভাষায় এর জন্য আমাদের নামকরণ করতে হবে এবং দুর্ভাগ্যজনক যে, একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যসূচক নামের অভাব চিন্তা এবং অভিব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। জার্মান লেখকরা এইভাবে পদ্ধতিটিকে নির্দিষ্ট করেছেন, যার উল্লেখে আমি নাম দিয়েছি Sittlichkeit······Sittlichkeit একটি অভ্যস্ত প্রথাগত আচরণ, আইনগত না হয়ে বরং নীতিগত, যা নাগরিকের সব বাধ্যবাধকতাকে আলিঙ্গন করে, অর্থাৎ "খারাপ ধরন" অথবা "যথাযথ নয়" তাকে অশ্রদ্ধা করে।

জার্মানীতে Sitte-এর অর্থ প্রথা, এবং Sittichkeit অর্থ আরোপ করে প্রথা ও মন ও কর্মের অভ্যাস, বলা যাক্, সামাজিক নৈতিকতা ও সামাজিক অনুমোদনের মিশ্রণ জনসাধারণের পরস্পরের প্রতি ও যে সমাজে তারা বাস করে, সেই সমাজের প্রতি আচরণের নীতিকে সংগঠিত রূপদান করছে।

এরূপ আচরণ ও যে নিয়ন্ত্রণ এ আরোপ করে এগুলি ছাড়া সহনযোগ্য-সমাজ জীবন হতে পারে না, এবং বাধামুক্ত প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না। প্রতিদিনের জীবন ও আচরণে কি করা হবে, কি হবে না এটি সহজাত চেতনা এবং স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এবং বাধ্যবাধকতার এই সহজাত চেতনাই সমাজের প্রধান ভিত্তি। এর বাস্তবতা বিষয়গত আকৃতি গ্রহণ করে ও পরিবারিক জীবনে এবং আমাদের অন্যান্য নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জাহির করে নিজেকে। এটি কোন নির্দিষ্ট আকৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়, নতুন নতুন আকারে এবং পুরাতন আকারের পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্যে নিজেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক সম্প্রদায় রাজনৈতিক কাঠামোর চেয়েও বেশি। সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং যার দ্বারা ব্যক্তিজীবন প্রভাবিত—যেমন পরিবার, স্কুল, গীর্জা, আইনসভা ও প্রশাসন বিভাগ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির কোনটিই অবশিষ্টগুলি থেকে আলাদা হয়ে বাঁচতে পারে না, তারা একত্রে ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি একটিই সাংগঠনিক সমগ্রতা গঠন করে, যে সামগ্রিক রূপ জাতি হিসাবে পরিচিত।

নাগরিক জীবনের বিরাট অংশ সম্পর্কিত এই উন্মোচিত ব্যাখ্যার প্রতিটি শব্দ হয়ত গ্রহণ করতেন ভগিনী নিবেদিতা। এবং তিনি হয়ত সত্য সত্যই যোগ করতেন যে 'ধর্ম' সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর সন্তোষজনক একটি শব্দ মানুষের আচরণের ও সমাজের জীবন্ত আদর্শের পক্ষে,—ধর্ম সম্পর্কে ভারতীয়ের অসীম সমৃদ্ধিশালী ও গভীর ধারনার পরিমাপ, লর্ড হ্যাল্‌ডেন যাদের কাছ থেকে তাঁর কথাগুলি ধার করেছেন, তাদের ধারণা থেকে অনেক বেশি।

পরিশিষ্ট

মূল ইংরাজীভাষায় রচিত
স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ

OUR MASTER AND HIS MESSAGE

IN the four volumes of the works of the Swami Vivekananda which are to compose the present edition, we have what is not only a gospel to the world at large, but also, to its own children, the Charter of the Hindu Faith. What Hinduism needed, amidst the general disintegration of the modern era, was a rock where she could lie at anchor, an authoritative utterance in which she might recognise herself. And this was given to her, in these words and writings of the Swami Vivekananda.

For the first time in history, as has been said elsewhere, Hinduism itself forms here the subject of generalisation of a Hindu mind of the highest order. For ages to come, the Hindu man who would verify, the Hindu mother who would teach her children, what was the faith of their ancestors, will turn to the pages of these books for assurance and light. Long after the English language has disappeared from India, the gift that has here been made, through that language, to the world, will remain and bear its fruit in East and West alike. What Hinduism had needed, was the organising and consolidating of its own idea. What the world had needed was a faith that had no fear of truth. Both these are found here. Nor could any greater proof have been given of the eternal vigour of Sanatan Dharma, of the fact that India is as great in the present as ever in the past, than this rise of the individual who, at the critical moment, gathers up and voices the communal consciousness.

That India should have found her own need satisfied only in carrying to the humanity outside her borders the bread of life is what might have been forseen. Nor did it happen on this occasion for the first time. It was once before in sending out to the sister lands the message of a nation-making faith that India learnt as a whole to understand the greatness of her own thought—a self-unification that gave birth to modern Hinduism itself. Never may we allow it to be forgotten that on Indian soil first was heard the command from a Teacher to His disciples, "Go ye out into all the world, and preach the Gsopel to every creature !" It is the same thought, the same impulse of love, taking to itself a new shape, that is uttered by the lips of the Swami Vivekananda, when to a great gathering in the West he says : "If one religion be true,

then all the others also must be true. Thus the Hindu faith is yours as much as mine." And again, in amplification of the same idea: "We Hindus do not merely tolerate, we unite ourselves with every religion, praying in the mosque of the Mohammedan, worshipping before the fire of the Zoroastrian, and kneeling to the cross of the Christian. We know that all religions alike, from the lowest fetishism to the highest absolutism, are but so many attemps of the human soul to grasp and realise the Infinite. So we gather all these flowers, and, binding them together with the cord of love, make them into a wonderful bouquet of worship." To the heart of this speaker, none was foreigner or alien. For him, there existed only Humaaity and Truth.

Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of "the religious ideas of the Hindus," but when he ended, Hinduism had been created. The moment was ripe with this potentiality. The vast audience that faced him represented exclusively the occidental mind, but included some development of all that in this was most distinctive. Every nation in Europe has poured in its human contribution upon America, and notably upon Chicago, where the Parliament was held. Much of the best, as well as some of the worst, of modern effort and struggle, is at all times to be met with, within the frontiers of that Western Civic Queen, whose feet are upon the shores of Lake Michigan, as she sits and broods. with the light of the North in her eyes. There is very little in the modern consciousness, very little inherited form the past of Europe, that does not hold some outpost in the city of Chicago. And while the teeming life and eager interests of that centre may seem to some of us for the present largely a chaos, yet they are undoubtedly making for the revealing of some noble and slow-wrought ideal of human unity, when the days of their ripening shall be fully accomplished.

Such was the psychological area, such the sea of mind, young, tumultuous, overflowing with its own energy and self-assurance, yet inquisitive and alert withal, which confronted Vivekananda when he rose to speak. Behind him, on the contrary, lay an ocean, calm with long ages of spiritual development. Behind him lay a world that dated itself from the Vedas, and remembered itself in the Upanishads, a world to which Buddhism was almost modern; a world that was filled with religious systems of faiths and creeds; a

quiet land, steeped in the sunlight of the tropics, the dust of whose roads had been trodden by the feet of the saints for ages upon ages. Behind him, in short, lay India, with her thousands of years of national development, in which she had sounded many things proved many things, and realised almost all, save only her own perfect unanimity, from end to end l of her great expanse of time and space, as to certain fundamenta and essential truths, held by all her people in common.

These, then, were the two mind-floods, two immense rivers of thought as it were, Eastern and modern, of which the yellow-clad wandered on the platform of the Parliament of Religions formed for a moment the point of confluence. The formulation of the Common Bases of Hinduism was the inevitable result of the shock of their contact, in a personality, so impersonal. For it was no experience of his own that rose to the lips of the Swami Vivekananda there. He did not even take advantage of the occasion to tell the story of his Master. Instead of either of these, it was the religious consciousness of India that spoke through him, the message of his whole people, as determined by their whole past. And as he spoke, in the youth and noonday of the West, a nation, sleeping in the shadows of the darkened half of earth, on the far side of the Pacific waited in spirit for the words that would be borne on the dawn tha was travelling towards them, to reveal to them the secret of their own greatness and strength.

Others stood beside the Swami Vivekananda, on the same platform as he, as apostles of particular creeds and churches. But it was his glory that he came to preach a religion to which each of these was, in his own words, "Only a travelling, a coming up, of different men and women, through various conditions and circumstances to the same goal." He stood there, as he declared, to tell of One who had said of them all, not that one or another was true, in this or that respect, or for this or that reason, but that "All these are threaded upon Me, as pearls upon a string. Wherever thou seest extraordinary holiness and extraordinary power, raising and purifying humanity, know thou that I am there". To the Hindu, says Vivekananda, "Man is not travelling from error to truth, but climbing up from truth to truth, from truth that is lower to truth that is higher". This, and the teaching of Mukti—the doctrine that "Man is to become divine by realising the divine," that religion is perfected

in us only when it has led us to "Him who is the one life in a universe of death, Him who is the constant basis of an everchanging world, that One who is the only soul, of which all souls are but delusive manifestations"—may be taken as the two great outstanding truths which, authenticated by the longest and most complex experience in human history, India proclaimed through him to the modern world of the West.

For India herself, the short address forms, as has been said, a brief Charter of Enfranchisement. Hinduism in its wholeness the speaker bases on the Vedas, but he spiritualises our conception of the word, even while he utters it. To him, all that is true is Veda. "By the Vedas," he says, "no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times." Incidentally, he discloses his conception of the Sanatan Dharma. "From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the lowest ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists, and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion". To his mind, there could be no sect, no school, no sincere religious experience of the Indian people—however like an aberration it might seem to the individual—that might rightly be excluded from the embrace of Hinduism. And of this Indian Mother-Church, according to him, the distinctive doctrine is that of the Ishta Devata, the right of each soul to choose its own path, and to seek God in its own way. No army, then, carries the banner of so wide an Empire as that of Hinduism, thus defined. For as her spiritual goal is the finding of God, even so is her spiritual rule the perfect freedom of every soul to be itself.

Yet would not this inclusion of all, this freedom of each, be the glory of Hinduism that it is, were it not for her supreme call, of sweetest promise: "Hear, ye children of immortal bliss! Even ye that dwell in higher spheres! For I have found that Ancient One who is beyond all darkness, all delusion. And knowing Him, ye also shall be saved from death". Here is the word for the sake of which all the rest exists and has existed. Here is the crowning realisation, into which all others are resolvable. When, in his lecture on "The Work before Us," the Swami adjures all to aid him in the

building of a temple wherein every worshipper in the land can worship, a temple whose shrine shall contain only the word Om, there are some of us who catch in the utterance the glimpse of a still greater temple—India herself, the Motherland, as she already exists—and see the paths, not of the Indian churches alone, but of all Humanity, converging there, at the foot of that sacred place wherein is set the symbol that is no symbol, the name that is beyond all sound. It is to this, and not away from it, that all the paths of all the worships, and all the religious systems lead. India is at one with the most puritan faiths of the world in her declaration that progress is from seen to unseen, from the many to the One, from the low to the high, from the form to the formless, and never in the reverse direction. She differs only in having a world of sympathy and promise for every sincere conviction, wherever and whatever it may be, as constituting a step in the great ascent.

The Swami Vivekananda would have been less than he was, had anything in this Evangel of Hinduism been his own. Like the Krishna of the Gita, like Buddha, like Shankaracharya, like every great teacher that Indian thought has known, his sentences are laden with quotations from the Vedas and Upanishads. He stands merely as the Revealer, the Interpreter to India of the treasures that she herself possesses in herself. The truths he preaches would have been as true, had he never been born. Nay more, they would have been equally authentic. The difference would have lain in their difficulty of access, in their want of modern clearness and incisiveness of statement, and in their loss of mutual coherence and unity. Had he not lived, texts that today will carry the bread of life to thousands might have remained the obscure disputes of scholars. He taught with authority, and not as one of the Pundits. For he himself had plunged to the depths of the realisation which he preached, and he came back, like Ramanuja, only to tell its secrets to the pariah, the outcast and the foreigner.

And yet this statement that his teaching holds nothing new, is not absolutely true. It must never be forgotten that it was the Swami Vivekananda who, while proclaiming the sovereignty of the Adwaita Philosophy, as including that experience in which all is one without a second, also added to Hinduism the doctrine that Dwaita, Vishishtadwaita, and Adwaita are but three phases or stages in a

single development, of which the last-named constitutes the goal. This is part and parcel of the still greater and more simple doctrine that the many and the One are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes ; or as Sri Ramakrishna expressed the same thing : "God is both with form and without form. And He is that which includes both form and formlessness."

It is this which adds its crowning significance to our Master's life, for here he becomes the meeting-point, not only of East and West, but also of past and future. If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid.

This is the realisation which makes Vivekananda the great preacher of Karma, not as divorced from, but as expressing Jnanam and Bhakti. To him, the workshop, the study, the farmyard and the field, are as true and fit scenes for the meeting of God with man as the cell of the monk or the door of the temple. To him, there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality. All his words, from one point of view, read as a commentary upon this central conviction. "Art, Science, Religion," he said once, "are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Adwaita."

The formative influence that went to the determining of his vision may perhaps be regarded as threefold. There was, first, his literacy education, in Sanskrit and English. The contrast between the two worlds thus opened to him carried with it a strong impression of that particular experience which formed theme of the Indian sacred books. It was evident that this, if true at all, had not been stumbled upon by Indian sages, as by some others, in a kind of accident. Rather was it the subject-matter of a science, the object of a logical analysis that shrank from no sacrifice which the pursuit of truth demanded.

In his Master, Ramakrishna Paramahamsa, living and teaching in the temple-garden at Dakshineshwar, the Swami Vivekananda—

"Noren" as he then was—found that verification of the ancient texts which his heart and his reason had demanded. Here was the reality which the books only brokenly described. Here was one to whom Samadhi was a constant mode of knowledge. Every hour saw the swing of the maid from the many to the One. Every moment heard the utterance of wisdom gathered superconsciously. Every one about him caught the vision of the divine. Upon the disciple came the desire for supreme knowledge "as if it had been a fever". Yet he who was thus the living embodiment of the books was so unconsciously, for he had read none of them! In his Guru, Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda found the key to life.

Even now, however, the preparation for his own task was not complete. He had yet to wander throughout the length and breadth of India, from the Himalayas to Cape Comorin, mixing with saints and scholars and simple souls alike, learning from all, teaching to all, and living with all, seeing India as she was and is, and so grasping in its comprehensiveness that vast whole, of which his Master's life and personality had been a brief and intense epitome.

These, then—the Shastras, the Guru, and the mother-land—are the three notes that mingle themselves to form the music of the works of Vivekananda. These are the treasure which it is his to offer, These furnish him with the ingredients whereof he compounds the world's heal-all of his spiritual bounty. These are the three lights burning within that single lamp which India by his hand lighted and set up, for the guidance of her own children and of the world in the few years of work between September 19, 1893, and July 4, 1902. And some of us there are, who, for the sake of that lighting, and of this record that he has left behind him, bless the land that bore him, and the hands of those who sent him forth, and believe that not even yet has it been given to us to understand the vastness and significance of the message that he spoke.

THE NATIONAL SIGNIFICANCE OF THE SWAMI VIVEKANANDA'S LIFE AND WORK

Of the bodily presence of him who was known to the world as Vivekananda, all that remains today is a bowl ashes. The light that has burned in seclusion during the last five years by our riverside, has gone out now. The great voice that rang out across the nations is hushed in death.

Life had come often to this mighty soul as storm and pain. But the end was peace. Silently, at the close of even song, on a dark night of Kali, came the benedication of death. The weary and tortured body was laid down gently and the triumphant spirit was restored to the eternal Samadhi.

He passed, when the laurels of his first achievements were yet green. He passed, when new and greater calls were ringing in his ears. Quietely, in the beautiful home of his illness, the intervening years with some few breaks, went by amongst plants and animals, unostentatiously training the disciples who gathered round him, silently ignoring the great fame that had shone upon his name. Man-making was his own stern brief summary of the work that was worth doing. And labriously, unflaggingly, day after day, he set himself to man-making, playing the part of Guru, of father, even of schoolmaster, by turns. The very afternoon of the day he left us, had he not spent three hours in giving a Sanskrit lesson on the Vedas ?

External success and leadership were nothing to such a man. During his years in the West, he made rich and powerful friends, who would gladly have retained him in their midst. But for him, the Occident, with all its luxuries had no charms. To him, the garb of a beggar, the lanes of Calcutta, and the disabilities of his own people, were more dear than all the glory of the foreigner, and detaining hands had to loose their hold of one who passed ever onward toward the East.

What was it that the West heard in him, leading so many to hail and cherish his name as that of one of the great relegious teachers of the world ? He made no personal claim. He told no personal story. One whom he knew and trusted long had never heard that he held any position of distinction amongst his Gurubhais. He

made no attempt to popularise with strangers any single form or creed, whether of God or Guru. Rather, through him the mighty torrent of Hinduism poured forth its cooling waters upon the intellectual and spiritual worlds, fresh from its secret sources in Himalayan snows. A witness to the vast religious culture of Indian homes and holy men he could never cease to be. Yet he quoted nothing but the Upanishads. He taught nothing but the Vedanta. And men trembled, for they heard the voice for the first time of the religious teacher who feared not Truth.

Do we not all know the song that the tells of Shiva as he passes along the roadside, "Some say He is mad. Some say He is the Devil. Some say—don't you know ?—He is the Lord Himself !" Even so India is famillar with the thought that every great personality is the meeting-place and reconciliation of opposing ideals. To his disciples, Vivekananda will ever remain the archetype of the Sannyasin. Burning renunciation was chief of all the inspirations that spoke to us through him. "Let me die a true Sannyasin as my Master did," he exclaimed once, passionately, "heedless of money, of women, and of fame ! And of these the most insidious is the love of fame !" Yet the self-same destiny that filled him with this burning thirst of intense Vairagyam embodied in him also the ideal householder,—full of the yearning to protect and save, eager to learn and teach the use of materials, reaching out towards the recoganisation and re-ordering of life. In this respect, indeed, he belonged to the race of Benedict and Bernard, of Robert de Citcaux and Layola. It may be said that just as in Francis of Assisi, the yellow robe of the Indian Sannyasin gleams for a moment in the history of the Catholic Church, so in Vivekananda, the great saint, abbots of Western monasticism are born anew in the East.

Similarly, he was at once a sublime expression of superconscious religion and one of the greatest patriots ever born. He lived at a moment of national disintegration, and he was fearless of the new. He lived when men were abandoning their inheritance, and he was an ardent worshipper of the old. In him the national destiny fulfilled itself, that a new wave of consciousness should be inaugurated always in the leaders of the Faith. In such a man

it may be that we possees the whole Veda of the future. We must remember, however, that the moment has not come for gauging the religous significance of Vivekananda. Religion is living seed, and his sowing is but over. The time of his harvest is not yet.

But death actually gives the Patriot to his country. When the master has passed away from the midst of his disciples, when the murmurs of his critics are all hushed at the burning-ghat, then the great voice that spoke of Freedom rings out unchallenged and whole nations answer as one man. Here was a mind that had unique opportunities of observing the people of many countries intimately. East and West he had seen and been received by the high and low alike. His brilliant intellect had never failed to gauge what it saw, "America will solve the problems of the Sudra, but through what awful turmoil !" he said many times. On a second visit, however, he felt tempted to change his mind, seeing the greed of wealth and the lust of oppression in the West, and comparing these with the calm dignity and ethical stability of the old Asiatic solutions formulated by China many centuries ago. His great acumen was yoked to a marvellous humanity. Never had we dreamt of such a gospel of hope for the Negro as that with which he rounded on an American gentleman who spoke of the African races with contempt. And when, in the Southern States he was occasionally taken for "a coloured man", and turned away from some door as such (a mistake that was always atoned for as soon as discovered by the lavish hospitality of the most responsible families of the place), he was never known to deny the imputation. "Would it not have been refusing my brother ?" he said simply when he was asked the reason of this silence.

To him each race had its own greatness, and shone in the light of that central quality. There was no Europe without the Turk, no Egypt without the development of the people of the soil. England had grasped the secret of obedience with self-respect. To speak of any patriotism in the same breath with Japan's was sacrilege.

What then was the prophecy that Vivekananda left to his own people ? With what national significance has he filled that Gerrua mantle that he dropped behind him in his passing ? Is it for us perhaps to lift the yellow rags upon our flagpole, and carry them forward as our banner ?

Assuredly. For here was a man who never dreamt of failure. Here was a man who spoke of naught but strength. Supremely free from sentimentality, supremely defiant of all authority (are not missionary slanders still ringing in our ears ? Are not some of them to be accepted with fresh accessions of pride ?), he refused to meet any foreigner save as the master. "The Swami's great genius lies in his dignity," said an Englishman who knew him well. "It is nothing short of royal !" He had grasped the great fact that the East must come to the West, not as a sycophant, not as a servant, but as Guru and teacher, and never did he lower the flag of his personal ascendancy. "Let Europeans lead us in Religion !" he would say, with a scorn too deep to be anything but merry. "I have never spoken of revenge," he said once. "I have always spoken of strength. Do we dream of revenging ourselves on his drop of sea-spray ? But it is a great thing to a mosquito !"

To him, nothing Indian required apology. Did anything seem, to the pseudo-refinement of the alien, barbarous or crude ? Without denying, without minimising anything his colossal energy was immediately concentrated on the vindication of that particular point, and the unfortunate critic was tossed backwards and forwards on the horns of his own argunment. One such instance occurred when an Englishman on boardship asked him some sneering question about the Puranas, and never can any who were present forget how he was pulverised, by a reply that made the the Hiindu Puranas, compare favourably with the Christian Gospels, but planted the Vedas and Upanishads high up beyond the reach of any rival. There was no friend that he would not sacrifice without mercy at such a moment in the name of national defence. Such an attitude was not, perhaps, always reasonable. It was often indeed , frankly unpleasant But it was superb in the manliness that even enemies must admire. To Vivekananda, again, everytning Indian was absolutely and equally sacred,—"This land to which must come all souls wending their way Godward !" his religious consciousness tenderly phrased it. At Chicago, any Indian man attending the Great World Bazar, rich or poor, high or low, Hindu, Mohammedan, Parsi, what not, might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment, and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have cost them his presence.

He was himself the exponent of Hinduism, but finding another Indian religionist struggling with the difficulty of presenting his case, he *sat down and wrote his speech for him*, making a better story for his friend's faith than its own adherent could have done!

He took infinite pains to teach European disciples to eat with their fingers, and perform the ordinary simple acts of Hindu life. "Remember, if you love India at all, you must love her as she is, not as you might wish her to become" he used to say. And it was this great firmness of his, standing like a rock for what actually was, that did more than any other single fact, perhaps, to open the eyes of those aliens who loved him to the beauty and strength of that ancient, poem—the common life of the common Indian people. For his own part, he was too free from the desire for approbation to make a single concession to newfangled ways. The best of every land had been offered him, but it left him still the simple Hindu of the old style, too proud of his simplicity to find any need of change. "After Ramakrishna, I follow Vidyasagar!" he exclaimed, only two days before his death, and out came the oftrepeated story of the wooden sandals coming pitter patter with the Chudder and Dhoti, into the Viceregal Council Chamber, and the surprised "But if you didn't want me, why *did* you ask me to come?" of the old Pundit, when they remonstrated.

Such points, however, are only interesting as personal characteristics. Of a deeper importance is the question as to the conviction that spoke through them. What was this? Whither did it tend? His whole life was a search for the common basis of Hinduism. To his sound judgment the idea that two pice postage, cheap travel, and a common language of affairs could create a national unity, was obviously childish and superficial. These things could only be made to serve old India's turn if she already possessed a deep organic unity of which they might conveniently become an expression. Was such a unity existent or not? For something like eight years he wandered about the land changing his name at every village, learning of every one he met, gaining a vision as accurate and minute as it was profound and general. It was this great quest that overshadowed him with its certainty when, at the Parliament of Religions, he stood before the West and proved that Hinduism converged upon a single imperative of perfect freedomso completely as to be fully capable of intellectual aggression as any other faith.

It never occurred to him that his own people were in any respect less than the equals of any other nation whatsoever. Being well aware that religion was their national expression, he was also aware that the strength which they might display in that sphere, would be followed before long, by every other conceivable form of strength.

As a profound student of caste,—his conversation teemed with its unexpected particulars ano paradoxes ! he found the key to Indian unity in its exclusiveness. Mohammedans were but a single caste of the nation. Chrjstians another, Parsis another, and so on ! It was true that of all these (with the partial exception of the last), non-belief in caste was a caste distinction. But then, the same was true of the Brahmo Samaj, and other modern sects of Hinduism. Behind all alike stood the great common facts of one soil ; one beautiful old routine of ancsertal civilisation ; and the overwhelming necessities that must inevitably lead at last to common loves and common hates.

But he had learnt, not only the hopes and ideals of every sect and group of the Indian people, but their memories also. A child of the Hindu quarter of Calcutta returned to live by the Ganges-side, one would have supposed from his enthusiasm that he had been born, now in the Punjab, again in the Himalayas, at a third moment in Rajputana, or elsewhere. The songs of Guru Nanak alternated with those of Mira Bai and Tanasena on his lips. Stories of Prithvi Raj and Delhi jostled against those of Chitore and Pratap Singh, Shiva and Uma, Radha and Krishna, Sita-Ram and Buddha. Each mighty drama lived in a marvellous actuality, when he was the player. His whole heart and soul was a burning epic of the country, touched to an overflow of mystic passion by her very name.

Seated in his retreat at Belur, Vivekananda received visits and communications from all quarters. The vast surface might be silent, but deep in the heart of India, the Swami was never forgotten. None could afford, still fewer wished, to ignore him. No hope but was spoken into his ear,—no woe but he knew it, and strove to comfort or to rouse. Thus, as always in the case of a religious leader, the India that he saw presented a spectacle strangely unlike that visible to any other eye. For he held in his hands the thread of all that was fundamental, organic, vital ; he knew that secret springs

of life; he understood with what word to touch the heart of millions. And he had gathered from all his knowledge a clear and certain hope.

Let others blunder as they might. To him, the country was young, the Indian vernaculars still unformed, flexible, the national energy unexploited. The India of his dreams was in the future. The new phase of consciousness initiated today through pain and suffering was to be but first step in a along evolution. To him his country's hope was in herself. Never in the alien. True, his great heart embraced the alien's need, sounding a universal promise to the world. But he never sought for help, or begged for assistance. He never leaned on any. What might be done, it was the doer's privilege to do, not the recipient's to accept: He had neither fears nor hopes from without. To reassert that which was India's essential self, and leave the great stream of the national life, strong in a fresh self-confidence and vigour, to find its own way to the ocean, this was the meaning of his Sannyasa. For his was pre-eminently the Sannyasa of the greater service. To him, India was Hinduistic, Aryan, Asiatic. Her youth might make their own experiments in modern luxury. Had they not the right? Would they not return? But the great deeps of her being were moral, austere, and spiritual. A people who could embrace death by the Ganges-side were not long to be distracted by the glamour of mere mechanical power.

Buddha had preached renunciation, and in two centuries India had become an Empire. Let her but once more feel the great pulse through all her veins, and no power on earth would stand before her newly awakened energy. Only, it would be in her own life that she would find life, not in imitation; from her own proper past and environment that she would draw inspiration, not from the foreigner. For he who thinks himself weak is week; he who believes that he is strong is already invincible. And so for his nation, as for every individual, Vivekananda had but one word, one constantly reiterated message:

"Awake! Arise! Struggle on,
And stop not till the
Goal is reached!"

SWAMI VIVEKANANDA AS A PATRIOT

Perhaps the distinguishing feature of the Swami's patriotism was the fact that it was centered in the country itself. Like all religious teachers in India he had a more complex and comprehensive view of what constituted the nation than could be open to any lay mind. And he hoped for nothing from the personality or the methods of the foreigners. He occasionally accepted Europeans as his disciples, but he always disciplined them to the emphatic conviction that they "must work under black men."

Before meeting his own Guru, Ramakrishna Paramahamsa, he may be said to have imbibed completely all that the Europeanising movement among his own people had to give. His whole life from this point becomes a progressive recapture of national ideals. He was no student of economic sociality, but his Asiatic common sense and brilliant power of insight were of themselves enough to teach him that the labour-saving mechanism of the far West,—where vast agricultural areas have to be worked single-handed—could only be introduced to the remote East,—where a tiny plot of land maintains each its man or men—at the cost of overwhelming economic disaster. He was eager indeed to see the practicability of modern science developed among his own people, but this was rather with the object of giving a new and more direct habit of thought than with any outlook on the readjustment of conditions. He probably understood as well as any university student of the West, (for scholars there are the only people who understand the actual bearing of national and economic questions ! statesmen certainly do not !) that the problem of Asia today is entirely a question of the preservation of her old institutions at any cost, and not at all of the rapidity of innovation. He was no politician : he was the greatest of nationalists.

To him the very land was beautiful,—"The green earth, mother !" The organisation of labour through all its grades, the blossoming of ideals, the fruitage of social and spiritual powers, of thought and deed, represented a mine of wealth from which his great mind and passionate reverence could perpetually draw forth new treasures of assimilated thought for the guidance and enlightenment of cruder people. It was not the religion alone, or the philosophy

alone, or the Indian Samadhi alone that spoke to the world through this great teacher. He was a perpetual witness, he was as the flood-gate of the mighty torrent, of the national genius itself. His great pugilistic energy was absorbed in the task of defence and not of aggression. He understood exhaustively all that could be urged by the opponents of caste for instance. He could say more brilliant things in its defence than anyone else living. But the one point that was clear to him when such disputes arose was the necessity of a strength that would deal with its own questions, and make or unmake its own castes old or new at will.

It was useless to plead to him the morality of his people as a proof of their well-being. He would point out only too promptly that not one of them was so moral as any corpse! Life! let it bring order or disorder, strength, though it might entail turmoil and sorrow,—these, and not petty reforms were the goal of his patriotism. But it must be the nation's own life, proper to her own background. *India must find herself in Asia, not in a shoddy* Europe "made in Germany"! The future would not be like the past, yet it could be only firmly established in a profound and living reverence for that past.

This was why the Swami aimed so persistently, so pertinaciously at discovering the essentials of the national consciousness. This was why no smallest anecdote, no trifling detail of person or of custom, ever came amiss to his intellectual net. This was the meaning of his great search for the common bases of Hinduism. Let a still greater future be built upon the mighty past. Let every man be Bhisma or Yudhisthira and the Mahabharata lives again. His great cry—"We are under a Hypnotism! We think we are weak and this makes us weak! Let us think ourselves strong and we are invincible," had a national as well as a spiritual meaning. He never dreamt of failure for his people, any more than he tolerated the superficial criticisms of exuberant fools. To him India was young in all her parts. To him the ancient civilisation meant the inbreeding of energy through many a millennium. To him the destiny of the people was in *their* own soil, and the *destiny of the* soil was no less in its own people.

SWAMI VIVEKANANDA

When I come before you this evening to talk to you about Swami Vivekananda you will remember that I come to speak as his disciple and his daughter. It is impossible for me to give you to calm, cold and critical account of my great master that you would expect from a historian or a journalist. I have come to offer you my own sincere and faithful experiences. Stories have been told of his early childhood, of his wandering dreams, his devotion to Shiva, his being locked up by his mother on account of his strange divine notions, and his University education. His Sanskrit learning led him to abandon loyally and beneficially all the superstitious notions and to stand face to face with realities. His devotion to truth became unassailable. With his marvellous intellectual endowments he stood equipped, at the age of fifteen, with a considerable degree of enthusiasm, education and development of the heart and mind, and at that age he began to wander in the woods and jungles to search for the great Hanuman to find out truth. Time after time he returned disconsolate, for no Hanuman was there. Then there came a day when, while he was rambling in the garden of the great Temple on the banks of a river he met one, who answered his question "Have you seen God ?" by saying "Yes, my child. I have seen God and I will teach you how to see Him". That person was Sri Ramakrishna Paramahamsa. I don't know, if you, in Bombay, are deeply acquainted with his life. He was, if I may so put it, the heart and soul of my own Guru, Swami Vivekanada. He was born some sixty years ago, and about forty years ago, that is, towards the beginning of the present era, he came to establish himself as a priest in the Temple of Kali. His ideal of Mukti is to be found in the Upanishads and in the Vedas. His theory of Mukti is contained in the writings of the Bhagavad Gita. He wandered through the Mahommedan graveyards. slept there, called aloud the name of Allah—ate Mahommedan food and his opinion was that a Mussalman was absolutely as accessible to the divine grace as any child of the Aryan race. Similarly he laid himself at the foot of Christ, turned an Indian Christian, identified himself with all the possible external details of Christian life, and was convinced that Christ himself was indeed a way to truth and light as much as Mother Kali. It was to this man that my Guru came at

the age of eighteen, then full of windy talk in English about Idolatry, about the necessity of breaking the Zenana system and about the despicable character of Indian civilization, but his association with Sri Ramakrishna helped him in his realization of truth and enabled him to fight the intellectual battles of different nations. Wandering from place to place he came to the West and on its own ground invaded its religious consciousness as a master and conqueror. Some of us have learnt to believe that these two souls were indeed one great soul manifested into two souls for regenerating and rejuvenating Indian life.

It would be impossible for me to give you the slightest perception of the unity of your Eastern life. Eastern life gives to me my fullest consciousness. I regret so deeply that I was born in another country. So far as my own perception of the unity of the Eastern life is concerned, India is not deficient in any way in the power of tremendous unity; she is not in any way inferior to any people whatsoever of this earth; she is the greatest of the great in this world. She has double the power of other nations and practises it only on the very highest plane for the good and not for the evil of the, other nations. I ask you, how much would Swami Vivekananda have been able to accomplish even with his mighty and overwhelming genius, had it not been for the twelve or fifteen men whom he had behind him? How much would have possibly been done, had it not been for the steady co-operation of the men behind him? It is a wondrous thing, this unique Indian consciousness! These two Sannyasis dedicated their whole lives to the service of the whole world—to the redemption of the whole world.

The education of Swami Vivekananda may be divided into different stages comprising the amassing of the instrument of research and the study of English and Sanskrit at the University. His study of Sanskrit supplied him with the key of the Shastras. That key came into the hands of the man, who had himself sounded the depth of salvation. It was, however, after his meeting Sri Ramakrishna Paramahamsa that the Swami went out across the country and lived now with a scavenger and now with a Brahmin; and now with a Shaiva and now with a Vaishnava and it was only then that he completed his own great realization. It was for this reason, I take it, that Sri Ramkarishna Paramahamsa once for all put

his personal unconscious life in Swami Vivekananda, and that Swami Vivekananda, once for all, by direct and thounder-like touch, perceived that strength. Strength is religion and not Salvation alone. You will remember that the Swami himself after his return to Madras in the year 1897 declared that the world "Vedanta" must be given a wider meaning. We have been a little faltering and a little thin in our conception of the word "Vedanta" when we take it to mean only a formulated philosophy. It could never have that meaning at all. Do you imagine that the great Shankaracharya understood that word in that sense? In one sense "Vedanta" was nothing but an expression of national life including a thousand different forms of religion, because it expresses the attitude of each one of those religions to the other. And what is that attitude? That none of these faiths is destructive to another. Vedanta philosophy is full of religious genius and is like a kindergarten class for religious education. The great ideas of Brahmacharya and Sannyasa are now being realised in England and America. The Swami in the strength of his own personal character and his own personality impressed upon us the deep meaning of Hinduism, and it struck us as the solution of the whole difficulty of our idea of true religion—it was the superconsciousness of life itself. That was the doctrine which he held up to be his own on the basis of the Hindu religion. But we have reached this great formula and also the great conception of life itself with the authority, not of a single personality, not with the authorityof a single Guru, but in the life and literature of persons who lived three thousand years age.

The Swami has done great work in the West. He has also done that work by moving among different nations, regardless of colour, race, creed, history or traditions. He did that work in the midst of their suffering, in the midst of their belief and in the midst of their happiness, going here and going there, regardless of whether death would find him on the snows of the Himalayas or in some Western places frozen, or starved, or what not. He took it that consciousness of life was a nucleus of national unity. I think that there is no economic problem of more consequence in this country, that there is no social problem of any greater consequence to this country and that there s no educational problem of more consequence to this country than

that great problem, namely, "How India should remain India ?" That is a great problem. The answer is, "by means of the national consciousness." I do not say "national existence," for national consciousness remains intact ; it does not die. I ask you to adopt his principles, and be true to yourselves because truth is a mighty treasure that you hold and you hold it not for your own benefit but for the benefit of the world, of the suffering humanity.

SWAMI VIVEKANANDA'S MISSION

As far back as 1877, one afternoon, there went to the garden of aksbineshwar a company of college boys to pay a visit to the s cred temple of the Holy Mother where they saw an old Sadhu in the midst of a group of Brahmins; friends and hangers-on and a lot of other people. The Sadhu was sitting in a little room of the temple when there entered this company of college boys. The Sadhu happened to turn to one amongst them, one who had nothing then to distinguish him from the rest of the company. He asked the young collegian to sing, and as the little room echoed with the song of Ram Mohan Roy sung by the youth the old Sadhu looked upon him with a look of recognition and between them passed a signal of exchange. The song was over and the old Sadhu bent forward and embraced the youth exclaiming, "Ah! Why did you not come before? I have been searching for thee these three years." Then began the six years' struggle between the Sadhu and his young disciple. The struggle ended, ended by the capture of the Guru by the disciple, the capture of brother-disciples. And strong personality was infused into the young collegian by the teacher and then out went to the world the modern St. Paul of the natinal movement.

The youth educated on Western lin s at an Indian University, had that Indian power of thought with Westcrn hold of scientific learning; had that doubt and scepticism wh ch charcterises the modern youth, but with a passionate hunger for truth. He had very little belief in old ways and methods and customs which he used to refer to in the ironical and sarcastic ways of his age. This youth came in later life to be known as Swami Vivekananda. In his childhood he used to go from sage to sage with his question—"Have you seen God?" Once, it is said, he saw Maharshi Devendranath going in a boat on the Ganges. The boy at once swam and climbed up the boat and stood before the Maharshi. Then out came the usual question. But the Maharshi could not but reply in the negative. The boy went from teacher to teacher with the self-same question only to return home broken-hearted at the answer he received. In his babyhood he was asked to look for Hanuman in the Ramayana. He went, opened the book, scanned

it but in vain did he search for him. He had from his boyhood that passion for truth that won for him no mean worship in a foreign country. The soul of the Sadhu spoke with the soul of the boy and the Guru impressed on the boy those blazing points of his. The favourite question "have you seen God" was put to the Sadhu, who with immeasurable love replied that he had, and that the lad would see Him too. All saw the lad pass into utmost Samadhi, a human cry escaped his lips as he woke up as if at a separation unwished for. But the Sadhu said, "the mercy that is refused thee now will be thine. Weep, weep and weep thy heart out."

Such was the meeting between this young collegian with his scepticism and doubt and this ignorant Fakeer, this worshipper of Kali,—of that image neither of wood nor stone nor painted with grim colours, but that image. horrible, aboriginal. too cruel against which the revolt of the pure side of the twentieth century would crush—that image of Kali, the image with which are blended the associations of early orthodoxy. Before that horrible image stood the lad till horror grew full upon the lad and he could not stand the idea. But then the truth in the man drew the lad nearer and such love did the lad cherish for his Guru that he left home and adoring friends and guided by a strange element he came to serve him with all the ideas of an old Hindu student for his Guru. For the Sadhu he had only an anxious attitude of reverence and worship. Patience and hardship were the accompaniments of the boy. But the fond love and adoration for the Guru made the boy great ; provided him with a band of brothers, a band of devoted friends ; supplied him with that courage which made him not to shrink from eating with Mlechhas ; filled him with that Bhakti and discipline which stood him in good stead in afterlife. Such was the influence of that Guru that when time came, the world saw a level of brotherhood and friendship—not of a mean order—rise in response to the call of their brother to proclaim to the world the mission preached by the life of one whom the world reveres.

It is inexplicable to us that the God of the Universe, who sends down the rivers that roll down seawards, sends down a band of companions and fellow-workers when time comes to follow up the work of a noble soul. How beautiful, how noble, how elevating is the picture of the disciple sitting at the feet of his Guru, year after

year, absorbing the power of the Master, strange and inexplicable in itself, and appreciating the communicative nature of his Guru,—communicative of the horrible secret of which he possessed. The experiences of his Guru conquered the lad and that sceptic of a youth believed in the power of the dread Mother,—a youth with hopes, anxiety and fears produced on the mind by the Western education. The youth imbibed the strength of the Guru and came out possessed of the blessings of India's past in all completeness. The Guru saw visions but the disciple believed not in them and thought that his Guru was old and brainsick and the visions were so many productions of his weak brain. At last the youth came to realise that the visions were no brainsick adulations of an old Sadhu but were truths—truths sent down to his Guru by the dread Mother. So great a master did the youth become that one afternoon came an old woman with her stories of visions which she saw. The old Sadhu referred the woman to the boy. She recounted them to him and then the youth told her that her visions were truth and nothing but the truth. The Guru's power was inexplicably great ; he made single actors play dramas ; his touch made people saints ; his sweet words were as Ganges water to the troubled and sinful hearts. He was a strange mixture of superstitions and the wonderful insight into truth. And who was this Guru ? He was Ramakrishna Paramahamsa—a priest of Kali in a temple built by a lady—a priest too orthodox in his views, eating the Prasad of the Goddess and performing the Puja. But when the Goddess sent down her blessings he abandoned his family and friends, and, seized with truth and visions that he saw, he would lapse into Samadhi. His soul was set on God and the grim Mother and reached that place which was behind all forms of prayers—which no image reached till in his last Samadhi he reached the unattainable and uttermost peace and passed on to a place beyond all understanding.

Out went the disciple with the mission of his Guru on an eight years' wandering in India and foreign lands, avoiding publicity and seeking rest and meditation till at last one finds him a yellow-clad beggar in America in that memorable assembly, the Parliament of Religions. There for the first time the mission of his Guru was voiced forth before an assembly which knew very very little about the religion of the Hindus. It was

the mision of India, of her people and of the ideas of her people. In one of the diaries written by one who was present there, we find what struck the writer most in that "orgie of religions dissipation was the strange man's passion for his own people." His speech was one about Hindu belief and whatever he said and taught was Hindu, essentially Hindu. To proclaim to the world the mission of his teacher he had three things within him which fitted him for the work. He was educated on English lines at an Indian University. He had the complete ability of studying facts and things from the modern standpoint. He had the knowledge of Sanskrit. To all these were added the vision of the Guru, and his knowledge of India as a whole. He was sent to teach what was true in a religion, true for the East as well as for the West, and to explode the miserable sophistry about religion.

For the last time at the Paris University in 1900 he spoke out to the West the mission of his teacher. The interpretations of his religion which he gave there were accepted by the highest in the English and American worlds as some of the highest culture. His work glorified that humble life in the garden of Dakshineswar and restored to Asia her leadership in the sphere of thought. Europe could very easily grasp the doctrine of evolution and other scientific dogmas but all religious activity is the ground of Asiatic intellect.

His mission to you, his own countrymen, is what you have the strength to make it. His mission depends upon your activity, faith and understanding and above all on courage. Fail not in courage. May the blessing of the great Mother be upon you; may you be drunk with strength and energy to unite together in bonds of brotherhood, bonds stronger than iron ones.

SWAMI VIVKANANDA'S MISSION TO THE WEST

Nothing is more difficult to disentangle than the history of a definite religious idea. Even things apparently so historically originated, as the annual religious mourning of the Christians and Mahommedans may possibly be traceable to the yearly weeping of the Phoenician by the banks of the Adonis, over the waters, reddened by the blood of the slain God. Yet a few facts stand out more or less plainly. Religious ideas spring up spontaneously as does language in geographical areas. Vaguely they seem to be more or less ssociated with religion and with race. The Jamuna, for instance, ppears to be the home of a great nexus of ideals, centering in Brindavan, and the Ganges of another belonging to the North. The political and ethnological movements of history are the occasions of union for such systems. They meet and unite, perhaps to cleave again in different directions, along other lines, like fields of Polarice. In this way the outstanding religions of the world today have come into being, and most interesting to notice is Christianity, the faith of the West the result of that particular consolidation of nations, Eastern and Western, which is known as the Roman Empire. But these meetings of races and mythologies always have the effect of destroying a people's faith in the historic credibility of their local mythology, and this shock Christendom, at least Protestant Christendom, has recently undergone. It is impossible to hold the old faith in the literal accuracy of the story of Bethlehem of India, when we learn for the first time the details of the older tales of Mathura. Moreover, the birth of modern science has confronted the intellect of Europe with the problems of qualily. It has become clear that Europe is living under the shadow of Semitic conceptions of Good and Evil, not because she has chosen to do so, but because she has not yet been able to shake herself free of them. Such are the religious conditions consequent on the modern discovery of the world as a whole. Such became the state of thought in the West as soon as the inclusion of India in the circle of English-speaking contries brought the Aryan intellect within the sphere of purely Aryan thought. It was under these conditions that Swami Vivekananda made his historic pronouncement in the West with regard to the religious ideas of the East. Like the

youug Buddha making pilgrimage to Nalanda, there to test th strength and vigour of the teaching of his own Guru Kapil Vivekananda went out in the might of a great life, that of Rama krishna Paramahamsa. But that life had been amplified an deepened in time by his wanderings over the whole of India. It wa "the religious ideas of the Hindus" of which he stood before th culture of the West to speak. Through him more than 200 million of men became eloquent. A whole nation, a whole evolution, stoo on their trial. And out of the work done by him during four yea in the West, two ideas emerge into special clearness as dominati factors in the future evolution of a consolidated *religion*, pronounce by him for the first time with authority. One is that favourite saying, in which he constantly sums up the life of Ramakrishna Paramahamsa. To a world which has learnt to deny that any religion is true in the sense in which *it* is *accepted*, he well affirms that in a higher and truer sense, all *religions* are true. "Man proceeds from truth to truth, and not from error to truth." And the other *is* the doctrine of unity, *the doctrine that* culminates in the Adwaita Philosophy, "one behind Good and Evil, one behind pleasure and pain, one behind form and formless. Thou art He ! Thou art He O my soul !"

We must not shrink from the claim that here spoke a world-voice. What we have to learn in this matter is to think greatly enough of our time, greatly enough of the presence under which we are gathered together today, in the era of the discovery by the human consciousness of the world as a whole, we have seen with our eyes and heard with our ears, one whose voice with the centuries will become only more and more potent, one who shall avail to bring clearness and light, to bring unnumbered souls, one for the touch of whose feet many now unborn, in countries we have never seen, shall yearn unspeakably and yearn in vain.